বর্ত্তিকা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

বর্ষ—২৫ সংখ্যা—১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিক

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

১। চিত্রাবলি ও সূত্রাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২। আমার প্রথম প্রণাম	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
৩। কলোরার উজীররা	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
৪। যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	৩৯
৫। গান	রবি গুপ্ত	৫১
৬। সৌর কলঙ্ক (কবিতা)	অনির্বাণ	৫২
৭। মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৫৭
৮। প্রশ্নোত্তর	শ্রীমা	৭৬
৯। কবি দীর্ঘতমার সূর্যস্তব (অনুবাদ)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮৭

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

1963

Let us prepare for—
the Hour of God

১৯৬৩

দেব-মুহূর্ত এসেছে—প্রস্তুত হও।

শ্রীমা

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

ভগবানের কাছে যে বর আমরা ভিক্ষা করেছি, তা হল পৃথিবীর পক্ষে পরমেশ্বরের কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর-ভিক্ষা—তা হল সব চেয়ে কঠিন যে পরিবর্ত্তন, যার দাবির মাত্রা সব চেয়ে বেশি—জড়ের মধ্যে পরম সত্যের ও শক্তির অবতরণ, জড়ের স্তরে ও চেতনায়, জড়ের জগতে অতিমানসের প্রতিষ্ঠা, জড়ের তত্ত্বে অবধি অখণ্ড রূপান্তর। এর কম কিছু নয় আর এ অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে শুধু এক ভাগবত করুণা।

পরাশক্তি জড়তম চেতনার মধ্যে নেমে এসেছে—কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘন স্থূল-যবনিকার অন্তরালে; প্রকট হবার জন্যে, তার বিপুল ব্যক্ত ক্রিয়া আরম্ভ করবার জন্যে তার দাবি হল পরম-করুণার অনুকূল এক সত্যকার ও ফলপ্রদ ব্যবস্থার আয়োজন।

পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, কেবল ভাগবত প্রভাবের দিকে একান্ত আত্ম-উন্মীলন, সত্যকে নিরন্তর সম্পূর্ণ গ্রহণ আর মিথ্যার সেই রকম বর্জ্জন—এই হল সেই ব্যবস্থার অঙ্গ। কিন্তু এদের চাই পূর্ণভাবে পালন করা, কোন কুণ্ঠা না রেখে, কোন ছল না করে, সহজ ভাবে, আন্তরিক ভাবে, স্থূলতম চেতনায় ও তার ক্রিয়াবলিতে পর্য্যন্ত।

শ্রীঅরবিন্দ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

ভক্তি

বিফলতাকে অসম্পূর্ণতাকে দোষের বলে যে বাতিল করে, সে ভগবানকেই বাতিল করে—নিজের অন্তরাত্মাকে সঙ্কীর্ণ করে, নিজের দৃষ্টিকে প্রতারিত করে—দোষ দেখে নয়, কিন্তু প্রকৃতিকে দেখে চলবে, তোমার সব মানুষভাইকে সাহায্য করবে, নিরাময় করবে, তোমার সহানুভূতি দিয়ে তাদের সামর্থ্য, তাদের সাহস বাড়িয়ে তুলবে।

*

নরকে ভালবাসা, নারীকে ভালবাসা, জিনিষকে ভালবাসা, তোমার পরিজনকে ভালবাসা, দেশকে ভালবাসা, জীবজন্তুকে ভালবাসা, মানবজাতিকে ভালবাসা—সবই হল ভগবানকে ভালবাসার প্রতিবিম্ব এই যত জীবন্ত মূর্ত্তিতে। ভালবাসবে, বীর্য্যবান হয়ে সমস্তকে নিয়ে যা সব ভোগ করতে, সমস্তকে সাহায্য করতে, ভালবাসতে চিরকালের জন্য।

*

যদি এমন জিনিষ কিছু থাকেই যা ভগবানের মহত্তর মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত কি পরিবর্ত্তিত হতে আদৌ চায় না, তবে তাদের ধ্বংস করতে পারা যায়, কিন্তু হৃদয়ে স্নেহ থাকবে, আঘাতে যদিও থাকবে নির্ম্মমতা। কিন্তু আগে স্থির নিশ্চিত হও যে ভগবানই তোমাকে দিয়েছেন তোমার তরবারী আর তোমার ব্রত।

*

প্রতিবেশীকে আমি ভালবাসব, সে নিকটে আছে বলে নয়—নিকট আর দূরের মধ্যে কি আছে? এ জন্যও নয় যে শাস্ত্রে বলে সে আমার ভাই—কারণ সে ভ্রাতৃত্বের মূল কোথায়? তা নয়, তবে এই কারণে যে সে হল আমি নিজেই। নিকটত্ব আর দূরত্ব শরীরের সম্বন্ধে, [illegible] ছাড়িয়ে যায়। ভ্রাতৃত্ব হল রক্তের সম্বন্ধ, দেশের সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সম্বন্ধ কিম্বা মানবীয় সম্বন্ধ; কিন্তু স্বার্থ যখন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন কি হয় এ রক্তগত ভ্রাতৃত্বের? কেবল যদি ভগবানের মধ্যে বাস করতে পার, তাঁর যে বিশ্বব্যাপী একত্ব সেই ছাঁচে যদি ঢালতে পার তোমার মনকে হৃদয়কে দেহকে তবেই সম্ভব হবে সেই গভীর নিঃস্বার্থ অপ্রতিহত প্রেম।

*

*

শ্রীকৃষ্ণের যখন আমি বাস করি তখন অহং আর স্বার্থ অন্তর্হিত হয়, কেবল ভগবানই তাঁর ছন্দে গুণান্বিত করেন আমার অতল অসীম প্রেমকে।

*

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তুমি যদি বাস কর, তবে শক্রতা হয় প্রেমেরই খেলা, ভায়ে-ভায়ে বন্ধুক্রীড়া।

*

যে জীব ধারণ করেছে পরম ব্রহ্মানন্দ, তার কাছে জীবন কখন পাপসৃষ্টি কি দুঃখের যাত্রা হতে পারে না। বরং সমস্ত জীবনই তার হয়ে ওঠে এক দিব্য প্রেমিকের ও খেলার সাথীর উচ্ছলিত প্রেম ও হাসি।

*

তুমি কি ভগবানকে দেখতে পার নিরাকার অনন্তরূপে, তবুও তাঁকে ভালবাসতে পার মানুষ যেমন উপপত্নীকে ভালবাসে তেমনি করে? তা হলেই বলব অনন্তের উর্দ্ধতন সত্য তোমার কাছে ব্যক্ত হয়েছে। অনন্তকে কি তুমি এক নিগূঢ় আলিঙ্গন-যোগ্য দেহ পরিয়ে দিতে পার, তাঁকে দেখতে পার এই সব দৃষ্টিগোচর, স্পর্শলভ্য প্রত্যেকটি দেহের ভিতরে? তাহলে বলব তোমার অধিকারে এসেছে অনন্তের বৃহত্তর গভীরতর সত্য।

*

ভাগবত প্রেমের দুপাশে দিব্য লীলা—এক বিশ্ব-গতি, গভীর, স্থির, তলহীন, যেন মহা-সাগরের নিভৃত অন্তর, সমস্ত সৃষ্টির উপর তার চেতনা প্রসারিত, প্রত্যেক জিনিষ যেন রয়েছে সমতলে, সমান চাপ প্রত্যেকের উপর, আবার তাদের রয়েছে একটা চিরন্তন গতি, তেজোময়, তীব্র, আনন্দোচ্ছল, সেই সাগরেরই তরঙ্গায়িত বুকের মত—সেই সাগরই ত তার তরঙ্গ-রাজির শক্তি ও প্রবেগ দিয়ে বৈচিত্র্য এনে দেয়, নির্দ্ধারণ করে কোন বস্তুটির উপর সে ধেয়ে পড়বে এসে তার ফেনপুঞ্জের, তার শীকররাজির চুম্বন নিয়ে, তার পরিপ্লাবনী জলধারায় আলিঙ্গন দিয়ে।

*

এক সময় বেদনাকে আমি ঘৃণা করতাম, তাকে এড়িয়ে চলতাম, তার আক্রমণে ক্লিষ্ট হতাম—কিন্তু এখন আমি দেখছি যদি দুঃখকষ্ট না পেতাম তা হলে আমার মনে হৃদয়ে দেহে এই যে আনন্দের অসীমভাবে, বহুলরূপে রসগ্রহণ-সামর্থ্য তা আমি আয়ত্ত করতে পারতাম না, পরিমার্জিত করে, পরিপূর্ণ করে তুলতে পারতাম না। ভগবান যদি উৎপীড়কের অত্যাচারীর মুখোস পরে এসে দেখা দেন, পরিণামে তারও সার্থকতা তিনি প্রমাণ করে দেন।

*

আমি পণ করলাম জগতের দুঃখে, জগতের মূর্খতায় অজ্ঞতায় অন্যায়ে আমি ব্যথিত হব না—আমার হৃদয়কে তাই কঠোর করে তুললাম, যাঁতার নীচের পাথরখানার মত সহ্য

করবার ক্ষমতা দিয়ে, মনকে করলাম ইস্পাতের পীঠের মত মসৃণ। আমি আর দুঃখভোগ করলাম না, কিন্তু সুখভোগও অন্তর্হিত হল আমার কাছ থেকে। তখন ভগবান এসে আমার বুক ভেঙ্গে দিলেন, মনকে চষে দিলেন। নিষ্ঠুর নিরন্তর মর্মযন্ত্রণার ভিতর দিয়ে আমি উঠে গেলাম একটা আনন্দময় নির্বেদনার মধ্যে, দুঃখের, রোষের, বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হলাম এক অসীম জ্ঞান ও অটল শক্তির মধ্যে।

*

যখন আমি দেখলাম বেদনা হল আনন্দের বিপরীত দিক, আনন্দের অনুশীলন, তখন আমি চাইলাম আঘাতের পর আঘাত যেন আমার উপর স্তূপীকৃত হয়, যেন আমার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা পুঞ্জীভূত হয়—ভগবৎ-দত্ত জীবনও তখন আমার কাছে মনে হয় স্তিমিত, তুচ্ছ এবং নিষ্ফল। তখন আমার প্রিয় আমাকে নিরস্ত করতে বাধ্য হল, বলে উঠল, "থাম, থাম—আমি যে আঘাত দেই, তাই যথেষ্ট।"

*

প্রাচীন সন্ন্যাসীদের তপস্বীদের আত্ম-পীড়ন হল বিকৃতি, অজ্ঞান। কিন্তু তাদের এই বিকৃতির অন্তরালে ছিল এক নিভৃত জ্ঞানের উৎস।

*

ভগবান আমাদের জ্ঞানী আদর্শ বন্ধু; কারণ তিনি জানেন কখন আঘাত দিতে হবে আর কখন আদর করতে হবে। কখন আমাদের প্রাণ ছিনিয়ে নিতে হবে, কখন আবার বাঁচিয়ে রাখতে হবে, উদ্ধার করতে হবে।

*

বিশ্বজনের দিবা-বন্ধু তাঁর বন্ধুত্ব তিনি ঢেকে রাখেন শত্রুর মুখোস পরে, যত দিন তিনি আমাদের তৈরী করে না তুলতে পারছেন ঊর্ধ্বতর স্বর্গের যোগ্য করে। তখন, যেমন কুরু-ক্ষেত্রে, সংঘর্ষের, কষ্টের, ধ্বংসের অধীশ্বর তাঁর বিশ্বরূপ সম্বরণ করেন, তাঁর যে সৌম্য, স্নিগ্ধ মূর্তি, কৃষ্ণের অতিপরিচিত বহু-আলিঙ্গিত দেহ ভাস্বর হয়ে দেখা দেয় তাঁর চিরন্তন সঙ্গী ও চেতনার সাথীর শিহরিত অন্তরাত্মা এবং পবিত্রশুদ্ধ দৃষ্টির কাছে।

*

দুঃখভোগ আমাদের সমর্থ করে তোলে আনন্দময়ের সমগ্র প্রবেগ আবেগ যাতে ধারণ করতে পারি—আরো আমাদের সমর্থ করে তোলে যাতে সহ্য করতে পারি শক্তিময়ের দ্বিতীয় লীলার ধারা। বেদনা হল চাবিকাঠি, খুলে দেয় সামর্থ্যের দুয়ার—বেদনাই হল রাজপথ, নিয়ে যায় আনন্দপুরীতে।

*

তবুও—হে মানবাত্মা! দুঃখের খোঁজে তুমি চলবে না, কারণ দুঃখ তাঁর কাম্য নয়, শুধু তাঁর আনন্দের খোঁজে চল। কষ্ট—সে ত আসবেই তোমার কাছে তাঁর দিব্যবিধান

অনুসারে, যতখানি তোমার পক্ষে প্রয়োজন ঠিক ততখানি—তখন তাকে সহ্য করে থাকবে, যাতে আবিষ্কার করতে পার তার অন্তরের বস্তু যে সুধাময়।

*

আবার, হে মানুষ, তোমার মানুষ-ভায়ের উপর দুঃখ কষ্ট হানবে না—একমাত্র ভগবানেরই আছে দুঃখ কষ্ট দেবার অধিকার আর আছে শুধু তাদের যাদের তিনি চাপরাস দিয়েছেন। কিন্তু সাবধান, "তোরকেমাদা"র* মত ধর্ম্মোন্মত্ততার বুদ্ধিভ্রংশের ফলে বিশ্বাস করো না তুমি তাদের একজন।

পূর্ব্বতন কালে যে সব বীর-আত্মা ছিল বীর্য্যে কর্ম্মশক্তিতে ভরাট, তাদের মুখের উদাত্ত বাণী ছিল, "ভগবান ত আছেন, তেমনি নিঃসংশয়"। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রয়োজন অনুসারে আর এক বাণী বেশী উপযুক্ত হবে, "ভগবান ত ভালবাসেন, তেমনি নিঃসংশয়।"

*

ভগবৎ-প্রেমিক কি ভগবৎ-জ্ঞানীর পক্ষে সেব-কর্ম্ম উপকারী, কারণ তাতে সে পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝতে পারে এবং সমাদর করতে পারে, জড়বস্তু নিয়ে ভগবানের বিচিত্র বিস্ময়কর কারু-কৌশল সব। ভগবৎ-জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করে, বলে ওঠে "দেখ চেয়ে, আত্মা কি রকমে জড়ের মধ্যে প্রকট হয়েছে"। ভক্ত বলে ওঠে "দেখ চেয়ে, আমার প্রিয়ের, আমার প্রভুর—পরম নিপুণ শিল্পী যিনি, তাঁর সর্ব্বশক্তিমান হস্তস্পর্শ।"

*

হে বিশ্বের রসিকপ্রবর! হে বিশ্ব-প্রহসন-রচয়িতা। তোমার জগৎ তুমি দেখে চলেছ, আর মনে মনে হাসছ সুমধুর। কিন্তু আমাকেও দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখাবে না তোমার জগৎ-জোড়া হাসি, সে হাসির ভাগ আমায় দেবে না?

*

কালিদাস তাঁর এক দুঃসাহসিক উপমায় বলছেন যে কৈলাসের তুষার-শিখর হল পর্ব্বতের উপর পুঞ্জীভূত মহাদেবের শুভ্র বিশ্ব-ব্যাপী অট্টহাস্য—সত্য কথা। এই ছবি হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় যখন, তখন জগতের ভাবনা-চিন্তা সব নিষ্প্রভ মেঘেরই মত গলে যায়, তাদের সত্যকার স্বরূপ যে শূন্যতা তাতেই মিলে যায়।

*

আত্মপুরুষের সবচেয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল এই যে যখন সে বিশ্ব-বিপত্তির বাহ্য আকার আর ভীতি-প্রদর্শনের তোয়াক্কা রাখে না তখন বিশ্ব-বিপত্তিকে আর চার পাশে কোথাও দেখা যায় না, তখনই ঐ সব ফাঁকা বায়ার বেষপুরুষের পিছনে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন ভগবান।†

---

* পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন স্পেনদেশীয় খৃষ্টীয় পাদরী—খৃষ্টীয় "পাষণ্ড-দলনে"র প্রতিষ্ঠান—Inquisition-এর প্রতিষ্ঠাতা।

† Thoughts and Aphorisms থেকে। অনুবাদক—নলিনীকান্ত গুপ্ত

আমার প্রথম প্রণাম

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

তোমরা মাকে না বলে চিনেছ ও ডেকেছ একরকম জন্ম থেকেই—যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই। আমাদের—বড়দের—সে সৌভাগ্য হয় নি—আমাদের জ্ঞান হয়েছে, চোখ ফুটেছে অনেক, অনেক দেরীতে—অনেকটা সময় আমাদের নষ্ট হয়েছে, বৃথা গিয়েছে। যা হোক, জান ত', never too late to mend; আর নষ্ট সময় পুনরুদ্ধার করা যায়, পুষিয়েও নেওয়া যায়—সে এক মজার রহস্য।

বলছি তাই মাকে তোমাদের চিনিয়ে দিতে হয়নি—মায়ের কোলেই ত' প্রায় তোমরা জন্মেছ ও বেড়ে উঠেছ। আমাদের বেলায় মাকে চিনিয়ে দিতে হয়েছে—আমরা যে এক সংসারের কোলেই জন্মেছিলাম ও বেড়ে উঠেছিলাম—যদিও তা মায়ের আর এক নামান্তরী রূপ।

মায়ের কথা প্রথম শুনি, আমাদের এখানে আসবার কিছু পরেই। শুনেছিলাম শ্রীঅরবিন্দের মুখে যে একজন মহিলা আছেন ফরাসী দেশে, প্যারী সহরে—তিনি একজন বড় সাধিকা। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চান। শ্রীঅরবিন্দ যে তাঁরই উদ্দিষ্ট মহাপুরুষ এ কথার প্রমাণ তিনি পাবেন একটি চিহ্ন দিয়ে—একটি জিনিষ তিনি পাঠাবেন শ্রীঅরবিন্দকে—যদি শ্রীঅরবিন্দ তা চিনতে পারেন। জিনিষটি হ'ল—শ্রীঅরবিন্দের সিম্বলটি—অঙ্কিত প্রতীক বা চক্র, যাকে বলা হয় Solomon's Seal। বলা বাহুল্য প্রমাণের পরে, এখানে আসবার ব্যবস্থা স্থির হ'ল। Monsieur Richard তখন আধ্যাত্মিক সাধনা ও চিন্তার অনুরাগী—এখানে আসবার তার একটা সুযোগও আবিষ্কার হ'ল—ফরাসী ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি নির্ব্বাচিত হতে পারেন কি না ফরাসী প্রতিনিধি সভায়—এই পদের প্রার্থী তিনি হতে চাইলেন। তখনকার দিনে ফরাসী ভারত থেকে দুজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হত ফরাসী দেশে, উচ্চতর সভায় (Sénat) আর নিম্নতর সভায় (Chambre des Députés)। এই নির্ব্বাচনের কথা আমি একবার বলেছি—এ উপলক্ষে এখানে এমন দলাদলি ছিল যে সে এক বাস্তবিক খুনোখুনি রক্তারক্তি, সাধারণের পক্ষে আতঙ্কের ব্যাপার।

প্রথমতঃ M. Richard এসেছিলেন একা—তদ্বিরের জন্য, পরে আসেন মায়ের সঙ্গে। শ্রীমা ও M. Richard এলেন বাহ্যতঃ নির্ব্বাচনের জন্য প্রচেষ্টা বা ভোট-সংগ্রহ অনুষ্ঠানের

জন্য। অবশ্য শেষে M. Richard বিশেষ কিছু ভোট পেলেন না,—কিন্তু এ তিনিধটি উপলক্ষ করে মায়ের দেখাসাক্ষাৎ হল শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ; বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধব, অনুগত মিলন করেকজন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমাকে একবার কারিকাল যেতে হয়—সত্যকার অর্থাৎ বাহ্যকার ভারতের এই প্রথম অভিজ্ঞতা তাঁর—তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল এমন একখানা ঘরে যার বিবরণ না নিজেই দিয়েছিলেন রহস্যছলে—যেমন অন্ধকার তেমনি অপরিষ্কার, জীর্ণ ও শ্বেতপিপীলিকা অধ্যুষিত। অর্থাৎ এই রকমেই 'সৌম্যা সৌম্যতরা অশেষ সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও অতি সুন্দরী' যে দিব্যজননী তাঁকে নেমে এসে প্রবেশ করতে হয়েছে মানুষী জীবনের কলুষকলনষের মধ্যে—নতুবা এ সব অভাজনের গতি কি ?

যখন প্রথম কথা উঠল এই রকম একজন 'মহীয়সী' মহিলা আসবেন এবং আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবেন, তখন সমস্যা উঠল আমাদের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা কি রকম হবে ? কারণ আমরা ত ছিলাম বেপরোয়া জীব সব—খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা, ঘোরা-ফেরা, কথাবার্ত্তা সব ছিল বাধাবন্ধনহীন মুক্তক ছন্দে। তদ্রসমাজে তা ঠিক চলে না। যা হোক, তবু সিদ্ধান্ত হ'ল নূতন অবস্থায় আমাদের মুক্তধারা যতটা সম্ভব বজায় রাখবই—আমরা কেন আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাধীনতাকে অবনত খর্বিত হতে দেব ? মানুষের অজ্ঞান অহংকার এই প্রকারেই তার নিজত্বের স্পর্দ্ধা ঘোষণা করে।

মা এলেন—শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা হত বিকেলে সমবেত বৈঠকে—নিজে তিনি কথা বলতেন খুবই কম। আমরা সেই সময়টা প্রায়ই বাহিরে বাহিরে কাটাতাম। মাঝে মাঝে তবু উপস্থিত থাকতাম। 'আর্য্য' পত্রিকার প্রস্তাবনা ও সূচনায় তিনিই সব ব্যবস্থাদির ভার গ্রহণ করেন গ্রাহকদের নামতালিকা নিজের হাতে লেখেন, হিসাবপত্র নিজেই রাখেন, সে সব খাতাপত্র এখনো বোধ হয় আছে। তারপর শ্রীঅরবিন্দের লেখা ইংরেজী থেকে ফরাসী অনুবাদ কার্য্যে (ফরাসী সংস্করণের আর্য্যের জন্য) এক তিনিই সাহায্য করেন M. Richard-কে। Duplcix House-এর নীচের তলায় বইএর ঠেক ছিল, আর গেই হাউসের নীচের তলায় ছিল আফিস—শ্রীমাই ছিলেন প্রধান বা সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ম্মকর্ত্রী। সপ্তাহে একদিন করে আমরা তাঁর ওখানে সকলে যেতাম শ্রীঅরবিন্দ সহ, সান্ধ্যভোজনের জন্য ; —একসঙ্গে আহার হত—দু'একটা পদ মা নিজে হাতে রান্না করতেন। পরেও, মা যখন ফিরে আসেন শেষবার, Bayoud House-এ এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল—বলেছি আগে আমি তা। এই সময়ে কয়েকজন যুবক নিয়ে একটা ছোটরকম গোষ্ঠীও তৈরী করে তুলেছিলেন, এ কথাও আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। তাঁর কর্ম্মের যাবার এক তৃতীয় ধারাও তখনই দেখা দিয়েছিল—কারবার ব্যবসা বাণিজ্য—এখন যেমন আমাদের মাঝে রয়েছে ব্যবসায়ী-ভক্ত এবং ভক্ত-ব্যবসায়ী ; মায়ের আশ্রয়ে, পরামর্শে চলেন যাঁরা—তেমনি সে যুগেও বীজাকারে দেখা দিয়েছিল এই একটা ধারা। আমাদের সৌরীন স্থাপন করলেন Aryan Stores—লক্ষ্য অর্থোপার্জ্জন—আমাদের অর্থকৃচ্ছ্রতা বেশ তখন তীব্র ছিল

—এখনো যে স্বচ্ছল তা নয়, তবু—এই ব্যাবসাদি বিষয়ে শ্রীমা এখান থেকে চলে যাবার পরেও জাপান থেকে সৌরীনের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন।

এক সময়ে মায়ের একটা বিশেষ কর্মযোগ দেখা দিয়েছিল বেড়ালদের নিয়ে। কেবল যে তিনি মানুষকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন তা নয়, পশুদের জগৎ এবং গাছপালাদের জগৎও সমানে মায়ের জাগ্রত সান্নিধ্য লাভ করেছে। বেদে পশুযজ্ঞের কথা আছে—শ্রীমা পশু-যজ্ঞ করেছেন, কিন্তু নূতন অর্থে—তাঁর চেতনা দিয়ে তাদের ঊর্দ্ধগতির সহায় হয়েছেন। পশুদের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন কয়েকটি বেড়াল। তিনি বলতেন বেড়ালদের যে রাজা (সূক্ষ্মজগতে)—মহামার্জার বলতে পার—সে না কি মায়ের সঙ্গে মিতালী স্থাপনা করেছিল। এই মার্জারকুলের আবির্ভাব আমাদের মধ্যে একটু কৌতূহলজনক। একদিন হঠাৎ একটা বুনো গোছের বেড়াল এসে পড়ল আমাদের বাড়ীতে—Guest House-এ—এসে পড়ল এবং রয়ে গেল। বুনো ছিল, বনে গেল শান্ত-শিষ্ট অতিভদ্র—তার বাচ্চা হ'ল, প্রথমটির শ্রীঅরবিন্দ নাম দিলেন "সুন্দরী"—কারণ সে ছিল খুব ফর্সা অর্থাৎ একেবারে সাদা। সুন্দরীরও বাচ্চা হ'ল—একটির নাম হল Bushy, কারণ একে-বারে ছিল লোমশ, বিশেষ তার লেজটি—সুতরাং তার দিদিমাকে নাম দেওয়া হ'ল Grand Mother। এই Bushy সম্বন্ধেই কাহিনী আছে যে বাচ্চা হলে, একটু বড় এবং চোখ ফুটলে সে মুখে করে একে একে মায়ের পায়ের তলায় রেখে যেত—মায়ের কাছে যেন সমর্পণ করতে এবং মায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। সুতরাং দেখছ যে কতখানি সাধক বা সাধিকা হয়ে উঠে-ছিল সে। Bushy র দুটি বাচ্চা স্বনামধন্য পুরুষ, মায়ের আদরের—বড়টির নাম Big Boy আর ছোটটি Kiki একটির সম্বন্ধে কথা আছে—আমার মনে নেই কোনটি, খুব সম্ভব Kiki —সে সমাধিতে ধ্যানে যোগ দিত—এবং আমাদের মতনই ধ্যান করত ধ্যানে কি কি হয়ত দেখত আর চোখ-বন্ধ অবস্থাতেই কেঁপে কেঁপে উঠত। তবে সাধনা করলে কি হবে—ঠিক আমাদের মতনই তার বাসা ব্যবহার ছিল অনেক ক্ষেত্রে কিছু অমার্জিত। Big Boy আর Kiki দুটি ভায়ে মোটেও বনিবনাও ছিল না—সর্বদা সাবধানে দুজনকে আলাদা আলাদা রাখতে হত। Big Boy টা ছিল ষণ্ডামার্ক—Kiki বেচারা মার খেয়ে মরত। যা হোক শেষে অসুখে ভুগে ওরা মারা যায়। আমাদের উঠোনে গোর দেওয়া আছে। Grand Mother কিন্তু যেমন এসেছিল, তেমনি হঠাৎ একদিন অন্তর্ধান করলো—আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

বেড়ালদের আদর-আপ্যায়ন ছিল অপরূপ ব্যাপার—তাদের আহার-ব্যবস্থা ছিল একটা সমারোহ—বিশেষভাবে রান্না হত তাদেরই জন্যে—দুধ, মাছ ইত্যাদি সোপচারে। যেন রাজকুমার রাজকুমারী ওরা। সব নিয়ম বাঁধা—তাদের শিক্ষাও ছিল তদনুরূপ—ঘরদোর কখনও নোংরা করত না—ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ছিল তাই মেনে চলা শিক্ষা দেওয়া হয়ে ছিল—অর্দ্ধেন্দুর মার্জার জিপ্‌সী-বেদুইনদের মত নয়।

মায়ের আসার পূর্ব্বে ছিল আমাদের কুকুর—তার ইতিহাস একই রকম। হঠাৎ একটা কুকুর এসে পড়ল—অতি সাধারণ রাস্তার কুকুরের মত—কুকুরী—আমাদের সর্ব্বপ্রথম বাসাটিতে—সেও এল এবং রয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ তার নাম দিলেন যোগিনী। তার বুদ্ধির সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ এক গল্প করেন—রাত হয়ে গিয়েছে, ওরে বাহিরে আছে, তা আমাদের জানা নেই—সদর দরজায় এসে কিছু ধাক্কাধাক্কি, কিছু ডাকাডাকি করলে, কিন্তু আমরা ছিলাম পিছনের উঠানে—রান্নাঘরে—সেখান থেকে কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। যোগিনীর হঠাৎ মনে পড়ল পিছনে দরজা একটা আছে—সেখান দিয়ে হয় ত ঢোকা যাবে কি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারে। তাই দৌড়ে তিনদিকের রাস্তা ঘুরে পিছনে এসে উপস্থিত—তখন তার সাড়া পাওয়া গেল—এবং তার প্রবেশ ঘটল। তারও বাচ্চা হয়েছিল—এবং শ্রীঅরবিন্দের খুব প্রিয় ছিল দুটি বাচ্চা প্রধানতঃ—নাম এখন আমার মনে নাই।

তরুলতার সঙ্গে মায়ের যে আত্মীয়তা ও অন্তরঙ্গতা তা তোমরা জান। সে সম্বন্ধে তাই আজ আর কিছু বললাম না। পশুপক্ষী জীবজন্তু যেমন তেমনি অশরীরী সত্তাদের সঙ্গে ছিল মায়ের আদান-প্রদান—ছোটখাট পরীদের থেকে বড় বড় হোমরা-চোমরা দেবতারা পর্য্যন্ত—পেয়েছে মায়ের অনুগ্রহ, শুনেছ তোমরা—কিন্তু অনুগ্রহ অর্থ সময়ে সময়ে চপেটাঘাতও বটে।

মা আমাদের সাধনার অর্থাৎ যোগ-সাধনার গুরু—সেকথা আজ ছেড়ে দিলাম, খুব সাধারণভাবে তাঁর শিক্ষার একটা অঙ্গের কথা বলি আজ—জীবন-গঠনের সাধনায় প্রধান করণীয়। এই জীবন-গঠনের মোটা অর্থ হ'ল জীবনটাকে মার্জিত উন্নত করে ধরা। আচ্ছা, এ কাজটির মূল ও প্রধান সূত্রটি কি? গুছিয়ে তোলা। মা আমাদের যে শিক্ষা সর্ব্বদা দিয়েছেন—গভীর সাধনতত্ত্বের দিকটি উল্লেখ করছি না—আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সহজ সাধারণ জীবনের জন্য, তা হল এই গোছানোর কাজ—আমরা যে কি পরিমাণে এলো-মেলো তা আমাদের চোখে পড়ে না সব সময়ে—আসবাব জিনিষপত্র অগোছাল, আমাদের কাজকর্ম্ম অগোছাল,—আমাদের বাইরের জীবনটা যেমন বিশৃঙ্খল, অন্তরের জীবনও তেমনি বা ততোধিক—ফলতঃ অন্তরের জীবন বিশৃঙ্খল বলেই বাইরের জীবনও বিশৃঙ্খল হয়েছে। আমরা চিন্তা করি এলোমেলোভাবে—আমাদের মাথা খেয়ালী চিন্তায় পরিপূর্ণ—দু চার মিনিটও স্থির হয়ে এক বিষয় অনুধাবন করতে, সুশৃঙ্খলার অনুসরণ করতে পারি না; নাই সেখানে শান্তি-সংযম-সমন্বয়—আমাদের কয়োটি একটি হট্টস্থান—কোলাহলে পরিপূর্ণ। মনের অবস্থা এই রকম, প্রাণের অবস্থা আরো শোচনীয়। কত রকম কিম্ভূত সব প্রেরণা অভিলাষ সেখানে খেলে যায় তার হিসাব-নিকাশ নাই। নষ্টিক যদি হয় হট্টস্থল, প্রাণ তবে পাগলাগারদ। যা হোক, অন্তরের জীবনের কথা আর বলব না—বাহিরের জীবনটা, বাহিরের জীবনের উপকরণাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সব কিছু সাজিয়ে

গুছিয়ে রাখা পার্থিবজীবনে যে একটা অতিপ্রয়োজনীয় কর্তব্য তা না শিখাতে চেষ্টা করেছেন কথায় এবং কাজে উভয়তঃ। জানি না, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে আমরা কতখানি এই শিক্ষা আয়ত্ত করতে পেরেছি। শ্রী যে জীবনের যন্তত: অর্দ্ধেক স্থান জুড়ে এবং জীবনের মূল্য যে ভবল বাড়িয়ে দেয়—তা কজন জানে এবং জেনে তার তাগিদ অনুভব করে!

মায়ের শিক্ষা তবে, স্থূল জিনিষপত্র ব্যবহার করা সতর্কতার সঙ্গে, যত্নের সঙ্গে, এ ত বটেই। কিন্তু শুধু তাই নয়, আরো আগে আছে কথা। মায়ের বৈশিষ্ট্য এখানে। জিনিষপত্র তিনি ব্যবহার করেন কেবল যত্নের সঙ্গে নয়, আদরের সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে। কারণ তাঁর কাছে জিনিষপত্র জড় বস্তু মাত্র নয়, প্রাণহীন উপকরণ কেবল নয়, তাদের আছে প্রাণ, আছে চেতনা পর্য্যন্ত এবং প্রত্যেকের আছে বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব। প্রাচীনেরা উদ্ভিদ সম্বন্ধে যা বলে গিয়েছিলেন, জড়বস্তু সম্বন্ধেও সেই কথা না বলেন—যন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ—অন্তরে এরা সজ্ঞান, এরাও সুখদুঃখসমন্বিত। আমরা সকলেই জানি যে অতি পুরাতন জিনিষ পর্যন্ত মা কি রকমে পুষে রাখেন, কোন জিনিষ জীর্ণ হয়ে গিয়েছে বলে সহজে ফেলে দিতে চান না—এর হেতু রক্ষণশীলতা বা কৃপণতা নয় – এর কারণ পুরান জিনিসপত্র হল পুরান বন্ধু, জীবন্ত সঙ্গী সব।

এই প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেই, শ্রীঅরবিন্দ কি বলেছিলেন। একজন সাধক শ্রীঅরবিন্দকে লেখে যে তার গোটের দরজা কিছুতেই খুলছিল না—কেমন আটকে গিয়েছিল। জোরে লাথি মেরে খুলতে হয়। ফলে দরজা খুলল বটে—কিন্তু পায়ে দারুণ আঘাত লাগল—দরকার হল ডাক্তারের মলম ও শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদ। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে কি বলেছিলেন? "If you kick at the door, the door will naturally kick back at you."

যা হোক আমি বলেছি মা প্রথম থেকেই আমাদের (পুরাতনদের) কাছে মা হয়ে আসেন নি। এসেছিলেন বোধহয় এই শ্রীমরী হয়ে—তাঁকে গোড়ায় আমরা বন্ধুভাবে মিত্রভাবে এবং একান্ত স্বজনভাবে গ্রহণ করেছি—প্রথমত: শ্রীঅরবিন্দ নিজে তাঁকে ও-ভাবে গ্রহণ করেছেন বলে, দ্বিতীয়ত, তাঁর গুণের জন্য। মায়ের গুণের কথা যখন উঠল —যদিও সন্তানের পক্ষে মায়ের গুণকীর্ত্তন করা প্রয়োজন হয় না, তবুও—এখানে মায়ের কাছে আর একটি শিক্ষার কথা ভুলতে পারিছ না—একটু গভীরের কথা। শ্রীঅরবিন্দ যখন মায়ের প্রথম গুণকীর্ত্তন করলেন, তখন বললেন, এমন আত্মসমর্পণ তিনি কোথাও দেখেন নি—নি:শেষ, অকুণ্ঠ। আরও একটু মন্তব্য করেছিলেন এই সঙ্গে যে এক মেরেরাই হয় ত পারে এই রকম আপনাকে নিঃশেষ করে দিয়ে দিতে—এবং একান্ত সহজভাবে। তার অর্থ হল অতীতকে একেবারে ভুলে যাওয়া, সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া—দোষগুণসহ। শ্রীমা তাঁর একটি প্রার্থনায় বলেছেন যে এখানে তিনি এলেন, ভগবান শ্রীঅরবিন্দের কাছে আত্মনিবেদন করলেন, তাঁর সমস্ত অতীতকে, তাঁর সমস্ত অর্জিত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বা চেতনাসম্পদ মুছে দিয়ে—একেবারে

শূন্য সরল শিশুচিত্ত নিয়ে। সদ্যোজাত শিশুর মত নিরাবরণ হলেন—সব তাঁকে শিখতে হবে গোড়া থেকে—যেন কিছুই তিনি জানেন নাই শোনেন নাই।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মাকে প্রথম জানি ও শুনি উচ্চ সাধিকা হিসাবে। তাঁর যে অন্য গুণ আছে জানি নাই। পরে জানলাম ক্রমে ক্রমে—প্রথমে জানলাম তিনি একজন পরমকুশলী চিত্রকর—তারো পরে জানলাম তিনি একজন তেমনি পরমকুশলী সঙ্গীতকার। কিন্তু আরো আবিষ্কার বাকী ছিল—তাঁর বুদ্ধিজীবী দিকটিও কম সমৃদ্ধ ছিল না—অর্থাৎ গ্রন্থপাঠ, অধ্যয়ন করেছেন অনেক—যাদের বলে পণ্ডিত তাঁদের মতই করেছেন মস্তিষ্কের চর্চা। যারো আশ্চর্য্য হয়েছি যখন দেখেছি ফরাসী দেশে থাকতেই—তিনি ভারতীয় শাস্ত্র অনেক পড়েছিলেন এবং অনুবাদ করেছিলেন—গীতা, উপনিষদ্, যোগসূত্র, নারদীয় ভক্তিসূত্র ইত্যাদি। আমি এ সব বলছি এ কথা জানাবার জন্যে যে মায়ের চিত্তাগত বা মস্তিষ্কগত অর্জন যেমন ছিল বিপুল তেমনি মস্তিষ্ককে একেবারে খালি শূন্য করে দেবার ক্ষমতাও ছিল অপূর্ব্ব—এইটিই তাঁর বিশেষত্ব। গোড়ায় আমাদের (সাধনার) ভার যখন তিনি সবে গ্রহণ করেছেন, তখন একদিন তিনি আমায় একান্তে বললেন—আমি একজন intellectual, আমার হয়ত' এ ধরণের আত্ম-প্রত্যয় আছে মনে করে—"বুদ্ধির চর্চা ও দার্শনিক বৃত্তি কিছু আমার ছিল একদিন—এখন সে সব তলিয়ে গিয়েছে, তবে ধীরে ধীরে সে সব তুলে ধরতে পারি, সুতরাং তোমার কোন ভয় নাই" (ভাবটা এই)। মা যেন apology চাইছেন তাঁর পাণ্ডিত্যের ত্রুটির জন্য! মা এভাবেই আমাকে দিলেন বিনয়ের শিক্ষা—যাকে বলি আমরা Divine Humility.

বলছিলাম, পুনাতনকে এই রকমে নিঃশেষ বাতিল করে দেওয়া, মায়ের চেতনায়, সাধনায় একটা বিশেষ সামর্থ্য। অতীতে যা কিছু অর্জিত হয়েছে, বুদ্ধিগত বিদ্যা হোক, আর প্রাণগত সংস্কার হোক—সমস্ত ধুয়ে মুছে নাকচ হওয়া—শরীরের কথা ছেড়েই দিলাম—মানুষের পক্ষে সহজ নয়—অথচ এইটিই হল অধ্যাত্মসাধনার সর্ব্বপ্রধান প্রক্রিয়া এবং মায়ের কাছে এই শিক্ষার পেয়েছি যাকে বলে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাই না চেয়েছিলেন সব ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে, সব ভুলে গিয়ে তাঁর শিক্ষা এবং দীক্ষা নূতন করে, ক খ থেকে আরম্ভ করতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে। আর বাস্তবিকই নমুনা এবং বাহ্যচিহ্নস্বরূপ সংস্কৃত ও বাংলার হাতেখড়ি বা বর্ণপরিচয় তাঁর হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের কাছে।

যা হোক এ সব হ'ল ক্ষুদ্রের চেষ্টা বৃহৎকে কিছুটা ধারণ করতে, বালুকণা চায় যেন সূর্য্যের স্পর্শ কিছু ধরে দিতে—উষাহরির বামনঃ—মায়ের রূপবর্ণনায় শিশুকাকলি।

মাকে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম প্রথম "মীরা" বলে উল্লেখ করতেন বেশ স্পষ্টই। তার-পরে কয়েক বছরই হবে, দেখেছি আমরা, "মীরা"র র পর্য্যন্ত বলে থেমে যেতেন এবং ইত-স্তত: করে তবে মীরা বলতেন। আমাদের কাছে জিনিষটা একটু প্রহেলিকা বোধ হ'ত তখন। কিন্তু পরে বুঝেছি, কেন, কি হেতু। শ্রীঅরবিন্দের ওই বলতে উদ্যত Mother,

কিন্তু আমরা প্রস্তুত হইনি, তাই Mother বলতে গিয়ে "মীরা"-র শেষ করেছেন। কবে কোন শুভমুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দের ওষ্ঠাধরে Mother কথাটি সর্ব্বপ্রথম ফুটে উঠেছিল, জানা নাই—কিন্তু সেটি হল অলিখিত ইতিহাসে দিব্যমুহূর্ত্ত, মহাসন্ধিক্ষণ পৃথিবীর পক্ষে, মানবজাতির পক্ষে। কারণ তখনই ত হয়েছিল শ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠা এই জড়ভূতলে, মানুষের বাহ্যচেতনায়।

এখন তবে আমার শেষ কথাটি বলে আজকার গল্প শেষ করি।

বলেছি তখন পর্য্যন্ত মা ছিলেন বন্ধু, মিত্র, সতীর্থ, ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র এই পর্য্যন্ত। আমি বাংলাদেশে একবার যাব (বৎসরে একবার করে তখন যেতাম)—সেই বোধ করি শেষ যাত্রা—যাওয়ার পূর্ব্বে ইচ্ছা হ'ল মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাই—মা তখনো অন্তরালে আর শ্রীঅরবিন্দ বাহিরে। আমি শ্রীঅরবিন্দকে বললাম I would like to see Her before I go (H=Capital H=মায়ের পরিবর্ত্তে)। শ্রীঅরবিন্দ মাকে খবর দিলেন। চম্পকলালের বর্ত্তমান ঘর তখন ছিল মায়ের ঘর—আমি Prosperity-র ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন (শ্রীঅরবিন্দ বারান্দায় লোকেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন)। মা এলেন চম্পকলালের ঘর থেকে---দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন—আমি গিয়ে বললাম 'আমি যাচ্ছি', তারপর গড় হয়ে প্রণাম করলাম। সেই আমার প্রথম প্রণাম মা বললেন Come back soon—এই come soon-এর অর্থ হয়েছিল come for good.

বসোরার উজীররা

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

খাতুন

তোমার অজস্র আদরে ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো গা—মনুষ্যত্ব দূরে থাক্ মানুষপদবাচ্যও সে নয়। ভগবদ্দত্ত সৌন্দর্য, বীর্য শৌর্য সব মুছে গেলো—পশু পশু, পশ্বাচারের ভেতাল ধাতুটাই শুধু চক্ চক্ করছে—সংসারের হাটে ও আর বিকোবে না।

আলনুয়েন

আঃ কেবল খাক্ খাক্ কানের কাছে আলাপালা। তোমার ঘরে না এসে ঐ বাঁদীদের একজনের কাছে গেলেই হতো—বেয়াদবী করলে বা বেশী বকলে দু এক ঘা দিলেই চুকে যায়।

খাতুন

হাঁ, তুমি কি আর তাতে পশ্চাৎপদ নাকি? জানো, আমি তোমার চেয়ে বংশ-মর্যাদায় কতো উঁচু—বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ হয়েছিল তোমার—আমার পিছনে আমার আত্মীয়স্বজন কুল আছে না—তাদের চকচকে তরোয়াল খাপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার প্রতি অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে জানে না?

আলবুয়েন

পাপীয়সী, তোমার রসনাকে যদি সংযত না করো তবে একদিন তোমার ঐ বাঁদীদের দিয়েই নগ্ন করিয়ে শপাশপ্ বেত মারবো?

খাতুন

আহা, সেদিন যেন শীঘ্রই আসে—তোমার মত বীরপুঙ্গবের সাহস দেখলে আমি খুবই খুশী হব।

(লাফাতে লাফাতে ও অঙ্গভঙ্গী করতে করতে ফরীদের প্রবেশ)

ফরীদ

ও বাবা, আমার বাবাগো, বাবা, বাবা!

খাতুন

কী আধোআধো প্রলাপ বকছো, ফরীদ, তোমার কী কোনদিন জ্ঞান হবে না—মানুষের মত খাড়া দুপায়ে দাঁড়িয়ে চলতে পারো না, না ভাল করে কথা বলতে পারো না?

আলনুয়েন

থামো ঠাকরুণ—আমার এমন চমৎকার ছেলেটাকে আর বকতে হবে না—প্রকৃতির দুলাল হয়ে জন্মেছে সে—কেবল বকুনী—ফের যদি শুনি, তা তুমি মহিলাই হও আর যেই হও, দাঁত ভেঙে দেবো।

ফরীদ

দাও বাবা, তাই দাও—না তো নয়, সব সময়ে বকছে—তুমি যখন থাকনা বাবা, না তখন মারে। ঠিক হবে বাবা, দাঁত ভেঙে দাও—আমি এমন হাসি হাসবো!

আলনুয়েন

আমার পাগল ভূতনাথ।

খাতুন

তোমার লজ্জা করেনা—ওকে ওর গর্ভধারিণীর বিরুদ্ধে ঘৃণায় প্ররোচিত করছো? তুমি কি বুঝতে পারছো না যে ওর ভিতরের শয়তানকে উত্তেজিত করছো তুমি? পরম

কারুণিকের কৃপায় আর মানুষের বিশেষ চেষ্টায় ঘুমিয়ে থাকে সেই দানবতা—তাকে জাগিয়ে তুলে নরকের বিদ্বেষশিখার সিলমোহর খুলে দিতে নেই—তাহলে দাউ দাউ করে দুরন্ত আগুন জ্বলে উঠে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। মনে করছো এই অকালপক্ক ছোঁড়াটা তার মাকে অপমান করেই শান্ত হবে? এটা হচ্চে একটা অস্বাভাবিক বিদ্রোহ—একদিন তোমাকেই অনুতাপ করতে হবে।

(প্রস্থান)

ফরীদ

ঐ মেয়েটাকে চাই বাবা, কী মেয়ে—ওটাকে কিনে দাও বাবা,

আলবুয়েন

কী বলছিস, কোন মেয়ে, লাফাচ্ছিস্ কেন পাগল।

ফরীদ

কেন—দাসদাসীর হাটে বিক্রী হবার জন্য এসেছে—দশটাকায় দাম। কী হাত, কী চোখ, কী পা আর পাছা না, বাবা, আমার চাই ওটাকে, যতক্ষণ না জড়িয়ে ধরছি—

আলবুয়েন

আরে, আরে, বলিস কী। এরি মধ্যে একেবারে পাকাপোক্ত পেকে উঠেছিস্ দেখছি—পিঠে কুঁজ হলেও যৌতুকের নিতে ওস্তাদ দেখছি—বাহবা, বাহবা—আমাদের বড় উজীরের পুত্ররত্ন নুরুদ্দীনের সাকরেদ্ বনে গেলি নাকি? আঁা এই বয়সেই এই সিঁদ্ খুললি, তালা ভাঙলি, পাকা সিঁধেল চোর বনলি?

ফরীদ

তোমরাই ত এর জন্য দায়ী। তুমি আর মা, পিঠে এতো বড় কুঁজ এতো তোমাদেরই দান। মেয়েরা ঠাট্টা করে—কেউ আমল দেয়না, শুধু অন্ধ মেয়েদের সঙ্গেই যা একটু আপনাই হয়—সত্যি, কী লজ্জার কথা।

আলমুয়েন

কিন্তু ঐ বাঁদীর মেয়েটা যে তোকে ভালবাসবে কে বললে ?

ফরীদ

সে হবে আমার দাসী, তাকে বাসতেই হবে ভালো।

আলমুয়েন

কাকে বিয়ে করবি, বল দিকিন্, আয় বাজী ধরি—রাজার মেয়ে পছন্দ হয়, কেমন ?

ফরীদ

হুঃ রাজকন্যা নয়, আমার চোখ রয়েছে পূজনীয় চাচা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীটির দিকে, ভারী ভালো লাগে তাকে

আলমুয়েন

উজীর : না, না, আমার বিশেষ ঘৃণা ছিবে আছে তাকে -- ওরে বোকা নয়া দিকি, ওখানে বিয়ে চলবে না।

ফরীদ

আমারও কী ওঁকে পছন্দ নাকি, আমিও ঘৃণা করি এবং অনেকটা সেইজন্যই ওঁর ঘরে বিয়ে করতে চাই। কেননা বিয়ে হলে দিনে দুবার করে তাকে ঠেঙাতে পারবো তো এছাড়া কোন না পূজনীয় পিতৃব্যমহাশয়ের কর্ণে তা পৌঁছবে আর তিনি মরমে মরে থাকবেন।

আলমুয়েন

সাবাস্—আমারই ছেলে বটে।

ফরীদ

আর তাছাড়া মেয়েটা কেমন বশম্বদ নরম প্রকৃতির ঘরোয়া মেয়ে। কাঁদতে বলো কাঁদবে, কাঁপতে বলো কাঁপবে, চুমু খেতে বললেই চুমু খাবে—আর কি চাই। মায় মতন মায়নুষী নয়, সবসময়েই কেবল ভুরু কোঁচকানো, বকুনী আর খুঁতখুতুনী। কিন্তু বাবা কই বললে না তো কিছু, ঐ মেয়েটাকে বাজার থেকে কিনে আনিয়ে দাও।

আলনুয়েন

আরে বাপু চিকীষুর, দশহাজার করকরে গুণে দিতে হবে সোনার মোহর যাচ্ছে—দামটা বড্ড বেশী—দুহাজার হয়তো দেখতে পারো—একটি পয়সা কিন্তু তার উপরে নয়। বিক্রেতার কপাল ভালো যদি সে এই দাম পায়—ফরীদ্, বাপদের ডাকো।

ফরীদ

চরণে চপ কি মজাটাই লুটবো কানুর...

(ডাকতে ডাকতে প্রস্থান)

আলনুয়েন

এই রকমভাবেই ছেলেকে মানুষ করতে হয়। তাকে পদেপদে বাধা দিতে নেই, বকতে নেই, শাস্তি দিতে নেই—প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখলে সত্যিকার মানুষটা যায় মরে এবং একটা ধর্মভীরু হাঁদাগঙ্গারাম গড়ে ওঠে। যে মানুষের রক্তে কোন পাপের স্রোত নেই, যে কখনো বয়সকালে কোনো তন্বীতরুণীর টাটকা তাজা ঠোঁটের কোমলপরশ পেলো না, রাতে কখনো সাকীর পিয়ালার সঙ্গে প্রেম জমালো না, সে মানুষের আমি কানাকড়িরও মূল্য দিই না। নীতিবিদ্‌রা বলে এক, প্রকৃতি শেখায় আর এক—কোনটা মেনে নেবো ? নিজেকে গড়ে তোলো প্রকৃতি মায়ের কোলে, তার নির্দেশ অনুসারে। দেহের প্রতিটি অণুতে রক্তে তন্তুতে এই মহাপ্রকৃতির ডাক—তাকে অসম্মান করবো কোন সাহসে। আমাদের কাজ হচ্ছে, মানুষকে গড়ে তোলা—হাঁ-নার দ্বন্দ্বদোলায় দুলবে এমন মূর্খ নিয়ে কি হবে, নীতিশাস্ত্র আওড়ায় এমন ভালো মানুষেরও দরকার নেই। চাই এমন মানুষ যে অন্য মানুষের উপর সর্দারী করতে পারবে, হবে সৈনিক, হবে মন্ত্রী, হবে বাণিজ্যবীর, বিপদ তুচ্ছ করে যারা সম্পদ আনতে পারবে দেশ বিদেশ থেকে, সাগর পার হয়ে যারা বর আহরণ করে আনবে।

সামনের রক্তবীজ যারা। প্রভুত্ব করতে গেলে, রাজসাম্রাজ্য গড়ে তুলতে গেলে এই ধরণের মানুষের প্রয়োজন। দূরে দূরান্তরে তারা পাড়ি দেবে, সাতসাগরের পারে, পৃথিবীর এপার থেকে ওপার। গড়ে তুলবে একটি ভাষা, একটি রাজত্ব। হাঁা, প্রকৃতিই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো সাম্রাজ্যবাদী, সেখানে নীতির বুলি আওড়ানো হয় না। প্রকৃতির কোল থেকে যারা অরটিকা নিয়ে বেরোয় তারা দুঃখদুর্দশা, ঝঞ্ঝাবাতাস, শীতগ্রীষ্ম কিছুই মানে না—তারাই বীর, উন্নতশির, তারাই পৃথিবী জয় করে, বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। আমি ফরীদের জন্য এই বাঁদীটিকে সংগ্রহ করবো—এদের সাহচর্য্যও একধরণের শিক্ষা—যুদ্ধ কর, ভোগ কর—এই ত প্রকৃতির মন্ত্র। আমার ছেলের উপযুক্ত কাজই এই আর সেই বীজে শক্তসমর্থ পৌত্রের দল এনে দিক, বংশ সুপ্রতিষ্ঠিত হোক্।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(দাসদাসী ক্রয়বিক্রয়ের হাট)

মুয়াজ্জীন ও তার অনুচর, বালকিস্ ও নীনুা, আজিব, আজিজ্,
আবদুল্লা ও অন্যান্য সওদাগরগণ

মুয়াজ্জীন

মশায়রা, আর দেরী করছেন কেন? দর হাঁকুন, আপনিই আরম্ভ করুন না?

বালকিস

কে ঐ দামী পোষাকপরা সুন্দর যুবকটি?

মুয়াজ্জীন

আমাদের আজীব সাহেবের কথা বলছেন—উজীরের ভাইপো, ছেলেটা ভালো কিন্তু খুড়োটি মোটেই সুবিধের নয়।

বালকিস

শুনুন—দালাল মশায়—আমার গুণকীর্তনটা একটু ভালো করেই করবেন, অর্থাৎ কবির ভাষায় করবেন।

মুয়াজ্জীন্

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কবিতাসুন্দরীকে কাব্যেই বর্ণনা করবো। মশায়রা আর কেন, দর দিন।

একজন সওদাগর

এই সুন্দরীর জন্য তিনহাজার।

মুয়াজ্জীন

কি বলেন মশাই, মোটে তিনহাজার—একবার চোখটা খুলে দেখুন ত—চীন থেকে ফিরিঙ্গিস্থান ঘুরে আসুন—এর জুড়ি মিলবে না—আসুন, সাতহাজার।

আজীজ্

সেরা মাল হলেই ত হয় না, দামটাও দেখতে হয়, বড্ড বেশী দর।

মুয়াজ্জীন

কী যে বলেন, আজিজ্ সাহেব, সেই সর্বশক্তিমানই শাস্তি বিধান করবেন—বেশী দর বলছেন?

বালকিস

(আজীবের প্রতি)

আমার জন্যে দর দিন না—আমার আরশীই আমায় বলে দেয় যে আমি কতটা সুশ্রী এবং আমি সেটা জানি। আমি যখন তারে তারে সুরের ঝংকার তুলি, বীণাবাদিনী হই, তখন বাতাসে তার কাঁপন লাগে, কথাগুলো হয় মধুক্ষরা—বসোরায় এরকম কখনো শোনেন নি, নিন না আমাকে, দর দিন?

আজীব

আমার উপর তুমি এত সুপ্রসন্ন কেন, সুন্দরী? আরো ত অনেক সওদাগর রয়েছেন।

বালকিস

না, না, মনে করবেন না যে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি, আপনার মুখ চোখ বলছে যে আপনার মা শুধু রূপসী নন, অত্যন্ত দয়াবতীও—আমি তাঁর সেবাদাসী হতে চাই।

আজীব

এই সুন্দরী তন্বীটির জন্য আমি পাঁচহাজার পর্যন্ত উঠতে পারি।

মুয়াজ্জীন্

তাজ্জব করলেন বনাই, মোটে পাঁচ—আর উনিই কিনা নিজে স্বয়ম্বরা হতে চান আপনার কণ্ঠে মালা দিয়ে—সাতের এক পয়সা কম নয়।

আজীব্

আচ্ছা, আচ্ছা ছ'হাজারই নেবেন, হলো ত, আর একটি কানাকড়িও নয়, আসুন—

মুয়াজ্জীন

আর কেউ বেশী দর দেবেন?

সওদাগর

আরে, দাঁড়ান, দাঁড়ান দেখি।

আবদুল্লা

যেতে দাও ভাই, যেতে দাও—ওকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিনে লাভ হবে না—দেখছো না মন ঠিক করে ফেলেছেন, ঠাকরুণ।

সওদাগর

যেতে দাও, যেতে দাও।

মুরাদ্‌জীর্

আপনিই পেলেন, হুজুর।

বালকির্

আমাকে যদি দয়া করে স্থান দিলেন, তাহলে আমার এই ভগিনীটিকেও নিন—আমরা বাইরে দু'জনে আলাদা বটে কিন্তু ভিতরে এক দিল।

বালকির্

আমাদের যদি আলাদা করে দেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো, হয়তো মৃত্যু হবে, আর আপনার দু'হাজারই লোকসান।

মুরাদ্‌জীর্

একই সঙ্গে ওদের নিলাম হবে—এক জোড় ওরা।

আজীব

আচ্ছা, আরো দু'হাজার দেবো—দিতে হয় দাও, না হয় রইলো তোমার বেচাকেনা।

মুরাদ্‌জীর্

হায়রে কপাল—এতো প্রায় বিনামূল্যেই দেওয়া ; যান নিন, আর কী হবে।

আজীব

আমি টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি

(বালকির্ আর মীমুনার সঙ্গে প্রস্থান)

আবদুল্লা

কী হে দালাল সাহেব, রইলো কত?

মুরাজ্জীন্

কিছুই বিশেষ নয়, তবে যাঁর সম্পত্তি তিনি সামান্য কিছু লাভ করবেন।

আজীজ

উজীর! (ইবন্‌সয়ীর প্রবেশ)

আবদুল্লা

মহান্ আফজল্ সাহেব এসেছেন, তার পদধূলি পড়েছে, দেখছি লক্ষণ শুভ, ভালো বেচাকেনাই হবে।

সওদাগররা

আসুন, আসুন, উজীর সাহেব।

ইবন্‌সয়ী

আপনাদের সকলের শান্তি হোক্—ধন্যবাদ, এই যে আবদুল্লা—ভাল সব খবর?

আবদুল্লা

আমার ভাইএর সব গেছে।

ইবন্‌সয়ী

সে কী—আমাকে তোমার কোষাধ্যক্ষ করে নাও। ভাবতেও লজ্জা হয় যে আমরা যখন ঐশ্বর্যবিলাসে বাড়তি জিনিষ নিয়ে সুখভোগ করছি তখন আর একজন দুঃখে কষ্টে দিন

যাপন করছে। এই যে দালাল সাহেব, বাজারের হালচাল কী রকম—আছে নাকি মনের মত জিনিষ, দুপয়সা ঘরে আসে।

মুরাদ্‌জীম

মহামহিম উজীর সাহেব—আপনার সঙ্গে আবার দরদস্তুর, আপনার দৃষ্টিভোগে লাগবে দর্শনযোগ্য হবে এমন জিনিষ কি আর সহজে পাওয়া যায়, তবে বলুন কি দরকার, আমি ভালো জিনিষই দেবো, বাজারের সেরা মাল, দামেও বনবে—যদা সব দালালরা, জানেনই ত হুজুর, সব গলাকাটার দল—আমায় ত আপনি চেনেন।

ইবনসরী

আরে, তা যা বলেছো—সত্যিই ব্যবসাদারী মহলে তোমার সততার খ্যাতি আছে—আমি শপথ করে বলতে পারি তুমি সত্যিই একটা আশ্চর্য মানুষ। যাক, এখন দাও দিকি একটি একেবারে সেরা মেয়ে—রূপসী বিদুষী মোহিনী—ছেলেন যা শেবার রাণী কোথায় লাগে—তারপর দাম বলো।

মুরাদ্‌জীম

হুজুর ধর্মাবতার যা বলছেন ঠিক সেইরকম একটি আছে সন্ধানে—একশো বছরে তার জুড়ি পাবেন না। আইনকানুন, ধর্মশাস্ত্র তার কণ্ঠস্থ, নৃত্যগীতবাদ্যযন্ত্রে সে পটু, মনের কোণে জ্ঞান বিজ্ঞান সে যথেষ্ট আহরণ করেছে। সে সুরসিকা, হাস্যোলাস্যে সুনিপুণা—আর তার রূপ আর গুণের কথা কি বলবো, প্রত্যেক কথায় যেন মধু ঝরে পড়ছে—পনেরো হাজার লাগবে হুজুর—তার তুলনা হয় না।

ইবনসরী

বলো কি হে, এ যে একটা দামের মত দাম।

মুরাদ্‌জীম

দাঁড়ান, একবার শুধু দেখুন—খালিদ—মেয়েটিকে নিয়ে এসো।

(খালিদের প্রস্থান)

আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, কিন্তু আপনার পুত্র কি আপনার অনুমতি নিয়েছে —আমি তাকে একটি গলার হার দেবো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

ইবনসরী

কণ্ঠহার?

মুয়াজ্জীম্

হাঁ, হুজুর, এমন কিছু নয়—সামান্য উপহার তবে জিনিষটা দামী। রাজপুত্রের চালে এসে বললেন সেদিন—"পাঠিয়ে দিয়ো যে অমুক বাড়ীতে আর দামটা পিতৃদেবের হিসেবেই লিখে নিয়ো—আর জানি ত তুমি দামটা এমন চড়াবে যেন এলবুরজ্ পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে ঠেকে—আস্ত চশমখোর, যতো পারো বুড়োটাকে শুষে নাও।" যাই বলুন হুজুর, ভারী খোশ্‌মেজাজী নওজোয়ান আপনার ছেলেটি।

ইবন্‌সরী

হ্যাঁ সুন্দর বদনাইসটা এই বলেছে— শুষে নাও, হ্যা, হ্যা, বেশ দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, চুলের ঝুঁটি ধরে—আচ্ছা কোন বাড়ীতে পাঠাতে বলেছে, কাকে, জানো নাকি?

মুয়াজ্জীম্

তা, হুজুর যা বললেন, মেয়েটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়, আমাদের মতের নয়—তবে জানলেন কি, যা পাচ্ছে তার চেয়ে বেশী দিয়ে ফেলেছে।

ইবন্‌সরী

তাতে কোন সন্দেহ নেই—দুষ্টু দামাল ছেলে শিষ্ট আর হলো কবে। তার কী আর বিবেক বিচার জ্ঞান আছে—ভালোই করেছো আমায় জানিয়ে। জানো, ছোকরার একটা মস্ত গুণ, শুধু দিলদরিয়া মেজাজ্ নয়, পেটেমুখে কথা নেই। যা করবে যা বলবে কোথাও লুকোচুরি নেই, মিথ্যাভাষণ নেই। যৌবনের তাড়নায় সে মাঝে মাঝে উদ্দাম হয়ে পড়ে বটে কিন্তু গোড়ায় গলদ নেই—রক্তের ধারা ভালো, এবং শেষ পর্য্যন্ত শেষরক্ষা হবেই—আমার সে আশা আছে—আসছি মুয়াজ্জীম্। (প্রস্থান)

মুরাদ্‌জীব

আরে বাপকা বেটা, তবে ছেলেটার মধ্যে রক্তের তেজ আরো দ্রুত--এই যে খালিদ এসে গেছে পারসীক্ মেয়েটাকে নিয়ে।

(আনিস্-আলজালিসের সহিত খালিদের প্রবেশ)

খালিদ্, ছুটে যাও, বড় উজীর সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসো, একটু আগেই এখানে ছিলেন।

(খালিদের প্রস্থান, আলনুয়েন, ফরীদ ও দাসদের প্রবেশ)

ফরীদ্

ঐ যে, বাবা, ঐ, ঐ, ঐ।

আলনুয়েন্

আপনিই দরদস্তুর নিলাম করছেন—আপনাকে ভালরকমই চিনি—আজ কিন্তু একটু বেশী সততা দেখাবেন। মেয়েটি বিক্রয়ের জন্য ত?

মুরাদ্‌জীব্
(একান্তে)

সর্বনাশ। একেবারে ইবলিস্ এসেছেন নরক থেকে উঠে, সঙ্গে তাঁর ভূতপ্রেত দৈত্য-দানার দল। (উচৈচস্বরে) হাঁ হজুর, আমরা বড় উজীর সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছি —তিনিই এর দর দেবেন বলে গেছেন—তাঁর সঙ্গেই প্রথম কথা হয়েছে।

আলনুয়েন্

এইতো উজীর তোমার সামনে—আমি দর দিচ্ছি দু'হাজার, কে আছে আমার বিরুদ্ধে দর দেয়?

মুরাদ্‌জীব্

উজীর সাহেব, আপনি বড়, আপনার সঙ্গে পাল্লা দেবে কে? কিন্তু আপনি আপনার পদমর্যাদার উপযুক্ত লেনদেন করুন—দশ হাজারের কম এ জিনিষ ছাড়া যায় না।

আলনুয়েন্

কী, দশহাজার? জোচ্চোর, প্রতারক—এই খোলা বাজারে এরকমভাবে প্রতারণা করতে সাহস হয়? এইতো সামান্য একটা মেয়ে, এর দাম দু'হাজার বলেছি—আবার কী? হয় আমার দাম স্বীকার করে নাও, না হয় নিলামের ডাক তোলো—তা যদি না করো, তাহলে তোমার সমূহ বিপদ।

মুয়াজ্জীন্

হুজুর এ সব পণ্য দ্রব্যের সে আইন নয়। আপনারাই এর বিচার করুন মশায়রা—এ কী সবাই গা ঢাকা দিচ্ছেন কেন? উজীর সাহেব, তাহলে স্পষ্টই বলি, আমাদের বড় উজীর ইবন্‌সয়ীই প্রথমে দরদস্তুর করে গেছেন।

আলনুয়েন্

জানি, জানি, তোমাদের দালালির ছলাকলা, ফন্দ-কৌশল সবই জানা আছে—জোচ্চোরের দল—দর হাঁকো, নিলামে চড়াও।

মুয়াজ্জীন্

গালাগাল দেবেন না হুজুর—থাকুন্ সাহেব, বসোরাতে বিচার আছে, আর ইবন্‌সয়ীই বিচার করুন।

আলনুয়েন

কী, বিচার, তাও আবার তোমার আর আমার মধ্যে। একটা জোচ্চোর দালাল আর আমি হলাম সমান? (ভৃত্যের প্রতি) এই টাকাটা দিয়ে দাও তো, যদি কিছু গোলমাল করে, ধরে কষে বাঁধো, তারপর দাও লাঠ্যৌষধি—এসো, সুন্দরী, সরে যাচ্ছো কেন?

করীম্

বাবা, আমি ওর পেছনে গিয়ে আমার ঘোড়ার চাবুক দিয়ে সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু দেবো? আমি ওকে এমনি তাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারি, যাবো বাবা?

মুয়াজ্জীন

একে অত্যাচার বলবো না তো কি বলবো? আমি নালিশ করবো বড় উজীরের কাছে, আর রাজার দরবারে।

আলনুয়েন

ব্যাটা, বদমাইশ চোর, আগে তোকে শাস্তি দিই তারপরে বাবের মাখখানে যতো পারিস আপিল করিস—ওকে পাকড়াও।

(ইবনসরীর সহিত খলিফের প্রবেশ)

মুয়াজ্জীন

রক্ষা করুন, হুজুর, এই অবিবেচক অত্যাচারী লোকটার হাত থেকে।

ইবনসরী

কি হয়েছে?

মুয়াজ্জীন

হুজুর, আপনার জন্যে যে নিখুঁত দাসীকন্যাটি রেখেছিলাম, উনি তাকে জোর করে নিয়ে যাবেন এবং এমন দাম দিতে চাইছেন যে তাতে একটা রান্নাকরার কালো বাঁদুনীও মেলে না। তারপর আমি যখন আপনার নাম করলাম তখন উনি রাগে ফুলতে ফুলতে নিজের দাসদের আমায় মারবার হুকুম দিলেন।

ইবনসরী

উজীর, একথা কী সত্যি।

আলনুয়েন

আমার মাথাটা বোধহয় বোঁয়ার ভর্তি। আমি ভেবেছিলাম দালালটা বুঝি চালাকি

খেলছে। আচ্ছা, আপনি বুঝি মেয়েটির জন্য দরদস্তুর করবেন বলে গিছলেন? তাহলে ত ভারী অন্যায় হয়েছে। আমি কি জানতাম যে আপনি দর দেবেন? আচ্ছা আরম্ভ করো হে।

ইবনসরী

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি উজীর সাহেব। এই কেনাটা আমার নিজের জন্য নয়, স্বয়ং রাজার জন্য। আমি জানি তুমি রাজভক্ত, অযথা ইচ্ছে করে দর বাড়িয়ে রাজার রাজকোষকে ভারগ্রস্ত করায় কোন লাভ আছে কী। অবশ্য তোমার যদি ইচ্ছা হয় সে স্বাধীনতা তোমার আছে। আইন তাই বলে, সুবিচারও তাই—যে কেউ দর দিতে পারে—সবচেয়ে দীনহীনও—আচ্ছা দর দেবে নাকি?

আলমুয়েন

(স্বগত)

এই লোকটি সর্বত্রই আমায় বাগড়া দেবে। (উচৈচস্বরে) নিখুঁত সর্বগুণান্বিতা এই দাসকন্যাটি। না, আমি দর দেবো না—বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে আমার ছেলের মন বসেছে এই মেয়েটির উপর—ইবনসরী, ওকেই পাও না?

ইবনসরী

কি করবো বলো ভাই—দুঃখ হচ্ছে যে ওকে নিরাশ করতে হলো—আমার নিজের ছেলেও যদি হাহুতাশ করে মরতো, তা আমি কিছু করতে পারতাম না। রাজার দাবী সর্বপ্রথম।

আলমুয়েন

নিশ্চয়ই, আচ্ছা চলি, আসছি বাড়ীতে।

ইবনসরী

কেন? জরুরী সরকারী কাজ নাকি?

আলবুয়েন্

সরকারী নয়, বেসরকারী—এই আমাদের দুজনের ভাঙা ঘর আর মনকে নতুন করে একটু জোড়া দেবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা—আমার ফরীদ আর আপনার পিতৃমাতৃহীন ভাইঝিটি।

ইবন্‌সরী

ও, বুঝেছি ভায়া—বেশ, বেশ, কথা কওয়া যাবে—কিন্তু জানোই ত তোমার ছেলের সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য আছে—ও একটু বেশী রকমের কড়া ও চড়া ধাতের উদ্ধত। কেমন যেন বিগড়ে গেছে এই আর কী। এই ধরণের ছেলের হাতে আমার ঐ নরম ফুলের মত মেয়েটিকে সঁপে দিতে মন সরছে না—অবশ্য সে যদি নিজেকে শুধরে নিতে পারে, তাহলে ত খুবই আনন্দের কথা।

আলবুয়েন্

বয়সকালে সবাই একটু এদিক-ওদিক করে দাদা, উদ্ধত হয়—ওসব ধর্তব্যই নয়, ওর জন্য ভাবনা নেই। একটি ভালো মনের মতন ঘরণী জোগাড় করে দিন দেখবেন দিব্যি গৃহীসংসারী হয়ে বসেছে। এই সব চঞ্চল ধারাকে বাঁধের মধ্যে ঘিরে চালিয়ে দিলেই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলও শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরসংসারে মন দিয়ে রাজ্যকে উর্বর করবে।

ইবনসরী

আশা করি ভাই তাই হোক—আচ্ছা পরে কথা কওয়া যাবে।

আলবুয়েন

ফরীদ, চলে এসো।

ফরীদ্

না, আমার ঐ মেয়েটিকেই চাই—আমি সবাইকে মেরে কেড়ে নেবো।

আলবুয়েন্

দেখছো না, মূর্খ, তোমার পিতৃব্যদেব ওকে নিচ্ছেন।

ফরীদ্

তাহলে, ওঁরই মাথা আগে ভাঙবো। আর ঐ পাজী দালালটাকে সারা বাজার চরকী ঘুরিয়ে চাবুক মারবো—এক পয়সা দেবো না। তুমি না উজীর—এইটুকু ক্ষমতা নেই?

আলবুয়েন্

উন্মাদ বন্ধু, স্বয়ং সুলতানের জন্য নিচ্ছেন উনি, চুপ কর।

ফরীদ

ওঃ!

আলবুয়েন

চলে আয় বোকা, এর চেয়ে ঢের ভালো রূপসী তোকে এনে দেবো, ওজনে ভারী।

ফরীদ

ওর কী চুল, কি পদযুগল, উজীর, রাজা আর তোমার উপর অভিসম্পাত পড়ুক—আমি ওকে নেবই।

(বেগে ফরীদের প্রস্থান, পিছনে আলবুয়েন ও দাসগণ)

মুরাদ্‌জীন

হুজুর, এই হলো আমাদের ভাবী উজীর—একবার চেয়ে দেখুন, আমি কি শুধু কথায় কথায় দালালী করছিলাম

ইবন্‌সরী

সত্যি, সর্বেশ্বরী হবার উপযুক্ত—পৃথিবীতে এমন রূপসী আছে জানতাম না ?

মুরাদ্‌বীর্

বলিনি আপনাকে ?

ইবন্‌সরী

আশ্চর্য, যেমন দেহের রূপ আর অঙ্গ সৌষ্ঠব, তেমনি যদি মনের দিক দিয়ে গুণবতী হয় তাহলে ত ওর সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হওয়া উচিত, কি নাম, সুন্দরী ?

আনিস্-আলজালিস্

আমাকে আনিস্-আলজালিস্ বলে লোকে ডাকে।

ইবন্‌সরী

তোমার পূর্ব ইতিহাস ?

আনিস্-আলজালিস্

দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় আমার বাপ মা আমাকে বিক্রী করে দিয়েছিলেন।

ইবন্‌সরী

মনে হয়, এই পৃথিবীর ছাঁচে যেন তোমায় তৈয়ারী করা হয়নি, তুমি কি স্বর্গের হুরী না পরী ছদ্মবেশে এসেছো এখানে তোমার ঐ সৌন্দর্যের ছলাকলায় আমাদের ভোলাতে।

আনিস-আলজালিস

আমি বাঁদী, হুজুর, আমি দাসী, আমি মানুষ।

ইবন্‌সয়ী

প্রমাণ করো।

আনিস-আলজালিস্‌

পরী হলে পাখা থাকতো, কই আমার ত নেই।

ইবন্‌সয়ী

আচ্ছা থাক্‌, ঐ তফাৎটুকু আমি দেখেছি—দাম কতো হে?

মুয়াজ্‌জীন্‌

মহামান্য উজীর সাহেব, আপনি ওকে উপহারস্বরূপেই গ্রহণ করুণ।

ইবন্‌সয়ী

কি হরবারী কায়দা দেখাচ্ছো—আমি দশহাজার মূল্য ধার্য করলাম্‌।

মুয়াজ্‌জীন্‌

আপনার কাছে ওর চেয়ে বেশী আশা করিনা। যদি অন্য কেউ হতো আরো বেশী দাম আদায় করতাম। আমি বলি কি, ওকে দশদিন ঘরে রাখুন—সবে অনেকদূর থেকে এসেছে, পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর—কয়েকদিন বিশ্রাম, নিয়মমত স্নান, আহার প্রসাধন করুক, তাজা হোক্‌—দেখবেন কী রকম রূপ খোলে—তখন একবার ভালো করে চেয়ে দেখবেন।

ইবন্‌সয়ী

হুঁ্যা, তুমি বুদ্ধি দিয়েছো ভালো, কিন্তু আমার যৌবনোদ্ধত পুত্ররত্নটিকে তো চেনোনা—দেখছি একেবারে কৌটোয় সিল্‌ করে রেখে দিতে হবে, শান্তি হোক মুয়াজ্‌জীন্‌—সেলাম আলেকুম।

বুরাক্‌জীর্

সেলাম—শান্তি, শান্তি—উজীর সাহেব আমাদের আদাব্ নিন. শুভেচ্ছা...

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(ইবন্‌সরীর অন্তঃপুরে মহিলাদের একটি কক্ষ)

আমিনা, দুনিয়া

আমিনা

দুনিয়া, খোকাকে ডাক দাও, দেখুক্ নুরুদ্দীন এসেছে কিনা।

দুনিয়া

কি দরকার মা, তুমি জানো যে সে আসেনি, মন খারাপ করে লাভ কি ? খারাপ টাকা কখনও হারায় না।

আমিনা

কী বললে—খারাপ টাকা, খারাপ আমার ছেলে একটু উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বটে, কিন্তু সর্বগুণান্বিত, সে খারাপ নয়. ঐটুকুই তার চাঁদের কলঙ্ক, গুণরাশিনাশী নয়। পাকা সোনায় একটুখানি খাদ্, তাকে খারাপ বলিসনি।

দুনিয়া

মা যেন কী—সত্যিই কি আমি তাকে তাই মনে করি নাকি ? শুনতে ভালো লাগে তার গুণকীর্তন তোমার মুখে।

আমিনা

তোরা সবাই ঠাট্টা করবি ত কর, কিন্তু আমি বলবো ওর মত ছেলে বসোরাতে নেই—প্রমাণ করুক কেউ—এতো বড় রাজ্যে এমন সুন্দর এমন হৃদয়বান ছেলে খুঁজে বার করুক তো কেউ।

দুনিয়া

সারা সহরের মেয়েগুলো তাইতো পাগল ওকে নিয়ে—কিন্তু আমার হাসি পায় তোমাকে আর আমাকে দেখে—লোকে বলবে যেমন খারাপ মা, তেমনি খারাপ বোন।

আমিনা

কী বললি, আমি কুমাতা।

দুনিয়া

হাঁ, সব চেয়ে খারাপ মা, তুমিই ওর মাথাটি চিবিয়ে বসে আছো, আমিও বাবাও আর সারা সহর আর সহরের মেয়েগুলোর ত কথাই নেই—সবাই প্রশ্রয় দিচ্ছি।

আমিনা

কেন বল দিকিন্, মায়ের মন নিয়ে আমি ত বুঝি, ওর মত ছেলের আবদারের বিরুদ্ধতা করতে পারে কে, ওর হাসিখুসি চোখে দুঃখের রেশ্ দেখতে ?

দুনিয়া

ওই বোধ হয় আসছে।

(প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

না, উনি হচ্ছেন পিতৃব্য ঠাকুর—এবং তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে—যেন নুরুদ্দীন্ বলাবো

—তেমনি রূপ, তেমনি রক্তে রং-এ মিল। আমি তাকাতেই আমার দিকে চেয়ে হাসলো এবং সেই এক হাসিতেই আমি নাত হয়ে গেছি, মাথাঘুরে দেহ থেকে মন হরণ করে নিয়েছে, মা, এই বয়সে তোমার আবার প্রতিদ্বন্দ্বিনী জুটলো নাকি? পিতৃব্য মশায়ের ত সে বয়স আর নেই।

আবিনা

দূর, পাগলী।

(ইবন্‌সরী ও আনিস-আলজানিসের প্রবেশ)

ইবন্‌সরী

আয় না দুনিয়া, শোনো আবিনা, এই বাঁদীটিকে হাটে কিনেছি, আমাদের মহামহিম সুলতানের জন্য। তোমার ছেলেটির যেন নজর না পড়ে, ছঁসিয়ার—আমার জীবন নির্ভর করছে এর উপর, যদি কোনো রকমে সন্ধান পায় সে বা তার জন্যায় বা স্পর্শ করে, তাহলেই গেছি আমি।

আবিনা

আচ্ছা, আমি দেখছি।

ইবন্‌সরী

একটা ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের খোজা রক্ষীকে পাহারাদার করে দাও উন্মুক্ত তরবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে দোরের পাশে। ওকে বেশ করে স্নান করিয়ে ভালো খাওয়াও আর তোমার পুত্র—তুমিই তাকে আস্কারা দিয়ে নারীমেধ যজ্ঞের হোতা করেছো, তোমাকে কিছু বিশ্বাস নেই, স্নেহময়ী কিনা।

আবিনা

এ কী বলছো তুমি, আমি তাকে নষ্ট করেছি?

ইবন্‌সরী

নিশ্চয়ই, একশোবার বলবো—যখনই তাকে আমি শাসন করতে যাই তুমি এসে মিষ্টি কথা বলে আমার রাগ ভাঙিয়ে দাও—তোমার অন্ধ স্নেহেই সে নষ্ট নয়?

দুনিয়া

ক্ষান্ত হোন খুড়া মশায়, যখন আপনি বকেন তখন আমার বড্ড ভয় করে—সমস্ত পৃথিবী যেন আপনার ভ্রূকুঞ্চনে কালো হয়ে ওঠে, দেখছেন না আমি কাঁপচি?

ইবন্‌সরী

আরে আমার মুখরা মায়ী যে, তুই এখানে, কবে চাবুক খেয়েছিস্ বল দিকিন্?

দুনিয়া

কবে আবার? তুমি কি কড়া কথা বলো নাকি, কবে বকলে তাই বলো?

ইবন্‌সরী

না, আর তোকে রাখা হবে না, বিয়ে দিতেই হবে—আমার মত একটা বাক্যগণ্য বৃদ্ধকে যে কেবল হাসিঠাট্টা করবি তা হয় না, কাকে বিয়ে করবি বল দিকিন্ না?

দুনিয়া

একটি সাদাসিদে সোজা হাবাগোবা বুড়োকে, ঠিক তোমার মত হাসিখুসি, আবার ঠিক তোমার মত বকুনীও দিতে পারবে যে, আর কাউকে নয়।

ইবন্‌সরী

কেন কনীদের মত নওজোয়ান কি দোষ করলে বলি সুহাসিনী, সুবধূর ভাষিনী, শোনো তার বাপও তাই চায়, সে-ও চায়।

দুনিয়া

হ্যাঁ, এখনই এই জানলা গলিয়ে ফেলে দাও আমাকে উঠোনে—না পারো ত বলো, আমি নিজেই লাফ দিতে পারবো।

ইবন্‌সরী

থ্যাঁ, এতটা, তাই ভেবেছিলাম—না, না, তোর বিয়ে যদি নাও হয় তবু তোকে খাঞ্চনের ঘরে দেবো না—আচ্ছা আমি আসি আমিনা। আনিস্‌ তুমি থাকো, কিন্তু একটি কথা বলে যাই আমার একটি পুত্র রত্ন আছে, রূপে স্বগুণেসমুজ্জ্বল, তবে সব সময়েই তার মন "উহু উহু, চোখ চুলু চুলু"। সে যেন তোমায় না দেখে। তোমায় দেখে শুনে মনে হচ্ছে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তেজও আছে, অন্ততঃ তোমাদের নারীজাতির তুলনায়—তোমার বিচার বিবেচনায় আমার বিশ্বাস আছে, মাথা ঠিক রেখে চলো।

আনিস্‌-আলআলিস

হুকুম, আপনার কথা শিরোধার্য, আমি সাবধানে থাকবো। কিন্তু আমার নিজের উপর বেশী বিশ্বাস করবেন না, বরং আমাকে ভালো করে তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখবার চেষ্টা করুন। তাঁর যা বর্ণনা দিলেন তাতে তিনি যদি আমার চোখে পড়েন হয়তো আমিই তাঁর শ্রীচরণের দাসী হয়ে যাবো।

ইবন্‌সরী

সাবধানে থেকো তোমরা।

(প্রস্থান)

আমিনা

সত্যি মা, কি রূপ তোমার, কি রং, না, না নুরুদ্দীনের নজরে যেন না পড়ে, দেখিস্‌, দুনিয়া, সাবধান—আমি যাই ওর জন্য ঘরদোর, বাসপেটরা গোছাই—ওকে নিয়ে আয় দুনিয়া।

(প্রস্থান)

দুনিয়া

(আনিসের গায়ে চলিয়া পড়িয়া)

চমৎকারিণী. কি নাম ভাই তোমার নাম, তোমার নামটি কি ?

আনিস্-আলজালিস্

একটু হাঁফ ছাড়তে দাও ভাই, বলছি।

দুনিয়া

হাঁফ না ছেড়েই বলো।

আনিস-আলজালিস্

খুব লম্বা নাম কিন্তু।

দুনিয়া

হোক গে, তাই বলো।

আনিস-আলজালিস্

আনিস-আলজালিস্

দুনিয়া

আনিস, তোমার নামে শুধু নয়, তোমার অঙ্গে অঙ্গে হাসির সনড় বয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে তোমার দেহ যেন শান্ত নিস্তরঙ্গ কিন্তু, তোমার ঐ নুকুলিত সহাস্য অধরে আছাড় খাচ্ছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ কতো ভঙ্গী করে। শোনো সুন্দরী. আমি হাসি ভালবাসি। কিন্তু এ হাসি রাজার জন্য কেন—আমার জন্য—রাজা কখনও হাসে, কি জানি

(দৌড়ে চলে যায়)

আনিস-আলজানিস্

আমার রাজা এইখানে। কিন্তু ওরা হয়তো আমাকে গঁপে দেবে এক নক্সদাড়ীওয়ালা সুলতানের কাছে। হয়তো সপ্তাহে একদিন তাঁর দেখা পাবো এবং তাঁর কাজের জন্যই আমাকে থাকতে হবে, ভালোবাসা সোহাগ প্রীতি এসবের জন্য নয়। আমার হৃদয়পুরের রাজা হবেন পারস্যদেশের তরুণদের মত যারা হাসতে জানে আর সারা পৃথিবীকে হাসিমুখে অভিনন্দন করতে জানে—দশদিন—দশদিন অনেক সময়—রাজা উল্টে যায় দশদিনে।

(দুনিয়ার পুনঃপ্রবেশ)

দুনিয়া

এসো আনিস, আমার ভারী ইচ্ছা করছে আমার ভাই নুরুদ্দীনও যদি এখানে থাকতো আর তোমায় শিকার করতে পারতো কী মজাই হতো—কী মজা

(প্রস্থান)

[ক্রমশঃ]

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[তৃতীয় পাদ—ভক্তিযোগ]

৫

দিব্য পুরুষ

একথা না হয় বুঝলাম, ভগবানকে বিচিত্রভাবে ভালবেসে আমার হৃদয়ের তৃপ্তি। তবুও প্রশ্ন হয়, যাঁকে আমি ভালবাসছি তাঁর স্বরূপ কি? আমার ভাবে সাড়া দেবার জন্য পরমার্থ কেউ কি আছেন, না ভগবানের বিগ্রহ আমারই মনের মায়া?

আধুনিক যুগ বুদ্ধিবাদী, হৃদয়কে সে বড় একটা আসন দিতে চায় না। বুদ্ধির ঝোঁক সামান্যের দিকে, বিশিষ্ট রূপ গুণ ক্রিয়ার পিছনে নির্বিশেষ শক্তিকে আবিষ্কার করার দিকে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নৈর্ব্যক্তিক, ব্যক্তির ভাবনা বেদনা সংস্কারকে তত্ত্বমীমাংসার বেলায় যথাসম্ভব বাদ দিয়ে তিনি চলতে চান। এদেশের একশ্রেণীর দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গিও বৈজ্ঞানিকের অনুরূপ। পরমার্থ তাঁদের কাছে নির্বিশেষ সত্তা চৈতন্য এবং আনন্দ, অথবা তাও নয়— সে শুধু অনুপাখ্য শূন্যতা নাম-রূপ মায়া। তা-ই যদি তত্ত্বের স্বরূপ হয়, তাহলে শক্তি ও ভক্তি দুয়েরই সাধনা অবাস্তবের সাধনা অতএব নিষ্ফল আত্মবঞ্চনা হয়ে পড়ে, কেননা শক্তি আর ভক্তি দুইই নাম-রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ। আমি যখন কাজ করি বা ভালবাসি, তখন আমি নিঃসঙ্গ নই এই নাম-রূপের জগৎকে আশ্রয় করেই আমি আমার শক্তি ও আনন্দকে তখন মুক্তি দিই। এও কি আমার স্বভাব নয়? এরও কি শাশ্বত একটা মূল্য নাই? জ্ঞানের নিরুচ্ছ্বাস তটস্থতার সঙ্গে শক্তির এই লীলায়নের যদি একটা সমন্বয় আমরা করতে না পারি, তাহলে কি করে বলব সত্যের অখণ্ড স্বরূপকে আমরা উপলব্ধি করেছি?

বুদ্ধির কাছেই নির্বিশেষ আর সবিশেষের নির্গুণ আর সগুণের অরূপ আর রূপের দ্বন্দ্ব একটা সমস্যা। আর এ-সমস্যার সৃষ্টি হয় চেতনার উত্তারের পথে, তার একটা সাময়িক সার্থকতাও আছে। কিন্তু সহজ সর্বগত বোধের কাছে এ-দ্বন্দ্ব নাই। দেহ-প্রাণ-মনের ন্যূনতায় উৎপীড়িত হয়ে আমাকে একসময় জোরের সঙ্গেই বলতে হয়, 'আমি দেহ নই প্রাণ নই মন নই, আমি চিদানন্দ শিবস্বরূপ'। কিন্তু সেই শিবেরই প্রশান্তি চৈতন্য এবং আনন্দ যদি এই দেহ-প্রাণ-মনকে বৃহৎ উদ্ভাস্বর এবং অমৃতময় করে তোলে, তাহলে অনুভবের সে

সর্বগত নিরৌপল স্বাচ্ছন্দ্যকে হেয় মনে করবার আর-কি কারণ থাকতে পারে—ঐকান্তিক দুরাগ্রহ ছাড়া ?

বৈদিক ভাবনায় পরম তত্ত্বের সংজ্ঞা হল 'পুরুষ'—যার মধ্যে দেহ-প্রাণ-মন-বোধি সব নিয়ে পুরাপুরি একটা মানুষের বাসনা আছে। বিভজ্যবাদী (analytic) সাংখ্যভাবনায় এই পুরুষই হয়ে দাঁড়ালেন প্রকৃতি হতে বিবিক্ত এক নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্র। সাংখ্যের ভাবনা স্পষ্টতই এখানে উজানপন্থী মুমুক্ষু সাধকের ভাবনা, অতএব তার দর্শন সত্যের একদেশ-দর্শন শুধু। অখণ্ডদর্শনে পুরুষের মুক্তি শুধু দৃষ্টিতেই নয়, ভুক্তিতে এবং শক্তিতেও। ভুক্তি এবং শক্তি, আনন্দ এবং কর্ম, প্রেম ও সেবা তখন প্রমুক্ত চৈতন্যেরই উল্লাস। পুরুষ আর তখন প্রকৃতি হতে বিবিক্ত নন, প্রকৃতি তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত এবং অবিনাভূত।

*

বুদ্ধি যখন পরমকে খোঁজে, তখন এষণার চরমে সে পায় নির্বিশেষকে। খুঁজতে গিয়ে তাকে আত্মহারা হতে হয়, প্রাকৃত-পুরুষের অপরা-প্রকৃতির সমস্ত বিকারকে পিছনে ফেলে যেতে হয়। এই বিকারগুলিই এতদিন ছিল তার ব্যক্তিত্বের নির্ভর। এগুলিকে বাদ দিয়ে তার চেতনা হয়ে যায় নৈর্ব্যক্তিক। এই নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বচেতনাই পরিব্যাপ্ত হয় নৈর্ব্যক্তিক সিন্ধু চেতনায়। উপনিষদের ভাষায় এই আত্মাই হয় ব্রহ্ম, জ্ঞান-আত্মা হয় মহান্ আত্মা এবং শান্ত আত্মা, হয় 'একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্'।

আবার হৃদয় যখন পরমকে খোঁজে, সেও আত্মহারা হয়েই তাঁকে পায়। কিন্তু তখন তার মধ্যে ঘটে প্রাকৃত-গুণের অপ্রাকৃত যোগাগুণে রূপান্তর, অপরা-প্রকৃতির স্থান গ্রহণ করে পরা প্রকৃতি। প্রাকৃতগুণের পরিহারে সে গুণাতীত না হয়ে হয় শুদ্ধসত্ত্ব এবং তাইতে পরমকে পায় সত্ত্বতনুরূপে। এই সত্ত্বতনু শুধু সচ্চিদানন্দময় নয়, সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ।

'যেমন ভাব, তেমনি লাভ।' অথচ সমস্ত লাভই অফুরান। বুদ্ধি দিয়েই হ'ক আর হৃদয় দিয়েই হ'ক, কিছুতেই কেউ বলতে পারবে না, পরমকে অনিঃশেষে পেয়েছে, এর পর আর তার পাওয়ার কিছুই বাকী নাই। সমুদ্রে ডুবে গিয়ে ঘট গলে যেতে পারে, ভরে উঠতে পারে। কিন্তু গলা ঘট আর ভরা ঘট কোনওটা দিয়েই সমুদ্রের ইয়ত্তা মেলে না।

বুদ্ধির পাওয়া পুরুষের, আর হৃদয়ের পাওয়া প্রকৃতির। দুয়ের মূলেই আছে বৈরাগ্য। কিন্তু দুটি বৈরাগ্যের জাত আলাদা। পুরুষের বৈরাগ্য বিরূপে, আর প্রকৃতির বৈরাগ্য স্বরূপে। যেমন দিগম্বর শিবে দেখি জ্ঞানের বৈরাগ্য, আর তাঁরই কোলে সর্বালঙ্কারভূষিতা গৌরীর বৈরাগ্য হল প্রেমের বৈরাগ্য। 'আমি সাজি না'—এও যেমন বৈরাগ্য, তেমনি 'আমি সাজি তোমারই জন্যে'—এও বৈরাগ্য। সাংখ্যের ভাষায় এটি প্রকৃতির পারার্থ্যের বৈরাগ্য—প্রকৃতি কিছুই নিজের জন্য করে না, সব করে পুরুষের জন্য। আর তাতেই তার মধ্যে প্রকাশ পায় ঐশ্বর্য আর মাধুর্য, শক্তি আর প্রেম। কিন্তু তার জন্য প্রকৃতিকে বিরূপ হতে হয় না।

ভক্তির সাধনা প্রকৃতির স্বরূপে থেকেই পুরুষের সাধনা। সে-পুরুষ অবশ্যই নির্বিশেষ, পরঃকৃষ্ণ; কিন্তু প্রকৃতির প্রেম তারই মধ্যে আবিষ্কার করে ষোড়শকল সৌম্য পুরুষকে, মহাভাব দিয়ে আবিষ্কার করে চিরকিশোর রসঘনবিগ্রহকে।

*

জ্ঞানের সত্য আর প্রেমের সত্য—একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ। দুটি মিলিয়ে জীবনসত্য—কর্মের সত্য অর্থাৎ সেবার আর সৃষ্টির সত্য। জ্ঞান প্রেম আর কর্ম—তিনটি অতি সহজে আমার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। অখণ্ডের আলোকে তিনটিকেই একসঙ্গে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলি না কেন? পরমকে সর্বাতীত অবিগ্রহ, আবার আমারই হৃদয়রাগে সবিগ্রহ, আবার রূপে রূপে প্রতিরূপ—যুগপৎ এই তিন ভাবেই ভাবি না কেন?

অবশ্য আমরা যে-অর্থে 'পুরুষ' (Person), ভগবান্ সেই অর্থে পুরুষ নন, যদিও বিগ্রহভাবনার গোড়াতে আমরা মানুষের মত করেই তাঁর কল্পনা করি। সাধনার প্রথম অবস্থাতে এমনতর কল্পনা চিত্তের একটা সহজ এবং স্বাভাবিক অবলম্বন হতে পারে, কিন্তু ভাবের উন্মেষ এবং বিশুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনারও রূপ বদলে যেতে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্যে সীমার যে-সঙ্কোচ, তা দূর হয়ে যায় বুদ্ধি-গ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় ভাবনার প্রভাবে। বাইরের রূপ তখন হয় ব্যঞ্জনাবহ। আমার গোপালের প্রতিমার ভিতর দিয়ে তখন উঁকি দেয় বিশ্বজনীন বাৎসল্যের ঘনবিগ্রহ। তখনকার অনুভব অরূপ আর রূপের মাঝে আশ্রয় করে ভাবকে। প্রতিমা তখন ভাব উদ্‌বোধনের উপলক্ষ্য মাত্র। সেই ভাবের প্রতিরূপ দেখি রূপে-রূপে—জগতের সকল শিশুর মুখেই আমার গোপালের প্রতিচ্ছায়া। রূপ তখন আর বন্ধন নয়, অরূপেরই বিচিত্র এবং বহুলীকৃত ভাবনার উল্লাস। রামকৃষ্ণের ভবতারিণী আদিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মৃন্ময়ী। তাকে ধরেই চিদাকাশে ফুটল অপ্রতিম অতীন্দ্রিয় বুদ্ধি-গ্রাহ্য চিন্ময়ী। অবশেষে সেই চিন্ময়ীর সত্তাই আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে বিচ্ছুরিত হল সতীতে বেশ্যাতে বৃদ্ধায় তরুণীতে বালিকায়, মানুষে পশুতে পক্ষীতে তরু-লতায়—স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্র। উপনিষদের দুটি ভাবনার সমন্বয় হল এই বিশ্বতোমুখ অনুভবে 'ন চ সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য'—তাঁর রূপ চোখের সামনে দেখা যায় না। আবার 'রূপং-রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ'—রূপে-রূপে তিনি প্রতিরূপ হয়েও আবার সবার বাইরে। ঋগ্বেদের ঋষি তাইতে বললেন, 'তস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়'—তাঁর সে-রূপ চোখ মেলে চেয়ে দেখবার মতই বটে।

*

আমার যা সত্য, তা-ই বৃহৎ হয়ে হল আমার ভগবান। অথবা আমার সত্য এক বৃহৎ সত্যের বিভূতি। আমার ব্যক্তিত্বের একটা সত্য আছে, আমার নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে আমি তীক্ষ্ণভাবে তা অনুভব করি। আবার আমি যখন ভালবাসি, বহুর মধ্যে আমাকে তখন আমি ফিরে পাই—বিচিত্র রূপে। আবার কখনও অনুভব করি আমি নীরূপ নৈর্ব্যক্তিক

সর্বাতীত আকাশবৎ। আবার আকাশবৎ ভাবনার চেতনার যে-ব্যাপ্তি, আর আবার ব্যক্তি-ভাবনার চরম তীক্ষ্ণতায় চেতনার যে-ঘনীভাব, দুয়ের মাঝে ঐ রূপোল্লাসের জগৎ—যেখানে আমি সবার রঙে রঙ্ মিশিয়ে চলেছি। আমার বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে আবার এই অনুভবের যে-সমন্বয়, তা-ই আমার ভগবান্। তিনি অবিগ্রহ বিশ্ববিগ্রহ এবং সবিগ্রহ—একাধারে। তিনি পরম 'পুরুষ' বা পুরুষোত্তম। সেখানে চোখ যায় না মন যায় না—এও যেমন সত্য; তেমনি এই দুচোখ ভরে তাঁকে দেখে-দেখে, একই মনের বিচিত্র বৃত্তির উল্লাসে তাঁকে পেয়ে-পেয়েও ফুরাতে পারি না—এও সত্য।' আবার সত্য তাঁকে এই দেহ-প্রাণ-মন দিয়েও 'মনের মানুষ'রূপে পাওয়া—পাওয়া সর্বেন্দ্রিয়ের উন্মাদন এবং বিমোহন চিন্ময় রূপে, এই তনুরই অণুতে-অণুতে বিদ্যুচ্চকিত জ্যোৎস্নাতরলিত আনন্দের মূর্ছনায়। অরূপ বিশ্বরূপ আর ইষ্টরূপ—সব মিলিয়ে তাঁর স্বরূপ। ইষ্টরূপে অনুভবের যে ঘনিমা, তারই বিচ্ছুরণ বিশ্বরূপে, তারই আনন্তো 'বিনশন' (fading away) অরূপে। সব অনুভবই সত্য এবং যুগপৎ সত্য।

সীমার মাঝে অসীমের ব্যঞ্জনাতে রূপ সত্য। ভক্ত ভাবের চোখে যে-রূপ দেখেন, তা এই অর্থেই সত্য। চোখ মেলে ইষ্টের যে-রূপ দেখছি, চোখ বুজেও যদি তা দেখতে পারি, তাহলেই ইষ্টদর্শন হয় না। দেখতে হবে ভাবের চোখে, রূপকে অরূপে মুক্তি দিয়ে আবার তাকে ঘনীভূত করতে হবে চিন্ময়রূপে। তখন ইষ্টরূপ আর আমার কল্পনা নয়, সেই পরমেরই 'আবিঃ' অর্থাৎ আবির্ভাব বা প্রকাশ। এইভাব নিয়ে যদি পূজা করতে পারি, তাহলেই প্রতিমাপূজা দেবপূজা হয়ে ওঠে, নইলে তা হয় শুধু পুতুলখেলা। কি জ্ঞানে কি ভক্তিতে কি কর্মে চাই চেতনার মুক্তি এবং স্বচ্ছন্দচারিতা। রূপকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না, ভাবের উল্লাসে অরূপে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে। আবার অরূপের প্রতি অত্যাগ্রহে রূপকে প্রত্যাখ্যান করলেও চলবে না, অরূপকে তেজস্কির করতে হবে রূপের উৎসারণে। এবং সবার শেষে অরূপের অন্তশ্চিন্তিত-অতীষ্টরূপকে ছড়িয়ে দিতে হবে রূপের মেলায়, বিশ্বরূপের দর্শন জীবনেও সত্য করতে হবে।

★

দিব্যপুরুষ যেমন অবিগ্রহ, তেমনি আবার সবিগ্রহও। তিনি 'প্রপঞ্চোপশমঃ শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'—এই তাঁর স্বরূপের একদিক; তখন তিনি অবিগ্রহ। আবার আরেক-দিকে তিনি ঈশ্বর, তিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনি বিরাট্; তখন তিনি সবিগ্রহ। ঈশ্বরে তাঁর শক্তিরূপ, হিরণ্যগর্ভে ভাবরূপ, আর বিরাটে বস্তুরূপ। বিরাটে তিনি বহুরূপ—অনন্ত গুণ ও ক্রিয়ার লীলায় বিচিত্র। আমরা তাঁর এই বিশ্বরূপেরই অন্তর্গত। এখানে কালের প্রবাহে গুণ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে রূপের বিবর্তন চলছে। যে সহস্রদল পদ্মে সে-রূপবিবর্তনের চরম সার্থকতা তা-ই হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন বা ভাবরূপ। আমাদের ইষ্টের মধ্যে এই ভাব-রূপকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি, এবং সত্যকে অনুভব করি বিচিত্র পূর্ণতায়—বিশ্ব কালী কৃষ্ণ

বুদ্ধ খৃষ্টের রূপে। পাত্রের দলে-দলে রূপের বৈচিত্র্য, কিন্তুতে রূপের সমাচার। পদ্মটি ভাসছে ঈশ্বর-রূপী কারণসমুদ্রে এই দিব্যপুরুষের শক্তিরূপ। সবাইকে আবৃত করে আছে অরূপ আকাশ।

অরূপে-রূপে চতুষ্পাৎ দিব্যপুরুষের এই অনির্বচনীয় মহিমা।

৬

রসো বৈ সঃ

ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার মিলন হল যোগ। মিলনের ফল হতে পারে সাযুজ্য—জলে জল মিশে যাওয়ার মত; অথবা হতে পারে সালোক্য—যেন আলোর মাঝে আলোর খেলা, চেতনায়-চেতনায় বিদ্যুদ্বিনিময়; অথবা সাধর্ম্য—আবিষ্ট চেতনা হতে সাবিত্রদীপ্তির বিচ্ছুরণ। তিনটি অনুভব পৃথক বা যুগপৎ দুইই হতে পারে। যুগপৎ হওয়াটাই পূর্ণ-যোগের লক্ষ্য। সাযুজ্যের বোধ তখন অদ্বৈতচেতনারূপে জীবনের অধিষ্ঠান সেই অধিষ্ঠানেই সালোক্যের বোধে দ্বৈতের অদ্বৈতসম্পৃক্তি বিলাস, আবার সাধর্ম্যে বহুর মেলায় দিব্যজীবনের লীলায়ন, তার সামর্থ্যের বিকিরণ।

জীব আর ব্রহ্মের সম্পর্ককে যদি প্রকৃতি আর পুরুষের সম্পর্ক বলে ধরি, তাহলে সাযুজ্যে প্রকৃতি পুরুষে অভিনিবিষ্ট বা তন্ময়, সালোক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে পুরুষে বিলসিত, আর সাধর্ম্যে পুরুষ হতে বহুধা বিচ্ছুরিত। পুরুষ আর প্রকৃতির অন্যোন্যাসঙ্গের যদি অনুভবের মধ্যপর্ব হয়, তাহলে তার উত্তরপর্বে অদ্বৈত, আর অবরপর্বে সৃষ্টি। আবার উপর থেকে নীচের দিকে দেখতে গেলে এ যেন একের মিথুনাকারে দুই হওয়া, আবার সেই মিথুন হতে বহু মিথুনে বিচ্ছুরিত হওয়া। বৈষ্ণব কল্পনা করলেন, বিশ্বের রাসচক্রের কেন্দ্রে একটি নিত্যমিথুন, যাঁরা 'একাত্মনাবপি দেহভেদং গতৌ'—এক আত্মা হয়েও দুটি দেহে ভিন্ন হয়েছেন; আর চক্রের পরিধিতে সেই মিথুনেরই অনন্ত কায়ব্যূহ। এটি অপ্রাকৃত ভাবলোকের ছবি; প্রাকৃতলোকের অসমতল দর্পণে তারই আঁকাবাঁকা প্রতিচ্ছবি। সব মিলে এক অন্বয়তত্ত্বেরই একবচন দ্বিবচন আর বহুবচন। জ্ঞান প্রেম আর শক্তির লীলায়ন। অবিরোধে তিনটিকে একসঙ্গে পেলেই যোগের পূর্ণতা।

তিনটি অনুভবের মূলেই নিবিড় হয়ে আছে একটি তত্ত্ব—রস বা আস্বাদনের অনির্বচনীয়তা। রস জ্ঞানে, রস প্রেমে, রস শক্তির উল্লাসে বা কর্মে। তবুও মনে হয়, রস যেন প্রেমেরই স্বধর্ম। জ্ঞানে আমরা তটস্থ থাকতে পারি, অকর্তার ভাব নিয়ে নির্বিকার হয়ে কর্মও করতে পারি; কিন্তু তটস্থ বা নির্বিকার হয়ে ভালবাসছি, একথা বলা চলে না। উল্লাস অথবা আস্বাদনের রমণীয়তাই ভালবাসার প্রাণ।

কিন্তু এই রসচেতনা জ্ঞানে এবং কর্মেও আছে। প্রাকৃত জগতে রস অতিসহজেই পেঁকে ওঠে বলে অপ্রাকৃতের সাধনায় আমরা রসকে বর্জন করে চলি। তাইতে জ্ঞানীর প্রতি অনুশাসন, ব্রহ্মোপলব্ধির পথে রসাস্বাদকে সযত্নে পরিহার করতে হবে। কেউ-কেউ এমনও বলেছেন, সত্তা এবং চৈতন্যই আত্মার স্বরূপলক্ষণ—আনন্দ নয়। কর্মযোগে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার অর্থ দাঁড়িয়েছে আবেগশূন্য হয়ে কঠোর চিত্তে কর্তব্য সম্পাদন করে যাওয়া।

রসের প্রতি এই বিতৃষ্ণা দুঃখবাদী দর্শনের দান—যে-দর্শন গোড়াতেই রসকে প্রাকৃত সুখের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে। বস্তুত রস সুখ-দুঃখের অতীত, অথচ সুখ-দুঃখের মর্মমূলে। দুঃখেও যে রস আছে, তা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করি ভালবাসায়। সুখ-দুঃখের ছোঁয়াচ বাঁচাতে গিয়ে জ্ঞানকে বা কর্মকে যেখানে রসাস্বাদবর্জিত করবার সাধনা করি, সেখানে কিন্তু জ্ঞানের পরিপক্ক রূপটি পাই না। স্বভাবের গভীরে ডুবলে দেখি, জ্ঞানের প্রপাত্তোপশম প্রশান্তির মূলে আছে আত্মারামতা, অনাসক্ত কর্মের মূলে আছে সেবার বা সৃষ্টির উল্লাস। রস সব অনুভবের মূলে, কেননা আনন্দ সত্তার স্বধর্ম। ভক্তির কারবার সোজাসুজি এই রসকে নিয়ে; জ্ঞান আর কর্মকে কখনও-কখনও একটুখানি ঘুরপথে তার কাছে পৌঁছতে হয়।

*

শুধু তাঁর জন্যই তাঁকে চাইতে গিয়েই তাঁর রসস্বরূপকে আবিষ্কার করি। সে-চাওয়ার মধ্যে আমার আত্মরতির স্থান নাই। তাঁকে বিশ্বাতীতরূপে চাই বিশ্বের অতীত হয়ে নিজের মুক্তিবাসনাকে চরিতার্থ করব বলে নয়, আমার চেতনায় বিশ্বাতীত রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন বলেই। গোলোকের মাধুরীতে ডুবতে চাই আমার রসতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করব বলে নয়, অখিলরসামৃতমূর্তিতে তিনি আমার হৃদয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বলেই। যতক্ষণ একলা আমার চাওয়া, ততক্ষণ সবই বিরস, পাওয়ার মধ্যেও তখন একটা আড়াল থেকেই যায়। রসের ফোয়ারা তখনই উছলে ওঠে, যখন তাঁর চাওয়াতেই আমার চাওয়া—মহাজনেরা যাকে বলেন সমর্থারতি। তখন তিনি যে-রূপেই আসুন না কেন, সবই তাঁর রসরূপ: রস বিশ্বাতীতে, রস বিশ্বরূপে, রস হৃদয়নিকুঞ্জে আনন্দঘনবিগ্রহরূপে—সুখে-দুঃখে জয়ে-পরাজয়ে সিদ্ধিতে-অসিদ্ধিতে লাভে-অলাভে সব কিছুতেই রস। যতক্ষণ কামনা আছে—সে-কামনা যত উচ্চকোটিরই হক না কেন—ততক্ষণ রস বিশুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রীতির ইচ্ছা যখন সম্পূর্ণ পর্যবসিত হয় কৃষ্ণপ্রীতিইচ্ছার মাধুরীতে, তখনই প্রেম, তখনই রস।

রসযোগেই সব যোগের পূর্ণতা। চক্রের নাভিতে শলাকার মত সব যোগই এসে তখন সমর্পিত হয় ভালবাসায়। তাঁকে ভালবাসি বলেই তাঁকে বিচিত্ররূপে জেনে আমার আনন্দ—বিশ্বাতীতে বিশ্বে ব্যক্তিতে অরূপে-রূপে নির্গুণে-সগুণে অবিগ্রহে-সবিগ্রহে মুক্তচ্ছন্দ আস্বাদনের আনন্দ। তাঁকে ভালবাসি বলেই তাঁর কর্মে আমার আনন্দ—তাঁর অনিবার্য শক্তির প্রবাহে ভেসে যাওয়ার, তাঁর আলোকে তাঁরই স্বপ্নের ফুল হয়ে ফুটে ওঠার, তাঁর দুর্ধর্ষ বীর্যের শরিক হয়ে তাঁর সৃষ্টির উল্লাসকে সার্থক করবার আনন্দ।

এমনি করে কামগন্ধহীন রসের অভিষেকেই জীবনের পর্বে-পর্বে ফোটে সহস্রদল সৌষম্যের পূর্ণতা। অন্তরে জাগে সামরস্যের সুধার উচ্ছল প্রেম, চোখে লাগে অরূপের রূপমাধুরীর মায়াঞ্জন।

৭

আনন্দ-ব্রহ্ম

সৎ চিৎ আর আনন্দ—তিনটি ওতপ্রোত। তবুও যেন সত্তা আর চৈতন্যের পুষ্টি এবং পূর্ণতা আনন্দে। ভালবেসে এই আনন্দকে আবিষ্কার করি—বাইরে রূপে, আর অন্তরে রসে। এই আবিষ্করণে আর আস্বাদনে জানার অন্তরঙ্গতা আর নিবিড়তা। আনন্দরূপে যাঁকে জানি, তাঁকে দেহ প্রাণ মন হৃদয় বোধি সব দিয়ে জানি। জানার উল্লাস রূপ পায় সেবায় আর সৃষ্টিতে। জীবনে তখন জ্ঞান ভক্তি আর কর্মের ত্রিবেণীসঙ্গম। আনন্দ তার রসায়ন।

একটি কথা গোড়াতেই জেনে রাখা ভাল, আমরা যাকে সুখ বলি, আনন্দ তা নয়। সুখ বস্তুনির্ভর, আর আনন্দ স্বনির্ভর, সত্তার গভীর হতে আপনি সে উছলে পড়ে। শৈব দার্শনিক তাই আনন্দের একটি সুন্দর লক্ষণ দিলেন—'আনন্দো বিশ্রান্তিঃ'। যোগী তার ইশারা করলেন—সমস্ত প্রযত্ন শিথিল করে চেতনাকে অনন্তে ছড়িয়ে দিয়ে আধারব্যাপী যে স্থিরসুখের অনুভব হয়, তা-ই আনন্দ। উপনিষদের ঋষি তার সংজ্ঞা দিলেন 'ভূমা' তার উপমা দিলেন আকাশ। বললেন এই আকাশ যদি আনন্দ হয়ে আবিষ্ট করে না রাখত, তাহলে কেই-বা শ্বাস ফেলত, কেই-বা বাঁচত? এই আকাশ হৃদয়ে এসে বেঁধেছে ছোট একটি কমলের ঘর, আর সেখান থেকে দ্যুলোক-ভূলোককে ছাপিয়ে গেছে।

আনন্দের এই নির্বিশেষ স্বরূপকে অনুভব করতে হবে, জানতে হবে আকাশকে, আনন্দব্রহ্মকে। তবে রতি স্থির হবে। মহাজনেরা তাই বলেন, সব ভাবের মূলে শান্তভাব। 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া'—নির্বিকারাত্মক চিত্তে প্রথম যে-বিকার, তা-ই ভাব। কিন্তু অলৌকিক ভাবে বিকার সত্ত্বেও তার নির্বিকার স্বভাব ক্ষুণ্ন হয় না। ভাবের গতি তখন 'অগাধজলসঞ্চারী রোহিতের মত', অথবা আকাশে উপচে-পড়া আলোর তরঙ্গায়ণের মত। গতি আছে, তার অনিবার্য সংবেগ আছে; কিন্তু সে-গতি অন্তরাবৃত্ত। তৃষ্ণা আছে—রূপের তৃষ্ণা, রসের তৃষ্ণা; কিন্তু পুটপাকেরই মত তার পরিপাক চলছে অন্তরের গভীরে। ভাগবতী রতির স্বরূপ লোকোত্তর। তার মধ্যে স্থিতি আর গতিতে সমান অনুপাত—পরমাণুগর্ভস্থ বিষম বৈদ্যুতের সৌষম্যের মত। অমের গতিতে আর অটল স্থিতিতে গাঁটছড়া বাঁধা। যেন আকাশের বুকে সবিতার কৌস্তভদ্যুতি।

*

ঋষিরা বলেন, অপক্ক পাত্রে সোমরস ঢালনে পাত্রকে তা বিদীর্ণ করে দেয়। তেমনি অবিশুদ্ধ দেহ-প্রাণ-মন এই আনন্দব্রহ্মের আবেশকে স্বচ্ছন্দে ধারণা করতে পারে না। অবিশুদ্ধির কারণ হল জড়তা, চাঞ্চল্য, বস্তুনির্ভরতা। ব্রহ্মের আনন্দ বিচিত্ররূপে আমাদের স্পর্শ করছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু আমরা সে-স্পর্শে হয় সাড়া দিতে পারি না, অথবা রাগ-না-রানা মনের আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠি, যে-বস্তুকে উপলক্ষ্য করে আনন্দের প্রকাশ তাকেই লক্ষ্য করে তার পিছনে-পিছনে ছুটি।

প্রাকৃত আস্বাদনের এই ধারাকে বদলে ফেলতে হবে। চিত্তকে করতে হবে অত্যন্ত স্পর্শসচেতন অথচ প্রশান্ত। বাসকসজ্জিতার বিনিদ্র প্রতীক্ষা থাকবে, কিন্তু তার মধ্যে উন্মথন ব্যাকুলতা থাকবে না। অকৃপণ তাঁর স্পর্শ, অজস্র তার উপলব্ধি। কিন্তু উপলব্ধি হতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করে নিবিষ্ট করতে হবে তার উৎসে: বস্তু হতে যেতে হবে ভাবে, ভাব হতে সংবেদনে। উপনিষদের ঋষির ভাষায় শরীর হবে আকাশ, প্রাণ হবে আগান, তবেই মন হবে আনন্দ, আর চেতনা পাবে শক্তিসমৃদ্ধ অমৃতের আস্বাদন।

একদিনে তা হবে না, হবে ধীরে-ধীরে—অবিচ্ছেদ অথচ অনুচ্ছলিত অভ্যাসের ফলে। ভাবের সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা খেলবে। জোয়ারের প্রতি লোলুপতা আর ভাটায় বিমর্ষতা প্রথমটায় স্বাভাবিক। কিন্তু সাধককে এই দুটি অন্তই পরিহার করতে হবে। ভাব স্বভাবের স্ফূর্তিরূপে দেখা দিলেই তা কেমনতর হয়। চিত্তের প্রশান্তি আর পরিব্যাপ্তি এবং নিত্য-সমনস্কতা তার সাধন। আনন্দব্রহ্মের আবেশে, আলোয় ছোঁয়ায় ফুল ফোটার মত চৈতন্য বিকসিত হবে সহজের দীপ্তিতে ঐশ্বর্যে এবং মাধুরীতে।

*

ব্রহ্মোপলব্ধির তিনটি রীতি—অন্তরে, বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে। আনন্দব্রহ্মও আমাদের কাছে ধরা দেন এই তিন রীতিতে। অন্তরে তাঁর আসন হৃদয়ে, অথবা 'শিরসি সহস্রারে'। হৃদয় জীবচৈতন্যের ধাম, চেতনার ধারা সেখানে ঊর্ধ্বস্রোতা; আর সহস্রার শিবচৈতন্যের ধাম, সেখান হতে ভ্রূমধ্যবিন্দুকে উন্মীলিত করে ঝলকে-ঝলকে নেমে আসে আলো আর শক্তির বৈদ্যুতী। হৃদয়ের কমল যখন দল মেলে, তখন কিশোরী ভালবাসার মধুচ্ছন্দা আকূতি আলো আর আনন্দের অভিষেকে আধারকে করে চিন্ময়, ঊর্ধ্বস্রোতা প্রবেগে উধাও হয় মূর্ধন্যচেতনার শূন্যতায়, উতল সৌরভের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে যেন জড়িয়ে ধরে বিশ্বচরাচর। আবার ঊর্ধ্বে সহস্রদল কমল বিকসিত হয় যখন, চেতনা আপ্লুত হয় দিব্য জ্যোতি আনন্দ আর শক্তিতে, শিব-শক্তির সামরস্যের অমৃত পর্জন্যের ধারাসারে ঝরে পড়ে আধারের সর্বত্র, উচ্ছল প্রবাহে বয়ে চলে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তে।

আধারে ব্যক্তিচৈতন্যের গহনে আনন্দব্রহ্মকে যেমন পাই, তেমনি আবার পেতে পারি বিশ্বচৈতন্যের পরিব্যাপ্তিতে। এ-জগৎ 'আনন্দরূপং ব্রহ্মণো যদ্ বিভাতি'—ব্রহ্মেরই আনন্দরূপ, ঝলমল করছে দিকে-দিকে। তিনিই হয়েছেন এই যা-কিছু, হওয়ার আনন্দে

উছলে চলেছেন শাশ্বতকাল ধরে। বর্ষার জলের মত তাঁর সত্তা প্লাবিত করে রয়েছে সব-কিছু, তাঁরই আনন্দ সর্বত্র উদ্ভিন্ন হয়ে উঠছে বিচিত্র পত্র-পুষ্পের মেলায়। রূপে-রূপে তিনি চিদানন্দঘনবিগ্রহ, রূপান্তরিত চেতনায় দিব্য ইন্দ্রিয়ের গোচর। যেন তাঁরই চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা, সত্ততনুতে রমিত হওয়া তাঁরই অতনুর আলিঙ্গনে।

আবার তাঁর আনন্দকে অনুভব করি বিশ্বাতীতে, তাঁর আত্মারামতার অনুপাখ্য-নৈঃশব্দ্যের গভীরে। চিন্ময় সুষুপ্তিতে বিশ্ব আর ব্যক্তি দুই-ই তখন অবলুপ্ত, জীবন-মৃত্যুর আন্দোলন অপ্রকেত অমৃতসমুদ্রের গহনে নিস্তব্ধ। সুষুপ্তির আনন্দের মতই আনন্দ তখন প্রবিবিক্ত বোধের অতীত হয়েও 'সর্বেশ্বরঃ সর্বযোনিঃ'।

এমনি করে অন্তরে বাইরে এবং সমূর্ধ্বে তাঁকে আস্বাদন করা এক সংবর্তুল প্রত্যয়ে—প্রথম হয়তো বিদ্যুদ্দানের চকিতচমকে, তারপর স্থির সৌদামিনীর প্রচ্ছটায়, অবশেষে রূপান্তরিত দিব্যচেতনার আনন্দঘনতায়—এই তো ভক্তিযোগের পরমা সিদ্ধি। ব্রহ্ম তখন পুরুষোত্তম, আত্মানন্দ—অক্ষরের আত্মারামতা হতে আত্মবিধুন আত্মক্রীড়ের চিন্ময় রসলীলায় মধুস্যন্দী।

৮

প্রেমের লীলা

জ্ঞানবাদীরা বলেন, অক্ষর ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব, তাতে নিজে এক হয়ে যাওয়াই জীবের পরম পুরুষার্থ তার মধ্যে উপাসনার স্থান কোথায়? ভক্তিবাদী আবার অক্ষরে লীন হতে চান না, তাঁর পরম পুরুষার্থ হল পুরুষোত্তমের উপাসনায় প্রেমসেবোত্তরা গতি। জ্ঞানপন্থীর প্রতি কটাক্ষ করে তিনি এমনও বলেন, অক্ষর পুরুষোত্তমেরই তনুভা বা অঙ্গচ্ছটা মাত্র—যেমন সূর্যালোক মণ্ডলনদ্ধাবর্তী হিরণ্ময় পুরুষের তনুভা।

কিন্তু এ সব কথা একদেশদর্শনের, সম্যক্-দর্শনের নয়। সম্যক্-দৃষ্টিতে পরম তত্ত্ব একাধারে ক্ষরপুরুষ অক্ষরপুরুষ এবং পুরুষোত্তম। অরূপে-রূপে, নির্গুণে-সগুণে, নিত্যে-লীলায় কোনও বিরোধ নাই। নিত্যই স্বরূপে অটল থেকে লীলায় টলমল করছেন; আবার লীলার মধ্যেই দেখছি প্রবাহের নিত্যতা, ব্যঞ্জনার অসীমতা। জ্ঞানী খুঁজছেন সীমার পিছনের অসীমকে; আর ভক্ত খুঁজছেন সীমার মাঝেই অসীমকে। উভয়ত্র অসীমেরই উপাসনা।

সীমা অসীমকে চাইছে, অল্প চাইছে ভূমাকে, ক্ষুদ্র বৃহৎকে—অধ্যাত্মসাধনার এই তো সার কথা। অসীমের স্পর্শ যেভাবেই পাই না কেন, প্রথম তাকে পাই সীমার মধ্যে থেকেই: চেতনা আপ্লুত হয় বিস্ময়ে, আনন্দে। দুয়েরই মধ্যে আছে মহিমবোধ। তার পরিণাম

অহংগ্রন্থির শিথিলতা, ভক্তি, উপাসনা। অসীমের আবেশে অহং বিলুপ্ত হতে পারে, আবার রূপান্তরিতও হতে পারে। ভোরের পাতলা সাদা কুয়াসা কখনও সূর্যের আলোয় গলে যায়, কখনও-বা সূর্যের নতুন জন্মে ওঠে। তার চরম পরিণাম হয়তো গলে যাওয়া, কিন্তু জন্মে ওঠাটা মিথ্যা নয়। বরং এই রূপান্তরেই তার সত্তার পূর্ণতা, কুয়াসারূপে থেকেই সূর্য হয়ে ওঠাই তার জীবনের পরম চমৎকার।

অসীমকেই চাই। হয়তো তাঁর মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই, চাই মহানির্বাণের পরমা প্রশান্তি। হয়তো চাই তাঁর মধ্যে উন্মুলিত হয়ে উঠতে, চাই আমার ব্যক্তিসত্তার চরম ঐশ্বর্যের বিস্ফোরণ, তার পরম মাধুর্যের উচ্ছলন। কিন্তু এসবই আমার চাওয়া, তিনি কি চান, তা এখনও জানি না। আমার চাওয়া বলেই চাওয়াতে-চাওয়াতে এত বিরোধ, মত আর পথের এত হানাহানি। কিন্তু অসীমের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমার চাওয়া-পাওয়া আর খৈ পায় না যখন, তখন রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে হয় অপরূপের আবির্ভাব। নির্গ্রন্থ আত্মারাম মুনির হৃদয়ে অহৈতুক রসের উল্লাস, রসিকের অন্তর্দশায় পরঃকৃষ্ণ শূন্যতার নিঃসঙ্গ অবতরণ—দুই-ই শুধু সম্ভব নয়, সুনিশ্চিত।

*

'সর্বভাবেন' তাঁকে পাওয়া হল পাওয়ার চরম। কিন্তু কোনও পূর্বসংস্কারের বশবর্তী না হয়ে নিজেকে অসঙ্কোচে তাঁর কাছে মেলে না ধরলে তা সম্ভবপর হয় না। তার জন্য চাই বুদ্ধির ঔদার্য, ভাবের বিশুদ্ধি এবং কর্মে তন্নিষ্ঠতা। কিন্তু সাধারণত মানুষ রুচি এবং সংস্কারের দাস। অসীমকে মনোগত সীমার মধ্যে বন্দী করে তবে সে তাঁর ধারণা করতে পারে। তিনিও যে যেভাবে চায়, সেইভাবেই তার কাছে ধরা দেন। ভক্তির সাধনা তাই প্রবর্তিত হয় বিশিষ্ট নাম-রূপের মাধ্যমে ইষ্টের উপাসনা দিয়ে। কারও ইষ্ট কোনও দেবতা, কারও কোনও মহামানব। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা যে করে, তারও ঈশ্বর তার কল্পনারই অনুযায়ী—সেও সূক্ষ্ম নাম-রূপেরই উপাসনা করে। সর্বত্রই নাম-রূপ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য সেই অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দ।

পূর্ণযোগে ভক্তির সাধনায় সৎ-চিৎ-আনন্দের ভাবনাই মুখ্য, নাম-রূপ গৌণ। পূর্ণযোগীর ইষ্ট প্রথম হতেই 'বিশ্বরূপ' বা 'জগদ্‌মূর্তি'—বিশ্বচরাচরে সর্বজীবে লোকে লোকান্তরে যা-কিছু তাঁর অনুভবের গোচর, তা-ই তাঁর ইষ্টের আনন্দরূপ, সেই সচ্চিদানন্দেরই বিগ্রহ। সবার ইষ্টের মধ্যে তাঁরই ইষ্টের স্ফূর্তি। নিঃশেষে নিবেদিত অন্তরের নিরন্তর মননে ভাবৈকরস চিত্তের মাধুরী তাঁর চোখে পরিয়ে দেবে এক দিব্য অঞ্জন তখন তাঁর 'যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা তাঁহা ইষ্ট স্ফুরে'। ইন্দ্রিয়পথে বিশ্বের নামে আর রূপে তখন তাঁর ইষ্টের সঙ্গে সাযুজ্য।

এমনি করে ব্যাপ্তিচৈতন্যের ভূমিকায় বাইরে সর্বত্র ইষ্টদর্শনের অভ্যাস হল সাধনার একদিক। আরেকদিক হল চেতনার সংহরণে (convergence) অন্তরে ইষ্টের

চিন্ময় বিগ্রহের অনুধ্যান। বিগ্রহ দু'রকমের তত্ত্ববিগ্রহ আর ভাববিগ্রহ। তত্ত্ব-বিগ্রহে পরতত্ত্বের কতকগুলি বিভাবকে প্রতীকের আকারে প্রকাশ করা হয়। অধিকাংশ শাস্ত্রীয় বিগ্রহ এই ধরণের। ভাববিগ্রহ হল আমার মনের মত, আকৃতির অস্পষ্ট নীহারিকাই সেখানে জমাট বেঁধে বিগ্রহের রূপ ধরে। বলা বাহুল্য, এই বিগ্রহই সাধকের 'সত্যস্য প্রাণারাম মনআনন্দ', তাঁর রসচেতনারই সান্দ্র প্রতিরূপ। আধারের কানুসের মধ্যে প্রদীপের মত এই চিন্ময় প্রতিরূপকে নিরন্তর বহন করে চলতে হবে,—শুধু নির্জনে নয়, সজনে, জীবনের ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প কর্ম সব-কিছুর ঐকান্তিক নিবেদনে তাঁর সাযুজ্যবোধকে হৃদয়ে গভীর করতে হবে। অবশেষে জীবন হয়ে উঠবে তদ্‌গত, তাঁর চিন্ময় স্পর্শে চিন্ময়—এমন-কি দুঃখ-শোকের প্রতিকূল বেদনাও রূপান্তরিত হবে শান্তিসমৃদ্ধ আনন্দের অমৃতে।

তাঁর দ্বারা এমনি করে অধিকৃত আবিষ্ট গ্রস্ত এবং রূপান্তরিত হওয়ার পরিণাম হল ভাবোল্লাস। ভাবের কথা আগেই বলেছি ভক্তিযোগের সাধনাই হল ভাব দিয়ে পরমকে পাওয়া আস্বাদন করা আস্বাদিত হওয়া। দাস্য হতে মধুর পর্যন্ত ভাবের বিচিত্র পরম্পরা —যে-ভাবে হৃদয় তাকে চায় সেইভাবেই পাওয়া যায়। তিনি প্রভু শাস্তা ত্রাতা নিয়ন্তা পিতা মাতা সখা পুত্র কন্যা—সব। শুধু তা-ই নয় কখনও তিনি হৃদয়ে আসেন প্রতিকূল হয়ে—শত্রুর রূপে। আমার অজানতে জীবনে তাঁর ছোঁয়া লাগে, আমার সুখের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তিনি আমায় বুকে টানেন—আমি তাঁকে চাই না, কিন্তু ভুলতেও পারি না। সে এক বিষম জ্বালা।

কিন্তু তাঁকে সবচাইতে নিবিড় করে পাওয়া হল মধুরভাবে—গোপীর মত প্রিয়তমরূপে। আগেও বলেছি, যেমন শান্তভাব সমস্ত ভাবোল্লাসের অধিষ্ঠান, তেমনি মধুরভাবের মধ্যেই সব ভাবের অন্তর্ভাব। মধুরভাবে পাওয়ার অর্থ হল পরমা-প্রকৃতি হয়ে সাযুজ্যের আনন্দে পরমপুরুষকে পাওয়া। বিশ্বের সমস্ত আনন্দ এই আনন্দেরই বিভূতি এবং উল্লাস।

মহাজনেরা মধুরভাবের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—বাম্য বা বক্রতা। সাপ যেমন সোজা চলে না, এই ভালবাসাতেও চিত্তের বৃত্তি তেমনি সবসময় সোজা পথে চলে না। তার ফলে দেখা দেয় প্রিয়তমের অনাদরের কল্পনায় অভিমান। অভিমান যেন প্রিয়তমকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরিয়ে দেয়, কিন্তু তার পরমুহূর্তেই বিরহের দুঃসহ সন্তাপে প্রাণ জ্বলে-পুড়ে যায়, বিচ্ছেদের অশ্রুজলে আবার নতুন করে প্রেমের অভিষেক হয়।

এমনি করে মিলনে-বিরহে আনন্দে-বেদনায় 'বিষামৃতে একত্র করিয়া' চলে প্রেমের লীলোচ্ছলতা, এক অনির্বচনীয় রসায়নে রসায়িত হয় ইন্দ্রিয় প্রাণ আর মন—এমন-কি দেহ পর্যন্ত হয় সাত্ত্বিক বিকারের রঙ্গপীঠ। অনন্তের মধ্যে সান্তের প্রলয় নয়, সান্তের মধ্যে অনন্তের আবেশ ও বিলাস—তার গাঢ়তা আর বিভঙ্গের যেন শেষ নাই।

এই যে ভুক্তা এবং ভুক্তি—এও মুক্তি। উপনিষদে পুরুষের যে-মুক্তি, তারই পাশাপাশি উল্লাসে প্রকৃতির মুক্তি। আত্মারামের হ্লাদিনী স্বরূপশক্তির বিচিত্র বিলাসের বিবর্ত—সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য মুক্তি তার তরঙ্গভঙ্গ।

মধুরভাবের আকর্ষণ উন্মাদন। কিন্তু তাকেই একান্ত করে তোলা পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। পূর্ণযোগী পরমকে আস্বাদন করতে চান 'সর্বভাবেন'। তাছাড়া রসাস্বাদনের সঙ্গে জ্ঞান ও কর্মেরও তিনি কোনও বিরোধ দেখেননি। ভাবনা বেদনা (feeling) এবং স্বকল্প তিনটিই মানুষের মধ্যে ওতপ্রোত এবং সহচরিত বৃত্তি, তিনের সুসমন্বিত দিব্য রূপান্তরই পূর্ণযোগের আদর্শ—ভক্তিযোগের সাধনার একথা ভুললে চলবে না।

[তৃতীয় পাদ সমাপ্ত]

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

মানুষী তনুতে কে তুমি অতনু অলোক-বিবস্বান,
সীমার মাঝারে কে তুমি অসীম—অমরার আনো দান :
সব রজনীর ওই হ'ল শেষ—
নব প্রভাতের চির উন্মেষ,
তোমারি চরণে প্রণত বিশ্ব লভে আজি নব প্রাণ,
মানুষী তনুতে কে তুমি অতনু অলোক-বিবস্বান ?

ঘুমভাঙানিয়া বাঁশিতে তোমার, সুন্দর হে মধুর,
নব-চেতনার সব দিগন্তে ঢালো আজি কোন সুর ?
মুক্তির বাণী কণ্ঠে তোমার—
পাষাণ-যন্ত্র ভাঙে কারাগার,
হৃদয়-তন্ত্রে পাবক-মন্ত্রে উদগীথ নব গান,
মানুষী তনুতে কে তুমি অতনু অলোক-বিবস্বান।

স্বপনী-স্বপ্ননিষিক্তনয়নে তুমি হেথা ফিরে চাও,
সারথি, পূর্ণ বিজয়ে দীর্ণ-মানবতা সাথে নাও।
ঊষর সরণী বর্ণে বিশোভি'
আনিলে স্বর্ণ-জ্যোতি-জাহ্নবী,
তট-সীমানায় লাগে তরঙ্গ জাগে কার কলতান,
মানুষী তনুতে কে তুমি অতনু অলোক-বিবস্বান।

সৌর কলঙ্ক

অনির্বাণ

স্বাচ্ছন্দ্যের রোমন্থন রইল না জীবনে—
এ এক পরিত্রাণ, একটা আশীর্বাদ
চরম পাওয়ার আয়েস জড়তা আনল না কোনওদিন—
এক নিরাসক্ত চিরন্তন চাওয়া
শূন্যের নগ্নরূপ বুকে উঁচিয়ে রইলো কাঁটার মত—
'তারপর.....।'

এই যদি নিয়তি হয়,
জয় হক সে নিয়তির।
কপালিনীর কুটিল ভ্রূকুটিতে
দু'খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ুক বসন্তসখার ফুলধনু
পাষাণীর কঠিন আশ্লেষ পাঁজর গুঁড়িয়ে দিক
গুঁড়িয়ে দিক আসব শিথিল চেতনায় ফেনিয়ে ওঠা
ক্লিন্ন ভালবাসার আতুর স্বপ্ন।

নিষ্ঠুর উল্লাসে চর্বণ কর মনের যত বিভ্রম
হে রক্তদন্তিকা,
কিছুরই কোনও শেষ রেখো না যেন।
থাক্ শুধু নিষ্কিঞ্চন প্রলয়ের নিঃসীম তেপান্তর :
চোখবুজে সব ফুরিয়ে দেবার আরাম নেই তার মধ্যে,
আছে মধ্যাহ্নসূর্যের নিশ্চিত তীক্ষ্ণতায় ঝলসানো দৃষ্টিতে
এক অজানা রশ্মির চকিত আবির্ভাবের প্রত্যাশা শুধু।

আর আনন্দের কাকলি থাক শিশুর তরে—
উদ্দীপ্ত যৌবনের কঠিন মুষ্টির পরে এল
অনড় পাষাণপ্রাকারের ঘন্টাহ্বান :
'বীনু চিদ্ আ রুহু।'

অচ্যুত হবে প্রচারিত,
দুর্ধর্ষ বজ্রের লেলিহা
শূন্যের ধূসর শৈকতে ঝলকে মিলিয়ে যাবে
বিদ্রোহী প্রমিথিউসের অন্তরতপ্ত অন্তিম নিঃশ্বাসের মত।

জানি, সুখ নাই
সোয়াস্তিটুকুও কোথাও নাই।
অথচ আমাদের ঘিরে উথলে উঠেছে আলোর বন্যা।
আর তারই মাঝে
অতলস্পর্শ সৌরকলঙ্কের কালিমা
আসন্নপ্রসবার ব্যথার ঝিলিকে
চিকচিক করছে এক বিপ্লবী যুগান্তের জন্মলগ্নের উপান্তে।

বলি,
দুঃখের জয় হোক,
জয় হোক অদীনপ্রাণের,
আঁধার-চেরা বিদ্যুতের খাসকেয়ুরে জড়ানো
পিনাকপাণির উদ্যত ঈষিকার জয়।

আশ্চর্য!
অবিদ্যা আর দুঃখের হেতু নয়,
বিদ্যার অমৃতমন্থন বীর্যের তির্যক সন্নিপাতে।
অনেক জ্বালার বিস্মিত বেদনায়
পূর্ণিমারাতের নদির উচ্ছ্বাস মিইয়ে গেছে...

জেগেছে অমানিশার ঝড়ো হাওয়ার উর্ধ্বশ্বসিত আর্তনাদ
অভিরোহী প্রাণপঙ্কের মর্মে উদ্ভিন্ন
আকূট চেতনার পাণ্ডুর বেদনা
বিষাদৃতের বিহ্বল প্লাবনে
ফেনিয়ে উঠেছে যুগান্তের নীলকণ্ঠ।

কান পেতে শুনেছি একদিন
সে বেদনার ছিন্নসুর

বিস্রস্ত নিকণে গুমরে মরেছে
বিরহিণী রাধার হৃদয়তন্ত্রে,
আরোহ অবরোহের সর্পিল বিদ্যুতে ঝিকিয়ে উঠেছে
উদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ
চিরকিশোরী মীরার আবরণ অতৃপ্ত এষণায়।

ভেবেছি
এ শুধু অতীন্দ্রার চকিত স্ফুলিঙ্গ,
লোকোত্তর শূন্যতায় একাই ঘুঁজছে
একটি বিদ্যুন্ময় মুহূর্তের অস্থির স্ফুরণে
চেতনার পরিনির্বাণ।

আজ বুঝেছি
এতদিন কিছুই বুঝিনি।

আর্যাবর্তের মরুধূসর হাহাশ্বসিত সন্তাপে,
আর গঙ্গাহৃদির অশ্রুসজল শ্যামল আকৃতিতে
একই বিপ্রলব্ধা প্রকৃতির অন্তরবেদনা
কালবোশেখীর বুকে ধুকপুক করছিল সেদিন
দিগন্তস্পন্দন বিপ্লবের সূচনায়
আমরা বুঝতে পারিনি।

না, তাকে চিনিনি।
অভিপ্লাবিনী সিংহঙ্কার অতর্পণ তৃষায়
ভৈরবীর ভ্রূকুটি
ছিন্নমস্তার রক্তের জোয়ার
ছলকে উঠবে এমন করে
কেউ তো জানত না।

আজ চোখের সামনে দেখছি
মহানগ্নিকার অপালোন্মত্ত তাণ্ডবের উত্তালতা :
উন্মত্তী জায়ার ভালবাসার কোমল আমন্ত্রণ
আজ দূরের মরীচিকা।

সহসা উচ্ছ্বিত অনাবৃত হয়ে পড়েছে
বপুচৈতন্যের এক বিপুল বাঙ্ময়ী মহাভূমি
পাতালকন্যার সম্মোহন কটাক্ষের বিদ্যুৎ
আলিঙ্গন কামনায় সারঙ্গ হানছে
নচিকেতার কুবলয় দৃষ্টির শুচিতার পরে।
কী আছে তার ওপারে...
পূর্ণিমার আঁধার না অমার আলো
তা জানি না।

শুধু দেখছি
আমার ব্যানস্তিনিত দৃষ্টির জ্যোতিবিচ্ছুরণ
কিণাঙ্কিত হল
এক অনিশ্চিত সৌর-কলঙ্কের ছোঁয়ায়...
তবুও আমি সবিতা।
আমার হিরণ্যপাণির প্রসন্ন দাক্ষিণ্য
পাতালকন্যার পাণ্ডুর ললাটে এঁকে দিল
সুদূর সম্ভবা জয়ন্তী উষার অরুণ ইঙ্গিত
তার, উদ্ভান বিলোল কটাক্ষে পড়ল
হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠা প্রেমবৈচিত্র্যের মেদুর ছায়া।
দেখলাম...
তারপর—.....?

অনেক—অনেক দূরের আশ্বাস
এ্যাণ্ড্রোমিডার ঝিরিঝিরি আলোর প্রণয় লিখন
আজও তো পৃথিবীর বুকে পৌঁছয়নি।
আজকার এই মুনূর্ষু মুহূর্ত যে উচ্চকিত হয়ে রইল
সেই পরঃকৃষ্ণ নীহারিকার প্রেতচ্ছায়ার
লোকোত্তরের ভাস্বর শূন্যতায়
চেতনার পরিনির্বাণ তো ঘটল না।

অনির্বাণ বেদনা
অন্ধকারের তুষার স্পর্শ বারবার নেমে আসছে

আভাসের নিঃশব্দ সঞ্চারে...
জ্যোতির্ময় জীবনের কুহরে কুহরে
জড়িয়ে আছে সৌরকলঙ্কের মত
উষসনক্তের এই প্রণয় আরতি,
তাকে প্রত্যাখ্যান করি সাধ্য কোথায়।

তাই, আবরণ বরণের ভ্রূণে বিদ্ধ হয়ে বলি
নিষ্ঠুর তোমার সুতীক্ষ্ণ চুম্বন, হে রক্তদন্তিকা,
পাংশুল অধর হতে
আনন্দবেদনার ক্ষতক্ষরিত শোণিতের বিন্দুতে বিন্দুতে
ফুটিয়ে চলেছে
এ কি নিরঞ্জন হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নের পদ্মরাগ॥

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

(১)

প্রশ্ন সবাই বলে, "দিব্যপ্রেমের সন্ধান পেতে হলে অন্য সব রকমের প্রেম ছাড়তে হবে।" কিন্তু অন্য যে প্রেম সজোরে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে, কিছুতে ছাড়ে না, তাকে কেমন করে তাড়াবো ?

উত্তর : তার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে চলে যাবে।

সে প্রেমের ভিতরে ঢুকে দেখবে তার পশ্চাতে কি আছে ; তার বাইরের রূপটা দেখেই ভুলবে না, পিছনে কি হেতু রয়েছে তার খোঁজ করবে ; তার উৎপত্তির গোড়াতে মূলসূত্রটি কোথায় তা না জানা পর্যন্ত থামবে না। সেটি জানলে তখন তার বাইরের চেহারার খোলস আপনা হতেই খসে পড়বে, আর সব-কিছুর শেষে যে দিব্যপ্রেমটুকু থাকে তাকেই সেবা নিবে যাবে।

এই হলো সেরা উপায়। নইলে একটিকে ছেড়ে অন্যটিকে ধরা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। কারণ মানব-প্রকৃতি এমনই গণ্ডিবদ্ধ, তার মধ্যে এতই অমিল ও একগুঁয়েমি, যে নিম্নতর ধরনের মানুষী প্রেমকে যদি প্রত্যাখ্যান করতে যাও, অমনি প্রেমের বৃত্তিটাই ঘুচে গিয়ে তুমি প্রায় পাথরে পরিণত হবে। তখন আবার কত বছর বা কত শতাব্দী তোমায় শুকিয়ে থাকতে হবে, তবে তোমার মধ্যে আবার প্রেমগ্রহণের ও প্রকাশের ক্ষমতা জাগবে।

সুতরাং সব চেয়ে ভালো উপায় এই যে প্রেম যেমন থাকারেই এসে থাকুক, তার বাইরের স্বরূপকে ছাড়িয়ে ভিতরের দিব্য সূত্রটির সন্ধান করবে, যার থেকে ঐ প্রেমের সম্ভাবনা হয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে নানারকম জালবোনা ও জটিলতা তো থাকবেই, কিন্তু তবু এই রাস্তা নিলে তাতে খুবই কাজ হয়। অর্থাৎ তোমার প্রেম ভুল পথে যাচ্ছে ভেবে তাকে একেবারে ছেঁটে বাদ না দিয়ে, সেই বাঁকা প্রেমকে সোজা প্রেমে ঘুরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে।

যেমন, মানুষে মানুষে প্রেম কত রকমের হতে দেখা যায়,—সন্তানের উপর বাপমায়ের প্রেম, বাপমায়ের উপর সন্তানের প্রেম, তা ছাড়া ভ্রাতৃপ্রেম, ভগ্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রেম, নরনারীর প্রেম,—সকলগুলির মধ্যেই রয়েছে স্বার্থ, অজ্ঞানতা ও নানাবিধ মানবসুলভ দোষত্রুটি। এ ক্ষেত্রে প্রেম মাত্রকেই প্রত্যাখ্যান করে কোনো লাভ নেই, এবং তা করাও কঠিন, আর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে তাতে হৃদয়কে শুকিয়ে ফেলা ভিন্ন আর কিছু কাজ হয় না। তার চেয়ে সেই প্রেমকেই আরো উন্নত করে নিতে শিখবে—যাতে থাকবে নিষ্ঠা, আত্মদান, স্বার্থত্যাগ, সেই প্রেমকে প্রত্যাখ্যান না করে তুমি প্রত্যাখ্যান করবে তার বিকৃতিগুলিকে। অর্থাৎ তার

আনুষঙ্গিক রূপে থাকে যত কিছু স্বার্থসাধন, লোভের আকর্ষণ, অধিকারবোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি, সেইগুলির বিরুদ্ধেই তুমি সংগ্রাম করবে। সেখানে অধিকার স্থাপন করতে, প্রভুত্ব আরোপ করতে, আপন কামনাকে ও খেয়ালকে চরিতার্থ করতে, আপন ইচ্ছাকে জোর করে চাপাতে যাবে না। প্রেমে কোনো নেবার কথা নয়, কেবল থাকবে দেবার কথা ; অপর পক্ষের কাছে কোনো প্রতিদান কামনা না করে কেবল নিজের প্রেমকে নিয়েই খুশি থাকবে ; নিজের ব্যক্তিগত সুখ বা স্বার্থ বা আকাঙ্ক্ষার দিকে না চেয়ে কেবল স্নেহ ভালোবাসা দিয়েই তৃপ্ত হবে, তার বদলে কিছু প্রত্যাশা করবে না। কেবল ভালোবেসেই তুমি আনন্দ বোধ করবে, আর কিছু নয়।

এমন অবস্থা যদি এনে ফেলতে পারো, তবে তাতেই তুমি অনেকখানি এগিয়ে যাবে। এমন ভাব নিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ: একদিন তুমি দেখতে পাবে যে প্রেম কোনো ব্যক্তিগত জিনিস নয় এ হলো এক দিব্য ও বিশ্বময় অনুভূতি, যা তোমার মাধ্যমে অল্পবিস্তর বিকাশ পেয়েছে, কিন্তু আসলে ওটা ভগবানের জিনিস।

তাহলে প্রথম কথা হলো স্বার্থবোধটি ছাড়তে হবে। সকলের সম্পর্কেই এই কথা, কেবল যোগের জীবনের পক্ষেই নয়, সাধারণ জীবনের পক্ষেও খাটে। প্রকৃতই যদি ভালোবাসতে চাও তাহলে আগের থেকে নিজেকেই ভালোবেসে বোসো না, আর বিশেষ করে স্বার্থপর হয়ো না। প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে দান করবে তার মূল্য কিছু না চেয়ে। এটাই হলো ওর প্রথমিক শিক্ষা যে নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হবে, জীবনকে নিতান্ত স্থূলভাবে যাপন করবে না।

যোগের জীবনের পক্ষে এর সঙ্গে আরো কিছু যোগ করা যেতে পারে। আগেই যেমন বললাম, সংকীর্ণ ধরনের মানুষী প্রেমকে ভেদ করে দেখবে তার পশ্চাতে কোথায় রয়েছে দিব্যপ্রেমের সূত্র। তাতে নিশ্চয় একটা কিছু মীমাংসা খুঁজে পাবে। প্রত্যাখ্যানের দ্বারা হৃদয়কে শুরু করার চেয়ে এ অনেক ভালো উপায়। কাজটা হয়তো কিছু কঠিন, কিন্তু অনেক দিক থেকে ভালো, কারণ এতে অন্তত অপর কারো অহমিকাতে আঘাত করা হবে না, তারা যেমন ভাবে আছে তেমনি ভাবেই থাকবে, কেবল তুমিই চেষ্টা করবে আপন দিকের রূপান্তর ঘটাতে,—তাতে তোমার ইচ্ছাকে তাদের উপর চাপানো হবে না, এবং সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রেও তুমি কিছু উচ্চতর ও সুসঙ্গত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে।

(২)

প্রশ্ন : মা, "যোগ সমন্বয়" গ্রন্থের এখানটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ("The Synthesis of Yoga" pp. 153-54)

"ইচ্ছা, বল, বীর্য, এগুলি হলো প্রাণশক্তির সহজাত গুণসম্পদ, তাই প্রাণ চায় না কেবল জ্ঞান ও প্রেমের পদানত হয়ে থাকতে—সে চায় আপনা থেকে নিয়ে বিপজ্জনক পথে নির্ভাবনায় আপন দুঃসাহসিক উগ্র প্রচেষ্টাতে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবার গৌরব অর্জন করতে। প্রেম ও প্রজ্ঞার দিকই ভগবানের সব কিছু নয়, তাছাড়াও একটা শক্তির দিক রয়েছে।"

উত্তর : এর মধ্যে কোন জিনিসটা বুঝলে না?

শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলছেন যে প্রাণসত্তাই হলো বড়ো প্রতিবন্ধক, কারণ সে থাকে দুর্দমনীয় হয়ে, তবে যদি প্রেম ও জ্ঞানের বাধ্য করা যায় তবেই তার রূপান্তর সম্ভব হয়; কিন্তু তার নিজের রয়েছে যথেষ্ট তেজ ও শক্তিসামর্থ্য, তাই সে সত্তার অপর কোনো অংশের বশ হতে চায় না; সে কারো বাধ্য হতে যাবে কেন, কারো চেয়ে তার নিজের জোর কম নয়। কিন্তু নিবেদন ও সমর্পণ করতে না পারায় তার গুণগুলির কোনো সার্থকতা মেলে না, কারণ সমর্পিত হওয়া ব্যতীত তার সম্যক বিকাশ হয় না। এতেই বাধে গণ্ডগোল তার নিজের জোর আছে বলে কোনোমতেই সে নিজেকে সমর্পণ করতে চায় না, অথচ তদ্ভিন্ন তার শক্তির কোনো সার্থকতা নেই। তাহলে এমন অবস্থা হতে নিষ্কৃতির কি উপায়? প্রাণসত্তাকে ভগবৎ-সমর্পিত করতে পারলে তার দ্বারা অনেক মূল্যবান কাজ করানো সম্ভব হতো এবং উন্নতির ক্রিয়া অনেকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতো। কিন্তু নিজের শক্তিচেতনাতে সে কাউকেই মানতে নারাজ, সেই কারণে তার শক্তিগুলির সমুচিত সদ্ব্যবহার হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে কি করণীয়? শ্রীঅরবিন্দ এখানে এই সমস্যাটির উল্লেখ করে পরে বলেছেন তার সমাধানের কথা—ওর পরের ছত্রগুলি পড়লেই তা জানতে পারবে—তখন জানবে এ বিষকে কাটাবার কি উপায়—কিন্তু তার আগে এখানে জিনিসটা ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

প্রাণসত্তা যদি একটা মামুলী জিনিস হতো এবং ওর নিজস্ব কোনো বিশেষ ক্ষমতা না থাকতো, তাহলে ওর সমর্পণের পক্ষে কোনোই বাধা থাকতো না, কিন্তু তাহলে তা হতো এক অকেজো বস্তু। কিন্তু তা নয়, ওটি শক্তি ও তেজে পরিপূর্ণ এক সমৃদ্ধ দুর্গস্বরূপ—সকল রকম শক্তির ভাণ্ডার। কিন্তু সাধারণত সে শক্তি হয় বিপথগামী; ভগবানের কাজে না লেগে তা প্রাণের আপন প্রয়োজনেই লেগে থাকে, তারই তুষ্টির ক্রিয়াতে নিযুক্ত থাকে। যতকাল এই ভাবে চলে ততকাল ওকে দিয়ে কিছু করানো যায় না। অতএব তাকে বোঝানো চাই যে ওর শক্তি ও তেজ কেবল তখনই সার্থক যখন পৃথিবীতে ভগবৎ-অভিব্যক্তির ইচ্ছাধারাকে মেনে নিয়ে সে ঐ পন্থাই গ্রহণ করবে। যখন সে তা বুঝবে তখন শান্ত হয়ে সে সর্বসত্তাকেই সেই-ভাবে চালিত হতে দেবে, এবং পূর্ণ শক্তিতে ও পূর্ণ উদ্যমে ঐরূপ কাজে নিযুক্ত হবে। নতুবা ওর দ্বারা কিছুই হতে পারবে না। সাধারণ অবস্থায় সে অন্ধ ও অজ্ঞান ও অহংসর্বস্ব

হয়ে থাকে বলে ওর সকল কাজই হয় জটিল, তার মধ্যে কোনো সরলতা বা শুদ্ধতা থাকে না, আর থাকে না কোনো সৌন্দর্য বা সার্থকতা।

(৩)

প্রশ্ন : আমরা যত কিছু স্থূল সমস্যা নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যাপৃত হয়ে থাকি, এই স্থূলচেতনা হতে নিষ্কৃতি পাবার কি উপায়?

উত্তর : নানারকম উপায় আছে।

বুদ্ধির দিক থেকে যে উপায় তাকে বলা যেতে পারে ভাবের ঘরের ও আধ্যাত্মিক রকমের উপায়। যে উপায় যার পক্ষে সব চেয়ে সহজ তার পক্ষে সেই উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়, কেউ যদি নিজের পক্ষে কঠিন কোনোরূপ উপায় ধরতে যায় তাতে কোনো কাজ হবে না। আমরা সেই কথাতেই ফিরে আসছি যা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর "যোগ সমন্বয়" (The Synthesis of Yoga) গ্রন্থে সেই জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও কর্মমার্গ। তার মধ্যে কর্মমার্গ তোমাদের দৈহিক জীবনের কাজেই নিযুক্ত রেখে তার ভিতর থেকেই মুক্তি এনে দেবে। সম্ভবত এ পথ সবচেয়ে বেশি ফলপ্রদ, কিন্তু তেমনি আবার সবচেয়ে কঠিন।

অনেক সাধকের পক্ষে ধ্যানধারণা, একাগ্র নিবিষ্টতা, স্থূল জীবনকে এড়িয়ে চলে যাওয়া, দৈহিক প্রয়াসগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা, এই রাস্তাই হয় কর্মমার্গের অপেক্ষা সহজ। কিন্তু ওতে দেহচেতনার দিকটা যেমন ছিল তেমনিই থেকে যায়, তার কোনো পরিবর্তন ঘটে না, আর সে ক্ষেত্রে যদি তুমি সাধু সন্ন্যাসীদের মতো কর্মজীবনকে একেবারে পরিত্যাগ করে নিরন্তর কেবল ধ্যানধারণা নিয়েই ডুবে না থাকতে পারো, তাহলে কোথাও গিয়ে পৌঁছবে না। অর্থাৎ তোমার সমগ্র সত্তার রূপান্তর কোনোমতেই ঘটবে না। ওরূপ অবশ্য সাধু সন্ন্যাসীদের কাম্যও নয়, তারা চায় স্থূল সত্তাকে বর্জন করতে, দেহের বন্ধন হতে যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি পেতে। আগেকার দিনে যোগ সম্বন্ধে এমনি ধারণাই ছিল, কারণ ওটাই ছিল সহজ পন্থা। কিন্তু আমরা তা চাই না।

আমরা চাই স্থূল চেতনাকেও রূপান্তরিত করে নিতে, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে নয়। এর পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল ও সুনিশ্চিত উপায় হলো—শ্রীঅরবিন্দ যা বলে দিয়েছেন—ভগবানে আত্মসমর্পণ ; এই সমর্পণ সকল দিক দিয়ে উত্তরোত্তর সম্পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকবে, স্থূলচেতনা এবং দৈহিক ক্রিয়াগুলিও তার থেকে বাদ যাবে না। এতে যদি সক্ষম হতে পারো তাহলে তোমার দেহ বাধাস্বরূপ হওয়ার পরিবর্তে সহায় স্বরূপই হবে।

প্রশ্ন : এই সূত্রটির কিরূপ অর্থ হবে : "আত্মার আভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াও, সকল ঘটনার উপরে উঠে তার প্রভু হও" ?

উত্তর : এ হলো স্থূল চেতনাকে ও স্থূল ব্যাপারগুলিকে প্রত্যাখ্যান করার পদ্ধতির ঠিক বিপরীত পন্থার কথা। "জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াও" কথাটির মানে হলো, "জীবনের দিক থেকে পশ্চাৎপদ হয়ো না।" অর্থাৎ তোমার যেমন জীবন তার থেকে পালাবার চেষ্টা না করে তার সম্মুখীন হয়ে থাকো, আর তোমার আপন আভ্যন্তরীণ চৈত্যশক্তির কাছে সাহায্য চাও—ওকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আত্মার আভ্যন্তরীণ শক্তি, আর সেই চৈত্য-চেতনার জোরে নিজেকে সব-কিছু ব্যাপারের উপরে উঠিয়ে তার উপরে আত্মপ্রভুত্ব অর্জন করো। তখন যা-কিছু ঘটছে আর তার ফলাফল যেমন হচ্ছে তারই অধীনস্থ হয়ে না পড়ে তুমি নিজে তার উপরে উঠে যাও, সেগুলি এমনভাবে ঘটে যেতে থাকে যেন তা আদৌ তোমাকে স্পর্শ করলে না, চেতনা কিছুমাত্র বিচলিত হলো না। এই হলো ওর অর্থ।

(৪)

প্রশ্ন অপ্রত্যাশিতের ন্যায়।

উত্তর আমার কাছে এখানে একগাদা প্রশ্ন রয়েছে ; তার জবাব দেবার আগে আমি একটি কথা বুঝিয়ে দিতে চাই। তোমরা হয়তো লক্ষ্য করেছ যে আমার কথা বলার ভঙ্গী সব সময় একরকম হয় না। তফাৎটা তোমরা টের পাও কি না জানি না, কিন্তু আমার কাছে তা স্পষ্ট।

কখনো কখনো এমন হয়, হয়তো বা কিছু পড়লাম বা অন্য কোনো কারণ ঘটলো—ক্বচিৎ বা একটা প্রশ্ন শুনে—তখন আমার মধ্যে একটা অনুভূতি এসে পড়ে, আর তারই চেতনাতে প্রবেশ ক'রে আমি তারই বিষয়ে বলতে শুরু করি। তখন যে শক্তি আর যে চেতনা এসেছে সে আমার ব্যক্তিগত মনের মাধ্যমে নিজেকে ব্যক্ত করতে থাকে, আমাকে একটা "শব্দ ভাণ্ডারের" মতো করে তার ভিতর থেকে আপন পছন্দমত শব্দগুলিকে চয়ন ক'রে নিজেকে অভিব্যক্ত করে। এই হলো প্রকৃত শিক্ষাবিধি, এমন কোনো শিক্ষা বই থেকে মেলে না ; বই থেকেও এমন শিক্ষা তুমি নিতে পারো, কিন্তু তোমার তাহলে যেতে হবে অনুরূপ চেতনার অবস্থাতে। কিন্তু মুখে এইরূপ ভাবে বলাতে সেই শব্দশ্রবণের দ্বারা ভিতরের ঐ অনুভূতির কিছুটা অন্তত বেরিয়ে এসে যারা গ্রহিষ্ণু তাদের মধ্যে স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।

অন্যরূপ ক্ষেত্রে যখন কোনো প্রশ্ন আসে বা কোনো বিষয়বস্তুকে বেছে নেওয়া হয়,

তখন মন তাকে হাজির করে দেয় উচ্চতর চেতনার কাছে ; সেখান থেকে জবাব এলে মন তাকে বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে। শিক্ষাদানের কালে সাধারণত এইরূপই হয়ে থাকে —যদি অবশ্য শিক্ষকের মনের তেমন ক্ষমতা থাকে উচ্চতর চেতনাতে পৌঁছবার, যা সব সময় থাকে না।

দ্বিতীয় প্রণালীটা আবার তেমন মনে ধরে না। তাই প্রায়ই যখন এমন কোনো প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয় যা আমার মনে সাড়া জাগাচ্ছে না, কিংবা আমাকে ঐরূপ চেতনাতে নিয়ে যাচ্ছে না, তখন সেখানে আমি চুপ করে থাকাই ভালো বলে মনে করি ; একটা কর্তব্যবোধই সেখানে আমাকে কথা বলায়। তাই তোমাদের আগের থেকে জানিয়ে রাখি, ঐ কারণেই কখনো কখনো আমি হঠাৎ কথা বলা থামিয়ে দিয়ে ধ্যানে ডুবে গেছি।

(নীরব থেকে)

এ ছাড়া ব্যবহারিক দিক থেকে কতকগুলি প্রশ্ন এসেছে, তার সম্বন্ধে আমি যেটুকু দেখতে পেয়েছি তাই তোমাদের বলি। তা এমন কিছু ছবি দেখার মতো বা চিত্তাকর্ষক কিছু নয়। প্রশ্ন করা হয়েছে (হুবহু প্রশ্নটি না বলে আমি তার মোটামুটি তর্জমা করে বলছি), অতিমানস এলে বাস্তবে কিরূপ পরিবর্তন ঘটবে ? এখনকার সমস্যাগুলো তখন কেমনভাবে পাল্টে যাবে, জীবনের এই অভিব্যক্তিকে কিরূপ ভাবে নতুন করে বোঝা যাবে ? বাস্তব দৃষ্টান্তের মালা তাই বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। সে কথার কি অর্থ তা বুঝলাম না, কিন্তু যাই হোক তবু আমি গণিতের ভাব নিয়ে যেমন দেখেছি তাই বলি—যদিও গণিতের ভাষা আমার কাছে একটু অচেনা—তবু তাকে বলছি গণিতের ভাবে দেখা, অর্থাৎ গাণিতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমস্যাটিকে দেখা।

বোধ করি অঙ্কের ব্যাপারে তোমাদের সকলেরই এটা জানা আছে যে কোনো অঙ্ক-সমষ্টির ভিতর থেকে তার একক সংখ্যাগুলিকে নিয়ে উল্টোপাল্টে যদি বিভিন্ন রকমে সাজাতে থাকো, তাহলে তাতে কত বহু রকমের সংখ্যাসমন্বয় ঘটানো সম্ভব হতে পারে। এখানে তার বদলে বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে নিয়ে তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি, কারণ তোমাদের শেখা গণিতশাস্ত্রের ভাষাগুলো আমি এনে ফেলতে চাই না।

বর্ণমালাতে যতগুলি অক্ষর আছে সমস্তকে নিয়ে যদি সেগুলিকে উল্টেপাল্টে নানা বিভিন্ন রকমে সাজাতে থাকো, তাহলে দেখবে যে তার দ্বারা কত অক্ষরসমন্বয় করা যায়, এর সংখ্যা নিরূপণ করাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। এখন ওর পরিবর্তে যদি অক্ষরের বদলে এই জড়জগতের মূল উপাদানস্বরূপ ক্ষুদ্রতম পরমাণুগুলিকে ধরো (তারা এতই ক্ষুদ্র যে একেবারে অদৃশ্য, আর তা যে কতই অসংখ্য সে কথা তো জানোই), আর সেইগুলিকে ধরে যদি কল্পনা করো যে কোনো মহাচেতনা বা পরম ইচ্ছাশক্তি তাই নিয়ে নিত্য নতুন করে উল্টেপাল্টে সাজিয়ে আমোদ পাচ্ছে, আর একবার যেমন সমন্বয় দাঁড়াচ্ছে তার আর পুনরাবৃত্তি করছে না, তাহলে কেমন ব্যাপার হয় তা ভেবে দেখ।

অঙ্কশাস্ত্রে বলবে যে তার গণিতের সংখ্যাগুলি সীমায়িত, সুতরাং সেগুলিকে নিয়ে যতই রকমের সমন্বয় ঘটুক, তাও হবে সীমায়িত ; কিন্তু সে হলো নিতান্ত একটা তর্কযুক্তির কথা। কিন্তু কাজের বেলাতে যদি দেখো যে একটার পর একটা সমন্বয় এসেছে যার তার এতই দ্রুত বদল হচ্ছে যে ধরাই যাচ্ছে না, তাহলে তখন তোমাকে বলতেই হবে যে এই সমন্বয়-বৈচিত্র্যের সবটা ফুরিয়ে যাবার অনন্তকালই লাগবে। অর্থাৎ তার সংখ্যা এতই বেশী হবে যে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। তর্কের দিক থেকে না দেখে বাস্তবের দিক থেকে দেখলে ঐ কথাই বলতে হয়।

মনে করো আমি এটা যথার্থ কথাই বলছি, অর্থাৎ প্রকৃতই কোনো মহাচেতনা বা ইচ্ছা-শক্তি উপর্যুপরি এমনি সমন্বয়ধারা অশেষভাবে অভিব্যক্ত করে চলেছে, যার একই রকম দু'বার হতে দিচ্ছে না—তাহলে এই সিদ্ধান্তই মানতে হয় শাশ্বতকাল ধরে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিমুহূর্তে নিত্য নূতন ভাবে গড়ে উঠছে। এবং তাহলে শেষ পর্যন্ত এই কথাই স্বীকার করতে হয় যে এতে অসম্ভব বলে কোনো কিছু নেই। শুধু তাই নয়, আমরা যাকে যুক্তি বলি তাও টেঁকে না, কারণ সৃষ্টিকর্তা যে সব যুক্তির খেয়াল বদলাচ্ছেন তারও কোনো সীমা নেই।

অতএব যদি কোনো দুর্বোধ্য কারণে তাঁর সমন্বয়গুলির পূর্বাপর ধারাবাহিকতা বজায় না থেকে সেই পরাৎপরের মুক্ত ইচ্ছাতে অতঃপর অন্যরূপ কিছু ঘটে, তখন আমাদের এই বাহ্য ও বাঁধা যুক্তিতর্ক ও নিশ্চয়তার হিসাব একেবারে বানচাল হয়ে যাবে।

যতটা তোমরা ধারণা করতে পারো, এ সমস্যা তার চেয়েও অনেক বেশী জটিল। কারণ এ তো কেবল একটা স্তর নিয়ে একই রাজ্যের ব্যাপার নয় যেখানে মনে করতে পারো যে কেবল একটাই ক্ষেত্রে ঐরূপ সমন্বয়ক্রিয়া নিত্য নূতন ভাবে অনন্তকাল ঘটছে, কিন্তু এর আবার নানারকম স্তরভেদ ও মাত্রাবিভিন্নতা রয়েছে। সৃষ্টি যে শুধু একই স্তরের নানা সমন্বয়ে ঘটেছে এমন কথা নয়, তার মধ্যে আবার গভীরতর জিনিসের সমন্বয়ের কাজও রয়েছে—যাকে অন্যরূপ ভাষাতে বলি মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের ব্যাপার।

তাহলে বক্তব্য দাঁড়াচ্ছে এই সমগ্র রকমের সম্ভাব্য সমন্বয়ের মধ্যে যখন একটা কিছু নূতনত্ব এসে ঢোকে, তখন তার গণ্ডিগুলো সব ছেড়ে যায়—আগেকার দেওয়া গণ্ডি সমস্তই ঘুচে যায়, অনেক কিছু নূতন নূতন সম্ভাবনা তার মধ্যে এসে জোটে, আর আগেকার সম্ভাবনার মাত্রাও অসংখ্যগুণ বেড়ে যায়।

পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী তোমাদের এ জগৎ ছিল দ্বাদশ মাত্রার জগৎ ; সেই দ্বাদশ মাত্রার মধ্যে আরো কতকগুলি নূতন মাত্রা এসে পড়েছে, তাতেই পুরোনো ধারাগুলো সব এখন পাল্টে যাচ্ছে, যে সকল সম্ভাবনা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল তা এখন অনেক ত্বরান্বিত হয়েছে, নূতন সম্ভাবনার মাত্রাও অসংখ্য রকম বেড়ে গেছে, তার ফলে সমস্ত পুরোনো যুক্তিগুলি এখন নূতন যুক্তির কাছে অযুক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মানুষের মন তার সংকীর্ণ মাত্রা অনুযায়ী যে বিশ্বকে জানে আমি সে বিশ্বের কথা বলছি না। আমি বলছি সর্বৈব সনন্মুয়ের কথা যা এমনভাবে ঘটছে যে তা মানব-চেতনার জ্ঞান-গম্যের অতীত. কেবল উদ্যোগী মানব আপন শতাব্দীর পর শতাব্দীর সহিষ্ণু অভিজ্ঞতায় তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলছে মাত্র এবং একটা কিছু কার্যকরী পন্থা ধরে নিয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আগেকার প্রস্তরযুগের চেয়ে এখনকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সেই বিশ্ববাস্তবের অনেকটা কাছাকাছি যেতে পেরেছে। কিন্তু এবার তাকেও সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার মতো অবস্থা এসে গেছে. এযাবৎ যা ধারণায় আসেনি তেমন জিনিসও এখানে আবির্ভূত বা আবিষ্কৃত হয়ে আগেকার সবকিছু ধারণাকে বদলে দিতে পারে।

বিশ্ব-উপাদানের এই আকস্মিক পরিবর্তন ও রূপান্তর যাবতীয় পূর্বধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে একটা নবতর জ্ঞানদৃষ্টি এনে দেবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে তাই হবে এবার নূতন অভিব্যক্তির ফলে।

(নীরব থেকে)

দৃষ্টান্তের কথা যদি বলো, যদি নিতান্ত সীমাবদ্ধ বাইরের দিক থেকেও তা দেখতে চাও, না জানার এই অনুভূতির সম্পর্কিত কিছু নয়, তবে বাইরের লোকের কাছে থেকেও তার কিছু কিছু শুনতে পাবে : যেমন শোনা যাচ্ছে আজকাল বিস্তর "আশ্চর্য শিশুপ্রতিভার" (prodigy) আবির্ভাব হচ্ছে। আমি নিজে অবশ্য দেখিনি. সুতরাং বলতে পারি না কিরূপ তাদের আশ্চর্য প্রতিভা, কিন্তু যতটা শোনা যায় তাতে মনে হয় যে মানুষের মধ্যে বিস্ময়কর নূতন নূতন রকমের শক্তি দেখা যাচ্ছে। এই সব দৃষ্টান্ত হতেও কিছু বোঝা যেতে পারে।

খুবই সম্ভব এখন এমন অনেক কিছু ঘটছে যাকে বলবে অসাধারণ জিনিস। কিন্তু সমস্তই নির্ভর করে তুমি যেমন অর্থ করে নেবে তার উপর।

আমি তো অন্তত নিশ্চিতভাবেই জানি যে এবার সম্ভাব্য সনন্মুয়ের মাত্রা. প্রকৃতি ও পরিণাম হঠাৎ এতটাই বদ্‌লে যাবে যে জীবন সম্পর্কে যারা পর্যবেক্ষণ করে আসছে তারা তাই দেখে একেবারে অবাক হয়ে যাবে।

দেখা যাক কি হয়।

(মা তাঁর এই উক্তির পরে "নূতন জিনিস" সম্পর্কে এইটুকু যোগ করেছেন, "নূতন জিনিস বলতে এমন কথা বোঝায় না যে তা বিশ্বে কোনোকালে ছিল না, কিন্তু ওর মানে এমন কিছু যা বিশ্বে ইতিপূর্বে প্রকাশ পায়নি। ভিতরে যা গুপ্ত আছে তাই কেবল নূতন করে বেরিয়ে আসতে পারে। অনন্তের মধ্যে শাশ্বতকালে যার অস্তিত্ব নেই এমন কোনো কিছুই নেই, যা রয়েছে তারই নূতন অভিব্যক্তি ঘটবে"।)

(নীরব থেকে)

একটা ব্যবহারিক বিষয়ের কথাই বলি। এতে পরোক্ষভাবে সেই সব প্রশ্নেরই

জবাব মিলবে যা আমার কাছে করা হয়েছে—প্রকৃতির তথাকথিত কার্যকারণের আইন ও তার অপরিহার্য পরিণাম সম্পর্কে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে। সবাই বলে যে অমুক অমুক বিষয়ে যদি সাবধান হয়ে না চলো, যদি ঠিকমতো আহার না করো, বাঁধা নিয়ম মেনে যদি না চলো, তাহলে তার জন্যে যথেষ্ট ফলভোগ করতে হবে।

সবই ঠিক কথা।

কিন্তু এইমাত্র যা বললাম সেই দৃষ্টি নিয়ে যদি দেখ যে বিশ্বের কোনো দুটি মনুষ্য এক নয়, তাহলে সেখানে একটা বাঁধা নিয়ম কেমন করে চিরস্থায়ী হতে পারে, আর তার পুরোপুরি সত্যতাই বা কোথায় থাকে?

তেমন কিছু থাকতে পারে না।

কারণ ওর চেয়ে উচ্চতর যুক্তিতে বুঝে দেখ, বিশ্বের মধ্যে দুই অবস্থা যখন একরকম থাকছে না, তখন তার মধ্যে এক নিয়মের নিত্যতা কেমন করে থাকবে? বাইরের দৃষ্টিতে তেমন হতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা হয় না। আর সেখানে নির্দিষ্ট নিয়ম করতে গেলে সত্যের নিয়মকে মানা হয় না (যেহেতু মন আমাদের অনেক নিয়মই বানাতে পারে এবং বাহ্যরূপে তাকে মানাও যায়, কিন্তু তা কেবল বাহ্যই হয়), তা ছাড়া ওতে তুমি পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তির চলা পথ হতে সরে যাও, ভগবৎ-কৃপার ক্রিয়া থেকে তফাৎ হয়ে যাও। কারণ এটা নিশ্চয় কথা যে আত্মশুদ্ধি ও সাধনার জোরে বর্তমান অবস্থার মধ্যে যদি উচ্চতর নতুন জিনিস নেমে আসে—যাকে আমরা অতিমানস বলছি—তাহলে প্রকৃতি অবশ্যই বদলে যাবে। আর তখন এইসব তথাকথিত অপরিহার্য নিয়ম সবই নিরর্থক হয়ে যাবে।

নিজেই তোমরা তোমাদের কতকগুলি ধারণা ও মনোভাব নিয়ে ও তথাকথিত বাঁধা নিয়মের সূত্র ধরে থেকে অলৌকিক কোনো-কিছু ঘটবার সম্ভাবনার সকল দুয়ার এঁটে বন্ধ করে দিয়েছ (তা যদিও অলৌকিক কিছু নয়, যদি জানা থাকে যে কেমন করে তা হতে পারে, তবে বাহ্য চেতনাতে তাকে অলৌকিক বলেই মনে হয়)। নিজেই যখন নিজেদের বিচারকে একেবারে অব্যর্থ ভেবে নিয়ে বলো, "এই কাজটি করলে তার এমন ফল হবেই, আর তা না করলে ফল অন্যরকম হতে বাধ্য," তখন তোমরা নিজেরাই যাও সম্ভাবনার দরজা এঁটে—ভগবানের কৃপার মুক্ত ক্রিয়ার ও তোমার নিজের মাঝখানে লৌহযবনিকা টেনে দাও।

তার চেয়ে কত চমৎকার কাজ হয় যদি তুমি এই কথা ধরে নাও যে—ভগবানের যে পরমতম মুক্ত চেতনা সারা বিশ্বের অভিব্যক্তিকে নিরূপিত করছে, সে তার অবারিত ইচ্ছাতে এমন জিনিসও ঘটাতে পারে যা মানববুদ্ধির অগম্য, যার যুক্তি মানুষের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তা এক অভাবনীয় যুক্তি।

এতে কোনো সম্ভাবনারই সীমা টেনে দেওয়া হয় না, সব রকমের অপ্রত্যাশিত ও অপূর্ব জিনিস ঘটার রাস্তা খোলা থাকে। ইচ্ছাময়ের পূর্ণমুক্ত ইচ্ছা চিরন্তনের লীলার মধ্যে

এমন কিছু ঘটাতে পারে যা সব চেয়ে চমকপ্রদ ও আনন্দদায়ক, যা এমন নতুন জগৎ গড়ে তুলতে পারে যার পূর্বের জগতের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত কোনোই মিল নেই।

এ কি খুবই কাম্য জিনিস নয়? বর্তমান জগৎকে তো আমরা যথেষ্টই দেখলাম। এবার যেমনটি হলে ভালো হয় মনে করি তাই হোকনা।

এত কথা তোমাদের কাছে বলছি এই কারণে যাতে প্রত্যেকেই তোমরা আপন সম্ভাবনার পথের সকল বাধাই যথাসম্ভব ঘুচিয়ে রাখতে পারো। এইটুকু শেষ বক্তব্য।

আমার বক্তব্য তোমাদের বোঝাতে পারলাম কিনা জানিনা; কিন্তু এমন দিন আসবে যখন তোমরা নিজেরাই জানবে আমি কি বলতে চেয়েছি।

(৩)

প্রশ্ন আপনি এখানে যা লিখেছেন তা কি একটু ভালো করে আমাদের বুঝিয়ে দেবেন? "তোমরা তাকেই বলো অনুভূতি পাওয়া যার কথা তোমরা বর্ণনা করে বলতে পারো কিন্তু যতক্ষণে তোমরা তাকে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছ ততক্ষণে তার অধিকাংশ তীব্রতা ও ভিতরে বাইরে তার রূপান্তর আনার শক্তি অনেকটাই উবে গেছে।"

উত্তর: ওর মানে অনুভূতিকে যখন তুমি মনের মধ্যে একটা বোঝবার মতো গঠন দিতে পারো, আসল অনুভূতিটি তার অনেক আগেই এসে থাকে। মনের মধ্যে রূপ দিতে পারবার অনেক পূর্বেই তা দেখা দেয়। অনুভূতি জিনিসটার নিজস্ব এক পূর্ণতা ও শক্তি ও তেজ আছে যা তখনই সরাসরি তোমার প্রকৃতির উপর কাজ করে। যেমন ধরো, কোনো বিশেষ অবস্থাতে বা হঠাৎ কৃপার গুণে তুমি অতিমানস আলোর বা শক্তির ও চেতনার কিছু স্পর্শ পেয়ে গেলে। হঠাৎ যেন তোমার উপরকার খোলসের বদ্ধ ঢাকনিটা ফাঁক হয়ে গেল, সত্যকে আড়াল করা দুর্ভেদ্য পর্দাটা ছিঁড়ে গেল, আর অমনি সেই স্পর্শটি তোমার মিলে গেল। এতে তখনই তার শক্তি ও চেতনা ও আলো তোমার দেহের সব কোষে কোষে কাজ শুরু ক'রে দেবে, তার ক্রিয়াতে তোমার মন প্রাণ ও দেহের স্পন্দনগুলি বদলে যাবে, আর সবগ্র সত্তাতেই রূপান্তরের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এই হঠাৎ স্পর্শে ও হঠাৎ ক্রিয়াচাঞ্চল্যে তুমি একটা শক্ বা স্পর্শাঘাত পাবে; সেই অব্যক্ত ও অভাবনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে তুমি স্পষ্ট করে কোনো ধারণাই আনতে পারবে না, কেবল মনে হতে থাকবে, "একটা কিছু হচ্ছে"। আশ্চর্য জিনিস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তা তখন বর্ণনার অতীত। এই হবে অনুভূতির প্রকৃত অবস্থা।

পরে যখন তার ক্রিয়া ক্রমশ আরো চলতে থাকবে এবং তোমার বাহ্য সত্তার তা বোধগম্য হবে, তখন প্রথমে মনের চেতনাতে তা লক্ষ্য করে দেখার সামর্থ্য আসবে; মন তখন তাই

দেখেশুনে আপন প্রকৃতি অনুসারে তর্জমা করে তাকে একটা আকার দেবে। একেই তোমরা বলো বুঝতে পেরেছি, ধরতে পেরেছি (যা হারালেন), বলো যে আমার একটা অনুভূতি লাভ হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে সেই আসল জিনিসটি অনেকখানি জুড়িয়ে গেছে, তোমার মন প্রাণ দেহের আয়তনের মধ্যে খাপ খেতে গিয়ে অনেকটা গুটিয়ে গেছে, যদিও তোমার মনের কাছে তা তখন স্পষ্ট তবু মূল জিনিসটা হয়ে গেছে খর্ব ও স্তিমিত। তোমার বোধশক্তির মাপ মতোই তাকে ছোটো হতে হয়েছে।

এমনিতরোই প্রায় হয়ে থাকে, এমন কি সর্বোত্তম ক্ষেত্রেও। যেখানে সত্তা অচেতন থাকাতে সেই অচেতনার মধ্যে অনুভূতি এসে জ্বলন হারিয়ে যায়, সেখানকার কথা বলছি না ; যেখানে মন রয়েছে প্রস্তুত, আত্মা রয়েছে জাগ্রত, সাধনার পথে তুমি অনেকটা অগ্রসর হয়েছ,—এমন কি মন যখন রূপান্তর নিতে ও আলো পেতে অভ্যস্ত হয়েছে, সেই আলোকে আয়ত্ত করতে পারছে,—তখনও যদি তুমি চাও অনুভূতিকে তোমার মানব চেতনার বোধগম্য করতে (সে চেতনা যদিও সাধারণ নয় কিন্তু তা দীপ্ত চেতনা), তবু যেমনি তাকে বোঝবার মতো একটা আকার দিতে যাবে অমনি তাকে সীমাবদ্ধ ও খাটো করে ফেলবে তা বিকৃত বা মিথ্যা রকমের না হলেও সে জিনিস তখন নিস্তেজ ও অস্পষ্ট রকমের হয়ে আসবে। আর তা বিকৃতও হতে পারে, যদি তোমার মনে বা প্রাণে কোনো কপট ভাবকে স্থান দিয়ে থাকো। তবে আমি বলছিলাম উত্তম অবস্থারই কথা, যেখানে সত্তা খাঁটি থেকে অনুকূল রকমের ক্রিয়াই করছে। তবু বোধগম্য বাক্যের মধ্যে তাকে ধরতে চাইলেই তা অপরিহার্য রকমে সংকুচিত হয়ে যায়, তার ক্রিয়াশক্তি কমে যায়। যেমনি তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলবে, "অমক রকম ঘটেছিল", যেমনি তার বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে, ততক্ষণে তার ধার ও তেজ অনেক হ্রাস পেয়েছে। তা যে ছিল না এমন নয়, অনভূতির তেজ ও দীপ্তি সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু তা তোমার বলতে পারার আগে।

আমি সর্বোত্তম ক্ষেত্রের কথাই বললাম। নইলে আরো কত অসংখ্য অনুভূতি আসে, যেখানে মন চন্‌মনে হয়ে উঠে ভাবে, "ওহো, এটা কি হলো ?" কিন্তু পরে তা একেবারেই বিলীন হয়ে যায় ; কিংবা তার সব কিছু বাস্তবতা ঘুচে গিয়ে শুধু শেষপ্রান্তের লেজটকই ধরা পড়ে।

এখানে প্রথম কথা হলো, মনকে শেখাবে সম্পূর্ণ স্থির নিশ্চল হয়ে থাকতে, বলবে, "একটুও নড়াচড়া না করে চুপ ক'রে থাকো, যা আসছে তাকে পুরোপুরি ফুটতে দাও, কী হচ্ছে তা জানতে চেও না। নিতান্ত জড় হয়ে থাকা নয়, কিন্তু স্থির হয়ে শুধু নীরবে অপেক্ষা করো। তোমার জানবার সময় আসবে পরে, বেশী বিলম্ব হবে না।" হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন সেই অনুভূতি নিয়েই তখন থাকতে হবে, তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য আকার দিতে কোনো চেষ্টা না করে। এই ভাবটি বজায় রাখতে পারলে সেই অনুভূতির পুরো সার্থকতা তুমি পাবে। সে তখন তার রূপান্তরক্রিয়া শুরু করে তোমার প্রকৃতিকে যখন

করলে, কোষগুলির মধ্যে পর্যন্ত পরিবর্তন আনতে থাকবে। কিন্তু যেমনি তুমি তাড়াতাড়ি তাকে ধরতে ও বুঝতে ও আকার দিতে যাবে অমনি তা অতীতের কথা হয়ে দাঁড়াবে।

(৬)

কিছুকাল ধরে কেবল এগিয়ে যাবার প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল, কেমন করে এগোন যাবে, কি কি তার বাধা হতে পারে, অতিমানস শক্তিকে কেমন করে কাজে লাগানো যায় ইত্যাদি। এমনি সব প্রশ্ন এখনও এক গাদা আমার হাতে রয়েছে।

কিন্তু এবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক।

একজন প্রশ্ন করেছে মৃত্যু সম্বন্ধে : মৃত্যুর পরে কি হয়, কেমন করে আবার নবদেহে আসা হয়। বলা বাহুল্য এ বিষয় নিয়ে গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচিত হতে পারে। আর কোনো দুটি জিনিস কখনো একরকমের হয় না। মৃত্যুপারের জীবনে সব-কিছুই সম্ভব হতে পারে, যেমন পার্থিব লৌকিক জীবনেও সব কিছুই সম্ভব হতে পারে। এ ব্যাপারকে কোনো সর্ব-জনীন কাঠামোর মধ্যে আনতে গেলেই তা গোঁড়ামি হয়ে দাঁড়াবে। তথাপি এ প্রশ্নটি নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে, তাতে হয়তো কিছু নূতন কথা বেরিয়ে পড়বে।

প্রশ্নটি হলো এই :

প্রশ্ন "কোনো উন্নত আত্মা যখন দেহত্যাগ করে, তখন কি সূক্ষ্মদেহের কোনটি তার সঙ্গে যায়? পুনর্জন্মের সময় সে কেমনভাবে নবদেহে প্রবেশ করে?

উত্তর : আগেই বলেছি, এ বিষয় নিয়ে কত গ্রন্থ রচিত হতে পারে, আর মুখেও কিছু বলতে হলে তাতে অনেক ঘন্টা সময় লাগতে পারে। কারণ বস্তুত কোনো দুটি ক্ষেত্রে একরকম জিনিস হয় না। তা কাছাকাছি রকমের হতে পারে, একটা শ্রেণীবিভাগও করা যেতে পারে, কিন্তু তাও হবে বনগড়া। আমি এখন তোমাদের একটু পড়ে শোনাই, এই প্রশ্নে ওর পরে যে কথাগুলি লেখা রয়েছে, শুনলে কিছু আভাস পাবে (খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিও না, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যও কিছু আছে)।

"এ প্রশ্নগুলি করা হচ্ছে প্রাচীন এক ভারতীয় ঐতিহ্য ধরে, এবং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাজ্ঞ রাজা প্রবহনের গুহ্য তত্ত্ব অনুসারে।

"জীবনে সৎকর্ম করলে মৃত্যুর পরে সেই আত্মা পিতৃপুরুষদের (পিতৃযান) পথে ধোঁয়া বা আঁধারে পরিণত হয়ে পিতৃলোকে যায়, এবং সেখান থেকে চান্দ্র স্বর্গে উপস্থিত হয়। ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে যে আত্মা তার সূক্ষ্মদেহের উপাদানগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং পরজন্মে

তা ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রশ্ন তাই কি প্রকৃত কথা? তাহলে সেই সূক্ষ্মদেহ কি এ সম্বন্ধে সচেতন থাকে?"

এ প্রশ্ন এখন স্থগিত রইল। ওর পরে আরো পড়ে শোনাই—

"উপনিষদে আরো বলা হয়েছে: সৎকর্মের সম্পূর্ণ ফল যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন সেই আত্মা চান্দ্র স্বর্গ ত্যাগ করে নেমে আসে আকাশে বাতাসে ও মেঘে, এবং তৎপ্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে নামে বৃষ্টিরূপে, এবং তা বীজের মধ্যে ঢুকে সেখে খাদ্যরূপে এসে পিতৃদেহে স্থান পায়, তার থেকে সদ্যজন্ম শিশুর দেহ গঠিত করে।"

এতএব এটা খুব জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো, তাই নয় কি? (হাসা) আমি কিন্তু এতে যথেষ্ট আমোদ পেলাম। অতঃপর প্রশ্নটি শোনো (হাসতে হাসতে)

"এই গোলমেলে ও বিষযুক্ত প্রণালী অনুসারে কি যেতেই হবে? আত্মা কি তার সূক্ষ্মদেহের মন প্রাণ ও দেহসত্তা নিয়ে সরাসরি পরজন্মের জীবনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে না? কিন্তু তা যদি পারে তাহলে তার তখনকার বংশধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবে কেমন করে? সেইজন্যই কি তার পিতার দেহের মাধ্যমে আসার দরকার হয়?"

নাও এখন প্রশ্ন শুনলে তো?

এখানে আমি এইটুকু বলতে পারি যে এমনও কখনো হতে পারে। খুব সম্ভব যে এমন বর্ণনা লিখেছিল সে নিজে তা লক্ষ্য করে দেখেছে। হয়তো এ তার নিজের মনগড়া বা উদ্ভট কল্পনার কথা নয়। যদিও এতে কিছু বাস্তব সমস্যা এসে পড়ছে! যাই হোক তবু অসম্ভব কিছুই নয়। কেবল এটা বিশ্বাস করে নেওয়া কঠিন যে আত্মা বৃষ্টি হয়ে বীজের মধ্যে প্রবেশ করল, তার থেকে গাছপালা জন্মাল, আর তাই খাদ্যরূপে রক্ষিত হয়ে পিতার পেটে প্রবেশ করল, তার থেকে শিশুর বীজ তৈরি হয়ে মাতৃগর্ভজাত হলো। সম্ভব নয় তা বলছি না, কিন্তু খুবই গোলমেলে ব্যাপার।

আমি অনেক উন্নত আত্মাদের সন্তানলাভের পূর্বাবস্থাতে বা জন্মের পরেও লক্ষ্য করে দেখেছি। আগে যা বললাম, প্রত্যেকের কথাই বিভিন্ন। সব-কিছু নির্ভর করে মনস্তাত্ত্বিক সংস্থানের উপর, তা ছাড়া পার্থিব অবস্থাগুলির উপর। যে চৈত্যসত্তা জন্ম নিতে আসছে সে উন্নতির পথে কতদূর এগিয়েছে তারও উপর অনেকটা নির্ভর করছে (এখানে আত্মা শব্দটি চৈত্যের অর্থেই ব্যবহৃত)। এ ছাড়া আরো নির্ভর করে যেখানে সে জন্ম নিচ্ছে সেখানকার পরিবেশের উপর, এবং কোন উদ্দিষ্ট কর্ম করতে সে আসছে তার উপর। আরো নির্ভর করে তার পিতামাতার চেতনার অবস্থার উপর; কারণ এতে কোনো ভুল নেই যে ইচ্ছা ও চেতন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং আধ্যাত্মিক আবেদনে অদৃশ্য জগতে প্রার্থনা জানিয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়া আলাদা কথা, আর বিনা কামনায় বা এমন কি অবাঞ্ছিত মনে করে হঠাৎ সন্তানের জন্ম দেওয়া আলাদা কথা। তাতে কোনো চৈত্যসত্তা যে আসবে না এমন কথা বলছি না, কিন্তু সে আসবে অনেক পরে, গর্ভাধানের সঙ্গে নয়।

শিশুটি তৈরি হয়ে ওঠার ব্যাপারে এতে বিস্তর পার্থক্য হয়ে যায়।

যদি গর্ভাধানের সঙ্গেই আত্মা প্রবেশ করে তাহলে যে শিশুটি তাতে জন্মাবে তার গঠনক্রিয়া সেই আত্মার চেতনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়; কেমন উপাদান তার মধ্যে থাকবে, কোন দিকে তার স্বাভাবিক টান থাকবে, কোন কোন শক্তিকে সেখানে বেছে নেওয়া হবে, এমন কি কোন ভড়োপাদানের প্রাধান্য থাকবে তাও ঐভাবে নিরূপিত হয়; সুতরাং এতে আগের থেকেই শিশুর দেহ এক বিশিষ্ট প্রকারে গড়ে ওঠে এবং তদনুযায়ী জন্মের পূর্ব হতেই তার এক সুসঙ্গত বিকাশ শুরু হয়। খুব বিরল হলেও এমন জিনিসও হয়ে থাকে।

আর এমন প্রায়ই হয়ে থাকে যে শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে মুক্ত ফুসফুসের প্রথম ক্রিয়াতে তারস্বরে কেঁদে উঠল, সেই সময়কার আকুল ও আন্তরিক আহ্বান শুনে কোনো চৈত্যসত্তার পক্ষে নেমে আসা অনেক সহজ ও সার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

আবার কখনো কখনো বহুদিন ও বহু মাস পার হয়ে যায়, ধীরে ধীরে একটা প্রস্তুতি ঘটে, আর চৈত্যসত্তা এমন ধীরে ধীরে ও সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করে যে তা জানাই যায় না।

কখনো বা তাই হয় অনেককাল পরে, শিশু যখন নিজেই চেতন হয়ে উপরের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করছে, অনেক উপর থেকে কোনো প্রভাব এসে যেন তার উপর ভর করছে; তখন সে চায় ঐ অজানার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে, কিছুই না বুঝেও সে তাই কেবল চাইতে থাকে, সেই আস্পৃহাতে চৈত্য তার মধ্যে নেমে আসে।

মাত্র কয়েক রকম দৃষ্টান্তের কথাই বললাম, প্রায় যেগুলি ঘটে থাকে, কিন্তু এ ছাড়া আরো অসংখ্য রকম হতে পারে। এখানে যেগুলির কথা বললাম তা প্রায়ই আমি ঘটতে দেখেছি।

কখনো বা ক্রমোন্নুখ আত্মা তার ভবিষ্যৎ দেহাধারটিকে বেছে নিয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে উচ্চমানসের স্তরে থেকে যায়, কিংবা আরো নীচে নেমে প্রাণের স্তরে থাকে, অথবা সূক্ষ্মশরীরে এসে খুবই কাছাকাছি থেকে ভবিষ্যৎ শিশুদেহের গঠন নিয়ন্ত্রিত করে।

অতঃপর জন্ম প্রশ্নটিতে আসা যাক, অর্থাৎ দেহ ছেড়ে যাবার প্রশ্ন।

তাও নির্ভর করে উন্নতির অবস্থার উপর, মৃত্যুকালীন অবস্থার উপর, বিশেষত দেহত্যাগ কালে সত্তার মনোভাব ও বিশ্বসত্তার একীভূত হতে পারার উপর। সম্পূর্ণ উন্নত চৈত্যসত্তার কথাই এখানে হচ্ছিল। যারা স্থূলদেহে থেকে যোগের দ্বারা উন্নত হয়েছে তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। কিন্তু সাধারণত যেমন বললাম, সব-কিছু নির্ভর করে মৃত্যুকালীন মনোভাবের উপর। এবং তা নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও একীকরণের উপর।

এর উত্তম দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করো একজনের কথা, যে তার সত্তাকে ভগবৎ উপস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছে, তৎসঙ্গে এক ইচ্ছা ও এক চেতনা ক'রে আনতে পেরেছে। তার চৈত্যকে ঘিরে আছে পূর্ণ বিকশিত মন, পূর্ণ সমর্পিত প্রাণ ও নমনীয় পূর্ণধারা দেহ। সেই সত্তার যে সূক্ষ্মদেহ (শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন "true physical"), সে তার

আপন ঋতুতায় ও মননীয়তায় স্থূলদেহকে ত্যাগ করে আভ্যন্তরীণ সত্তার সঙ্গে সংলগ্ন থেকে আত্মাকে অনুসরণ করবে (উপরে উঠে যাবার কথা বলছি না, দেহমুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবার কথা)। সেই আত্মা তখন কোথায় যাবে, কি করবে? তা নির্ভর করবে তার দেহত্যাগের পূর্বক্ষণের সিদ্ধান্তের উপর। পূর্ণ মিলনের দ্বারা এইভাবে নিজেকে অটুট রাখার ক্ষমতা অর্জিত হওয়াতে সেই সত্তা তার গন্তব্যস্থান যেমন খুশি বেছে নিতে পারে এবং তার মধ্যেও নানারকম সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে ; সে চেতন থেকেই এক দেহ থেকে অন্য দেহে সরাসরি চলে যেতে পারে (এমনও হয়েছে যে সে আগের থেকেই কোনো নূতন আধারকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নিয়েছে তাকে গ্রহণের জন্য, যাতে তার আয়ুষ্ক পার্থিব কর্ম দেহত্যাগের পরেও থেকে না যায়, তাই অন্য চৈত্যের সঙ্গে মিলে সে অন্য স্থূলদেহে সংযুক্ত হয়ে গেছে)। এমন অস্তিত্ব দৃষ্টান্ত খুবই বিরল, কিন্তু গুহ্যতত্ত্বের ঐতিহ্যে এরও স্থান আছে। অপরপক্ষে সম্পূর্ণ অপর প্রান্তে দেখা যায় যে চৈত্য এক দেহধারণের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপাতত বিশ্রামের অবস্থায় তাকে জীর্ণ করতে চাইছে, এবং বহুকাল পরে আবার অন্য দেহ ধারণের জন্য সে প্রস্তুত হবে। সে স্থলে অন্যান্য নানারূপ সম্ভাবনার মধ্যে এই হবে যে সে তার বিভিন্ন সত্তাগুলিকে বিভিন্ন স্তরে রেখে দিয়ে যাবে—সূক্ষ্মদেহের রাজ্যে, প্রাণময় রাজ্যে ও মনোময় রাজ্যে। যদিও একটা যোগ থাকবে, কিন্তু সেগুলিও আপন স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে চৈত্যের রাজ্যে বিশ্রামানন্দ ভোগ করতে থাকবে, অতঃপর যেমন এই প্রশ্নের মধ্যে লেখা রয়েছে (হাসতে হাসতে) সকল সংকর্মের সুফল ফুরিয়ে গেলে তারা আবার নূতন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হবে। তখন সেই চৈত্যসত্তা তার বিশ্রামের কাল ফুরোলে নেমে আসবে বিভিন্ন স্তর থেকে তার পরিত্যক্ত কোষগুলিকে সংগ্রহ করে নিতে, এবং সেগুলিকে আবার ধারণ ক'রে পরিপূর্ণ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে আবার নরদেহে জন্মাবার জন্য প্রস্তুত হবে। এতে হয়তো শতাধিক বা সহস্রাধিক বছর বিলম্ব হতে পারে, কারণ আমরা যাকে মৃত্যু বলি তেমন কিছু বিনষ্টির ক্রিয়া ঐ সব রাজ্যে নেই। প্রাণসত্তা পূর্ণ পরিণত হলেই তা অমরত্ব পায়। যা কিছু তাকে নষ্ট বা ক্ষয়িষ্ণু করে তা হলো ওর আভ্যন্তরীণ বিকৃতি ও ভঙ্গপ্রবণতা কিন্তু পূর্ণ বিকাশ ঘটলে তখন সে অমর। মনঃসত্তার পক্ষেও একই কথা। সূক্ষ্মদেহও যদি পূর্ণ বিকাশ পেয়ে অধ্যাত্ম শক্তিতে সমৃদ্ধ হয় তবে তাও মৃত্যুর পরে নষ্ট হয় না। মৃত্যুর পরেও সে কাজ করতে পারে কিংবা কোনো প্রাকৃতিক উপাদানে বিশ্রাম নিতে পারে, যেমন জলে ; সাধারণত তরল জিনিসই তার পক্ষে প্রশস্ত—যেমন জলে, বা গাছের ভিতরকার রসে, বা মেঘের মধ্যে, যেমন এতে লেখা রয়েছে (হাস্য)। আবার জড়প্রকৃতির মধ্যে থেকেও সে ক্রিয়া করতে পারে।

কতকগুলি দৃষ্টান্ত মাত্রই বললাম। এমনি আরো কত দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা এ সম্বন্ধে বলে যেতে পারি। তবে মোটামুটি যেটুকু বললাম এতেই তোমাদের কল্পনার দুয়ার খুলে যাবে।

(৭)

প্রশ্ন এখানে লেখা আছে ("Thoughts and Glimpses p. 5" থেকে) "সুখভোগকে রূপান্তরিত করে নাও অহেতুক ও নিরপেক্ষ আনন্দে।"

উত্তর : হাঁ, ওর মানে এমন আনন্দ যার কোনো নিমিত্ত নেই।

সাধারণত তোমরা আনন্দ পাও কোনো একটা কারণে—মূল বাস্তব কারণ থেকে শুরু করে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক নানাবিধ কারণে। যেমন মনের দিক থেকে, কোনো বইতে বিশেষ কিছু পড়ে তোমার খুব আনন্দ হলো, কারণ তার থেকে তুমি কিছু আলো পেলে, নূতন কিছু জানলে। এ আনন্দ হলো কারণঘটিত, কথাটা পড়েছ বলেই আনন্দ, নতুবা তা হতো না। তেমনি কোনো মিষ্টি গান শুনে বা সুন্দর ছবি দেখে বা মনোরম দৃশ্য দেখে তোমার আনন্দ হয়, ওগুলি ব্যতীত যে আনন্দ আসে না, ঐগুলিই তার কারণ। এগুলি সবই হলো হেতুমূলক আনন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে এই সুখ বা তৃপ্তি বা আনন্দ যেমন স্তরের বা যেমন মাত্রারই হোক, এর বদলে চাই এমন এক আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি যা ভিতর থেকে সর্বক্ষণই তোমার সর্ব-সত্তায় সঞ্চারিত হতে থাকবে, এবং তার অস্তিত্বের কোনো নিমিত্তের প্রয়োজন হবে না। ওর একমাত্র হেতু হবে মূল ভাগবতী আনন্দের স্পর্শ, যা সর্বত্র সব-কিছুর মধ্যেই বিদ্যমান। একবার যদি তুমি সেই শাশ্বত ও বিশ্বময় আনন্দের স্পর্শ পাও, তাহলে তখন আর কোনো বাহ্য হেতুর প্রয়োজন হবে না। সেই আনন্দ হবে তখন অহেতুক, আর অহেতুক বলেই নিত্য। বাহ্য অবস্থা যেমনই হোক, যাই কেন তুমি করতে থাকো, ঐ আনন্দ সমানেই থাকবে, কারণ তা বাইরের কিছুর উপর নির্ভর করবে না, নির্ভর করবে ভিতরকার অবস্থার উপর। তুমি তখন আনন্দের মূল উৎসের সাক্ষাৎ পেয়েছ, অর্থাৎ এক দিব্য উপস্থিতির, দিব্য সাযুজ্য ; তাতেই তোমার আনন্দে কোনো হেতুর প্রয়োজন নেই। আর হেতু না থাকায় তার বিরামও নেই, তাই হবে তোমার নিত্যকার অবস্থা।

প্রশ্ন আরো বলা হয়েছে : "পশুকে রূপান্তরিত করে নাও পশুপালের চালকে ; তোমার সবটাই কৃষ্ণে পরিণত হোক।"

উত্তর : ও, এটি হলো এক প্রতিরূপ দিয়ে বলা।

পশু মানে এখানে মূলসত্তার পার্শ্বিক প্রবৃত্তিগুলি, তার যা কিছু চাহিদা ও আবেগ ও অভ্যাস ও তদনুযায়ী আচরণ, তার খাদ্যের প্রয়োজন, নিদ্রার প্রয়োজন, কাজের প্রয়োজন, অর্থাৎ যা-কিছু নিয়ে সত্তার পার্শ্বিক অংশ। আর শ্রীঅরবিন্দ এখানে কৃষ্ণকে বলছেন

পশুচালক বা রাখাল—তা একটা রূপক হিসাবে মাত্র। কথাটির অর্থ হলো তোমার দিব্য-চেতনা যেন স্থূলসত্তার সকল চাহিদাকে ও সকল ক্রিয়াকে আপন দখলে নিয়ে মানবের পশুত্বকে সংযত ও শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ পুরাণ অনুযায়ী কৃষ্ণকে বলছেন ভগবানের প্রতীক, আর পশুকে বলছেন মানুষের পশুপ্রকৃতির প্রতীক। তোমাকে তিনি বলছেন যে পশুপালের পশু হয়ে থাকার বদলে তুমি ওদের চালক হও, ওদের অধীন থাকার বদলে ওদেরও তুমি অধীনস্থ ও পরিচালিত করে নাও। সাধারণ অবস্থাতে তোমরা স্থূল জীবনের সকল চাহিদার ও সকল কাজের বাধ্য হয়ে থাকো, যেমন খাদ্য, নিদ্রা, কাজ, বিশ্রাম ইত্যাদির স্থূল প্রয়োজন মেটাও,—কিন্তু তিনি বলছেন তার পরিবর্তে এমন হোক যে তুমি ওদের বশে না থেকে ওরাই তোমার বশে থাক, তুমি কৃষ্ণের মতো হও অর্থাৎ দিব্য রাখাল হয়ে ওগুলিকে দিব্য সত্যের পথে চালাতে থাকো।

প্রশ্ন : "তোমার বিভাজিত ব্যক্তিত্বকে রূপান্তরিত করো বিশ্বময় ব্যক্তিত্বে।" ব্যক্তিত্ব বিশ্বময় হয়ে গেলে তখন আর ব্যক্তিগত দরকার নেই, তাই নয় কি?

উত্তর কিন্তু ঐ ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বকেই তো রূপান্তরিত করতে হবে বিশ্বময় ব্যক্তিত্বে। সাধারণত নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলতে যা বোঝায় সে ভাবটি আর থাকবে না,—যে ব্যক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ, কোটির কোটি মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্র একক ও স্বতন্ত্র জন, যে সকলের মধ্যে থেকে আলাদা, তার সেই বোধটি ঘুচে গিয়ে আসবে একটা বিশ্বময় ব্যক্তিত্বের বোধ, যা স্বভাবতই হবে দিব্য। এ একরূপ রূপান্তর, একটির পরিবর্তে অন্যটি হওয়া। শ্রীঅরবিন্দ এখানে দেহকে বাদ দেবার কথা বলছেন না, দেহের সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। তিনি বলছেন প্রাণচেতনার কথা, মনের চেতনার কথা, মনের স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা।

যেমন ধরো, বহুর মধ্যে তুমি একজন ব্যক্তি, তাই নয় কি? কিন্তু এ বোধটি ঘুচে গিয়ে তুমি ভাববে তুমি বিশ্বময়। সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য তখন ঘুচে যাবে। অথচ তুমি তোমার ঐ দেহের মধ্যেই থাকবে, দেহ ঘুচবে না। দেহ হলো অন্য জিনিস।

কিন্তু এই দেহ সম্বন্ধে তিনি শেষ ছত্রে বলছেন, "পশুকে রূপান্তরিত করো পশু-চালকে।" দিব্যচেতনা পেয়ে দিব্য ব্যক্তিত্ব যখন আসবে, তখন তুমি দেহবিষয়ের প্রভু হবে, কারণ তখন তুমি ওর উপরে উঠে গেছ; আর তুমি দেহপশুদের দাস নও, তাদের তুমি শাসন করছ, তোমার চেতনা তখন ক্ষুদ্র ব্যক্তিচেতনার চেয়ে বৃহৎ; তাই পার্থিক প্রয়োজনের বশ না হয়ে তুমিই তাকে বশে রাখবে। কিন্তু এখানে এক চেতনার উপর অন্য চেতনাকে চাপানোর কথা নয়, তাকে অন্য চেতনায় রূপান্তরিত করার কথা।

(একজন শিষ্যের দিকে দেখিয়ে) বোধ করি ও কিছুই বুঝতে পারছে না। হাঁ করে কেবল আমার দিকে চেয়ে আছে।...তুমি বোধহয় ভাবছো, এমন একজন দেহাশ্রিত

মানুষ হয়ে কেমন করে নিজেকে অন্যরকম ভাবতে পারি? (হেসে) তাই হয়, হয়। তাই পারা যায় হতে।

(নীরব থেকে কিছুক্ষণ পরে মা লিখিত প্রশ্নের দিকে চাইলেন)

এই একটি প্রশ্ন রয়েছে যা তোমার পূর্বপ্রশ্নের অনুসারী। এতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে বিশ্বনর ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি কেমন হবে।

সব চেয়ে বিশিষ্ট লক্ষণ হবে চেতনার পরিবর্তন। নিজেকে ছোটো রকমের আলাদা একজন না ভেবে তুমি বিশ্বগত চেতনাতে বোধ করতে থাকবে যে সকলেই তোমার অন্তর্গত, আর তুমিও তাদের সঙ্গে সংযুক্ত ও একাত্ম।

জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে সেরূপ ব্যক্তি কেমন ভাবে কথা বলবে ও কাজ করবে। কথা বলা? প্রশ্নটি ঠিক ভাবে করা হয়নি, কারণ কথা সে সকলের মতোই বলবে মুখ দিয়ে ও জিভ নেড়ে ও কণ্ঠ দিয়ে বাক্য উচ্চারণ করে! যদি প্রশ্ন করতে কেমন ধরনের কথা সে বলবে, —তা যদি সে তার চেতনার অবস্থাকে প্রকাশ করতে চায় তাহলে তার সেই বিশ্বনর চেতনা থেকেই বলবে সাধারণ মানুষের চেয়ে অন্যরূপ ভাবে সব-কিছুকে যেমন দেখছে, অর্থাৎ সে যেমন বোধ করছে তাই তখন বলবে। আর কাজের সম্পর্কে,—যদি তার সত্তার সকল অংশ এক সুরে মিলে যায়, তবে সেইরূপ চেতনা তার কাজের মধ্যেই প্রকাশ পাবে।

কিন্তু এমন অনেকে আছে যাদের শুধু একটা অংশই সুনিশ্চিত উপলব্ধি পেয়েছে, সত্তার অন্যান্য অংশগুলির মধ্যে তা সঞ্চারিত হতে পারেনি বা তখনও হয় নি। যেমন, কেউ হয়তো সাধনা বা একাগ্রতার জোরে বা কৃপার গুণে বিশ্বচেতনাতে গিয়ে পৌঁছেচে, কিন্তু এদিকে তার বহির্বাস স্থূল কাজগুলি করছে সাধারণ মানুষের মতো, যেহেতু তার সম্পূর্ণ সত্তা ঐ উপলব্ধির সঙ্গে মিলে যেতে পারেনি, তাই বিশ্বচেতনা পাওয়া সত্ত্বেও যেমনি খেতে, ঘুমোতে, চলতে ফিরতে বা কিছু কাজ করতে যাবে অমনি সাধারণ মানব-পশুর মতোই আচরণ করবে। এমনও হয়। সুতরাং এটি নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা, প্রত্যেকের নিজের উপরেই তা নির্ভর করে, যার যেমন উন্নতির মাত্রা।

কিন্তু কেউ যদি সব দিক থেকে মিলিয়ে এক হয়ে যেতে পারে, কেন্দ্রস্থ সত্যের সঙ্গে সর্বতোভাবে একাত্ম হতে পারে, তাহলে নিশ্চয় সে পুরো অহংশূন্য হয়ে কাজ করবে, সকলের সঙ্গে একাত্ম হওয়াতে সকলের দিকটাই সে বুঝবে-- তার সব কাজই হবে সাধুজনোচিত। সবই নির্ভর করছে কেন্দ্রচেতনার সঙ্গে সর্বাংশে মিল থাকার উপর। যদি সে তার নূতন চেতনাকে স্থূলদেহের ব্যাপারেও নিয়োগ না করে থাকে, তাহলে তার খাওয়া বসা ঘুম প্রভৃতি দৈহিক চাহিদাগুলি যেমন ছিল তেমনিই প্রায় থেকে যাবে, ওগুলির উপর তার কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। আর যদি সে তার নূতন চেতনাতে দেহের যাবতীয় উপাদানকে জারিত করে নিয়ে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, তাহলে তার ঘুমও হয়ে দাঁড়াবে বিশ্বগত রকমের এক চেতন ঘুম; ইচ্ছা করলে তার মধ্যেও সে জানতে পারবে কোথায় কি হচ্ছে, এখানে বা ওখানে,

পৃথিবীর এ প্রান্তে বা অপর প্রান্তে। তার চেতনা বিশ্বময় হওয়াতে সে সেখানকার কথা জানতে চাইবে সেখানকার সংস্পর্শেই আসতে পারবে। বাস্তবের হিসাবের কথা বাদ দিয়ে তার ঘুমও তখন অচেতন বা অনর্থক হবে না, তাও হবে সচেতন ও সফল।

খাদ্য সম্পর্কেও তাই। সে কোন চাহিদার দাস না হয়ে থাকবে এবং অন্ধের মতো কি প্রয়োজন তা না জেনেই খাদ্যাদি খেয়ে যেতে থাকার বদলে সে সম্পূর্ণরূপেই জানতে পারবে যে তার দেহের পক্ষে কিরূপ কতটুকু খাদ্য বাস্তবিক প্রয়োজন ও কেমনভাবে খাওয়ার সম্পর্কে দখল আনতে হয়। দৈহিক সকল প্রয়োজনকেই সে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করবে, তার আপন কাজের জন্য যেটুকু দরকার সেই অনুযায়ী সব-কিছুকে রূপান্তরিত করে নেবে।

কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট আত্মপ্রভুত্ব থাকা দরকার, আর শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন ঐ শেষ ছত্রে তাও থাকা দরকার, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মাধীন হয়ে থাকার পরিবর্তে ও আপন ভারসাম্য হারিয়ে তারই বশীভূত থাকার পরিবর্তে তুমিই হবে প্রভু, সব-কিছুকে দেখবে উপর হতে, সব-কিছুর সত্যকে জেনে আপন দেহবিষয়ে তারই বাস্তব প্রয়োগ করবে, এবং দেহও নির্বিবাদে তা গ্রহণ করবে।

এ সম্পর্কে আর কিছু জানতে চাও?

প্রশ্ন এর কি অর্থ "যুক্তিবুদ্ধিকে রূপান্তরিত করো সুসম্বদ্ধ বোধিতে"?

উত্তর: সুসম্বদ্ধ বোধি?

যখন প্রথম তুমি বোধি রাজ্যের পরিচয় পাও, তখন তা আসে প্রায় খাপছাড়া ভাবে, অর্থাৎ থেকে থেকে হঠাৎ আসে, চেতন বুদ্ধির দ্বারা কতকটা তার ব্যাখ্যা করা যায়, আকস্মিক আলোকসূত্ররূপে তা আকস্মিকভাবে আসে তোমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কিন্তু ইচ্ছার তাতে কোনো হাত থাকে না, তোমার কেন্দ্রগত ইচ্ছা অনুযায়ী তা আসে না। কিন্তু এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তোমার বুদ্ধিকে তাইতে রূপান্তরিত করে আনবার কথা—রূপান্তরিত করতেই তিনি বলেছেন—বুদ্ধি যেন বোধির মূলদেশে চলে যায়, যাতে সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া ও আভ্যন্তরীণ মনের কাজগুলি হতে থাকবে সেই বোধির দ্বারা এবং বুদ্ধিকে যেমন সুনিয়ন্ত্রিত করো তেমনিভাবে তাও হবে সুনিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ তোমার ইচ্ছায় তা ক্রিয়া করবে, প্রয়োজনমতো সুসম্বদ্ধভাবে তার কাজ হবে। এমন হবে না যে হঠাৎ এলো আর চলে গেল, কেন এলো আর কেমন করে এলো তার কোনো ঠিকানা নেই। এই হবে বুদ্ধিকে বোধিতে রূপান্তরিত করার ফল, অর্থাৎ মানব-মনের উচ্চতর অংশকে আরো উচ্চতর বোধির আলোতে নিয়ে যাওয়া। তখন তা আর খাপছাড়া ভাবে না কাজ করে সুসম্বদ্ধভাবে কাজ করবে।

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে)

(৭৮)

"আমাদের মধ্যে জ্ঞান যতক্ষণ তাজা আছে ততক্ষণ তা অজেয় ; পুরোনো হলে তার আর দাম থাকে না। তার কারণ ভগবান নিত্যই চলেছেন আগের পথে।"

উত্তর শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলছেন প্রেরণাঘটিত ও দিব্যলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে। যে জ্ঞান হঠাৎ উদ্ভিত হয়ে বুদ্ধিচেতনাকে আলোকিত করছে। হঠাৎ তুমি টের পেলে যে একটা নতুন কথা এই প্রথম জানলে, তার কারণ তা সরাসরি চলে এসেছে আলোর রাজ্য থেকে, তাই এমন এক দীপ্তি তুমি পেলে যার মধ্যে সত্যজ্ঞানের বীজ অন্তর্নিহিত রয়েছে। তখন মনে হবে কোনো কিছুই এই আলোকে ম্লান করতে পারে না। যার তাকে যদি কাজ করতে দাও তাহলে সে তোমার মধ্যে তার আপন ধারাতে অনেকখানি রূপান্তরও এনে দেবে।

এমন হঠাৎ অনুভূতি প্রায়ই অনেকের মধ্যে আসে। যখন আসে কিছুক্ষণের জন্য —বেশীক্ষণ তা থাকে না—তখন তোমার সব-কিছুই সেই আলোকে ঘিরে থাকে। তারপর ক্রমশ তা সকল জিনিসের সঙ্গে মিশে যায় ; বুদ্ধির মধ্যে একরূপ গঠন নিয়ে তার পরের জ্ঞানটুকু থেকে যায়, কিন্তু তা যেন ফাঁকা ফাঁকা। তার প্রথম দিকের সেই তীব্র তেজ আর নেই যার জোরে সত্তার সকল ক্রিয়া তারই ছাঁচে বদ্‌লে যাচ্ছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটাই এখানে বলতে চেয়েছেন। জগৎ চলেছে দ্রুতগতিতে এগিয়ে, ভগবান নিত্যই চলেছেন এগোবার পথে, তাই পিছনে যা পড়ে থাকছে তার আর তেমন অজেয় শক্তি থাকছে না, যেমন ছিল যখন সদ্য তিনি তাকে জগতের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন।

তখন এমন বোধ হয় কেন সত্যের এক পশলা বৃষ্টি নাবল ; যে তখনই তাকে ধরে নিতে পারে, যদি তার একটি বিন্দুও ধরা যায়, তাতেই তার দিব্যজ্ঞান মিলে যায়। কিন্তু তার পরেই আবার ছুটতে হবে দ্রুতগতিতে, কারণ ভগবান তাঁর সত্যবৃষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে চলে গেছেন, জোরে না ছুটলে আর সে বৃষ্টির নাগাল মিলবে না।

শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন : হাঁ, কিন্তু সেই জ্ঞানের যদি প্রকৃতই রূপান্তর আনার ক্ষমতা থাকে।

উত্তর নিশ্চয়, কারণ তা হলো উচ্চতর জ্ঞান, যা আপন সত্তাকে আপনিই উদ্‌ঘাটিত করে, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন "আসল জ্ঞান", এই জ্ঞানই সকল সৃষ্টিতে রূপান্তর আনে। তিনি যেন নিয়তই তা বর্ষণ করছেন, তুমি যদি বিলম্ব করে তার থেকে বাদ পড়তে না চাও তবে ছুটে এগিয়ে যাও। (মা হাসলেন) এমন কখনো অনুভব করেছ কি, যেন মাথার মধ্যে একটা আলো এসে ঢুকল ? তখন হঠাৎ তোমার জ্ঞান হলো, "হাঁ, এইতো বটে" ? বুদ্ধিতে হয়তো তার কিছু আভাস পেয়ে থাকবে, কিন্তু সে একটা প্রাণহীন কাল্পনা ধারণা মাত্র, এখন হঠাৎ ঐ আলো পেয়ে তাকে ঘিরে তোমার চেতনা যেন প্রাণতেজে অনুক্ষণ করতে থাকল,—কিন্তু তা বেশীক্ষণের জন্যে নয়। এ জিনিস হয়তো বা কয়েক ঘন্টা থাকে, কখনো বা কতক দিন পর্যন্ত, কিন্তু তার বেশী নয়—তুমি যদি খুব মনরগানী না হও। ওরই মধ্যে সত্যের উৎস কতদূর এগিয়ে যায়।

প্রশ্ন এ তো বলছেন মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের কথা, কিন্তু যেখানে জড়বস্তু ও স্থূলদেহ রূপান্তরের ব্যাপার, সেখানে কেমন জ্ঞান চাই ?

উত্তর না বাছা, সে কথা এখন আমি বলতে পারিনা, তা আমি জানি না।

প্রশ্ন তার জন্য কি চাই অন্য কিছু জ্ঞান ?

উত্তর : না, আমার তা মনে হয় না। (নীরব থেকে) হয়তো-বা তার ক্রিয়াবিধি অন্যরকম, কিন্তু জ্ঞান অন্যরকম নয়। (নীরব থেকে) বস্তুত তখনই বলা যাবে জড়ের রূপান্তরের কথা যখন তার কিছু নিদর্শন ঘটেছে, রূপান্তরের কাজ যখন শুরু হয়েছে। তখন বলতে পারবে কি ভাবে তা হচ্ছে। কিন্তু আপাতত...(নীরব থেকে) কিন্তু সত্তার মধ্যে যে-কোনো স্থলে যেমনই রূপান্তর ঘটুক, তার নীচেকার স্তরগুলিতে তার তরঙ্গাঘাত গিয়ে পৌঁছবেই। সেখানেও ক্রিয়া কিছু হবেই ; এমন কি যদি বুদ্ধির তরফেও কিছু হয়, তবে তার তরঙ্গ লেগেও মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে কিছু নড়াচড়া হবে।

এই জ্ঞানদীপ্তি কেবল নীরব মনের মধ্যেই আসতে পারে, অন্ততপক্ষে যে মন শান্ত স্তব্ধ ও নিস্তরঙ্গ হয়েছে, নতুবা তা আসে না। কিংবা এলেও তা জানা যায় না, নানারকম চাঞ্চল্য ও কোলাহল হতে থাকার কারণে। অনুভূতি জিনিসটা এলে তা এই স্তব্ধতা প্রশান্তি ও গ্রহিষ্ণুতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। পুনঃ পুনঃ অনুভূতি আসতে থাকলে তখন জানা যায় যে ভিতরটা অনড় অথচ আবদ্ধ নয়, অনড় থেকেও উন্মুক্ত, অনড় হয়েও গ্রহিষ্ণু। বস্তুত, বোজা, অসাড় নীরবতা হলো আলাদা জিনিস, আর শান্ত মনের গ্রহিষ্ণু নীরবতা হলো আলাদা জিনিস। কিন্তু তা আসে অনুভূতি আসার ফলে। যা-কিছু উন্নতি আমরা করতে পেরে থাকি, সবগুলি ঘটে উপর থেকে সত্তা নেমে আসার দ্বারা।

এর একটা বাস্তবের দিকের ফলও আছে, এগুলি দৈহিক ক্রিয়ার উপরেও কাজ করে—অর্থাৎ দেহযন্ত্রগুলির ও মস্তিষ্কের ও স্নায়ু প্রভৃতির ক্রিয়ার উপরে। বাহ্য আকৃতির উপর কোনো ক্রিয়া হবার অনেক আগেই তা নিশ্চয় ঘটবে।

বস্তুত লোকে যখন রূপান্তর আসার কথা বলে, তখন তারা ভাবে ছবির মতো রূপ দেখতে পাবার কথা, তাই নয় কি? বাইরের চেহারাটা দেখতে খুব সুন্দর হবে। ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল, অনায়াসে নয়নীয়, ইচ্ছামত তাকে বদ্‌লে নেওয়া যাবে। কিন্তু এই ধরণের পরিবর্তনের কথা, যা বাহ্য সৌন্দর্যধারক নয়, ভিতরের যন্ত্রগুলির রূপান্তর আসা এদিক দিয়ে কেউ ভাবেই না! অথচ তাই হবে আগে, যাহা রূপ পরিবর্তনের অনেক আগে।

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন চক্রগুলির ক্রিয়াতে যন্ত্রগত পরিবর্তন আনার কথা।

উত্তর হাঁ, হাঁ, তিনি এও বলেছিলেন তিনশো বছরের কথা! (হাস্য)

(নীরব থেকে)

কথাটা ভেবে দেখলে সহজেই বুঝবে। এ যদি হতো আগের জিনিসকে থামিয়ে দিয়ে নতুন কিছু গড়া শুরু করার ব্যাপার, তাহলে শান্তই তা করা যেতো। কিন্তু দেহ এই জীবন্ত অবস্থাতেই তার ক্রিয়াগুলি যথারীতি করে যেতে থাকবে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে নতুন ক্রিয়ার দ্বারা সেই জীবন্ত অবস্থাতেই একটা রূপান্তর আসবে—এমন যৌগভাবে কাজ হতে পারা খুবই কঠিন কথা। এটা আমি বেশ বুঝি, খুব ভালো করেই বুঝি.. এর জন্য বিস্তর সময় চাই, যাতে নির্বিঘ্নে তা হতে পারে।

বিশেষ করে কথাটা ভেবে দেখ হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে। এই হৃদ্‌যন্ত্রকে বদলাতে হবে তেজোগর্ভ মূল শক্তিকেন্দ্র হতে! (না হাসলেন) ঠিক কোন মুহূর্তটিতে ওর রক্ত-সংবহনের ধারাকে থামিয়ে রেখে সেই শক্তিস্পন্দন ওর মধ্যে ঢুকবে? খুবই কঠিন কথা।

(নীরব থেকে)

সাধারণ জীবনে এই হয় যে একটা কিছু বিষয় আগে ভেবে ও বুঝে নিয়ে তারপরে সেটাকে সমাধা করো, কিন্তু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উল্টো রকমের কথা, এই ধরনের জীবনে তুমি আগেই করতে থাকবে কাজটা, তার পরে বুঝবে কি কাজ করছিলে, তার অনেক পরে। আগে কিছু না ভেবেই তোমাকে করে যেতে হবে। ভাবতে গেলে তাতে কোনোই লাভ হবে না, তাতে আবার তুমি পুরোনো রাস্তায় ফিরে যাবে।

৬-১০-১৯৬২

(৭৯)

"ভগবান হলেন অনন্ত সম্ভাবনাময়। সেই হেতু সত্য কখনো কখনো একভাবে স্থায়ী নয়; আর সেই হেতু তাঁর সন্তানদের দোষগুলিও মঞ্জুর হয়ে থাকে।"

(৮০)

"কোনো কোনো ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা শুনে মনে হয় যে ভগবান বুঝি কখনো হাসেন না; হাইনে (Heine) অনেকটা সত্যের কাছে ঘেঁসে গিয়েছিলেন যখন ভগবানকে তিনি বলেছিলেন দিব্য এরিস্টোফিনিস (Aristophenes)।"

উত্তর: হাঁ, শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলছেন যে এককালে যা সত্য অন্যকালে তা আর সত্য নয়। সেই কারণে তার প্রান্তির সন্তানদের আত্মসমর্থন ছুটে যায়।

প্রশ্ন: তিনি হয়তো বলতে চেয়েছেন যে দোষ বলে কিছু নেই।

উত্তর: হাঁ, ও একই কথা অন্যভাবে বলা। আমরা যাকে দোষ বলছি তা কোনো কালে নির্দোষই ছিল। দোষ ধরা হয় কালের মাপে।

প্রশ্ন: কিন্তু এমন জিনিস আছে যাকে যথার্থই দোষ বলতে হয়।

উত্তর: কেবল সাময়িক ভাবে। তখনকার মতো তাই মনে হয়। আমাদের সকল বিচারই সাময়িক। এখন ভাবছ এমন, পরমুহূর্তে আর এমন নয়। আর আমরা যে দোষ দেখি, তার কারণ সব কিছুকেই আমরা দেখছি একটার পর একটা দেখার দৃষ্টিতে। কিন্তু ভগবানের চোখে তা এমনভাবে দেখায় না, তাঁর মধ্যে সব কিছুই আছে একত্রিত ভাবে।

মনে করো এক মুহূর্তের জন্য তুমি ভগবান হয়েছ। যাবতীয় সব-কিছু রয়েছে তোমারই মধ্যে; তুমি কেবল আনোদের ছলে তার থেকে একটার পর একটা কিছু বাইরে বের করছ, অথচ তোমার আপন চেতনাতে সবই রয়েছে একত্রে; সেখানে কালাকালের প্রশ্ন নেই, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নেই, সবই একজোট। তাতে সব রকমের সমন্বয়ই হতে পারে। তিনিও ঠিক তাই করছেন, একটার পর একটা জিনিসকে নামিয়ে এনে আমোদ করছেন। আর নীচে যে বেচারারা রয়েছে তারা দেখতে পাচ্ছে ওর কেবল একটুখানি, তাতেই তারা বলে উঠছে: "ওঃ, ওটা ঠিক নয়, ওটা দোষ হচ্ছে"। দোষ ভাবছে কেন? মাত্র অল্পটুকু দেখছে বলে।

এতো সাফ্ কথা, নয় কি, সহজেই বোঝা যায়। দোষের ধারণা শুধু স্থানকালের মাপে।

প্রশ্ন : একটা জিনিস একসঙ্গেই ঠিক আবার বেঠিক, তা কেমন করে হয়?

উত্তর : যেহেতু সেই জিনিস এবং তার বিপরীত জিনিস সেখানে একত্রেই রয়েছে। কেবল আমাদের কাছেই তা একসঙ্গে হাঁ আর না হতে পারে না। ভগবানের কাছে তাই হয়।

আমরা যেমন স্থান সম্বন্ধে বলি : "আমি রয়েছি এখানে, সুতরাং তুমি এখানে নেই।" কিন্তু বাস্তবিক এর মধ্যে আমিও আছি, তুমিও আছ, সব-কিছুই আছে। (মা হাসলেন) কেবল স্থান কালের ধারণার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারলেই তা বুঝবে।

এ জিনিস খুব বাস্তবরূপেই বোধ করা যায়, কিন্তু আমরা যে চোখে দেখি সেই ভাবে নয়।

বস্তুত এই সব সূত্রাবলী সেই সময়ের লেখা যখন উচ্চতর মন অকস্মাৎ খুলে গেছে অতিমানসের মধ্যে। তখনও সে সাধারণ দিকের কথা ভোলেনি, কিন্তু অতিমানসের দিকটাও সে দেখতে পাচ্ছে। তখনই এমন কথা লেখা হয়, অনেকটা হেঁয়ালির মতো। যেহেতু এক দিকের কথা না ভুলে অন্যদিকের জিনিসও নজরে পড়ছে।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

বাস্তবিক যদি ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখ, তাহলে বলতেই হবে যে ভগবান নিজেকে নিয়ে বেশ এক আমোদের খেলা (কমেডি) খেলছেন। এই সব অভিব্যক্তি নিতান্তই একটা কমেডির অভিনয়, নিজেই এতে আমোদ পাচ্ছেন। নিজেই দর্শক হয়ে এইভাবে নিজেকে দেখছেন। তখন তাহলে তাঁকে এই স্থান কালের ব্যাপারটা মেনেই নিতে হয়, নতুবা এভাবে দেখা যায় না! আর তখনই শুরু হয় কমেডির খেলা। খেলা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। আর আমরা থাকি গুরুত্বের সঙ্গে গম্ভীর হয়ে, কারণ আমরা তো এই খেলার পুতলি মাত্র, তাই নয় কি? এই পুতলির মনোভাবটা ছাড়তে পারলেই তখন দেখবে এ কমেডি ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন : কিন্তু কারো কারো পক্ষে এ যে বড়ো বাস্তব ট্রাজেডি।

উত্তর : হাঁ, আমরাই তা করে তুলি, আমরাই বড় দুঃখের ট্রাজেডি বানাই।

সম্প্রতি আমি তা লক্ষ্য করে দেখছিলাম। একই ঘটনা মানুষের বেলা ঘটলে ও পশুদের বেলা ঘটলে তাতে কি তফাৎ হয় তাই দেখছিলাম। পশুদের সঙ্গে একাত্ম হলে তুমি

দেখবে যে এগুলোকে তারা ট্রাজেডি বলে নেয়ই না, কেবল যারা মানুষদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তারা ব্যতীত ; সে ক্ষেত্রেও তা স্বাভাবিক জিনিস নয়, একটা বাড়াবাড়ি অবস্থা, যেহেতু তখন তারা মানুষ ও পশুর বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছে, তখন তারা মানুষের দোষগুলো-কেই আগে গ্রহণ করে, তাই সহজ বলে। তখন তারাও অকারণে অসুখী হতে শুরু করে।

কত কিছু জিনিস...কত কিছু জিনিসকে...মৃত্যুকে মানুষ এক ভয়ংকর ট্রাজেডি করে তুলেছে। এই কদিন ধরে আমি দেখলাম—কাল বা পরশু রাত্রে প্রায় ঘুমটা আমি ছিলাম সূক্ষ্মদেহের রাজ্যে, সেখানে মৃতেরা ও জীবিতেরা একত্রেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো পার্থক্যবোধ নেই। মৃতে আর জীবিতে কোনো তফাৎ নেই, যাদের আমরা "জীবিত" বলি তারাও আছে, আর যাদের "মৃত" বলি তারাও আছে। একত্রে মিলেই তারা ঘুরছে, খাচ্ছে, খেলা করছে, ইত্যাদি। চমৎকার আলো আছে সেখানে, আর শান্ত পরিবেশ, মোটের উপর খুবই মনোরম। আমি তখন ভাবলাম, "এই দেখ, মানুষই দিয়ে রেখেছে একটা দাঁড়ি টেনে, বলেছে যে দাঁড়ির পরেই মৃত্যু।" আর যাদের বলো মৃত! তোমরা তাদের অচেতন জড় বলেই ধরে নাও, অথচ তাদের সূক্ষ্মদেহ রয়েছে তখনও পুরোপুরি চেতন হয়ে!

(নীরব থেকে)

দোষ কোথায়? দোষ কোনখানে? দোষ কিংবা বেঠিক বলে কিছু নেই। কেবল আমরাই দেখি যে অমুক জিনিসটা অসম্ভব, যেহেতু আমরা জানিনা যে ভগবান সর্বসম্ভাবনাময়, তিনি যা খুশি আর যেমনভাবে খুশি তাই করতে পারেন। এ কথা আমাদেরই মাথায় ঢোকে না ; কেবল বলি, "এটা হতে পারে আর ওটা হতে পারে না।" কিন্তু সে তো ঠিক কথা নয়। আমাদের বোকামিতেই অমন বলি, নতুবা সবই সম্ভব।

(নীরব থেকে)

কেবল যেজন সমগ্র নাটকটি দেখতে পাবে সেই বিভ্রান্ত হবে না, কারণ সে সবস্তটা পুরোপুরি ভাবেই জানবে—যা হয়েছে এবং হচ্ছে এবং হবে, সবই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু আর যে-সব বেচারারা অভিনয়ের ভূমিকা নিয়ে এসেছে তারা কেউ জানে না যে কিসের অংশ তারা অভিনয় করছে। তাতেই তারা বিচলিত হয়ে ওঠে, ভেবেই পায় না যে কোন ভূমিকা নিয়ে তারা নেমেছে। এই জ্ঞানটাই আবার এসেছিল প্রবলভাবে, আমরা সকলেই এই কমেডির অভিনেতা কিন্তু জানি না কোন অংশটা কেমন, কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে ; সামান্য যতটুকু জানি তাও ভুল জানা—এমন কি, এখনই কি করতে হবে তাও জানা নেই। আমাদের সকল জানাই হয় বিকৃত তাই দারুণ বিব্রত হয়ে পড়ি! কিন্তু সম্পূর্ণ টা জেনে নিলে তা আর হয় না, যে জানে সে কেবল হাসে, খুবই আমোদ পায়, ..কিন্তু আমাদের বেলাতে...অথচ আমাদের মধ্যেও তেমনি ক্ষমতা রয়েছে তার মতো আমোদ পাবার। শুধু তাই নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।

প্রশ্ন কিন্তু সে ভাব আনা তো সহজ কথা নয়!

উত্তর : ও, হাঁ, তা যদি সহজই হতো—সহজ হলে কেউ আর তা চাইতই না। আমরা মাঝে মাঝে নিজেদের মনে প্রশ্ন করি, জীবন এমন দুঃখের কেন? কিন্তু জীবন যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখেরই হতো, তবে প্রথমত কেউ তার কিছু দাম দিত না—কারণ তাই তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—আর দ্বিতীয়ত, এমন কথা কেউ বলবে না যে কোনো ব্যতিক্রম চাই না, কেবল একঘেয়ে সুখই চাই। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে বলতে পারো না।

এ বোধ করি সেই গল্পটার মতো যে, পৃথিবী এককালে স্বর্গ ছিল—স্বর্গে সকলেরই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান, অর্থাৎ পশুদের মতো সহজ চেতনা নিয়ে তারা বাস করত, জীবনটা কিছু উপভোগ করে যেতো, এমনিতেই আনন্দ পেতো। কিন্তু তাদের মধ্যে কৌতূহল জাগতে শুরু করল,—কেন, কেমন করে, কোন দিক দিয়ে, কি করা যায়, ইত্যাদি। নিশ্চিন্তে সুখ পেতে পেতে তারা ক্লিষ্ট হয়ে উঠল, তখন থেকেই সকল গণ্ডগোলের শুরু।

(নীরব থেকে)

বোধ করি শ্রীঅরবিন্দ বলতে চেয়েছেন যে দোষ মনে করাও একটা দোষ বা ভ্রান্তি। দোষ কিংবা ভুল কাজ বলে কিছু নেই, যখন সকল সম্ভাবনাই রয়েছে—তা পরস্পরবিরোধীও হতে পারে—কিন্তু সেটা তেমনি দেখায় মাত্র। নিজের মধ্যে লুকিয়ে দেখে বলতে হবে, "কোনটাকে আমি ভুল বলছি?" খোলাখুলি দেখলেই বুঝবে যে তা লোকামি, ভুল বলে কিছু রইল না, তোমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে তা গলে বেরিয়ে গেল।

(নীরব থেকে)

আমার মনে হয় যে শ্রীঅরবিন্দের ঊর্ধ্বগমনের কালে তাঁর বোধিময় মন এক কোনো ছিদ্রকে ভেদ করে যখন অতিমানসের সংস্পর্শে এসেছিল, তখন হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো এই চিন্তাগুলি উঠেছিল জেগে, এবং তিনি তখনই তা লিখে ফেলেছিলেন। এই সূত্রকে অনুসরণ করলেই দেখতে পাবো যে কোথায় এর উৎপত্তি।

নিশ্চয় তিনি এই বলতে চেয়েছিলেন যে ভুল জিনিসও অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে একটি। "অনন্ত" মানেই "পরিপূর্ণ", তার বাইরে কোনো-কিছু নেই। তাহলে ভুলটাকে জায়গা দিচ্ছ কোথায়? আমরাই বলি ভুল, সে আমাদেরই মনগড়া কথা। কোনো-কিছুকে যখন "ভুল" বলি, তা কিসের তুলনায়? নিজেই বিচার করে যাকে ভাবছি "এটা ঠিক" তারই তুলনায়; কিন্তু ভগবানের বিচারে তা হয় না, কারণ সেও তাঁরই অংশ। কিন্তু চেতনার এতখানি বিস্তার এসে পড়লে খুব কম লোকই তা বরদাস্ত করতে পারে।

কিন্তু আমি যখন ঐভাবে দেখতে শুরু করি, (মা তাঁর চোখ দুটি বুজালেন) দুই মিলে কেবল একই জিনিস দেখি; হাঁ, এই স্থির ভাব, প্রফুল্লতা, খোলা হাসি, এই কেবল আছে, আর এই শান্তি। পূর্ণ শান্তি পূর্ণ আলো, বিপরীত কিছু নয়, বিরোধী কিছু আর নেই। দ্বন্দ্ব

কোথাও আর নেই। শুধু এক প্রদীপ্ত স্বয়ংসঙ্গতি—অথচ যাকে আমরা বলি দোষ, দুঃখকষ্ট, ব্যথা-বেদনা, তাও সব-কিছুই আছে, চাপা দিচ্ছি না। এও এক্সপ দৃষ্টি।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

বলা বাহুল্য যে সত্যই যদি তুমি ওর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাও, তবে তা কিছুই কঠিন নয়; তোমায় কিছু করতে হবে না, শুধু ভগবানকে দাও সব করতে। সব-কিছু তিনিই করুন। তিনি তাহলে সবই করবেন। এ বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার, খুবই চমৎকার।

তিনি সকল কিছুরই ভার নেন, এমন কি সাধারণ বুদ্ধিতে নিয়েও তিনি শিখিয়ে দেন: তাকে একপাশে সরিয়ে রাখতে; আর তুমি তাকে বিশ্রাম দিয়ে বলো, "থাকো বাপু, এখন চুপচাপ থাকো, ব্যস্ত হয়ো না, বিরক্ত কোরো না, তোমাকে আমি চাইনা;" অমনি তখন একটা দরজা খুলে যাবে, তুমি নিজে খুলেছ বলেও মনে হবে না, সেই খোলা দরজা দিয়ে তুমি ওদিকে গিয়ে পড়বে (সবই অন্যে করছে, তুমি নয়); আর তখন তোমার এদিকে চলা অসম্ভব হবে।

আর এই মনের তরফের যত কিছু প্রাণান্ত মেহনত, বুঝতে পারার জন্য দুর্দান্ত প্রয়াস, ভাবতে ভাবতে মাথা ফাটিয়ে ফেলা, সবই অনর্থক, কিছুরই দরকার নেই, কিছুমাত্র লাভ নেই তাতে। চিন্তার তালগুলো নিয়ে কেবল ভাঁজার পর ভাঁজতে থাকা।

ধরো একটা তথাকথিত সমস্যা এসে পড়েছে এখন এ অবস্থায় কি বলা যাবে, বা কি করা যাবে, বা তেমনি কিছু...। কিন্তু সেখানে কিছুই তুমি করবে না, কেবল ভগবানের দিকে ফিরে বলবে, "এই দেখ প্রভু, এই এক কাণ্ড উপস্থিত হয়েছে," ব্যস, ফুরিয়ে গেল। অতঃপর তুমি চুপ করে একদম স্থির হয়ে থাকো। তারপর সম্পূর্ণ সহজভাবে, কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তে বা কোনো ফন্দি না এঁটে, কষ্টপ্রয়াস না করে যা করবার তাই করে যাও। অর্থাৎ যেন ভগবানই তা করছেন, তুমি নিজে নয়। তখন তাঁরই সব করা হয়। তিনিই করেন ঘটনা-সংঘটন, লোকেদের তিনি সেই ভাবেই এনে ফেলেন, তোমার মুখে কিংবা কলমে সেই ভাবেই কথা জুগিয়ে দেন, তিনিই সব করেন, সব, সব, সবই, তোমার কিছু করবার দরকার হয় না, শুধু নিজেকে রাখো আনন্দের মধ্যে ডুবিয়ে।

কিন্তু আমি নিশ্চয় করে জানি যে এমন জিনিস কেউ চায় না।

প্রশ্ন : কিন্তু মনকে এমনি পরিষ্কার করা, আগের থেকে মুক্ত করা খুবই কঠিন কাজ।

উত্তর : তাও তোমাকে করতে হবে না, তাও তিনিই করে দেবেন তোমার হয়ে।

প্রশ্ন : কিন্তু তার মধ্যে যে নিত্য আক্রমণ চলেছে, পূর্বের চেতনা পূর্বের চিন্তাগুলো...

উত্তর : হাঁ, সেগুলো তাই করতে থাকবে অভ্যাসের কারণে, অমনি তখন তুমি

শুধু বলতে থাকবে, "এই দেখ প্রভু, তুমি একবার দেখ, দেখ, দেখ, এই সব আবার হচ্ছে," এই পর্যন্ত। তুমি বলবে, "দেখে নাও প্রভু, দেখে নাও, মূর্খটার কি কাণ্ড দেখ"। এই পর্যন্ত। যখনই হবে তৎক্ষণাৎ এই বলতে শুরু করবে। ও-সব জিনিস আপনা হতেই উল্টে যায় গো ছেলে, কোনো কষ্ট করতে হয় না। সোজাসুজি শুধু ঐকান্তিক হওয়াটাই দরকার, অর্থাৎ যথার্থ রকমে একান্তভাবেই তাই চাইতে হবে। তুমি তো ভালোমতেই জানো যে কিছুই তুমি করতে পারো না, তেমন কোনো ক্ষমতাই তোমার নেই। আমার নিজের মধ্যে তো এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে এই জড়পিণ্ড দেহ, কোষ প্রভৃতিকে একজোট করে এই নিশ্চিত কাঠামো, এ নিতান্ত তুচ্ছ অকম জিনিস। জানিনা কেমন করে লোকে ভাবতে পারে যে তারা খুবই শক্তিমান, দীপ্তিমান, অসাধারণ সুপটু; আমার তো এই কথাই মনে হয় যে তারা প্রকৃতপক্ষে জানেই না যে তারা কেমন। যে একবার দেখতে পায় যে কেমনভাবে সে গড়া—বস্তুত এর মধ্যে কিছুই নেই, কিছুই নেই, অথচ আবার এর দ্বারা সব-কিছুই সাধ্য যদি... যদি এর দ্বারা ভগবানকে সব করতে দাও। কিন্তু এর মধ্যে এমন একজন কেউ আছে যে নিজেই চায় সব করতে, সেখানেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি, নতুবা...

তোমার হয়তো বাস্তবিকই একটা সদিচ্ছা আছে, সেই সদিচ্ছাতে ভেবেছ যে নিজেই করে ফেলবে কাজটা। কিন্তু তাতেই সব কিছু জটিল হয়ে ওঠে। কিংবা তোমার মনে হয়তো বিশ্বাস ততটা নেই, তুমি ভাবো যে ভগবান অতখানি পারবেন না, হয়তো তিনি এতটা জানেন না, তাই নিজেকেই তোমার এ কাজ করতে হবে। (মা হাসলেন) এইরকম বোকামিই সর্বত্র। "তিনি কি আর সব দেখতে পাচ্ছেন? আমরা রয়েছি মিথ্যার জগতে, তিনি কেমন করে এই মিথ্যার ভিতর থেকে সমস্ত দেখবেন..." কিন্তু প্রকৃতই তাই হয়, যেখানে যেমন আছে সেই ভাবেই তিনি সব কিছু দেখতে পান।

যারা বুদ্ধিহীন তাদের সম্পর্কে আমি বলছি না, আমি বলছি বুদ্ধিমান মানুষদেরই কথা, যাদের বিশ্বাসও আছে, এমন কি জানেও তারা যে আমরা বাস করছি এক মিথ্যার ও অজ্ঞানতার জগতে, এবং এ কথাও মানে যে ভগবান একজন আছেন যিনি সর্বসত্যময়, তবুও তারা বলে, "হাঁ, জানি তিনি সত্যময়, সেইজন্যই আমাদের এই সব মিথ্যাগুলোর কথা বোঝেন না (মা হাসলেন), তাই এর কিনারা আমাদের নিজেদেরই করতে হয়।" এই ভাবটাই সর্বত্র বেশী বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

আমরাই অনর্থক সব কিছুকে জটিল করে তুলি।

প্রশ্ন: এই কথাটা প্রায়ই আমি নিজের মনে ভাবি: ভগবানের কাছে যখন আমার কিছু প্রার্থনা জানাচ্ছি, যখন তাঁকে জানাতে চাইছি যে আমি কিছু একটা গণ্ডগোলে পড়েছি, মনে হয় যে তখন আমার খুবই প্রবল একাগ্রতা আনা দরকার, যাতে অনেক দূর থেকে তাঁকে ডাক দিয়ে আনা যায়। তাই কি ঠিক কথা, কিংবা হয়তো...

উত্তর : তা নির্ভর করছে আমাদেরই উপরে।

আমার কথা যদি নাও, আমি তো এখন সর্বত্রই তাঁকে বোধ করছি, সর্বদা, সকল সময়েই ...দৈহিক স্পর্শ দিয়ে পর্যন্ত—যদিও সূক্ষ্মদেহে কিন্তু তবু দৈহিকভাবেই—সকল বস্তুতে, আকাশে, বাতাসে, সকল ব্যক্তির মধ্যে—ঠিক এইরকম ভাবে (মা হাত দিয়ে মুখের উপর চেপে ধরলেন)। দূরে কোথাও যাবার দরকার কি, শুধু এইটুকু করলেই হয় (মা হাত দিয়ে ভিতরে প্রবেশের ইঙ্গিত করলেন), শুধু এক মুহূর্তের একাগ্রতা—তখনই তিনি উপস্থিত। এখানেও তিনি, সবখানেই তিনি। দূরে ভাবলেই তিনি দূরে।

অবশ্য যখন ভাবছি বিশ্বচেতনার বিভিন্ন স্তর ও জগতের কথা, কোনোটা বা তার শেষ প্রান্তে থাকাতে অনেকখানি তফাতে, তখন তো অনেক দূরেই চলে যেতে হয়। (মা হাসলেন) কিন্তু যখন ভাবি যে তিনি আছেন সর্বত্র, তিনিই সব-কিছু, কেবল আমাদেরই এই বোধশক্তি তাঁকে দেখতে এবং জানতে দিচ্ছে না, তখন কেবল এই কাজটি করলেই হয় (ভিতর দিকে চোকার ইঙ্গিত করলেন)। এই ক্রিয়াতে জিনিসটা জমে (উপর্যুপরি ভিতরদিকে ও বাইরের দিকে হাত নাড়লেন), কিন্তু তোমরা করে থাকো এমনি (বাইরের দিকে হাত নেড়ে দেখালেন), তাতেই সব-কিছু হয়ে পড়ে কৃত্রিম, কঠোর, শুষ্ক, মিথ্যা, হাঁ তা কৃত্রিমই হয় ; কিন্তু যদি করো এমনি (ভিতরদিকে হাত নাড়লেন) অমনি সব-কিছুই হয়ে যাবে উদার, প্রশান্ত, বিরাট, আলোময়, আনন্দময়। শুধু এটাই দরকার, এটাই দরকার (ভিতরদিকে ও বাহির দিকে হাত ঘোরাতে লাগলেন)। কিন্তু কেমন ক'রে ? কোথায় কোনখানে ? তার বর্ণনা করা চলে না, সে কেবল চেতনারই ক্রিয়া, অন্য-কিছু নয়। আর তখন সত্যচেতনা ও মিথ্যাচেতনার পার্থক্য ক্রমশ...ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে পাতলা হয়ে যায়—যন্ত্রের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে বৃহৎ ব্যাপার কিছু করতে হয় না। প্রথমে মনে হবে তুমি এমন অবস্থার মধ্যে পড়েছ যার থেকে বেরোতে খুবই আভ্যন্তরীণতা ও একাগ্রতা ও তন্ময়তা দরকার। কিন্তু এবার মনে হবে যে পর্দার আড়ালটা তুমি নেমেই নিলে (মা তাঁর মুখের সামনে হাতের আড়াল দিয়ে দেখালেন), সে পর্দা পাতলা কিন্তু খুবই কঠিন—তবে তাকে নাড়ানো যায়, সেই শুকনো আর পাতলা চাকনিটা মুখোসের মতো তোমায় ঢেকেছে ; কিন্তু পরে যেমনি একদিন এমনি করে সরিয়ে দিলে (হাত নেড়ে দেখালেন) অমনি তা সরে গেল।

আসছে একটা সময় যখন এই মুখোস বোধ করার দরকারই হবে না, তা এমন পাতলা হয়ে যাবে যে তাকে ভেদ করেই সব-কিছু দেখা ও জানা যাবে, মুখোসে আর তুমি ঢাকাই পড়বে না। সেই কাজই এখন শুরু হয়েছে।

কিন্তু এই সর্বত্র উপস্থিতি...এ একটা স্পন্দন, আর এর মধ্যেই সব-কিছু, এর মধ্যে আছে অনন্ত শক্তি, অসীম আনন্দ ও অশেষ শান্তি, তার এমন বিরাট বিশালতা যার কোনো প্রান্ত নেই,...কিন্তু এ কেবল স্পন্দন, যার কথা বলাই যায় না...না, তুমি তার কথা ভাবতেই পারো না, তাই বলতেও পারো না। ভাবতে গেলেই দিশাহারা হও। তাই বলতেও কিছু পারো না।

কিন্তু তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। তুমি তাঁকে দূরে ভাবো বলেই তিনি দূরে থাকেন। তুমি যদি ভাবো এইখানে (মুখের দিকে হাত দিয়ে) তিনি ছুঁয়ে রয়েছেন...তাহলে তেমনি ভাবেই তাঁকে স্পষ্ট অনুভব করবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্পর্শ যেমন হয় এ তেমন নয়। অথচ অচেনা নয়, বাইরের কিছু নয়, যা বাহির থেকে ভিতরে ঢুকছে। তা সর্বত্রই থাকে।

সুতরাং একে অনুভব করবে সবখানেই, সবখানেই সর্বত্র—ভিতরে, বাইরে, সর্বস্থানে, তিনি ছাড়া কিছু নেই,—সবই তিনি, সবই তাঁর স্পন্দন।

কিন্তু আগে তুমি তোমার মাথাকে থামাও (মাথা দেখিয়ে), ওকে না থামালে তাকে দেখতে পাবে না,—যেমনি তুলনা দিতে যাবে, "তা এইরকম বা ঐরকম,"—অমনি, ওঃ।

(নীরব থেকে)

আর কতবার, কতবার সেই বোধটি আসবে, যার আকার আছে দেখছ অথচ তা নেই, বর্ণনা দিতে পারবে না। দেখবে যে তার দৃষ্টি রয়েছে কিন্তু চোখ নেই,—সে একচোখ-শূন্য দৃষ্টি,—আর হাসি আছে অথচ মুখ নেই, মূর্তি কিছু নেই! অথচ দেখবে যে তিনি হাসছেন, তিনি দেখছেন (না হাসলেন), আর তখন তুমি বলতে বাধ্য হবে, "হাঁ প্রভু, ঠিকই তো দেখছি, আমি যে কি বোকা!" তখন তিনিও হাসবেন, আর তুমিও হাসবে, আনন্দ খুব জমবে।

এর কথা বলা যায় না! ব্যাখ্যা করা যায় না। কিছুই তুমি বলতে পারবে না। যাই কেন বলতে যাও, তা কিছুই হবে না, কিছুই হবেনা।* ১২।১০।১৯৬২

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

With best compliments of

Russa Road Service Station

Authorised service agents for

Ambassador, Bedford, Chevrolet

Distributors :

Esso Standard Eastern Inc.

4/2 & 5 Russa Road, Calcutta-25

47-3467

ঋষি দীর্ঘতমার সূর্য্যমন্ত্র

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যগ্নিঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্য তিস্রো দ্যাবো বিষ্পতিং সপ্তপুত্রম্॥ ১॥

সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ॥ ২॥

ইমং রথমধি যে সপ্ত তস্থুঃ সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভি সং নবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম॥ ৩॥

কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্তি।
ভূম্যা অসুসাসৃগাত্মা ক স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপ গাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥ ৪॥

পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্ দেবানামেনা নিহিতা পদানি।
বৎসে বষ্কয়েঽধি সপ্ত তন্তূন্ বি তৎনিরে কবয় ওতব' উ॥ ৫॥

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তম্ভ ষড়িমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্॥ ৬॥

ইহ ব্রবীতু য ঈমঙ্গবেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিম্ বসানা উদকং পদাপুঃ॥ ৭॥

মাতা পিতরমৃত আ বভাজ ধীত্যগ্রে মনসা সং হি জগ্মে।
সা বীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইদুপবাকমীয়ুঃ॥ ৮

যুক্তা মাতাসীদ্ ধুরি দক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ গর্ভো বৃজনীষ্বন্তঃ।
অমীমেদ্বৎসো অনু গামপশ্যদ্বিশ্বরূপ্যং ত্রিষু যোজনেষু॥ ৯॥

তিস্রো মাতৃস্ত্রীন্ পিতৃন্ বিভ্রদেক ঊর্ধ্বস্তস্থৌ নেমব গ্লাপয়ন্তি।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচমবিশ্বমিন্বাম্॥ ১০॥

দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরি দ্যামৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥ ১১॥

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অস্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতম্॥ ১২॥

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্যতে সনাভিঃ॥ ১৩॥

সনেমি চক্রমজরং বি বাবৃত উত্তানায়াং দশ যুক্তা বহন্তি।
সূর্যস্য চক্ষু রজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নাপিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৫ ॥

সাকংজানাং সপ্তথমাহুরেকজং ষড়িদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥ ১৬ ॥

স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষন্বান্ন বি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ইমা চিকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুষ্পিতাসৎ ॥ ১৭ ॥

অবঃ পরেণ পর এনাবরেণ পদা বৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ।
সা কদ্রীচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক্ব স্বিৎ সূতে নহি যূথে অন্তঃ ॥ ১৭ ॥

অবঃ পরেণ পিতরং যো অস্যানুবেদ পর এনাবরেণ।
কবীয়মানঃ ক ইহ প্র বোচদ্দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম ॥ ১৮ ॥

যে অর্বাঞ্চস্তঁ উ পরাচ আহুর্যে পরাঞ্চস্তঁ। উ অর্বাচ আহুঃ।
ইন্দ্রশ্চ যা চক্রনঃ সোম তানি ধুরা ন ধুক্তা রজসো বহন্তি ॥ ১৯ ॥

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥ ২০ ॥

যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ ॥ ২১ ॥

যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধি বিশ্বে।
তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তরোরনশ্নন্নিহ পিতরং ন বেদ ॥ ২২ ॥

যদগায়ত্রে অধি গায়ত্রমাহিতং ত্রৈষ্টুভাদ্বা ত্রৈষ্টুভং নিরতক্ষত।
যদ্বা জগজ্জগত্যাহিতং পদং য ইত্তদ্বিদুস্তে অমৃতত্বমানশুঃ ॥ ২৩ ॥

গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রিষ্টুভেন বাকম্।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণীঃ ॥ ২৪ ॥

জগতা সিন্ধুং দিব্যস্তভায়দ্রথন্তরে সূর্যং পর্যপশ্যৎ।
গায়ত্রস্য সমিধস্ত্রিস্র আহুস্ততো মহ্না প্র রিরিচে মহিত্বা ॥ ২৫ ॥

উপ হ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্।
শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষন্নোঽভীদ্ধো ঘর্মস্তদু ষু প্র বোচম্ ॥ ২৬ ॥

হিঙ্কৃণ্বতী বসুপত্নী বসূনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ।
দুহামশ্বিভ্যাং পয়ো অঘ্ন্যেয়ং সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥ ২৭ ॥

গৌরমীমেদনু বৎসং মিষন্তং মূর্দ্ধানং হিঙ্ঙকৃণোন্মাতবা উ।
সৃক্কাবং ঘর্মমভি বাবশানা মিমাতি মায়ুং পয়তে পয়োভিঃ ॥ ২৮ ॥

অয়ং স শিঙ্ক্তে যেন গৌরভীবৃতা মিমাতি মায়ুং ধ্বসনাবধি শ্রিতা।
মা চিত্ত্বিভিন্মি হি ষকার মর্ত্যং বিদ্যুদ্ভবন্তী প্রতি বব্রিমৌহত ॥ ২৯ ॥

অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবমেজদ্ধ্রুবং মধ্য আ পস্ত্যানাম্।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ ॥ ৩০ ॥

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আ বরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥ ৩১ ॥

য ঈং চকার ন সো অস্য বেদ য ঈং দদর্শ হিরুগিন্নু তস্মাৎ।
স মাতুর্যোনা পরিবীতো অন্তর্বহুপ্রজা নির্ঋতিমা বিবেশ ॥ ৩২ ॥

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বো যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥ ৩৩

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।
পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম ॥ ৩৪ ॥

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।
অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচ পরমং ব্যোম ॥ ৩৫ ॥

সপ্তার্দ্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্মণি।
তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ ॥ ৩৬ ॥

ন বি জানামি যদিবেদমস্মি নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥ ৩৭ ॥

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ন নি চিক্যুরন্যম্ ॥ ৩৮ ॥

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৩৯ ॥

সূযবসাদ্ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
অদ্ধিতৃণমধ্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী॥ ৪০॥

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥ ৪১॥

তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ।
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্বিশ্বমুপ জীবতি॥ ৪২॥

শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিষূবতা পর এনাবরেণ।
উক্ষাণং পৃশ্নিমপচন্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্॥ ৪৩॥

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্।
বিশ্বমেকো অভি চষ্টে শচীভির্ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্॥ ৪৪॥

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥ ৪৫॥

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ ৪৬॥

কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিব্যমুৎপতন্তি।
ত আববৃত্র সদনাদৃতস্যাদিদ্ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে॥ ৪৭॥

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ত্সাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ॥ ৪৮॥

যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো মযোভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি।
যো রত্নধা বসুবিদ্যঃসুদত্রঃ সরস্বতি তমিহ ধাতবে কঃ॥ ৪৯॥

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥ ৫০॥

সমানমেতদুদকমুচ্চৈত্যব চাহভিঃ।
ভূমিং পর্জন্যা জিন্বন্তি দিবং জিন্বন্ত্যগ্নয়ঃ॥ ৫১॥

দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাম্।
অভীপতো বৃষ্টিভিস্তর্পয়ন্তং সরস্বন্তমবসে জোহবীমি॥ ৫২॥

ঋষি দীর্ঘতমার সূর্য্যমন্ত্র

ঋগ্বেদ—প্রথম মণ্ডল—১৬৪ সূক্ত

অনুবাদক—শ্রীমলিনকান্ত গুপ্ত

(১)

এই যে প্রেষ প্রাচীন হোতা। এর আছে মধ্যম ভ্রাতা, সে হল আহাবী।
তৃতীয় ভ্রাতা প্রোহ্যমান-পৃষ্ঠ—সেখানে দেখলাম আমি সপ্তপুত্রসহ বিশ্বপতিকে।

(২)

সাতজন একচক্র রথটি যোজনা করে, সাতটি নামে একই অশ্ব তাকে বহন করে।
চক্রের আছে তিনটি নাভি—যারা অক্ষয় অমর্ত্য, যেখানে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বভুবন।

(৩)

এই রথে অধিষ্ঠান করেন সাতজন। সাতটি চক্র তার, সাতটি অশ্ব তাকে বহন করে।
সাতটি ভগ্নী একযোগে চলেছে সেই দিকে যেখানে সাত নামের সাতটি গাভী গূঢ় নিহিত।

---

(১) তিন ভ্রাতা—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ; পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও আকাশ অথবা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ (দ্যৌ) হল তাদের নিবাস বা প্রতিষ্ঠান। অন্যরূপে, দ্যাবাপৃথ্বে, তাই দেহ-প্রাণ-মন। সপ্তপুত্র, সপ্তভগ্নী, সপ্তসিন্ধু, সপ্তনাভি, সপ্তঅশ্ব, সপ্তরশ্মি, সপ্তচক্র, সপ্তভুবন হল সত্তার বা চেতনার সাতটি স্তর। উপরে বা পরার্দ্ধে তিনটি সৎ-চিৎ-আনন্দ বা সত্যলোক-তপোলোক-জনলোক, আর নীচে অপরার্দ্ধে তিনটি দেহ-প্রাণ-মন অথবা ভূলোক-অন্তরিক্ষ-দ্যুলোক আর এই উভয়ের সংযোগ বা মধ্যবর্ত্তী হল মহর্লোক (একেই বলা হয় স্বর্লোক)।

(২) সাতজন—সপ্তলোকের সাতটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা সপ্তঋষি। অশ্ব অর্থ শক্তি, তপঃশক্তি, প্রাণশক্তি, বীর্য্য। গাভী অর্থ আলো, জ্যোতি, কিরণ।

(৪)

প্রথমে জন্মিল যে তাকে কে জেনেছে? সে অদ্বিনয়কে ধরে রেখেছে অনদ্বিনয়?

কোথায় সে, যে হল পৃথিবীর জীবন, রক্ত, আত্মা? জিজ্ঞাসু হয়ে কে গিয়েছিল জ্ঞানীর কাছে?

(৫)

অপক্ক আমি জিজ্ঞাসা করি, মনের সাহায্যে জানতে না পেরে—দেবতাদের এ-সব পদ কোথায় নিহিত?

তরুণ শিশুটির উপর সত্যদ্রষ্টা কবিরা সাতটি তন্তু ছড়িয়ে ধরলেন বয়নের জন্য।

(৬)

অচেতন আমি, তাই সচেতন সেই কবিদের এখানে আমি জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানের জন্য, অজ্ঞানী আমি।

এই দুয়টি লোক প্রসারিত করে কে ধরে আছে দৃঢ়ভাবে? কে সেই এক, রূপে যার জন্ম হয় নাই?

(৭)

এখানেই তবে বলে যেন সে, যে জানে এই বন্দনীয়ের গতিপথ।

তার শীর্ষ থেকে গাভীরা দোহন করে ক্ষীর আর যখন অবগুণ্ঠিত তখন পা দিয়ে পান করে জল।

---

(৪) অনদ্বিনয়—ব্রহ্মকে, বিশ্বাতীত তৎবস্তুকে ঈশ-উপনিষদ বলছেন "অম্না-বিরং"—শিরাবর্হিত অর্থাৎ অকায়ন্, অশরীরী। এই ঋগ্বেদেই অন্যত্র একে আত্মা বলা হয়েছে "অপদে" অর্থাৎ পদ বা স্থিতি নাই।

(৫) তরুণ শিশু অথবা সত্যের নিবাস (সায়ণ)। তরুণ সূর্য্য-সবিতা, পরমের প্রকাশ-শক্তি উদয় হয়েছেন পিছনে স্বরূপকে (সৎ-চিৎ-আনন্দ) রেখে, সম্মুখে নিয়ে আসছেন ব্যক্ত সৃষ্টিকে (দেহ-প্রাণ-মন) আর নিজের মহর্লোকস্থ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে—এই সাতটি বস্তু দিয়ে বিশ্বসৃষ্টি গঠিত।

(৬) সৃষ্টিতে সূর্য্য পরমের প্রতীক, কেন্দ্রস্থল; পরার্দ্ধ ত্রিতত্ত্ব ও অপরার্দ্ধ ত্রিতত্ত্ব সে-ই ধরে আছে দৃঢ়ভাবে।

(৭) উপরে শিরোভাগে যা জ্যোতি, নিম্নভাগে তাই জলপ্রবাহ বা শক্তি, জীবনী-শক্তি।

(৮)

মাতা পিতাকে ভজনা করেন, সত্যের মধ্যে—সম্মুখে এসে তার সঙ্গে সংযুক্ত হলেন বুদ্ধি ও মনের আশ্রয়ে।

সর্বরসে অভিসিক্তা হয়ে শিহরিতা তিনি—নতিমান যারা তারা বাঙ্ময় হয়ে উঠল।

(৯)

দক্ষিণ দিক দিয়ে মাতা ধুরিতে যুক্ত হলেন, নব-জাত শিশু স্থান গ্রহণ করল কুটিল-গতি সকলের অন্তরে।

গাভী-মাতার দিকে চেয়ে বৎস আহ্বান করে, চেয়ে দেখে প্রসার তিনটির মধ্যে বিক্ষিপ্ত রয়েছে কে এক।

(১০)

তিন মাতাকে, তিন পিতাকে ধরে ঊর্দ্ধে রয়েছে সেই এক—এরা তাকে নীচে নামিয়ে পীড়িত করে না।

দ্যুলোকের অপর পৃষ্ঠে তারা সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে, যা বিশ্বকে ধরে থাকে আপন জ্ঞানে, বিশ্ব যাকে ধারণ করে না।

---

(৮) "দৌর্মে পিতা.....মাতা পৃথিবী মহীয়িয়ং"—ঋগ্বেদ। এই পৃথিবী, এই নিম্ন অন্নময় ভূতল হল মাতা আর ঊর্দ্ধের চিন্ময় লোক হল পিতা। পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গেও তুলনা করা যায়। ঊর্দ্ধের জ্যোতি ও নিম্নের জড়, মাঝখানে মানস চেতনা। মনবুদ্ধিকে আশ্রয় করেই ঊর্দ্ধচেতনা রূপায়িত হয় এখানে, কিতির গর্ভসঞ্চার বা প্রকটন প্রস্ফুটন ফলন হয় ঊর্দ্ধের চিন্ময় আনন্দের অভিসিঞ্চনে। এ রহস্য তাদেরই দৃষ্টি-গোচর, তাদেরি মন্ত্রে প্রনূর্ত, যারা আত্মদান করে, অবনত প্রণত হয়ে একে গ্রহণ করেছে।

(৯) ধুরি হল বিশ্ব-সৃষ্টির নিভৃত মেরুদণ্ড, যাকে আশ্রয় করে ঊর্দ্ধ-চেতনা জড় চেতনা হয়ে দেখা দিয়েছে এবং জড় চেতনা ঊর্দ্ধচেতনায় উঠে চলেছে। জড়চেতনাই হল কুটিল গতির আবাসভূমি ; জড়চেতনা দক্ষিণ দিক ধরে অর্থাৎ সত্যাসত্যজ্ঞানের পথ ধরে যখন ঊর্দ্ধায়িত হতে থাকে তখনই তার মধ্যে জন্মে দেব-শিশু, মানুষের অন্তর পায় নব জন্ম। ঊর্দ্ধায়িত জ্যোতির্ময় পার্থিব চেতনাই গাভী-মাতা। এই পার্থিব চেতনার সঙ্গেই প্রায় অজাজী হল আর দুটি প্রসার, প্রাণ ও মন অর্থাৎ "ভূর্ভুবর্ধরং" কিন্তু অন্তরস্থ নবজাত চিন্ময় জীবের দৃষ্টিতে এ সকলের মধ্যে প্রস্ফুট এখন পরম এক পরাৎপর।

(১০) তিন মাতা যদি হয় ভূর্ভুবর্ধর্, দেহ-প্রাণ-মন অর্থাৎ এই অপরার্ধ, তবে উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ, জন-তপঃ-সত্য হবে পিতা এবং তারও ঊর্দ্ধে, পরাৎপর হল একং।

(১১)

সত্যের চক্র তার দ্বাদশ অর নিয়ে ঘুরে চলেছে দ্যুলোক বেয়ে, কখন সে জীর্ণ হয় না।

হে অগ্নি! যুগলে এখানে রয়েছে তারা যারা সংখ্যায় সপ্তশত-বিংশতি।

(১২)

দ্যুলোকের উত্তর অর্দ্ধে রয়েছেন পিতা—যাঁর পঞ্চ পদ, দ্বাদশ আকৃতি এবং যিনি প্রীতিময়।

অন্যেরা বলে আবার এই যে উর্দ্ধে দিব্যদৃষ্টিমান তিনি স্থাপিত হয়েছেন সপ্তচক্র বা ষট্-অরকে ধরে।

(১৩)

পঞ্চ-অর সহ চক্র ঘুরে চলেছে, তার মধ্যে সকল ভুবন প্রতিষ্ঠিত।

বিপুল ভারে তার অক্ষ ব্যথিত হয় না—নাভিসহ সে চিরকাল রয়েছে, শীর্ণ হয় না।

(১৪)

নেমি-সহ চক্র ঘুরে চলে অক্লান্ত হয়ে, উর্দ্ধমুখী দশটিতে যুক্ত হয়ে তাকে বহন করে।

সূর্য্যের চক্ষু চলেছে, আকাশ তাকে ঘিরে—তার মধ্যে স্থান পেয়েছে সকল ভুবন।

---

(১১) বৎসরের সমাবর্ত্তন চিত্রে প্রতিবিম্বিত বিশ্বচক্র। দ্বাদশ মাস বা রাশি এবং রাত্রি দিনে ৩৬০ + ৩৬০ = ৭২০। বলা হয়ে থাকে চেতনার উর্দ্ধায়ণ অর্থাৎ উত্তরায়ণ (৬ মাস) এবং নিম্নায়ন অর্থাৎ দক্ষিণায়ণ অর্ধ চেতনার অগ্রগতি, ব্যক্তির গতি বিশ্বের গতি, আলো-অন্ধকারের উপর-নীচের পর্য্যায়ক্রমে।

(১২) এই সব সংখ্যা—তিন, পাঁচ, ছয়, সাত, বার—চেতনার সত্তার বিবিধ স্তর বা লোক—তাদের শ্রেণীবদ্ধ গোষ্ঠিবদ্ধ করা হয় অনুভূতির বা উপলব্ধির বিশেষ ধারা অনুসারে।

(১৩) পঞ্চ অর—উপনিষদে বলছে তা হল দেহ-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আত্মা ; নাভি অর্থ ব্রহ্ম, ঋষি নিজেই বলছেন পরে। যজ্ঞ হল উর্দ্ধায়নী শক্তি, যার কল্যাণে নিম্নতন নিজেকে ধরে দেয়, আত্মদান করে উর্দ্ধতনের কাছে এবং এইভাবে সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে, ক্রমোন্নত জন্মপ্রকট করে চলে।

(১৪) অনুলোম-প্রতিলোম অর্থাৎ উর্দ্ধ-অধঃ গতি নিয়ে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি হয় দশটি, পূর্ণতার জ্ঞাপক।

(১৫)

এক সঙ্গে জন্মেছে যারা তাদের সপ্তমটি হল একক—আর সকলে যুগ্ম, ঋষি তারা, তারা দেবজাত।

আপন আপন স্থিতি অনুসারে তাদের গতি বিহিত—অধিষ্ঠাতৃকে লক্ষ্য করেই তারা বিবিধ আকারে রূপগ্রহণ করে চলেছে এগিয়ে।

(১৬)

আমায় বলা হল, স্ত্রী যারা তারা হল পুরুষ—যারা চক্ষুষ্মান তারাই দেখে, অন্ধ যারা তারা জানতে পারে না।

পুত্র যে দ্রষ্টা কবি, সে জানে—এ সব কথা জানে যে, সে হল পিতার পিতা ॥

(১৭)

নিজের উপরিতন পা দিয়ে বৎসের নিম্নতন পা, আর নিজের নিম্নতন পা দিয়ে বৎসের উপরিতনের পা ধরে গৌ-মাতা উঠে চলেছে।

কোন দিকে চলেছে সে, কোন অর্দ্ধে পার হয়ে যায়? কোথায় জনন দেয়? বহুলের মধ্যে নয়।

---

(১৫) এখানে বলা হয়েছে আবার ৬+১=৭'এর কথা। ১০ ঋকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(১৬) স্ত্রী এবং মাতা একই জিনিস। সত্তা এবং শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি, দুটি দিক আছে প্রত্যেক বস্তুর, প্রকৃত পক্ষে দুটিই এক। বিশ্বস্রষ্টা হলে বিশ্বপিতা, তাঁর পিতা বিশ্বাতীত বা পরাৎপর। জীব বা অন্তঃপুরুষ হল পুত্র, কুমার, দেবশিশু বিশ্বপুরুষ পিতা, আর বিশ্বাতীত পুরুষ (পুরুষোত্তম) পিতামহ, একে প্রজাপতিও বলা হয় কখন।

(১৭) ১৭ হতে ২০, এই কয়েকটি শ্লোকে ঊর্ধ্ব ও অধ, পরার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধ এই দুই লোক বা চেতনার সম্বন্ধ, আদানপ্রদান ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রথমে একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। বৎস যেন পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে, ঊর্দ্ধমুখী হয়ে সামনের দু'পা উপরে প্রসারিত করে দিয়েছে। আর তার মাতা উপর থেকে ঘুরে নীচে ঝুঁকেছে, তার সম্মুখের পা দিয়ে ধরেছে বৎসের নিচের পা, এবং পিছনের পা দিয়ে ধরেছে বৎসের উপরের পা। চেতনার এই ঊর্দ্ধমুখী ও অধোমুখী গতি, এই উত্তরণ ও অবতরণ আর একটি চিত্র দিয়ে দেখান হয়, গুহ্যবিদ্যার শাস্ত্রে; একটি ঊর্দ্ধমুখী সাপ মুখে করেছে আর একটি অধোমুখী সাপের লেজ, এই অধোমুখী সাপটি মুখে গিলছে আবার ঊর্দ্ধমুখী সাপটির লেজ, উভয়ে তৈরী করেছে একটা বলয়-আকৃতি। ঊর্দ্ধচেতনার বৈশিষ্ট্য হল ঐক্য, একত্ব; নিম্নচেতনার প্রকৃতি হল বহুলত্ব, নানাত্ব।

(১৮)

উর্দ্ধ দিয়ে যে অধঃস্থ পিতাকে সম্যক জানে, আর এই অধঃস্থকে দিয়ে উর্দ্ধকে জানে—কে সে, তার কবিক-শক্তি দিয়ে এখানে বলবে সে কথা, কোথা হতে জন্ম নিল এই দিব্য মন ?

(১৯)

অধোমুখী যারা তারাই আবার উর্দ্ধমুখী, বলা হয়—আর বলা হয়, উর্দ্ধমুখী যারা তারাই অধোমুখী।

হে সোম, হে ইন্দ্র ! তোমরা যা গড়ে তুলেছ তারা ঘৃতিযুক্ত অশ্বের মত জ্যোতির্ম্ময় ভুবনকে বহন করে চলেছে।

(২০)

দুটি শোভন-পক্ষ বিহঙ্গ, একসঙ্গে সখারূপে একই বৃক্ষ আশ্রয় করে রয়েছে—তাদের একজন সুস্বাদু ফল আহার করে, আর এক জন অভুক্ত থেকে কেবল চেয়ে দেখে।

(২১)

শোভন-পক্ষ বিহঙ্গেরা তাদের জ্ঞানের সহায়ে যেখানে অমৃতের ভোগ ঘোষণা (পরিষেশন) করে,

সেখানে বিশ্বভুবনের ঈশ্বর ও পালক যিনি, যিনি মহীয়ান তিনি এই অপক্ক আমার মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

(২২)

যে বৃক্ষে মধুপায়ী শোভন-পক্ষ বিহঙ্গেরা বাস করে এবং যেখানে থেকে এই বিশ্বের দিকে জেগে ওঠে,

তার ফল সুস্বাদু বলা হয়, তা লাভ করে না যে পিতাকে অগ্রে না জানে।

---

(১৮) অধঃস্থ পিতা হল অন্তর্যামী, হৃদয়গত ভগবান। এই অন্তরকে দিয়ে উর্দ্ধকে জানতে হয়, এই উর্দ্ধকে অন্তঃকে উদ্ভাসিত করতে হয়। এই উভয়ের সংযোগে লভ্য দিব্য-চেতনাময়, দিব্যমনোময় মানুষের মধ্যে নবজিন্ম।

(১৯) সোম—আনন্দের অমৃতত্বের দেবতা। ইন্দ্র হল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মন, অশ্ব হল জীবনীশক্তি, দিব্যপ্রাণশক্তি।

(২০) উর্দ্ধে পরার্দ্ধে চেতনা হল নির্বিকার দ্রষ্টা মাত্র, নিম্নের অপরার্দ্ধে সেই ঘরে আসে ভোক্তা রূপে। ব্যক্তিচেতনায়, বিশ্বচেতনায়, ভগবৎচেতনায় এই দুই রূপ।

(২১-২২) এই দুটি শ্লোকে পূর্ব্বের বিহঙ্গের ও বৃক্ষের চিত্রটি অনুসরণ করা হয়েছে। গোটা সৃষ্টিটাই হল বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ, তাকে আশ্রয় করে রয়েছে জীবকুল। যে জীবেরা

(২৩)

যেখানে গায়ত্রের উপর গায়ত্র স্থাপিত হল, যেখানে ত্রিষ্টুভ থেকে ত্রিষ্টুভ কেটে গড়া হল—

আবার জগৎ যেখানে জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, যারা জানে সেই পদ, তারাই অমৃতত্ব লাভ (ভোগ) করে।

(২৪)

গায়ত্র দিয়ে একে একে ঋক গড়ে তোলা হয়, ঋক দিয়ে সাম আর ত্রিষ্টুভ দিয়ে বাক—আর বাক দিয়ে দ্বিপদী বা চতুষ্পদী বাক গড়া হয় এবং অক্ষর দিয়ে গড়া হয় সপ্তবাণী।

(২৫)

জগতী দিয়ে দ্যুলোকে সিন্ধু প্রতিষ্ঠিত হল, রথন্তর ছন্দে সূর্যকে দেখা গেল চারিদিকে—গায়ত্রের বলা হয় ত্রিবিধ সমিধ—মন্ত্রের মাহাত্ম্যে তাই সে সকলের উর্দ্ধে।

শুদ্ধ শুভ্র জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে, তারা নিজেরা আনন্দময় অমৃতময় হয়ে উঠেছে এবং তারাই ঘোষণা করে এই মহাবার্তা, আনন্দের অমৃতত্বের মন্ত্র। এ অধিকার তাদেরই হয় যারা জেগেছে, পেয়েছে বুকের অর্থাৎ বিশ্বসত্তার অধিষ্ঠাতৃদেব ভগবানকে।

(২৩-২৫) ছন্দগুলি মূলতঃ হল চেতনার গতিচ্ছন্দ বিশেষ স্পন্দ বিশেষ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের জন্য ব্যবহৃত। এবং এদের প্রধান ক্রিয়া হল নিম্নতর চেতনাকে উর্দ্ধতর চেতনায় উন্নীত করা। এখানে তিনটি কি চারটি ছন্দের কথা বলা হয়েছে—তিনটি পরিচিত, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ আর জগতী, আর একটি কিন্তু অপরিচিত "রথন্তর"। গায়ত্র বা গায়ত্রী ও জগতী দুইই মনে হয় চলা বা গতিশীলতা-দ্যোতক (গম্, গা-ধাতু)। তবে গায়ত্রীর হয়ত উর্দ্ধগতি, ত্রিধা লোক ভেদ করে, তাই এখানে ত্রিধা সমর্পণ, আহুতি—দেহ, প্রাণ, মন বা ভূর্ভুবঃস্বর্। আর জগৎ বা জগতীর প্রসারিত গতি, চারিপাশে, বিশালতা ও উচ্চতা এই ধারা। রথন্তর মনে হয় এক বিশেষ ছন্দ, এক গতি থেকে আর এক গতিকে নিয়ে যায় (রথ = গতি), যে দেয় আলোর প্রকাশ। ত্রিষ্টুভ মনে হয় স্থিতির, স্থাপনার, প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। উপলব্ধি বা সিদ্ধি লাভ করা প্রথমে, তারপর তাকে স্থির প্রতিষ্ঠ করে ধরা। ত্রিষ্টুভ —তিনটি লোকে প্রতিষ্ঠা।

বাহ্য ছন্দ, ছন্দের বাহ্য আকার মূল রূপক বা প্রতীক মাত্র—ঋগ্বেদে যেমন প্রকৃতির বাহ্যরূপ, বা তাৎকালিক সামাজিক ব্যবস্থা বা ঘটনা গ্রহণ করা হয়েছে আশ্রয় বা উদাহরণ রূপে। মন্ত্রের অর্থ যদি কেবলই এই বাহ্যরূপেরই মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা হয়, তবে

(২৬)

সহজে দোহনীয় এই ধেনুকে আমি আহ্বান করি এখানে—সুহস্ত দোহা দোহন করে একে।

স্রষ্টা সবিতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের কাছে পৌঁছে দেন। তপ্ততেজ-সমিদ্ধ—তারই উদ্দেশ্যে তাই আমি কথা কহি।

(২৭)

সকল ধনে ধনবতী বৎসকে আকাঙ্ক্ষা করে, মনের আগ্রহে, হিং-উচ্চারণ করে এলেন নিকটে—

অশ্বিদ্বয়ের জন্য তিনি যেন দুগ্ধ দান করেন,—অহন্তব্যা তিনি,—তাঁর অভিবৃদ্ধি হোক, মহৎ-আনন্দভোগ যেন দেখা দেয়।

(২৮)

গাভীর দিকে চেয়ে রয়েছে যে বৎস, গাভী তাকে পোষণ করে, হিংরবে তার দীর্ঘ গড়ে তোলে।

ফল হয় নিরর্থকতা। এই ২৮ সংখ্যা শ্লোক সেই জন্যই ব্যর্থ করেছে সকল টীকা-টিপ্পনী-কারকে। গায়ত্রী যদি হয় চেতনার সেই মূলস্পন্দ যা চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে চলে, ঊর্দ্ধায়িত করে ধরে, তাহলে তার প্রথম আকার বা রূপ হল ঋক্ (ঋক্, অর্চ একই কথা) বা যা প্রকাশ করে, আলো এনে দেয়, যা জ্যোতির্ময় এবং তেজোময়। ঋক্ নিয়ে যায় সামে—সামবেদ হল ঋগ্বেদের সংগীত-সারাংশ। জ্যোতির্ময়ের পরে হলময়, মধুময়, আনন্দময়, জ্যোতির ও রসের প্রথমে প্রকাশ বা আবির্ভাব, তারপর তাদের প্রতিষ্ঠা, স্থায়ী করে তোলা তিন প্রতিষ্ঠানে, ত্রিলোকে ত্রিকোণে—তারই নাম ত্রিষ্টুভ্। স্থায়ী হয়ে ছন্দ ও সুর গাঢ় স্থূল হলেই স্ফুট হয়, দেখা দেয় বাক হয়ে—অর্থাৎ চিন্ময় ছন্দ আকার নিয়ে ফুটে ওঠে। বলতে পার দুই লোকে প্রতিষ্ঠা অথবা চারিটি লোকে বা প্রতিষ্ঠানে—ইহ এবং অমুত্র উভয়তঃ—পরার্দ্ধ অপরার্দ্ধ, পুরুষ-প্রকৃতি, ঈশ্বর-ঈশ্বরী রূপ অথবা দেহ প্রাণ মন ও আত্মা এবং তৎসংশ্লিষ্ট লোকচতুষ্টয়রূপে। অপরার্দ্ধ বা আত্মাই অক্ষর, যার ক্ষয় নাই পরিবর্তন নাই।

(২৬-২৯) এ কয়েকটি শ্লোকে ধেনু-বৎসের চিত্র ও উপমা দেওয়া হয়েছে। ধেনু (গৌ) হল ঊর্দ্ধের চিন্ময় বৃহৎ জ্যোতি—তিনি মাতা অদিতিও বটেন। ঊর্দ্ধে তিনি মূর্ত্ত চিন্ময় সূর্য্যরূপে, নিম্নে তিনিই মৃন্ময় মাতা পৃথিবী রূপে। বৎস হল মানুষের মধ্যে নবজাত দিব্যচেতনা, ব্যক্তির জ্যোতির্ময় স্বরূপ। ঊর্দ্ধের চেতনা প্রথমে মনে প্রকাশ, তারপরে

তার মুখের তেজঃপুঞ্জকে আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে স্বরূপ নির্ম্মাণ করে দেয়, আপন আনন্দ-সার পান করায়।

(২৯)

এই যে বৎস আহ্বান করছে—সে এসে গাভীকে ঘিরে দাঁড়ান—নির্ম্মাত্রী নির্ম্মাণ করে, প্রপতনের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত সে—

বিবিধ জ্ঞানে সে মর্ত্ত্যকে অন্তরে তৈরী করে, প্রদীপ্ত হয়ে আপন রূপ সম্মুখে প্রকট করে।

(৩০)

শায়িত যখন তখন নিঃশ্বাস ফেলে চলে বেগে—আবার ধেয়ে চলে যখন তখন তার আবাসের মধ্যে অচল সে।

জীবন্ত যে সে আপন নিজধর্ম্মে মৃতকে ধরে চলে, অমর্ত্ত্য যে মর্ত্ত্যেরই সঙ্গে জনন তার।

(৩১)

আমি দেখলাম অস্খলিত-পদ রক্ষককে—তিনি এ-পারের এবং ও-পারের পথ বেয়ে চলেছেন

তিনি সঙ্গে চলেছেন, ঘিরে রয়েছেন, ভুবনসমূহের অন্তরে আবৃত হয়ে ঘুরে চলেছেন।

(৩২)

যে একে সৃষ্টি করেছে, সে একে জানে না যে একে দেখেছে তার থেকে বিচ্ছিন্ন সে হয়ে গিয়েছে (অন্তর্ধান করেছে)।

প্রাণে প্রকট প্রাণবেগই অশ্ব, এবং প্রাণপুরুষ হলেন অগ্নিন্। বাক্ দিব্যস্বরূপকে মাতারূপে জনন দেন ঊর্দ্ধস্থ চেতনা ; ধেনু বৎসকে লেহন করে যেমন গাত্র পরিষ্কৃত করে তোলে তেমনি ঊর্দ্ধের জ্যোতির্বর্ষণে স্বরূপ গ্রহণ করে মানুষের অন্তরাত্মা বৎসের মুখে দুগ্ধের ফেণপুঞ্জ হল যেন চিন্ময় তেজোরাশি বা অন্তরাত্মা আহরণ করে উত্তর চেতনা হতে। ঊর্দ্ধচেতনার পতন বা স্খলন নাই, আর সৃষ্টির ধারাই হল এক হিসাবে চেতনার প্রপতন, অবতরণ—সৃষ্টির উপরে পরাচেতনা।

(৩০-৩৩) এই পরাচেতনার স্বরূপ বলা হয় এখন। উপনিষদ পরে এর সুন্দর বুদ্ধিগ্রাহ্য করে ব্যাখ্যা দিয়েছে।

(৩২) ইহকে, জীবভূত প্রকৃতিকে, অপরাকে, সৃষ্টি করেছে পরা। সৃষ্টি অর্থ স্রষ্টার আত্মগোপন—চিন্ময় যে সে অ-চিৎ রূপে তার মধ্যে লুকিয়ে যায়। অচেতনার অজ্ঞানের মধ্যে

মাতৃগর্ভে আচ্ছন্ন সে—বহন জন্মের ভিতরে দিয়ে সে অজ্ঞান-অন্ধকারে প্রবেশ করেছে।

(৩৩)

দ্যুলোক আমার পালক, আমার জনক—নাভি হল এই এখানে যাতে বাঁধা আমি, আর মাতা হল এই বিশাল পৃথিবী।

উর্ধ্বমুখী দুটি পাত্রের মাঝখানে নিহিত গর্ভস্থান—এখানে পিতা তার দুহিতার গর্ভ বিধান করলেন।

(৩৪)

তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় পৃথিবীর অন্তিম অন্ত, জিজ্ঞাসা করি কোথায় ভুবনের নাভি—

আরো জিজ্ঞাসা করি, বল ত, পুরুষ-অশ্বের রেত কি? জিজ্ঞাসা করি বাক্-এর আশ্রয় কোন পরম ব্যোম?

(৩৫)

এই বেদি হল পৃথিবীর অন্তিম অন্ত, এই যজ্ঞই হল ভুবনের নাভি,

এই সোম হল পুরুষ অশ্বের রেত—আর ব্রহ্ম হল বাক্যের উর্দ্ধতম স্থিতি।

জন্ম-জন্মান্তরের ধারা হল মাতৃগর্ভ—এখানেই—এখান থেকেই সৃষ্টির নবজন্ম শুরু হয় দেবশিশুরূপে, চেতনার ক্রমবিকাশের ঊর্দ্ধায়নের পথে।

(৩৩) ঊর্দ্ধস্থ ও অধঃস্থ চেতনা হল পিতা ও মাতা। অধঃস্থ চেতনার স্থূল রূপ হল পৃথিবী, আর ঊর্দ্ধস্থ চেতনার প্রকট রূপ হল দ্যুলোক (মনোময় সত্তা)—দুটিই ঊর্দ্ধমুখী, কারণ, তাদের গতি ও সার্থকতা ঊর্দ্ধস্থ পরমপদে। এই দুয়ের সংযোগে জীবভূত চেতনা দিব্যব্যক্তিরূপ জন্ম গ্রহণ করে। নিম্নস্থ চেতনা এক হিসাবে ঊর্দ্ধ চেতনা হতে সৃষ্ট, তাই সে হল ঊর্দ্ধের দুহিতা।

(৩৪) জিজ্ঞাসু সাধকের জিজ্ঞাসা এই সব, কাব্যরসে অভিসিঞ্চিত।

(৩৫) সমস্ত সৃষ্টি পৃথিবীতে এসে শেষ হয়েছে, ঊর্দ্ধের অবতরণের ফলে সকল সার্থকতা সিদ্ধি এখানেই ব্যক্ত-রূপ স্থায়ী-আকার লাভ করে। আর সৃষ্টিকে ধরে আছে যে বিধি, যে সত্যং ঋতং, সত্য-ধর্ম, তা হল যজ্ঞ: যার মূল রহস্য হল, গীতার ভাষায়, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ—প্রত্যেকে প্রত্যেককে, উপর নীচকে, নীচ উপরকে পরস্পরের আত্মদানের ফলে চলে এক পরম সার্থকতায়। তা হল সোম=আনন্দময় অমৃতত্ব (অশ্ব হল অনির্ব্বাণ অজর প্রাণশক্তি) আর বাক=ব্রহ্ম=পরমের ছন্দময় উক্তি বা প্রকাশ।

(৩৬)

সপ্ত গর্ভার্ধ হল ভুবনের উৎপত্তিস্থল—বিষ্ণুর আদেশে তারা বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করে চলেছে।

প্রজ্ঞাবান তারা, তাদের ধীশক্তি দিয়ে মানসশক্তি দিয়ে সর্ব্বব্যাপী তারা সর্ব্বদিকে ঘিরে রূপগ্রহণ করে।

(৩৭)

এই বস্তু আমি, কি না, তা জানি না নিগূঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে, মনকে আশ্রয় করে আমি বিচরণ করি।

যখন আমি ফিরে আসব, যখন সত্যের প্রথম-জাত আমাকে গ্রহণ করবে, তখন তার বাঙ্ময় প্রকাশের আনন্দ ভোগ হবে আমার।

(৩৮)

স্বধর্ম্মের বলে নীচ চলে উর্দ্ধে—অমর্ত্য মর্ত্যের সঙ্গে একই গর্ভে।

উভয়ে তারা শাশ্বত, তারা বিভিন্ন দিকে ঘুরে চলে, এক অন্যকে জানে অন্তরে, অন্যে কিন্তু জানে না অপরকে অন্তরে।

(৩৯)

ঋকমন্ত্রে রয়েছে যে পরম ব্যোম, তাতে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত,

তাকে যে না জানে, সে ঋকমন্ত্র দিয়ে কি করবে? যারা জানে, এই তারাই দেবতাদের সঙ্গে সমাসীন।

(৪০)

যবশস্যের কল্যাণে তোমার হয় যেন সুভোগ, আমাদেরও হয় যেন সুভোগ।

হে অনহনীয়া। চিরকাল ধরে তুমি কর তৃণভক্ষণ আর সর্ব্বত্র বিচরণ করে পান কর শুদ্ধ উদক।

(৩৬-৩৯) এখানেও বলা হয়েছে পরম, পরম ব্যোম, অক্ষর অর্থাৎ পরাৎপরের কথা —তারই প্রথম প্রকাশ হল সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু, সর্ব্বব্যাপী বিশ্ব-দেবতা। বিষ্ণুর গর্ভার্দ্ধ থেকে বিশ্বসৃষ্টি; অপরার্দ্ধ পরার্দ্ধে বিশ্বাতীতে নিহিত।

(৪০) এই ধেনু যে সাধারণ বস্তুটি নয়, তা পরবর্ত্তী দু-তিনটি শ্লোকে দেখান হয়েছে। এই জ্যোতির্ম্ময়ী চেতনাকে বলা হয়েছে এই পৃথিবীর রসে পরিপুষ্ট হতে, এই এখানে অক্ষত থেকে বিরাজ করতে।

(৪১)

গৌরবর্ণা ভক্ষণ করে চলেন, রূপ-দান করেন সকল সলিল ধারাকে—তিনি একপদী, দ্বিপদী, তিনিই চতুষ্পদী ;

আবার অষ্টাপদী নবপদী তিনিই এবং পরমে ব্যোমে তিনিই সহস্রাক্ষরা।

(৪২)

তাঁর হতে সপ্তরশ্মি প্রবাহিত হয়েছে সকলের উপরে, সকলকে ঘিরে, তাঁকে ধরেই জীবন ধারণ করে চতুর্দ্দিক ;

তাঁরই থেকে অক্ষর ক্ষরিত হয়, তাঁকে ধরেই বিশ্ব সব জীবন ধারন করে

(৪৩)

আমি দেখলাম অতি দূরে শুরু ধূম—নীচে থেকে সে ঢেকে রয়েছে উপরকে ;

বর্ষণরত বিচিত্রবর্ণ সবকে বীরবৃন্দ পাচন করে—তারাই হল আদি ধর্ম্ম সব।

(৪৪)

দীপ্তিময় তিনজন কালক্রমে পর্য্যবেক্ষণ করে চলেন—তাঁদের একজন সম্বৎসরে বীজ বপন করেন,

আর একজন তাঁর রশ্মিরেখা দিয়ে বিশ্বকে কর্ম্মরত করেন, আর এক জনের গতির প্রকোপ দেখি, কিন্তু রূপ দেখি না।

---

(৪১) গৌরবর্ণা, কারণ জ্যোতির্ম্ময় ; তিনি শুধু আলো নয়, তিনি শক্তি, তাই স্বরূপ দান করেন সত্যের বিভিন্ন প্রকারকে। সলিল হল সত্যের, চেতনার ধারা। সত্যের নানা স্থিতি ; উর্দ্ধতন স্থিতি হল একমাদ্বৈতম্। এই একম্-এর মধ্যেই বিশ্বসৃষ্টি নিহিত তাই সে সহস্রাক্ষরা এই উভয়ের মধ্যে তার নানা রূপায়ণ। তাছাড়া, পরা-চেতনা আবার আদিস্পন্দ, আদিবাক্ তাই তার ছন্দের প্রকাশ বাক্যে, রূপায়িত ধ্বনি অর্থাৎ অক্ষরে মন্ত্রের বিবিধ আকারে।

(৪২) সপ্তরশ্মি, চেতনার সপ্ত সমুদ্র বলা হয়। জ্যোতির্ম্ময়ী চিৎশক্তি থেকেই পরব্রহ্মের প্রকাশ, অক্ষরের ক্ষরণ।

(৪৩) ধূম হল নীচের অজ্ঞান, অচিতি—উপরের প্রকাশ ঢেকে রাখে তাতে। বীর হল আদিসত্যের শক্তি সব, ঋতং ; এদের আশ্রয় করে এই এখানে উর্দ্ধের বিবিধ বিচিত্র প্রকাশ।

(৪৪) প্রথম ঋকের তিনটি দেবতাকে এখানে আবার আহ্বান করা হয়েছে;

(৪৫)

বাক্ চারিটি পদে বিভক্ত। যাঁরা মনীষী, যাঁরা ব্রহ্মবিদ তাঁরা জানেন এদের।
তিনটি গুহার মধ্যে নিহিত, তাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, চতুর্থ বাক্ বলে মানুষেরা।

(৪৬)

দিব্য পুরুষ যিনি, প্রসারিত-সুবর্ণপক্ষ বিহঙ্গ যিনি, তাঁকেই বলা হয় ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি ;
সৎবস্তু একই, তাকে নানা ভাবে বলা হয়, বলা হয় অগ্নি-যম-মাতরিশ্বা।

(৪৭)

সুবর্ণপক্ষ রশ্মিকূল, বিহঙ্গের মত, জলস্রোতের রূপ ধারণ করে, কৃষ্ণ পথ বেয়ে দ্যুলোকে উঠে চলে।
তারা ফিরে আসে সত্যের আসন হতে, তপ্ত তেজে পৃথিবীকে ঊর্ধ্বের প্রসারে ঠেলে নিয়ে চলে।

(৪৮)

দ্বাদশটি শলাকা, একই চক্র, তিনটি নাভি। কে জানে একথা ?
তার মধ্যে একসঙ্গে তিনশত ষাটটি সচল ও অচল কীলক সংবদ্ধ।

তাদের পার্থিব আকারে তারা অগ্নি, সূর্য্য আর বায়ু। অগ্নি পৃথিবীর জ্যেষ্ঠ, অগ্নি জলে জড়ের মধ্যে অগ্নি হল স্থূল চেতনার অন্তরে আত্মা নূতন জন্মের নূতন সৃষ্টির বীজ, এখানে।

(৪৫) বাক্ চাররূপে পরিচিত—স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম : তাদের নাম দেওয়া হয়, বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী, পরা। বৈখরী মানুষী ভাষা, মধ্যমা হল প্রাণময়, মনোময়, অন্তরিক্ষ লোকের। পশ্যন্তী হল দিব্য-দৃষ্টিময় উত্তর-মানস লোকের আর পরা হল ব্রহ্মবাক্।

(৪৬) বিখ্যাত ঋক্, অদ্বৈত একত্বের।

(৪৭) চেতনার ঊর্দ্ধায়ন ও অবতরণের রহস্য, আমরা বলেছি ইতিপূর্ব্বে। কৃষ্ণ পথ, কারণ প্রথমে অজ্ঞানের ভিতর দিয়ে চলে যেতে হয়।

(৪৮) সত্যচেতনার রূপকে বাহ্যসূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—সূর্য্য এক চক্র, অখণ্ড মণ্ডলাকার ; দ্বাদশ শলাকা হল দ্বাদশ মাস ; তিনটি নাভিকে ব্যাখ্যা করা হয় তিনটি

(৪৯)

তোমার শাশ্বত স্তন সুখের আকর, তাকে দিয়ে বিশ্বের বরণীয় বস্তু সব তুমি পোষণ কর।

আনন্দসম্পদ সে স্থাপন করে, বিত্ত আবিষ্কার করে, দাতৃশ্রেষ্ঠ সে, তাকে, হে সরস্বতী, এখানে স্থায়ী করে রাখ।

(৫০)

দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেন—এই সবই আদি-ধর্ম।
এ সব মহিমা স্বর্গের সঙ্গে যুক্ত, যেখানে আসীন প্রাচীন সাধনীয় দেববৃন্দ।

(৫১)

এই জলধারা দিনে দিনে সবানে উর্দ্ধে চলে, নীচে নামে,
পর্বতকে জয় করে ভূমি, অগ্নিকে জয় করে দ্যুলোক।

(৫২)

সুবর্ণপক্ষ বৃহৎ দিব্য বিহঙ্গ, জলরাশির উৎস, ওষধিসমূহের স্রষ্টা, চারিদিকে বর্ষণ করে সে তৃপ্তি দান করে—চিরগতিমান সে, তাকে আমি আহ্বান করি রক্ষণের জন্য।

যুগল ঋতু দিয়ে। কিন্তু কেন? আসলে এ তিন নাভি নীচের তিনটি লোকসত্তা, অপরার্ধে ত্রিপুটি দেহ-প্রাণ-মন। তিন শ ষাট দিনে এক বৎসর—সচল অচল কেন বলা হল? দিনে সূর্যে গতিমান, রাত্রিতে তিনি যেন অচল, নিষ্ক্রিয়। আলো-অন্ধকারের বৈরূপ্যের ভিতর দিয়ে চেতনার অগ্রগতি।

(৪৯) সূর্য। শুধু জ্যোতির্ময় নয়, গোরূপে সে আবার আনন্দময়, ভোগময়। সরস্বতী চলিষ্ণু চেতনা, ক্রমবর্ধমান জ্ঞানধারা।

(৫০) যজ্ঞ ও যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ দেববৃন্দ—সৃষ্টির রহস্য এখানে।

(৫১) উপরের চেতনা অবতরণ করে নীচের স্থিতিকে শুদ্ধ উন্নত করে ধরে, আর নীচের চেতনা আস্পৃহা উর্দ্ধে উঠে প্রবেশ করে দেবতাদের লোকে।

(৫২) ওষধি হল পৃথিবীর উদ্যান সব—পার্থিব স্থিতি হতে উত্থিত জীবন্ত অঙ্কুর সব।

"One who has given himself to the Divine has no longer any other duty than to make that consecration more and more perfect."

The Mother

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

Eastern Carrying Company (P) Ltd.

(Transport Contractors)

Daily Service to West Bengal Towns
Bihar, U. P. and Nagpur

29, Waterloo Street,
CALCUTTA-1

Phone 23-1944
33-8558

Troubled by insects ? ?

If so, please do not hesitate to make use of our
up-to-date scientific and efficient servicing arrangements
by specially trained staff for completely
disinfecting your premises with :

I.C.I.'s " GAMMEXANE " FORMULATIONS

Eastern Insecticide & General Merchandise Pr. Ltd.

(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)

4, Lyons Range
CALCUTTA-1

Open thy eyes and see what the world really is and what GOD; have done with vain and pleasant imaginations.

—*Sri Aurobindo*

NATIONAL GENERAL TRADING

19, STRAND ROAD
CALCUTTA-1.

GRAM: DONWEL

PHONE: 22-3577
35-3314

It's Spencer's

Spen Orange

at home or in a party this invigorating and refreshing drink is sheer delight.

SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14

PHONE 31-2665 GRAM : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET, CALCUTTA—1

Beauty shall walk celestial on the earth,
Delight shall sleep in the cloud-net of her hair
And in her body as on his homing tree
Immortal Love shall beat his glorious wings.

Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

-The Mother

With compliments from:-

Tata Scob Dealers (Controlled Stock) Cal. Ltd.,

20, Strand Road,

CALCUTTA-1.

Telephone : **22-1101-1107** *Telegram :* **TASCOB**

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

Always keep in touch with the divine presence, try to bring it down—and the very best will always take place.

The Mother

Independence Transport & Shipping Agency,
P. 40, Princep Street,
CALCUTTA-13.

Phone : **23-6503**

Cable : **ITSACINCH**

"Having realised infinite unity in ourselves, then to give ourselves to the world is utter freedom and absolute empire."

—*Sri Aurobindo*

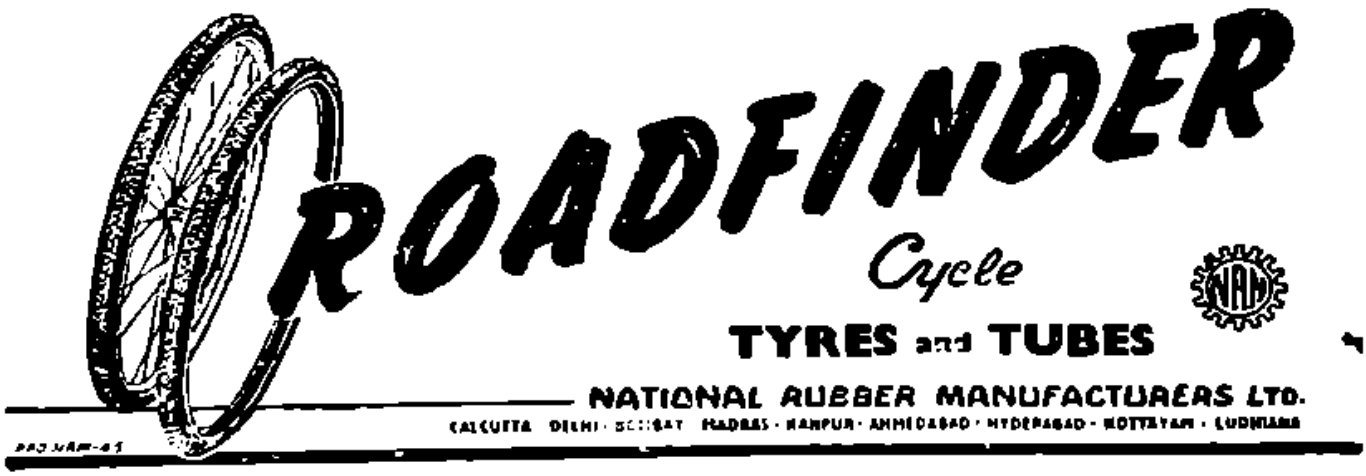

".....it is much more important for us to fix our attention upon what we want to become than upon what we have been."

The Mother

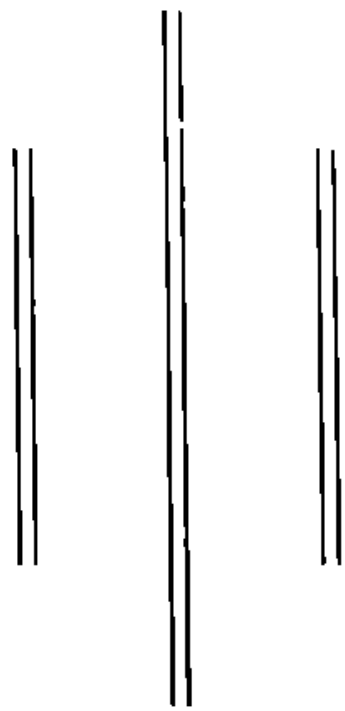

BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

To know how to wait is to put time on your side.

-The Mother

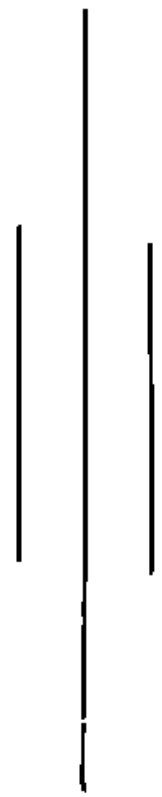

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

We should be in no other service but in God's alone.

-The Mother

For all sorts of glasses for Buildings, Furniture and Cars, please send your enquiry to :—

B. K. SHAW & CO.,

P - 20, Radha Bazar Street,
CALCUTTA - 1

Cable : BIKEGLAS

Phone : 225613

Telegrams: 'Vessel' Cal
Codes { Scott's 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office 23-1398
Dock Office:
Residence: { 55-6464, 55-3724, 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

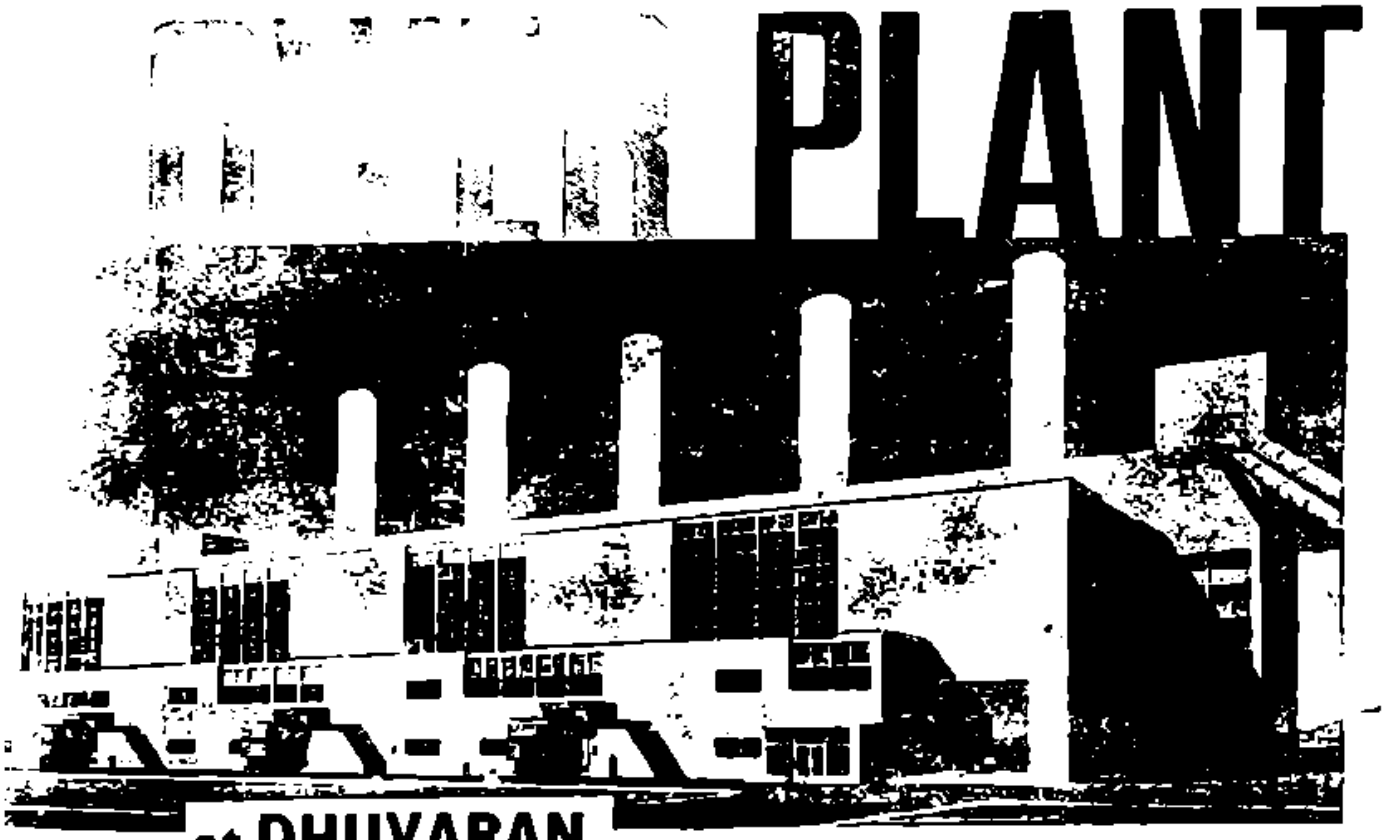

PLANT

at DHUVARAN promise of plenty for GUJARAT

In about two years' time, at the small village of Dhuvaran, near the confluence of the river Mahi and the Gulf of Cambay, a fine project of Gujarat will materialise. The Rs 250-million thermal power plant, with its four turbo-generators, will feed the power hungry industries of Gujarat with 250 mw of motive power. As at Bokaro, Barauni and Bandel, Delhi and Durgapur, the Kuljian Corporation, with its world-wide experience of power-engineering, is already there helping the State of Gujarat build this key power project.

The **Kuljian** *Corporation*

engineers . constructors

1200, NORTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, U.S.A.

India Office : 24-B, Park Street, Calcutta-16

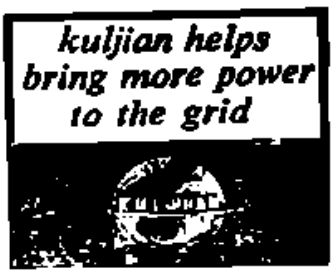

Design • Engineering • Procurement • Construction • Re, • Initial Operation

সরিষার তৈল

১, ২, ৪ ও ১৬।০ কে. জি. টিন এবং ৪০ কে. জি. শীল করা ড্রামে পাওয়া যায়।

এখন হইতে ৫০০ গ্রাম শীল করা বোতলেও পাওয়া যায়।

গণেশ
সরিষার তৈল

প্রাগ অয়েল মিল্স · আলীগড়।

12 MAR 1963

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি	শ্রীকানাই গুহ	৩৲
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীশচিন্দ্রলাল রায়	৪৲
কবিমনীষী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫।০
রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)		৩।০
সাধনার জীবন	শ্রীদমীরকান্ত গুপ্ত	৯৲

: শ্রীঅরবিন্দ :

বিবিধ রচনা

মূল বাংলায় লেখা পুরাতন খাতাপত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রথম মুদ্রিত

মূল্য ১৲

ভারতের একতা	১৷০
কর্ম্মযোগী	১৷০
জগন্নাথের রথ	১৲
গীতার ভূমিকা	২৲
শ্রীঅরবিন্দের পত্র	১৲
পত্রাবলী	১৷০

: শ্রীমা :

উত্তম রহস্য

[একাঙ্ক নাটিকা]

রাজনীতিজ্ঞ, লেখক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার দু'জনের ছয়টি আত্ম-কাহিনী ও তার উপসংহার

মূল্য ১৲

ছোটদের গল্প	১৷০
পুরাণো লেখা	১৷০
শিক্ষা	১৷০
মায়ের আলাপ	২৷০

মিথা-জীবন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম খণ্ড ৮৲ ; ২য় খণ্ড ১৪৲

1. Loving Homage Rs. 10/-
2. The Golden Book of The Mother ,, 100/- (De Luxe Edn.)
   60/- (Ord. Edn.)

বর্তিকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

২৪শে এপ্রিল, ১৯৬৩

বর্ষ —২৩ সংখ্যা—২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৩)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

১। চিঠাবলি ও সুবাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২। বৈদিক সংগীত	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৬
৩। আমার ফুটবল খেলা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১০
৪। বাংলার উত্তীরণ	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
৫। মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৩২
৬। প্রশ্নোত্তর	শ্রীমা	৩১
৭। যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	৩৪
৮। দৃঢ়সমর্থ ও আঁটসাট হলপেট	তারা অহর	৬৮

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

২৪ এপ্রিল ১৯৬৩

জীব যায় জীব-জননীর কাছে তার সকল কামনা, সকল বিপত্তির মাঝে—জীব-জননীর ইচ্ছাও তাই, কারণ তিনি চান যাতে তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা ঢেলে দিতে পারেন। জীব জীব-জননীর দিকে ফিরে চায়—কারণ তাঁর ভালবাসা স্বভাবতই স্বয়ম্‌প্রতিষ্ঠ, আর তাতে দেখিয়ে দেয় কোথায় আমাদের নিজের ঘর যেখানে ফিরে পৌঁছিতে আমরা উৎসুক, পৃথিবীতে আমাদের সকল পরিভ্রমণের পরে, মায়ের সেই বুকখানি যেখানে পাব আমরা শান্তি।

শ্রীঅরবিন্দ

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

ভক্তি

তোমার চেষ্টা সফল হয়েছে কি, হে অসুররাজ? রাবণ কি হিরণ্যকশিপুর মত তুমি আসনে বসে আছ, যার দেবতারা এবং জগদীশ্বর পর্যন্ত তোমার সেবা করছে? তা হলে, তোমার অন্তঃপুরুষ যে-বস্তুর শিকারে ঘুরে করে চলেছিল তা তোমার হারিয়ে গিয়েছে।

*

রাবণের মন বুঝেছিল সে চায় রামের উপর বিজয় এবং বিশ্ব-আধিপত্য। কিন্তু তার অন্তরাত্মার দৃষ্টি সদা-সর্ব্বদা নিবদ্ধ ছিল এই লক্ষ্যে যাতে যথা-সম্ভব শীঘ্র সে স্বর্গে ফিরে যেতে পারে, আবার হতে পারে ভগবানের দাসানুদাস। তাই ত সবচেয়ে হ্রস্বপথ বেছে নিয়ে সে শত্রুতার উন্মত্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবার জন্য ভগবানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

*

আনন্দের পরাকাষ্ঠা হল নারদের মত ভগবানের ক্রীতদাস হয়ে থাকা, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট নরক হ'ল ভগবানের ত্যাগী হয়ে জগতের অধীশ্বর হওয়া। অজ্ঞানীর মনে হয় ভগবান সম্বন্ধে তার যে ধারণা সবচেয়ে বেশি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, ঠিক তাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি দূরে।

*

ভগবানের সেবক কিছু বটে, ভগবানের দাস আরো বেশি।

*

জগতের অধীশ্বর হওয়া নিশ্চয় পরম আনন্দের, যদি বিশ্বের প্রিয়পাত্র হয়ে থাক— কিন্তু সে জন্যে সঙ্গে সঙ্গে সকল মানবজাতির আবার দাসও হওয়া দরকার।

*

ভগবানকে যে সুদীর্ঘ সেবা করেছে, যদি হিসাব করে দেখ তার যোগফল, তবে আবিষ্কার করবে যে তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ ছিল মানবজাতিকে ভালবেসে তুমি যতটুকু তাদ্দাচোরা যৎকিঞ্চিৎ উপকার তার করতে পেরেছিলে।

*

*

ভগবান তাঁর সেবকের দুটি কাজে সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, এক তাঁর মন্দিরের অঙ্গন ঝাঁট দেওয়া নীরব ভক্তিতে আর নয় বিশ্বের, জগতের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা, মানবজাতির মধ্যে তাঁর দিব্য সিদ্ধির জন্য।

*

মানুষের অতি যৎকিঞ্চিৎ উপকার যে করতে পেরেছে, সে যদি অতি নিকৃষ্ট পাপীও হয়, তবু তাকে ভগবান গ্রহণ করে থাকেন তাঁর ভক্তদের সেবকদের পঙক্তিতে—সে শাশ্বতের সাক্ষাৎ দর্শন পাবে।

*

নিজের দুর্বলতায় বিন্দু তুমি, ভগবানের মুখে তোমার বিহ্বলতার, ভীতির অবগুণ্ঠন পরিয়ে দিওনা, আর্তের ভিক্ষুকের দুর্বলতা নিয়ে তাঁর কাছে এস না। চেয়ে দেখ। তাঁর মুখে তুমি রাজার বিচারকের নিষ্ঠুর গাম্ভীর্য্য দেখবে না, দেখবে প্রেমিকের হাসি।

*

যতদিন তুমি শিখবে না কুস্তিগীর যেমন তার সাথীর সঙ্গে বলযুদ্ধ করে, সে রকমে ভগবানের সঙ্গে লড়াই করতে, ততদিন তোমার অন্তরাত্মার সামর্থ্য ভগবানের থেকে দূরে ঢাকাই রয়ে যাবে।

*

শুম্ভ প্রথমে কালীকে ভালবাসল দেহ-প্রাণ দিয়ে, তারপর সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, যুদ্ধ করল, শেষে হল জয়ী, চুলে ধরে তাঁকে স্বর্গে তিনবার চারিদিকে ঘুরিয়ে নিল, পরমুহূর্তেই নিহত হ'ল কালীর হাতে। অন্তরের অমরত্বলাভের এই হল চতুষ্পাদ—সর্বশেষটি হল দীর্ঘতম ও দুরূহতম।

*

কালী হলেন কৃষ্ণ, রুদ্রশক্তি আর ক্রুদ্ধ প্রেমের মূর্ত্তিতে। কালী তাঁর রুষ্ট আঘাতে নিহত করেন দেহগত, প্রাণগত, মনোগত পুরুষকে—যাতে মুক্তি দিতে পারেন শাশ্বত অধ্যাত্মপুরুষকে।

*

আমাদের আদি মাতা-পিতার পতন হয়েছিল—(সেমিটিক জাতির রূপক কাহিনী অনুসারে)—কারণ তারা পাপ-পুণ্যের গাছ থেকে ফল খেয়েছিল—কিন্তু সেই সঙ্গে তারা যদি শাশ্বত জীবনের গাছ থেকে ফল আস্বাদন করত, তবে তারা তাদের অব্যবহিত কর্ম্মফল থেকে উদ্ধার পেত। কিন্তু তা হলে মানবজাতিকে নিয়ে ভগবানের যে উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হত। তাঁর রুদ্রভাব আমাদের চিরন্তন সুযোগ।

*

নরক বলে যদি কিছু সম্ভব হয়, তবে তাই উর্দ্ধতন স্বর্গে উঠবার হ্রস্বতম পথ। কারণ ভগবান সত্যই ভালবাসেন।

*

ভগবান আমাদের তাড়িয়ে দেন প্রত্যেক স্বর্গ হতে, যাতে আমরা মরুভূ পার হয়ে চলে পারি স্বর্গতর স্বর্গে। যদি তোমার বিস্ময় লাগে কেন ঐ রকম রুক্ষ রুঢ় পথযাত্রা প্রয়োজন, তার অর্থ তোমার মন তোমাকে মুঢ় করেছে, তুমি দেখ নাই পিছনে তোমার অন্তরাত্মাকে, বোঝ নাই তার অস্পষ্ট বাসনা, তার গোপন পুলক।

*

সুস্থ মন বেদনাকে ঘৃণা করে। বেদনালাভের জন্য মানুষের সময়ে সময়ে মনে যে ইচ্ছা জাগে তা হল রোগের চিহ্ন, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ তা। কিন্তু অন্তঃপুরুষ মনের বা মনের কষ্টের তোয়াক্কা রাখে না, যেমন কামারের তোয়াক্কা নাই উনুনের মধ্যে যে ধাতুখণ্ড তার বেদনায়। অন্তঃপুরুষ চলে তার নিজের প্রয়োজন, নিজের ক্ষুধা অনুসারে।

*

বিনা বিচারে দয়া চরিত্রের মহত্তম ধারা এক। কোন জীবিতসত্তাকে কোন রকম একটুও আঘাত না করা হল মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম—কিন্তু ভগবান এ দুটির একটি কাজও করেন না। তাই বলে সর্ব্বপ্রেমময় থেকে মানুষ কি মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর?

*

মানুষী করুণার সবচেয়ে তিক্ততম অভিজ্ঞতা একটি হল এই যে কোন মানুষকে তার দৈহিক বা মানসিক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করা তার দেহের, মনের বা অন্তরাত্মার পক্ষে সব সময়ে কল্যাণকর নয়।

*

মানুষী দয়া জন্মে অজ্ঞান আর দুর্ব্বলতা থেকে—তা হল আবেগময় অনুভবের দাস। ভাগবতী করুণা বোঝে, বিবেচনা করে, উদ্ধার করে।

*

দয়া অনেক সময়ে ভালবাসার বিকল্প—কিন্তু ঐ বিকল্প মাত্র। স্থান গ্রহণ করে—কিন্তু ঐ স্থান গ্রহণ করে মাত্র।

*

আত্মদয়া জন্মে আত্মপ্রীতি হতে সব-সময়ে—কিন্তু অপরের উপর দয়া সব-সময় তাদের উপর প্রীতি হতে জন্মে না। কখনও তা হল দুঃখের দৃশ্য থেকে একটা আত্ম-সংকোচন—আবার কখনও বা তা হল ধনীর গরীবকে অবজ্ঞাভরে ভিক্ষাদান। অনুশীলন কর ভগবৎ-করুণা, মানুষী দয়া নয়।

*

দয়া নয়,—তা হৃদয়কে ক্ষুণ্ণ করে, আত্মার অঙ্গকে দুর্বল করে—পরন্তু এক ভাগবতী করুণা ও সহায়কতা, যা সর্ব্বশক্তিময়, অনুদ্বিগ্ন—এই গুণটিকেই পরিপোষণ করতে হবে আমাদের।

■

মানুষকে ভালবাস, সেবা কর—কিন্তু সাবধান, পদের প্রশংসার কামনা করবে না। বরং অন্তরস্থ ভগবানের অনুগত হয়ে চল।

■

ভগবানের, তাঁর দেবতাদের বাণী শ্রবণ না করাই জগতের মতে সুস্থ মনের লক্ষণ। *

—

* Thoughts and Aphorisms থেকে। অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ঋগ্বেদ

দশম মণ্ডল—একপঞ্চাশৎ সূক্ত

মহৎতদূষুং স্থবিরং তদাসী তেনাবিষ্টিতঃ প্রবিবেশিথাপঃ।
বিশ্বা অপশ্যদ্বহুধা তে অগ্নে জাতবেদস্তন্বো দেব একঃ ॥ ১ ॥

কো মা দদর্শ কতমঃ স দেবো যো মে তন্বো বহুধা পর্যাপশ্যৎ।
কাহ মিত্রাবরুণা ক্ষিয়ন্তা অগ্নের্বিশ্বাঃ সমিধো দেবযানীঃ ॥ ২ ॥

ঐচ্ছাম ত্বা বহুধা জাতবেদঃ প্রবিষ্টমগ্নে অপ্সু ওষধীষু।
তং বা যমো অচিকেচ্চিত্রভানো দশাস্তরুষ্যাদধিরোচমানম্ ॥ ৩ ॥

হোত্রাদহং বরুণ বিত্তাদায় নেদেব মা যুনজন্নত্র দেবাঃ।
তস্য মে তন্বো বহুধা নিবিষ্টা এতমর্থং ন চিকেতাহমগ্নিঃ ॥ ৪ ॥

এহি মনুর্দেববুর্যজ্ঞকামোঽ রঙ্কৃতা তমসি ক্ষেষ্যগ্নে।
সুগান্ পথঃ কৃণুহি দেবযান্ বাহ হব্যানি সুমনস্যমানঃ ॥ ৫ ॥

অগ্নেঃ পূর্বে ভ্রাতরো অর্থমেতং রথীবাধ্বানমবাবরীবুঃ।
তস্মাদ্বিষো বরুণ দূরমায়ং গৌরো ন ক্ষেপ্নোরবিজে জ্যায়াঃ ॥ ৬ ॥

কুর্ম্মস্ত আয়ুরজরং যদগ্নে যথা যুক্তো জাতবেদো ন রিষ্যাঃ।
অথা বহাসি সুমনস্যমানো ভাগং দেবেভ্যো হবিষঃ সুজাত ॥ ৭ ॥

প্রব্রাজান্মে অনুযাজাংশ্চ কেবলা নূর্জস্বন্তং হবিষো দত্ত ভাগং।
ঘৃতং চাপাং পুরুষং চৌষধীনা মগ্নেশ্চ দীর্ঘমায়ুরস্তু দেবাঃ ॥ ৮ ॥

তব প্রাযাজা অনুযাজাশ্চ কেবল ঊর্জস্বন্তো হবিষঃ সন্তু ভাগাঃ।
তবাগ্নে যজ্ঞোঽয়মস্তু সর্ব্ব স্তুভং নমন্তাং প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৯ ॥

বৈদিক সংলাপ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দেববৃন্দ, অগ্নি

দেববৃন্দ

বিপুল কঠিন আবরণে নিজেকে জড়িয়ে তুমি প্রবেশ করেছ জলরাশিগর্ভে।

হে জাতবেদা! তোমার জন্মকথা তুমি ত' জান। তোমার যে বহুল বিশ্বতনু তাকে দেখেছে অদ্বিতীয় আদিদেব। ১

অগ্নি

কে আমাকে দেখেছে? কোন সে দেবতা আমার বহুবিধ দেহপ্রসারকে সমগ্রভাবে দেখেছে?

হে মিত্রবরুণ! দেবমুখী অগ্নির সন্নিধ কে-সব, কোথায় তাদের নিবাস? ২

দেববৃন্দ

হে জাতবেদস্! জলরাশির মধ্যে, উদ্ভিদের মধ্যে বহু আকারে তুমি নিগূঢ় রয়েছ, তোমাকেই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি।

তোমার জ্যোতি বহুবিচিত্র—কিন্তু যম-দেব তোমাকে দেখেছে, দশস্যানের* ভিতর থেকে যখন তুমি সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলে। ৩

অগ্নি

হে বরুণ দেব! হোতা হতে হবে, এই ভয়ে আমি চলে এসেছি, আমাকে এ কাজে নিযুক্ত করবে না।

---

* দশস্যান—সম্ভবতঃ পঞ্চভূত বা পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণের বা দশবিধ অর্থাৎ সর্বত্র।

এই কারণেই আমার দেহ বহধা-বিভক্ত হয়ে লুকিয়ে পড়েছে, অগ্নি যাতে না জানতে পারে তাকেই এ কাজ করতে হবে। ৪

দেববৃন্দ

এস তুমি। অগ্নিদেব! মনোময় জীব যজ্ঞমুখী হয়েছে, সব প্রস্তুত করেছে—তুমি রয়েছ তবু অন্ধকার গহ্বরে।

দেবযানী পথ সুগম করে তোল তুমি—মনকে সম্যক তৈরী করে এখন হব্য বহন কর কর। ৫

অগ্নি

অগ্নির পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রাতা সকলেও এই পথে চলে এসেছিল, রথী যেমন চলে রথ বেয়ে—

তাই, হে বরুণ, ভয়ে আমি দূরে চলে এসেছি—বৃগ যেমন ধনুকে তীর দেখে কম্পিত হতে থাকে। ৬

দেববৃন্দ

তোমার আয়ুকে আমরা অক্ষয় করে তুলব, যাতে কর্ম্মে নিযুক্ত হলে তোমাকে বাধিত না হতে হয়।

সুজাত তুমি, সুমনা হয়ে দেবতাদের হবির ভাগ বহন করে চল। ৭

অগ্নি

যজ্ঞের পূর্ব্বে, যজ্ঞের পরে, যজ্ঞের নিজস্ব যা, যা বীর্য্যময় সেই সব হবি-ভাগ দাও আমাকে—হে দেবকুল। দাও আমাকে জলধারার মধ্যে যে তপ্ততেজ, উদ্ভিজ্জের মধ্যে যে চিন্ময় সত্তা, দাও দীর্ঘ জীবনীশক্তি। ৮

দেববৃন্দ

যজ্ঞের পূর্ব্বে যজ্ঞের পরে, যজ্ঞের নিজস্ব যা, যা বীর্য্যময়, সেই সব হবি-ভাগ হোক তোমার—এই যজ্ঞ সর্ব্বদা তোমারি হোক—দিকচতুষ্টয় তোমার কাছে প্রণত। ৯

তাৎপর্য

যজ্ঞ আরম্ভ করতে হবে—সব প্রস্তুত—আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু অগ্নি কোথায় —অগ্নি না হলে ত যজ্ঞ হয় না? দেবতারা উপস্থিত—তাদের যজ্ঞের ভাগ আছে—কিন্তু সর্ব্বাগ্রে অগ্নির প্রয়োজন। কিন্তু এ দেবতাটিকে পাওয়া যাচ্ছে না? ছুটল দেবতারা এদিকে ওদিক অগ্নির অন্বেষণে। ছুটল বরুণদেব, মিত্রদেব, যমদেব—অবশেষে এঁরা আবিষ্কার করলেন পলাতক দেবতাকে। সত্যই অগ্নি পলায়ন করেছিল—দেখা গেল সে আপাদমস্তক বিপুল দৃঢ় আবেষ্টনে নিজেকে মুড়ে লুকিয়ে আছে—জলরাশির নীচে। দেবতারা তাকে উঠে এসে তার কাজ আরম্ভ করতে বললে, সে উত্তর করলে, ঐ ভয়েই ত পালিয়ে এসেছে, ও-কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়—তাকে রেহাই দিতে হবে—তার আগে আরও বড় বড় দেবতারা এ কাজ চেষ্টা করেছে, তারাই সক্ষম হয়নি, সে কি করে পারবে তা হলে। দেবতারা তাকে অনেক বুঝিয়ে বললে, সাহস দিলে, লোভ দেখালে—যজ্ঞের ফল অমর আয়ু—অনেক সাধ্য-সাধনার পর অগ্নি উঠে এসে যজ্ঞ সুরু করল।

এ কাহিনী অর্থাৎ রূপকের অর্থ কি?

অগ্নি হল সৃষ্টির, স্থূল সৃষ্টির অন্তরে ভাগবত তপঃশক্তি। মর্ত্ত্য মানুষের মধ্যে অমর্ত্ত্য আস্পৃহা। সৃষ্টি হল জড়ের, দেহের আবির্ভাব—জড়ের মধ্যে, জড়রূপে তপঃশক্তির আত্ম-গোপন। ঊর্দ্ধতর অন্তরতম প্রদেশে যে সত্তা ও শক্তি এক অবিভাজ্য, সৃষ্টির অর্থাৎ বহিরাগমনের ফলে স্থূলে তা বিভক্ত বিশ্লিষ্ট হয়ে চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সর্ব্বত্র—মৃত সতীদেহের মত। তবুও এই প্রত্যেক চূর্ণ জড়খণ্ডে জাগ্রত রয়েছে সেই অনির্ব্বাণ শিখা। উপনিষদেও পাই এই সত্যের প্রতিধ্বনি—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব

একই অগ্নি যখন সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করল, তখন রূপে রূপে নানারূপ সে হয়ে পড়ল।

জড়ের নিরেট অন্তরে, নিশ্চেতনার বিজন গহ্বরে অগ্নি লুকিয়ে আছে বটে কিন্তু তার ব্রত ত তাকে ভুললে চলবে না। দেবতারা এসেছে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে।

অগ্নির ব্রত হল দেবতাদের কাছে যজ্ঞের হবিভাগ পৌঁছে দেওয়া। এ ব্যাপারটি কি? যজ্ঞ অর্থ উৎসর্গ, ঊর্দ্ধতর চেতনার কাছে অধস্তর চেতনার আত্ম-নৈবেদ্য-দান। আহুতি বা হবিদান অর্থ এই আত্মনিবেদন, আত্মদান—এইভাবেই দেবতার আহ্বান করা হয়, তাঁরা পার্থিব আয়তনে মানুষী চেতনায় এসে প্রকট হন।

মানুষের অন্তরে অগ্নির শিখা হল তার ঊর্দ্ধমুখী মত অভীপ্সা—অগ্নির সপ্ত জিহ্বা

সপ্তলোকের দিকে প্রসারিত। কিন্তু অন্তরে গভীরে এই যে প্রতপ্ত জ্যোতি তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে বিপুল নিশ্চেট এক অন্ধকারের চাপ—অজ্ঞানের নিশ্চেতনার অন্ধকার। তার ভয় দেবতাদের ডাক শুনলে, নিশ্চেতনা-অসুর তাকে পিশে বিলুপ্ত করে দেবে। এখন সে কোন প্রকারে লীয়ে বর্ত্তে আছে। মর্ত্ত্য অজ্ঞান মানুষের মধ্যে তার অভীপ্সা আস্পৃহা এই রকমই দুর্ব্বল সন্দেহাকুল অসহায় মনে করে। মনে করে দুঃসাহস না করা যুক্তিযুক্ত —দুঃসাহসে দুঃখ হয়।

কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। সময় আসে যখন, বিশ্বের প্রয়োজনে মানুষের প্রয়োজনে পরমের আসন টলে যখন তখন তাঁর ইঙ্গিতে প্রেরণায় নেমে আসে ঊর্দ্ধতর দেববৃন্দ—বরুণ মিত্র, তারপর ইন্দ্র, তারপর যম—পৃথিবীর আস্তরণ-অন্তরালে লুক্কায়িত অগ্নির অন্বেষণ ও আবিষ্কারের জন্য। বরুণ হল বৃহৎ—অসীম চেতনা মিত্র হল মৈত্রী বা ঐক্য সামঞ্জস্য প্রীতি; ইন্দ্র হ'ল ঊর্দ্ধতর বা দিব্য মানস। যম হল প্রাণের চিন্ময় অধীশ্বর। ঊর্দ্ধের দেববৃন্দ—ঊর্দ্ধের চেতনা নিয়ে যখন অচেতনার গর্ভে নিহিত আত্মবিস্মৃতপ্রায় যে চেতনা-কণিকা তাকে স্পর্শ করে, তখনই এই অগ্নিকণা ফিরে পায় তার আত্মচেতনা এবং ক্রমে সে বেড়ে ওঠে যত তার মধ্যে আহুতি দেওয়া হয় যত বৃত্তি, যত প্রেরণা, যত যজ্ঞ প্রত্যঙ্গ।

অগ্নি তার অনিচ্ছা অক্ষমতা ও পলায়নের হেতু দেখাতে গিয়ে বলল, তার পূর্ব্বে আরো দেবতারা চেষ্টা করেছিল এই কর্ম্ম করতে, কিন্তু তারাও সক্ষম হয়নি—তবে তার পক্ষে সম্ভাবনা কি?

কারা এই পূর্ব্বগামীরা? গুহ্য-বিদ্যা বলে যে দেবতাদের পূর্ব্বে হল অসুরেরা। বিধাতার প্রথম সৃষ্টি হল দিতির সন্তানেরা, তারপরে অদিতির সন্তান। অর্থাৎ জগৎ যখন সৃষ্ট হল, এক হল বহু—হল দ্বৈতের উদ্ভব, অহংএর উদ্ভব, অহংই হল অসুর—তার প্রতিষেধ হিসাবে দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতকে বজায় রাখবার জন্য, প্রস্ফুট করে তোলবার জন্য অদিতির সন্তানদের আবির্ভাব—এই তথ্যটিই গ্রীক-পুরাণে বর্ণিত হয়েছে তাদের দেবতা ও অসুর (Titan)-দের দ্বন্দ্বে ও যুদ্ধে—জিয়ুস দেবতা, বরুণ দেবতা—যুদ্ধ ঘোষণা করল পূর্ববর্ত্তী পিতৃপুরুষ Chronos ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে—তত্ত্বের দিক দিয়ে এই রূপকের অর্থ হল—সৃষ্টির প্রথমে ছিল অহং-প্রণোদিত প্রাণাবেগের বাসনা-বুভুক্ষার রাজত্ব—বিবর্ত্তনের ক্রমোন্নয়নের ফলে দেখা দিয়েছে ঊর্দ্ধতর মানস ও ক্রমে দেখা দেবে দিব্যচেতনার রূপায়ণ। অগ্নি নিজে এই দিব্যচেতনার পুরোধা—তবে যাত্রারম্ভে সে আত্মবিস্মৃত—শেষ লক্ষ্য ও পরিণতি হল এই পার্থিব চেতনায়, জড়-আয়তনে অগ্নির পূর্ণ অমৃতময় রূপ প্রতিষ্ঠা।

আমার ফুটবল খেলা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমার ফুটবল কীর্তি-কাহিনী কিছু তোমরা কেউ কেউ শুনতে চেয়েছ। ইতিপূর্বে একদিন বলেছি খানিকটা, আজ তবে বলা যাক আর-খানিকটা।

ফুটবলে পা দিয়েছি বলতে গেলে জন্ম থেকেই, অর্থাৎ বয়স যখন বছর পাঁচেক তখন থেকে—হাতে খড়ি আর পায়ে বল প্রায় একসঙ্গেই হয়েছে। জান, আমার হাতেখড়ি হয় দুবার, দুই সরস্বতী পূজায়, যেমন অনুষ্ঠান হয়। প্রথমবার আমার যখন চার বৎসর—কেন যে তখন অনুষ্ঠানটি হ'ল তা বলে নেই। হয়ত অন্যের কারো দেখে ভয়ানক কান্নাকাটি করেছিলাম, তাই সান্ত্বনা দেবার জন্য অনুষ্ঠানের ছল করা হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বৎসরে আবার করতে হল, কারণ চার বৎসর বয়সে ও-অনুষ্ঠান শাস্ত্রসম্মত নয়, তাই ওটা বাতিল হল, আবার নূতন করে দীক্ষা হ'ল, যা শাস্ত্রসম্মত এবং পাকা। হয় ত আমার বিদ্যার সুপক্কতা, পাকা বনিয়াদ এই ডবল দীক্ষার জন্য হয়ে থাকবে।

ফুটবল খেলব ত, কোথায় ফুটবল? তোমাদের এখানে ফুটবল ডজনে ডজনে, টেনিস বলের মত। কিন্তু আমাদের তখন একটা ফুটবল জোগাড় করতে দিনসিন খেয়ে যেতে হ'ত। বড়দেরই ছিল হয়ত একটি কি দেড়টি—একটি আধপুরানো, আর একটি অতিপুরানো এবং সহস্রতালিযুক্ত, আবু সেলিনের জুতোকেও হার মানাবে। কিন্তু ছোট-দের ত' কৌশলী বুদ্ধির অন্ত নেই। আমরা আবিষ্কার করলাম বাতাবী লেবু—শক্ত বটে কিন্তু চাপড়ে ঠেসে গুঁতিয়ে লাথিয়ে বেশ নরম করা যায়—অবশ্য অল্পক্ষণেই তারপরে ফেটে যায় কিন্তু ও-জিনিসের ত' অভাব নেই, যথেষ্ট গাছ ছিল, গাছে গাছে ফলত এন্তার, আমাদের বাসাতেই ছিল কয়েকটা। আচ্ছা, আমার প্রথম বিজয়-গৌরবের কথা বলি তবে এখন। আমার বয়স তখন সাত-আট হবে, তার বেশি নয়। বড়রা খেলছিল, আমি দাঁড়িয়ে দেখ-ছিলাম হয়ত লোলুপ-নেত্রে। কিন্তু ওদের লোক কম হয়ে গেল—একদলের গোল-কিপার নেই। আমাকে একজন ডেকে বললে, "যা, ওইখানে গিয়ে দাঁড়া, গোলে, কিছু করতে হবে না, দাঁড়িয়ে থাকবি শুধু।" নামমাত্র গোলকিপার—একেবারে একজন না থাকলে চলে না তাই। বল একটাও এল না আমাদের দিকে। একেবারে শেষাশেষি, প্রায় আঁধার হয়ে এসেছে, এমন সময় বিপক্ষের একজন দৌড়ে বল নিয়ে এসে কিছুদূর থেকেই মেরে দিল গোলের দিকে, সবাই নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিন্ত, বলে উঠল "গোল! গোল!" কারণ সামান্য ছোকরা আমি আর কি করে বল ঠেকাতে পারব। কিন্তু আশ্চর্য—miracle—দিলাম বলটা ঠেকিয়ে আমি, ধরে ফেললাম আগেই গোল না হতে। আমার দলের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, "নো, নো, নো গোল"। কি হৈ হৈ, আমাকে কোলে কাঁকে করে নৃত্য—"সাবাস্! সাবাস ভাইয়া!" রব চারিদিকে। এই আমার প্রথম, যাকে শিকারীরা বলেন, বাঘের tasting blood।

তারপর বহু বৎসর গেল। পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছি স্কুল-জীবনে। আমি খেলতাম right-out-এ, তাই অভ্যাস হয়ে গেল, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেল শুধু ডান পায়ে খেলা—এক পা-তেই সিদ্ধ হ'লাম, বাঁ পাটা চলত না তেমন, শুধু ঠেকা দিয়ে কোন রকমে কাজ সারা প্রয়োজন হ'লে—যেমন রাজেন এখনো করে তার ডান পা দিয়ে। বাঁ পায়ে রীতিমত অভ্যাস করি কোথায় জান? পণ্ডিচেরীতে এসে, করেক বৎসর লেগেছিল দুরন্ত হ'তে। কিন্তু দু'পায়ের ব্যবহারভঙ্গী আমার দু'রকমের হয়ে গেল। ডান পা-টা বিশেষভাবে দূরে উঁচু দিয়ে মারবার জন্যে—যেমন corner-kick বা overhead passing-এর জন্যে। বাঁ পাটা হোল চাপা জোরাল "স্যুট"-এর জন্যে। আমি যত গোল দিয়েছি, মনে হয় বেশির ভাগ দিয়েছি ঐ বাঁ পায়ের দৌলতে। পণ্ডিচেরীতে আমাদের টীমটীনে আমার right-out-এ স্থান হল না কারণ ওখানে যে ছেলেটি খেলত সে আর কোন position-এই খেলতে পারত না, অথচ ঐ position-এ ভালই খেলত। তাঁর নামটা লিপিবদ্ধ করে রাখি, Sinnas—Everiste Sinnas, দেশী খ্রীষ্টান, তাই ঐ ধরণের নাম। সুতরাং আমার position হয়ে গেল right in—আমি খেলতাম ডান দিকে আর মণি (সুরেশ চক্রবর্ত্তী) খেলত বাঁয়ে left out-এ। মণি চক্রবর্ত্তী, শুধু চক্রবর্ত্তী বা চাক্কা ও আমার খুব নাম হয়েছিল এখানে। কিন্তু আমাদের দুজনের ষ্টাইল বিভিন্ন রকমের, মণির ছিল একমাত্র tactic—বল পেলে, বলটা তাকে পাইয়ে দিতে হ'ত, কেড়ে কুড়ে বল সে বড় নিত না, বল ধরলে তাকে আর পায় কে? সে কি দৌড়, touch line ধরে একেবারে উড়ে চলা যেন, কেউ তাকে ধরতেও পারত না, আটকাতেও পারত না—একেবারে corner-এর কাছে পৌঁছাত গিয়ে—বলটাকে উঁচু করে shoot করে দিত ঠিক গোলের মুখে, যেন corner kick। তারপর আমি থাকতাম সেখানে তার যথাযথ বন্দোবস্ত করতে।

আমার ষ্টাইল ভিন্ন রকমের। আমিও দৌড়ে মণির চেয়ে কম যেতাম না, কিন্তু ছিলাম ভয়ানক ধীরস্থির এবং steady—মণি ছুটত ষণ্ডের মত কিছু দৃক্‌পাত না করে, যাকে বলে মরি-বাঁচি করে এ জন্যে তার কলার-বোন ভেঙেছিল দু' দুবার, নাক মুখও বেশ আঘাত পেয়েছিল। আমি বেশ ছুটতাম বটে, কাটাতে পারলে কাটাতাম, কিন্তু সর্ব্বদা আমার লক্ষ্য থাকত pass করে দেওয়া ও আবার receive করা। সর্ব্বদা position ঠিক রাখা—আগে থেকে বুঝে নেওয়া কোন position-এ বলটা আসবে, কোন position-এ আমাদের লোক থাকবার সম্ভাবনা। আমার খেলার স্বাচ্ছন্দ্য, একটা artistic ভঙ্গী দেখে কুচবিহারে একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় বলেছিল, আপনার খেলার ধরণে একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য রয়েছে—ধীর সুস্থির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জোরালো। আমার লক্ষ্য ছিল clean game—কেউ আমার গা ছোঁবে না, আমিও কারো গা ছোঁব না। বলের সঙ্গে শুধু ছোঁয়াছুঁয়ি। যাকে বলা হয় robust game, তার মধ্যে আমি নহি মহি, তার থেকে দূরে রহি। তাই এত

বছর ফুটবল খেলেও হাড়গোড় আমার কিছু ভাঙেনি, পায়ের একটা আঙুল একটু বেঁকে যাওয়া ছাড়া। প্রথম বয়সে অবশ্য গুঁতোগুঁতি করেছি, করতে হয়েছে; কারণ তখন খেলোয়াড়দের শ্লোগান ছিল **push him down**, সেটা **foul** ছিল না। অবশ্য **push** করারও একটা বিধি-নিষেধ ছিল, যেমন তেমন ভাবে **push** করলে চলত না।

পণ্ডিচেরীতে আমাদের নাম (মণি ও আমার), আমাদের টীম **Circle Sportif**-এর নাম ছড়িয়ে পড়ে একটা বিশেষ খেলার পরে। একবার **Vellore** থেকে একটি টীম আসে, তারা না কি দিগ্‌বিজয়ী টীম **Vellore** থেকে এখানে এসেছে খেলতে, কোথাও হারেনি। তাদের প্রথম হার আমাদের কাছে দু' দু' গোলে। তারা অপমানিত বোধ করে **return match** খেলতে চাইলে পরের দিন। জোর খেলা হ'ল, **drawn game**, আমাদের মান বজায় ত' রইলই। পণ্ডিচেরীর মত অজানা জায়গায় (ক্রীড়াক্ষেত্রে একদম অজানাই ত) এমন একটি দুর্দ্ধর্ষ টীম তারা কল্পনা করতে পারেনি। এই টীমে আমরা "স্বদেশী" (আমাদের স্বদেশী বলা হ'ত—যারা দেশের কাজ করে এখানে আশ্রয় নিয়েছে) ছিলাম চারজন, চারজন বাঙালী, আমি, মণি, বিজয় (বিজয় ছিল **centre half**) আর পূর্ণচন্দ্র পাকুরে বলে একজন চন্দননগরের ছাত্র—সে এখানে পড়াশুনা করত। এই পূর্ণচন্দ্র পাকুরে একটি বিষয়ে আমাদের উপর টেক্কা দিয়েছিল সে তামিল ভাষা এতখানি আয়ত্ত করেছিল যে তাকে দেখেছি বসে শুয়ে তামিল উপন্যাস (আমরা যাকে বলি বইওলার উপন্যাস) পড়ত। আমাদের এখানে ক'জনার তামিল বর্ণপরিচয় হয়েছে?

এবার তবে বাংলাদেশে ফিরে আসি যখন ফিরলাম চার বৎসর পরে, আমাদের খেলা দেখে (রংপুরে) আমাদের নাম দেওয়া হ'ল মাদ্রাজী খেলোয়াড়. প্রচার করা হল কি প্রকাণ্ড দুই মাদ্রাজী খেলোয়াড় এসেছে 'একেবারে দুর্দ্দম' সুতরাং **Town Club** ঠিক করলে এবার উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিনাজপুর **Shield** আনতে হবে অন্যত্র থেকে আরো দু একজন খেলোয়াড় "ভাড়া" করা হ'ল—একেবারে দুর্জ্জেয় **team** করবার জন্যে। গেলাম দিনাজপুরে—আমাদের টীমের বহিরা ঠিক ঘোষিত হয়ে গেছে: বড়ড়া **town**-কে আমরা **semi final**-এ হারিয়ে দিয়েছি দু গোলে. তার একটি গোল আমি দেই—শোন আমার সে কীর্ত্তি, অজস্র হাততালি পেয়েছি সেজন্যে। আমি **right out**-এ খেলছি; বিপক্ষের দিকে. প্রায় **mid-field**-এ. (মাঠের মাঝামাঝি). **line**-এর কাছে পেলাম বল ফাঁকা প্রায়, হাফব্যাক (একজন সাহেব) একটু দূরে ছিল. সহজেই তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। ব্যাক দৌড়ে এল তাকে দিলাম ফাঁকি; আর দেরী নয়, গোল তাক করলেম, কিন্তু ডান পা দিয়ে শুট না করে (আমি ডান দিকে খেলছি) বলটা বাঁ পায়ে বেড়ে দিলাম। গোলী **expect** করছিল ডান পায়ে মারা বল যাবে তার ডান দিকে. তা না হয়ে বল চলে গেল তার বাঁ দিকে। চমৎকার গোল, আর কি ছবুরে ছবুরে। বলা বাহুল্য এ সব জিনিষ

ও-রকম করে ভেবে চিন্তে সিলেক্ট-নির্বাচন করে হয় না, হয় মুহূর্তের মধ্যে আপনা থেকেই, automatically. পরে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় প্রক্রিয়াটা। এটা হ'ল যোগ-সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন involved process। যা হোক, এল শেষ দিন। Final, দিনাজপুর Town Club vs রংপুর Town Club—সবাই ঠিক করে যে আমাদের team যে রকম strong, জিতবে যে কোন সন্দেহই নাই—এখন কত গোলে, আমাদেরও তাই বিশ্বাস ছিল। খেলা ত' শুরু হল, কিন্তু আমার মনে হয় half time-এর আগেই একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল। ওদের একজন forward (নাম মনে হচ্ছে না এখন, বেশ ভাল খেলোয়াড়) আমাদের side-টা ফাঁকা প্রায় দেখে, আমরা চেপে খেলছি ওদের দিকে, প্রায় mid-field থেকে এক লাম্প দিয়ে হঠাৎ জোর মেরে দিলে একটা shoot, আমাদের গোলী প্রস্তুত ছিল না, দিব্যি চমৎকার গোল হয়ে গেল। সব হতভম্ব। পরের আধঘন্টা আমরা খেলেছি ওদের একেবারে গোলের মধ্যে চেপে রেখে—আর দমাদম শট করছি গোলে, বলটা উপরের বারে লেগে যায়, post-এ লেগে যায়, গোলীর গায়ে লেগে যায়, কিন্তু কিছুতেই ঢোকে না। রীতিমত bombing করছি প্রতি মিনিটে। কিছুই হয় না, যেন একটা দেয়াল গাঁথা রয়েছে ওখানে। আমি corner করলাম ৬।৭টা, প্রত্যেকটাই first class. কিন্তু কি হবে তাতে? আমার corner shot দেখে, কুমারটুলীর খেলোয়াড় ছিল একজন আমাদের সঙ্গে, সে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল, "আপনি কলকাতায় খেলুন না কেন? মফঃস্বলে পড়ে থেকে লাভ কি? আমাদের টিমে খেলবেন!" আমি রাজী হই নি, পরে বলছি কেন। যাই হোক, ঐ গোলটি আর ফেরৎ দেওয়া গেল না, হারই মানতে হল। এ রকম ব্যর্থ বোধ disappointed আর কখনও হই নি, মাথা হেঁট করে ফিরলাম রংপুরে চুপচাপ। কিন্তু ব্যাপার কি হয়েছিল জান? খেলার ঠিক পরেই দিনাজপুরের একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়, বোধ হয় Captain এ-ই হবে, সে ছিল অর্দ্ধেক রংপুরের দলে। রংপুরে তার আত্মীয়-স্বজন ছিল, মাঝে মাঝে আসত ও Town club-এ খেলত। সে এসে আমাদের বললে, 'কেমন হল ত?' মা কালী সাক্ষাৎ জাগ্রতা দেবী, এই দ্যাখো, বলে চাঁক থেকে একটা আধলা (আধ পয়সা) বের করলে, বললে, "কালীবাড়ি যাই, কালীর কাছে নিবেদন করি এই আধলা, বলি, 'মা, তোমার শরণ নিলাম, এই আধলাটা নিবেদন করি তোমায়, আমাদের আজ জিতিয়ে দিও,' দেখো, জিতিয়ে দিলেন তিনি, আমাদের সাধ্য কি তোমাদের টিমের সঙ্গে দাঁড়াতে পারি।" বুঝলাম, আমরা আমাদের সামর্থ্যের যোগ্যতার গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে ছিলাম, দুর্য্যোধন-ভাব, নারায়ণী সেনার গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত, ওরা বিনীত শ্রীকৃষ্ণে নির্ভরশীল পাণ্ডবের মত। এই শিক্ষাই ত' পেলাম।

কলকাতায় আমি খেলতে যাই নি, অবশ্য এটার এক কারণ আমার পাকা স্থিতি ছিল এখানে, ওখানে ত' যাই ছুটিতে বেড়াবার মত। তাই বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে চাই

নি। তারপর কলকাতার ফুটবল জগতের আবহাওয়া আমার সহ্য হবার মত বস্তু ছিল না —আমরা এক জগতের অধিবাসী ওরা আর এক জগতের।

আর একটা খেলার কথা বলি জলপাইগুড়ি সহরে, জলপাইগুড়ি Shield-final এসেছে—মনে হচ্ছে নিলকামারী vs পূর্ণিয়া—পূর্ণিয়া থেকে young সাহাব এসেছে, তখনই তার খেলা দেখবার জিনিষ। নিলকামারীর মান একটা আছে, সুনাম কি কুনাম, তোমরা বলবে—নিলকামারী খেলে ভাল কিন্তু হেরে যায়। এবারও তাই ঘটেছিল, মজার কথা এই, আমরা চার ভাইই একসঙ্গে খেলেছিলাম, মনে হচ্ছে একভাই গোলে, এক ভাই ব্যাক, আর দু ভাই—আমি আর আমার সেজ—ফ্রন্ট লাইনে। আমার সেজ Centre forward—সে কলকাতায় বি এ পড়ত এবং মোহনবাগান জুনিয়র টিমের খেলোয়াড় ছিল, ভালই খেলত। আমি কখনও out-এ কখনও in-এ, পালেট পালেট সে centre-এ। আমার একটি ট্রিক সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রচুর হাততালি ও উল্লাস তুলে দিয়েছিল—আমার পায়ে বল, দৌড় দেব মনস্থ করছি, সামনে বিপক্ষ—আরো দু হাত দূরে —দুজনেই স্থির দণ্ডায়মান, দুজনেই তাক করে, আমি হঠাৎ করলাম কি, বলটাকে ঠেলে চালিয়ে দিলাম তার পাশ দিয়ে, তারপর আমি পাশ কাটিয়ে দৌড়ে গিয়ে ধরলাম বলটা। বেচারী হতভম্ব হয়ে পিছনে পড়ে রইল—কি তুমুল হাততালি হর্ষধ্বনি দর্শকের মধ্যে

আমি Right out-এ line-এর কাছে কাছে থাকতাম যখন —তখনই দর্শকদের টীকা-টিপ্পনী—'দাড়ি তু বেশ খেলে', 'দাড়ি তুমি আপনি নিজে যাও, pass করো না'। কারণ আমার pass নিয়ে সদ্ব্যবহার করতে পারে নাই অনেক। আমার দাড়ি তখন ফ্রেঞ্চ কাট্ গোছের—তখন থেকেই বন্ধু-বান্ধবরা সুরু করল অভিযান আমার দাড়ির বিরুদ্ধে—ও আর বাংলাদেশে চলবে না, ফেলে দাও, ফেলে দাও। আমার এক বন্ধু এক shaving set পর্যন্ত উপহার দিয়ে ফেললে। অগত্যা "পর রুচিসে পরুনা" নীতিই অনুসরণ করতে হল। কিন্তু আমার দাড়িহীন মুখ শ্রীঅরবিন্দ পছন্দ করেন নাই, শ্মশ্রুগুম্ফ-মণ্ডিত চেহারাই তাঁর পছন্দসই ছিল অন্ততঃ তখন।

আমার শেষ কেরদানির কথাটা বলে আমার ফুটবল কাহিনী শেষ করি। ফুটবল ছেড়ে দিয়েছি, রিটায়ার করেছি। এখানে প্রথমে সাধারণ খেলোয়াড় ছিলাম, তারপর ফুটবল captain ছিলাম এক বৎসর, তারপর Inspector of Games ছিলাম এক বৎসর, তারপরে রিটায়ার। ম্যাচ আর খেলতাম না, Junior-রা সব এখন আমাদের জায়গা নিয়েছে—মাঝে মাঝে যেতাম, একটু আধটু খেলতাম। একবার একটা six a side competition হল। Final হবে আমাদের টীম Cercle Sportif আর পাড়ীদের টীম Société le Nid-এর সাথে—এ দুটিতে বরাবর rivalry ছিল নিদারুণ। এখানকার পাড়ীরা আমাদের বিরোধী জান বোধ হয়, সুতরাং পাড়ীদের পক্ষপাতী যারা তারাও আমাদের বিরোধী। Cercle Sportif-এর ছোকরারা পণ্ডিচেরীর nationalist, enlightened

group বলতে হয়। যা হোক খেলা সুরু হ'ল। একটা সর্ত ছিল যে খেলার মাঝখানে কেউ যদি অখন (disabled) হয় খেলতে খেলতে, তবে তাকে replace করা যেতে পারে। ছেলেরা ফন্দি করলে—আমাদের খেলা যদি সুবিধার না হয় অর্থাৎ হারবার দিকে চলে, তা হ'লে একজনকে disabled বানিয়ে তার জায়গায় আমাকে খেলতে হবে। ফলত হলও তাই. আমাদের টিম এক গোল খেল। যেই গোলটি হ'ল অমনি আমাদের একটি ছেলে (তিনি আজকাল মহামান্য জজসাহেব Antoine Tamby, এখন retired) ধপ করে বসে পড়ল—wounded, খেলতে পারবে না। সুতরাং ডাক পড়ল, 'রয়', 'রয়' কোথায়? আমি 'রয়' উপস্থিত—আমি নামলাম আমার লাল সাদা (মোহনবাগানী) uniform নিয়ে। আমি নেমেই খেলার ধরণ বদলে দিলাম। ওরা করছিল কি. বলের চারদিকে (short passing-এর জন্য) জড় হয়ে খেলছিল ৬ জনের মধ্যে তিন চার জনই। গোলের পরে centre kick হবে. আমি বল নিয়ে দাঁড়ালেন centre-এ, পাশের দু'জনকে বললাম—তোরা যতদূর পারবি দূরে থাকবি এবং long passing করবি। আমি বলটি centre থেকে দিলাম একেবারে right line-এর ধারে। আমাদের রাইট আউট প্রস্তুত ছিল—সে বলটা ধরে আবার centre-এ চালিয়ে দিলে আমার কাছে। আমি ত এগিয়ে গিয়েছি half back পেরিয়ে প্রায় যেই আমি বল ধরেছি আর ছুটেছি গোলের দিকে. গোলকিপার আমাকে দেখেই গেল ভড়কে—Roy আসছে। আমি অবলীলাক্রমে দিয়ে ফেললাম গোল। কি উল্লাস, কি তুমুল বিজয়ধ্বনি আমাদের ছেলেদের। এইভাবে জিতলাম দুই গোলে এবং কাপটি আমাদের আয়ত্তে এল।

খেলার পরে আমাকে মাথায় করে নিয়ে কি নৃত্য আমাদের ছেলেদের—মণি ছিল তার দলপতি—সেও আমার মত খেলা ছেড়ে অবসর গ্রহণ করেছিল এবং শুধু দর্শক হিসাবে থাকত। মণি এত খুসী হ'ল যে আমাকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে চলল কাছাকাছি এক bar বা হোটেলে—হায়, তখন গণপৎয়াম ছিল না।

উপসংহারে কাহিনীর পরে বলি কিছু প্রসঙ্গতঃ. তত্ত্বকথা—খেলার ষ্টাইলের কথা। আমার এক বন্ধু ছিল (বাংলায় আমাদের সহরে), টেনিস খেলত। তার খেলা দেখে আমি একবার বলেছিলাম there is no grammar about his play। আমার কথাটা খেলো-য়াড় মহলে ক্লাসিক বাক্য হয়ে উঠেছিল। সে খেলত যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে 'এলোপাথারি' মার। টেনিসের নিয়মভঙ্গ কিছু হত না—কিন্তু কেমন একটা এলোমেলো ধরণধারণ, শৃঙ্খলা অর্থাৎ ষ্টাইল নাই। কিন্তু বেরেকেটে দিতে যেত প্রায়ই—প্রাণশক্তি vital energy-র জোরে। আমাদের এখানে ফুটবলেও আমাদের সঙ্গে খেলত যে দুটি half back বিজয় আর ছিনে জোঁক বেঞ্জামিন (Benjamin) তাদেরও ঠিক ঐধরণ ছিল খেলার। খেলার ফলতঃ দুটি জিনিষ দরকার, grammar ও style. ব্যাকরণ ও ছন্দ—প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলবেন। আমাদের যুগে ছুলে ব্যাকরণের প্রতিপত্তি থাকলেও খেলার জগতে এ-জিনিষের

বালাই ছিল না—অন্তত: আমাদের দেশে। তখনকার ওস্তাদেরা ছিল genius অর্থাৎ স্বত:স্ফূর্ত কৌশলী তাঁরা। বিনা শিক্ষায়, বিনা বিজ্ঞানসম্মত অভ্যাসে, কেবল ভিতরের একটা প্রতাব প্রেরণা বলে তাঁদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে ক্রীড়া-নৈপুণ্য। Genius মাত্রই হয়ত বা এই ধরণের জীব। Napoleon সম্বন্ধে কাহিনী আছে—তিনি জিতে জিতে চলেছেন অবিরল, কোথাও কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না অন্যপক্ষের প্রাচীন সুদক্ষ সেনাপতিরা (অষ্ট্রীয়ারাজের) হিমসিম খেয়ে গিয়েছেন; অনুযোগ করলে তাঁরা বলছেন, কি করব মশাই, এ ছোকরা লড়াইএর কোন নিয়ম-কানুন মেনে চলে না—তবে লড়াই করব কি? He breaks every rule of battle. কিন্তু বর্তমানে এসেছে অশিক্ষিত-পটুত্ব নয়, রীতিমত পুঙ্খানুপুঙ্খ অভ্যাসের শিক্ষার অনুশীলনের যুগ। তোমরা আশ্রমে কসরতে ও খেলায় দেহের প্রতিটি অঙ্গের স্থিতি ও গতি সুনিয়মিত, সুশিক্ষিত সুনির্দিষ্ট করে তুলছ, চর্চা করছ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, আমাদের যুগে আমরা এ-সব কিছু জানতাম না—একেবারে আকাট মূর্খ ও অজ্ঞ। আজকাল হল মানুষের সজ্ঞান সাধনার যুগ—অজ্ঞানে অন্ধভাবে পা চেনে নিয়ে চলা নয়, আপনা থেকে যা ঘটে তাতে সন্তুষ্ট থাকা নয়। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে ব্যাকরণের চর্চা ছিল দুটি ক্ষেত্রে—ভাষা-ব্যাকরণ শিক্ষায় এবং যোগ-সাধনা শিক্ষায়। এ দুটি ক্ষেত্রে দারুণ কড়াকড়ি নিয়ম ছিল—যম-নিয়মের সূত্র-উপসূত্র যে কত ছিল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু জীবন-ধারায় ছিল বিপুল একটা শৈথিল্য ও অনিয়ম, বিশেষভাবে অর্বাচীন কালে।

আমি দুটি জিনিষের কথা বলেছি—ব্যাকরণ ও ছন্দ (style হ'ল বিশেষভাবে ছন্দ তবে তা ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্ত করে)। ব্যাকরণ বাদ দিয়ে সুঠাম style গড়ে উঠতে পারে না। ব্যাকরণ হল শরীরে যেমন অস্থি-সংস্থান, মেরুদণ্ড, সে আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা না থাকলে শরীর হল মাংসপিণ্ডমাত্র। ব্যাকরণ বলতে বুঝি প্রত্যেক অঙ্গের যথাযথ বিন্যাস—টেনিসে ক্রিকেটে, যে কোন খেলায়, সাধারণ দৌড়ঝাঁপে পর্যন্ত, হাত থাকবে কি ভাবে, পা থাকবে কি ভাবে, বুক পিঠ পেট, প্রত্যেক আঙুল পর্যন্ত থাকবে কি ধরণে, শরীরের প্রত্যেক পেশীর কি ক্রিয়া হবে—এই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ও তার প্রয়োগ চাই। আবার প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক চাল-চলন যথেষ্ট নয়, সব গতিকে কি করে মিলিত করে একটা সমন্বয় ঐক্যসাধন করে সুডৌল সুঘম একমুখী ছন্দে পরিণত করতে হবে—এই শেষোক্ত গুণই হ'ল বিশেষভাবে ছন্দ বা style. বলা হয়ে থাকে ষ্টাইল হল মানুষের নিজস্বতা, তা হ'ল ভিতরের, অর্থাৎ শরীরের ভিতরের—শারীর চেতনার ও অন্তঃপ্রাণের একটা শৃঙ্খলা-বিধান—একটা নৈসর্গিক তালমানবোধ। আমাদের যুগে আমরা এ-সব জানতাম না—অর্থাৎ আমরা ছিলাম ভাবুক, কিন্তু আজকাল হ'ল বিজ্ঞানীর রাজত্ব। তোমাদের ভাগ্যে এই সৌভাগ্য হয়েছে যে তোমরা এ দুটিকেই আয়ত্ত করতে পারবে একটা পরম সমন্বয় সামঞ্জস্য ও উর্দ্ধতর সার্থকতার মধ্যে।

বসোরার উজীররা

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ইরানসরীর গৃহ, অন্তঃপুরিকাদের স্থিতিস্থল একটি কক্ষ)

দুনিয়া, আনিস-আলজালিস

দুনিয়া

সত্যিই, তুমি ইরানদেশের বুলবুল, যেন মূর্ত স্বপ্নপ্রতিমা, আচ্ছা, তোমাদের দেশে নিয়মই বুঝি যে সবাই প্রথমদর্শনেই প্রেমে পড়ে?

আনিস-আলজালিস

দুনিয়া, লক্ষ্মীটি, তুমি আমায় সাহায্য করবে বলো? আমার মন চাইছে ওকে, দাড়িওয়ালা রাজাবাহাদুরকে নয়—সত্যিই নরকের জন্য অপেক্ষা করতে করতে স্বর্গের অতি নিকটে পৌঁছে গেছি।

দুনিয়া

জানি, সখী, জানি, আমিও বুঝি, আমারও ঐরকম মনের অবস্থা হবে, যদি আমায় বলা হয় যে দশ দিনের মধ্যে ঐ নিষ্ঠুর পাষাণ পিতৃব্যপুত্রটিকে বিয়ে করতে হবে। হাঁ, আমি তোমায় সাহায্য করবো, কিন্তু আশ্চর্য্য লাগছে, যে তুমি তাকে যেতে দেখলে আর অমনি প্রেমে পড়লে—সে কি তোমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল?

আনিস-আলজালিস

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ।

দুনিয়া

হ্যাঁ, নুকসীনই বটে।

আনিস-আলজালিস

সত্যি, আমায় সাহায্য করবে তো?

দুনিয়া

নিশ্চয়ই, মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, দেহ দিয়ে—কিন্তু কেমন করে তাই ভাবছি —আমার পিতৃব্যমশাই লোকটি সোজা নন, বড্ড কড়া—হাকিম নড়বে তো হুকুম নয়।

আনিস-আলজালিস

কী আমার কর্তৃব্যপরায়ণা ভাইঝি রে, সব সময়েই পূজনীয় খুল্লতাতের হুকুমের খবরদারী করছেন?

দুনিয়া

হুঁ। কড়াগণ্ডার কলি বই কি যদি সুবিধেটা আমার দিকে ঝোঁকে। আমি কিন্তু এ কাজ করবোই, এমন কি এর যদি শাস্তি হয় যে ফরীদকে বিয়ে করা, তাতেও রাজী। কিন্তু কে জানে তিনি আবার দর্শন দেবেন কখন, বাড়ী ফিরবেন কিনা কে জানে?

আনিস-আলজালিস

রোজ বাড়ী আসেনা বুঝি?

দুনিয়া

কই আর, বিশেষ করে যখন এই বিকিকিনির বেসাতীতে দোরে দোরে হাঁকতে হয় —পশরা লিবি গো। বলি কচিখুকী—বোঝোনা—সন্ধানে ঘোরেন স্বপনকুমার—ঘুঘুর খোজে ঘুর ঘুর করেন—শুভ্রশ্বেতবরণা।

আনিস-আলজালিস

একবার আমায় হোননা, সব বন্ধ করে দেবো।

দুনিয়া

সত্যি ? হাঁ, তুমি পারবে, তোমার কাছে এটা শক্ত হবেনা—পারবে ।

আনিস-আলজালিস

পারবো ।

দুনিয়া

যাক্ বাঁচালে, আমার মনের গুরুভার লাঘব হলো—আর কে কী বলতে পারে। আমার সুযোগ্য ভ্রাতাকে কামিনীকুলকলঙ্ক থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমার এই মহৎ ব্রত। ভেবে চিন্তে বিবেচনা করে বিশ্বাস করেই এই কাজে আমি হাত দিচ্ছি। জানি, আমাকে জেনে শুনে অবাধ্য হতে হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে আমার এই মরণ মুখে একটা লম্বা সাদা দাড়ি গজিয়েছে—বস্তুটি বড়ই ভাবগ্রাহী যেন আপনিই বিচারবিবেচনা টেনে আনে—ধীরে, বন্ধু ধীরে—গম্ভীরভাবে ভেবে দেখি।

(অনুদ্গত দাড়িতে হাত বুলাইবার ভঙ্গীতে প্রস্থান)

আনিস-আলজালিস

আঃ, এতক্ষণে আমার বুকের ধড়ফড়ানি শান্ত হলো। আমার মন বলছে—সে আসবে—আমার যুগযুগান্তরের বাঞ্ছাপুরুষ। এ যে ললাটের লিখন—সব অমঙ্গল কেটে যাবে, সব অকল্যাণ—ওগো স্বর্গের দেবদূতরা, তোমরা জানো আমার মনের গোপন কথা—রমণীর লজ্জা, নারীর নারীত্ব তোমাদের উছ্‌খল ডানা দিয়ে আবৃত করে রক্ষা করো তোমরা। তোমাদের রোষকষায়িত শোনদৃষ্টি যেন এখানে পতিত না হয়—এটা কামোন্মত্ততা নয়, লালসা নয়। অবশ্য দাসীবাঁদীদের সবই সহ্য করতে হয়—তবু ভালোবাসবার অধিকার তাদেরও আছে। বিনতি করি, তোমাদের চিত্রগুপ্তের খাতায় এ কাহিনী যেন লেখা না হয়, দোষগুণের বিচার যেন স্থগিত থাকে। আজ আমি এক অতলগহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে—একদিকে তাড়া করে আসছে নারীমাংসলোভী কুকুরের দল—আজ কি আমার লজ্জা করবার দিন—দরকার হলে অনন্ত আগুনের বন্যা দিয়েও পালাতে হবে—আইন, ধর্ম, শোভনতা, যে যার দোহাই দিক—আমায় বাঁচতে হবে—আজ আর আস্তে আস্তে গুণে গুণে নিশ্চিন্তে পা ফেলবার অবকাশ নেই—না, না বিপদ অত্যন্ত কাছে—পালাতে হবে, দৌড় দিতে হবে—যে রাস্তা খোলা আছে সেই রাস্তা দিয়ে—আর হয়তো সেই পথই আমায় নিয়ে যাবে আমার দয়িতের দুবাহুর নিভৃত আশ্রয়ে।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(ইবন্‌সরীর গৃহ—অন্তঃপুরিকাদের একটি কক্ষ)

আমিনা, দুনিয়া

আমিনা

এসেছে সে ?

দুনিয়া

হাঁ।

আমিনা

তিন দিন, তিনটি দীর্ঘদিবস, দীর্ঘরজনী—না আমি তাকে বকবো—তাকে ডেকে দাও, দুনিয়া, আমাকে কড়া হতে হবে।

দুনিয়া

নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে, কিন্তু ঠোঁটদুটো একটু চেপে রেখো, ঠাকরুণ, আর চোখের দৃষ্টিটা আর একটু কটমটে করো, যাতে ভ্রূগুলো বেশ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং তোমার রাগী রাগী দেখায়—তোমার এই রুদ্রাণীরূপ দেখলেই—ওকি হাসছো কি, হেসেই সব মাটি করে দিলে।

আমিনা

দূর পাগলী, যেয়ো, ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

দুনিয়া

ডাকতে আর হবেনা, শমন্ ধরাতে আর হলোনা, ডাকাত নিজেই ধরা দিচ্চে।

(নুরুদ্দীনের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন্

(দ্বারে দাঁড়িয়ে)

কে আছিস—আমার ঘরে শরবৎ রেখে যা।

(প্রবেশ করে)

এই যে মা জননী, দুরন্ত সন্তান হজুরে হাজির—তোমার গোস্সার যাওয়া আদুরে গোপাল পুত্তুরটি—মা, বাগো, অনেক সয়েছো, অনেক যেলেল্লাগিরী করেছি, কিন্তু সব দুষ্টুমীর যে পার পাওয়া যায় তোমার ঐদুবাহুর মধ্যে। এতো ক্ষমা তোমার—তোমার কিন্তু হাসতে হবে মা, তোমায় হাসতে দেখলে যে কী ভালো লাগে।

আমিনা

আমার মাণিক্।

নুরুদ্দীন্

দুনিয়া বোনটি আমার, কি হলো রে—অমন আম্বাবান খাঁচাছাড়া মুখ কেন তোর?

দুনিয়া

দেখো দাদা—আমরা মেগেছি কিন্তু; দেখতে পাচ্ছোনা বুঝি ললাটের ভীষণ ভ্রূকুটি, কাঁপছো না একটুও—আচ্ছা লোক ত তুমি—সত্যি বলছি, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো, হে আমার পূজ্যপাদ ভ্রাতৃদেব, আমরা চেষ্টা করে দেখছিলাম যে চারিটি নেত্রের মিলিত ক্রোধাগ্নিতে আর অনলবর্ষী শাণিত কথার স্রোতে ভস্মীভূত করে দিতে পারি কিনা—যদি আমরা আমাদের অস্ত্র চুঁড়তাম, দেখতে তোমার অবস্থাটা কি করুণ হতো—বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করো ওকে।

আমিনা

কান দিসনি ওর কথায় নুরুদ্দীন—কিন্তু বাছা সত্যি করে বল দিকিন—এই যে দিনের পর দিন ডুব মারিস, কাউকে কিছু না বলে, এতে মায়ের প্রাণটা কি রকম করে—ভাবনা হয়না, ভয় করেনা? না বাপু, এরকম ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হলে চলবেনা বলে দিচ্ছি, একটা কিছু বিধিব্যবস্থা করতে হয়

দুনিয়া

কেমন, বুঝতে পারছো এখন, আমাদের শত্রু কেন হতে হয়।

নুরুদ্দীন

না, মা, আমি শুধু এদিক-ওদিক যাই, রীতিনীতি শিখি, দুনিয়ার মানুষগুলোর হালচাল বুঝি, এই আর কি—ভবিষ্যতের জন্য তৈরারী হতে হবে ত?

দুনিয়া

সাধু, সাধু, নিশ্চয়ই—অবশ্য আর সঙ্গে সঙ্গে যদি নানা রকম পানীয়ের স্বাদ পাওয়া যায়, আর নানান ধরণের মেয়েদের গুণের পরীক্ষা, রসাস্বাদ—মন্দ কি—এই ধরোনা ডাবাস্তাস যে সুন্দরী শোভনিকাদের পাঠান তাঁরা সাধারণা হলেও অসাধারণা—তাদের সঙ্গে বিশরকাররোবাদিনী নিপুণিকাদের কটাক্ষের তফাৎটা কোথায়—এওতো শিক্ষা দরকার। আর বাগদাদনন্দিনীদের রক্ত অধর বা ইয়েমেনের জনপদবধূদের ললিতলবঙ্গলতার মত সুললিত দেহযষ্টি এও তো একটা জ্ঞাতব্য বিষয়, বা ধরো এই বসোরার তনুঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষীণকটি কোন সুহাসিনীর বা কার সুদর্শন চরণযুখানি নূপুরের নীচে চাঁদের আলোর মত ভাস্বর হয়ে ওঠে নৃত্যের ছন্দে। সুরত-মহাবিদ্যালয়ের পৌরুষপরাক্রান্ত গ্রাজুয়েট হতে গেলে এ সব বিদ্যা এই বাহ্য নয়, অবশ্য শিক্ষণীয়, কি বলো, ভাইসাহেব?

নুরুদ্দীন

ঠিকই বলেছো বহিন, সংসারে বাস করতে গেলে সব ধরণের অভিজ্ঞতাই অর্জন করতে হয়—আর বলো ত না, তোমার আঁচল ধরে কোলে বসে মায়ের শান্ত সুশীতল কাঁখরাতে থাকলেই কি এই চলতি পৃথিবীর শিক্ষা শেষ হয়?

আমিনা

না, না, তা কে বলছে, খাচ্চা দুনিয়া, সত্যিই এই যে বাউণ্ডলে হয়ে চৌ চৌ করে ঘুরে বেড়ানো, এটা যে একেবারেই খারাপ তা নয়, আর লোকে একটু বাড়িয়ে বলেই—কি বলিস্?

দুনিয়া

সংসার বড়ই কঠোর স্থান।

আমিনা

কিন্তু নুরুদ্দীন, এতোটা ভালো নয়, তুমি বেশী বাড়াবাড়ি করছো—আমরা যখন থাকবোনা, তখন তোমার কপালে যে কী আছে জানিনা—যদি না এখন থেকে একটু বুঝে সুঝে বুদ্ধি খাটিয়ে চলো যা কিছু দুপয়সা বাপের পাবে সবই যে ফুঁকে দেবে—তারপর?

নুরুদ্দীন

শোনো, মা, তারপরেই আরম্ভ হবে সত্যিকার জীবন—এই বিপুল বিশ্ব আবার বাহু

নেবে নেবে—আমি বেরিয়ে পড়ব—যাযাবর পথিক—তরবার হাতে বীরের মতো চলে যাবো দেশ দেশান্তরে, যাবো পশ্চিমে, নুরুদ্দীনের সঙ্গে করবো মিতালী, দেখবো পাথরে গড়া গ্রানাডা সহর, যাবো কাইরোয় চাঙ্গিয়ারে, এলোপ্পোয়, ট্রেবিয়ণ্ডে—যাবো মহাচীনের প্রান্তরে। কাফেরদের দেশ দিল্লীও রবেনা বহুত দূর, গজমোতিগুঁড়া যেখানে পথের ধুলো, যেখানে স্তম্ভ উঠেছে আকাশ পানে, ইন্দ্রজালের ইন্দ্রধনুচ্ছটায় যেখানে সাততলা মন্দির মাথা তোলে ভাস্কর্য্যের নমুনা নিয়ে। তারপর যাবো আরো আরো দূরে কত অজানা স্বপ্নাচ্ছন্ন দেশে, বীরের মত তরবার হাতে প্রচার করবো ইসলামের পুণ্যনাম। বিক্রী করবো মশলা, পাড়ি দেবো বসোরা থেকে জাভা, জাভা থেকে জাপান। কতো অচিন দেশ, নাম-না-জানা সমুদ্র আর দ্বীপ ডাক দেবে আমায়, কতো অনাবিষ্কৃত জনপদপ্রান্তর। বিপদ হবে সাথী, তাকে করবো তুচ্ছ জ্ঞান, তার গলায় টুঁটি টিপে ধরবো।

দুনিয়া

তারপর চকচকে ইস্পাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবো সেই সব ভীষণ ভয়ঙ্কর রক্তলোলুপকারী রাক্ষসগুলোকে, দৈত্যদানাপিশাচের দল এই, না?

নুরুদ্দীন

তারপর কোন এক এখনও নাম-না-জেওয়া অপরূপ দেশে আস্তানা গাড়বো।

দুনিয়া

হ্যাঁ নাম দাও কামকাচিয়া বা গাড়লদের দেশ।

নুরুদ্দীন

তারপর নিজের বীর্য্যের শৌর্য্যের নানা কসরৎ দেখিয়ে অসভ্যদের সভ্য করে তুলে সেখানকার রাজকন্যাকে করবো বিয়ে—তার মিঠে চোখ দুটি হবে মধুরহসোভরা, সে হবে আলুলায়িতকুন্তলা কেশবতী কন্যা দীঘল চুল যার, তার হয়ে আমি যুদ্ধে যাবো, যুদ্ধ জয় করবো, দিগ্বিজয়ে বেরুবো, অরাতি নিধন করবো, বড়ো বড়ো লৌহদ্বারবেষ্টিত সহরগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে জয়ঢক্কার কেড়ে নেবো, শত্রুকবল থেকে বন্ধুরাজ্যদের উদ্ধার করবো এবং আমার হৃদয়পুরসুন্দরীর সাম্রাজ্য বিস্তার করবো।

দুনিয়া

বাঃ বসোরা থেকে একেবারে চাঁদমামার দেশ।

নুরুদ্দীন

যেখানে আমি রাজত্ব করবো, সেখানে আমার রাজশক্তিই বজ্রসুকঠিন হবেনা, আমার প্রাসাদ করবে ঐশ্বর্যে ঝলমল, হবে অপূর্ব সুন্দর, শুধু সোনাদানা শ্বেত পাথরেই তৈয়ারী নয়, স্ফটিকে, বৈদূর্যে, প্রবালে মণিমুক্তা মাণিক্যে মকরতে লিখিত থাকবে কোরাণের প্রত্যেকটি পুণ্যবাণী। আমি সোনার ভৃঙ্গারে পান করবো নানাজাতীয় সুরা আর আসব—পুরসুন্দরীদের নূপুরনিক্কণে বেজে উঠবে মর্মর হর্ম্যতল, গানের অমর মূর্চ্ছনার সঙ্গে তাল রেখে। আর চতুর্দিকে ঘিরে থাকবে চমৎকারিণী হাস্যলাস্যময়ী রূপযৌবনবতী বাঁদী ও বেগমরা—প্রতিটি-দিন দিল-মাতানো, মন-ভোলানো নও-রোজ, মনে হবে যেন আকাশের তারকাবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন স্বয়ং চন্দ্রদেব। আমার ভাণ্ডারে এতো ঐশ্বর্য থাকবে যে প্রত্যহ কোটি কোটি টাকা খরচ করেও আমি অভাবগ্রস্ত হবোনা। আমি দান করবো অজস্র, সবগুলো রাজ্যের কোথাও কোন প্রাণী দরিদ্র থাকবেনা, সকলের দুঃখ কষ্ট দৈন্য দূর হবে। প্রতিটি রাত্রে আমি ছদ্মবেশে বেরুবো মহামান্য খলিফা হারুণ-অল-রসিদের মত—সঙ্গে থাকবে জাফর আর মাসরুরের মত সহচর—আমি লোকের দুঃখদুর্দশা অবিচার অনাচারের কথা শুনবো, প্রতিকার করবো, আলনুয়েনের মত মানুষরা ধিক্কৃত তিরস্কৃত হবে, আমার পিতাঠাকুরের মত কর্তব্যপরায়ণ মহৎব্যক্তিরা পুরস্কৃত হবে সম্মানিত হবে—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ বিধানের জন্য বিধাতার অদৃশ্য শক্তির মত ঘুরে বেড়াবো।

দুনিয়া

আর প্রিয় নুরুদ্দীন, তুমি প্রতিদিন যাই করো না কেন আমার বিয়েটা দিয়ে দিয়ো তোমার বুদ্ধিমতী ঐ জাফরের সঙ্গে, যাতে করে তোমার সাথে কোনদিন আর বিচ্ছেদ হবে না। প্রতিটি সন্ধ্যায় তোমার প্রাসাদে বসবে পানের আর গানের আসর, নৃত্যগীতে মশগুল হব আমরা অন্ততঃ যতদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র ওঠে এবং ভবিষ্যৎ বহাল থাকে অর্থাৎ মাথাটা খারাপ না হয় আর সুরা ও সুন্দরীরা বজায় থাকেন। হে ভবিষ্যৎ পরীমুলুকের মালিক মহোদয়, আমার আর্জি এখন থেকেই পেশ করা রইল।

নুরুদ্দীন

হে মালিকা সাহেবান, তোমার আরজ গৃহীত হলো, এখন কাজের স্থূল সাম্রাজ্যেই একটু আমোদ-আহ্লাদ হৈ হল্লোড় করা যাক্, ঝিরিঝিরের কুঞ্চিত কেশদাম আর সাজারখ-অল-দারের মধুনিষ্যন্দী কণ্ঠ।

দুনিয়া

আর শোনো প্রাতৃবর, যতদিন না তোমার রাজ্য করতলগত হয় ততদিন আমরা কিন্তু তোমার প্রতি কঠিন হবো, কঠোর হবো।

আবিনা

কিন্তু বাপু তোমার বাপ ত এবার ভীষণ রেগেছে, এমন চটতে তাকে দেখিনি তোমাকে শাস্তি দিতে যেন না হয় আমাদের।

নুরুদ্দীন

হ্যাঁ, দিয়ো, যত পারো, তবে বিষ্টি চুমু মিশিয়ে দিয়ো—দেখ, দুনিয়া, দেখ—এই মাণিক-জোড়ের কাণ্ড কারখানা দেখ—একজন কানের কাছে বাপু বাছা বলে মধুমাখা ছুরি বসাবেন আর একজন সজোরে চেঁচিয়ে মারমুখী হবেন—কুঃ, তোমাদের কথা গ্রাহ্যেও আনতে নেই।

আবিনা

কী বললি, গ্রাহ্য করবি না ?

নুরুদ্দীন

না, এক কড়াক্রান্তি না, আমার মাথাখি, হ্যাঁ, তবে একটি ছোট্ট চুমুর মধ্যে যদি তোমার বকুনীটা ভরে দাও, তাহলে ততটুকু মানবো শুনবো।

আবিনা

বলিনি তোকে দুনিয়া, কি চালাক বদমাইসটা—সত্যি এমন বিষ্টি ছেলে—ভারী ভালো, ভারী দয়ালু।

দুনিয়া

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো, ভালো ছেলে ত নিশ্চয়ই, তা নাহলে আর শহরের সব চেয়ে সেরা ভালো মেয়ের সন্ধানে দিনরাত্রি ঘোরে ? স্বয়ং সূর্যদেব আর আকাশে বসে বসে সপ্রশংস নেত্রে ওর লীলাখেলা দেখেন আর আনন্দে তিনবার নিজের কক্ষপথে ডিগবাজী খান ?

নুরুদ্দীন

দুনিয়া রানী, শোনো বলি একটা কথা, সন্ধান মিলেছে, সেই চিরপরিচিতার।

দুনিয়া

পিছনে ফিরে তাকাচ্ছো কেন ?

আমিনা

এই, তোর বাবা আসছেন।

(ইবনসরীর প্রবেশ)

ইবনসরী

আমিনা, আমি রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি, দরবারে ডাক পড়েছে, একটা কিছু ঘটেছে—আঃ রাফেল, বদমাইস তুমি এখানে?

নুরুদ্দীন

অনেকক্ষণ বাবা।

ইবনসরী

তুমি ভেবেছো কী, পাজী বেতমিজ—আমার বাড়ীটা কি সরাইখানা—যখন খুশী আসবে, যখন খুশী যাবে?

নুরুদ্দীন্

না, বাবা, এটা হচ্ছে বসোরার সবচেয়ে সুখী পরিবার। এখানে এমন দুটি হৃদয়বান হৃদয়বতী মানুষ আছেন—স্বামী আর স্ত্রী—যাঁরা তাঁদের মূর্খ বুদ্ধু পুত্রের সবকিছু দোষ মাফ্ করেন।

ইবনসরী

বুঝেছি, আর বক্তৃতা দিতে হবেনা, গহনা কিনবে, উপহার দেবে, দামটা চাপুক বুড়োর ঘাড়ে, কিছু মোটা টাকা তার খসুক, পাজি, ছুঁচো...

নুরুদ্দীন

আঃ বেটা তোমাকে এর মধ্যেই ধরেছে, বেশ একটা মোটা সঙ্গীত অস্ত্র বলেছে নিশ্চয়ই—আমি মোক্ষম মন্ত্র কানে দিয়ে এসেছিলাম।

ইবনসরী

শুনুন মশাই—এটা কী ধরণের রসিকতা? তোমার প্রেমপাত্রীদের উপহার দিতে চাও, তা বাপের ঘাড়ে বিলটা চাপানো কেন? এই ধরণের শিক্ষা দিলে কে?

নুরুদ্দীন

আপনিই দিয়েছেন।

ইবন্‌সরী

আমি, হতভাগা, বলছিস কি?

নুরুদ্দীন

তুমিই ত বলেছো বাবা, যে দেনা করবেনা—পাপের মত পরিত্যাজ্য—তা গয়নাও দেবো, অথচ দেনা করবোনা?

ইবন্‌সরী

ন্যায়শাস্ত্রবাগীশ হয়েছেন অকালকুষ্মাণ্ড, ওরে মধুপায়ী আরিষ্টটল, তোকে কি আমি বলেছি যে যত পারিস, মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়াবি আর তাদের উপহার দিবি?

নুরুদ্দীন

না, তা ঠিক বলনি।

ইবন্‌সরী

তবে রে শয়তান।

নুরুদ্দীন্

তুমি না দিলে আমার বিয়ে, না দিলে কিনে একটি সুন্দরী ক্রীতদাসী যে বাড়ীতে আমার সেবাশুশ্রূষা করবে—তাইতো বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, মধুচক্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করতে হয়, এই পৃথিবীর রসাস্বাদন করবার জন্য, অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। যদি মনে করো ভুল হচ্ছে, শুধরে দাও।

ইবনসরী

বেটা বলে কী—আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

নুরুদ্দীন

কেন, ঐত রয়েছে একটি পারসীক্ দেশের মেয়ে, মুরাজ্জীনের হাটে, পাওনা কিনে, দাম দশহাজার।

ইবন্‌সরী

পারসীক্ দেশের মেয়ে—নুরাল্‌জীন—শাহাজাদা।

(নিজের মনে মনে)

আঃ ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে তুলনে দেখছি—ভয় হচ্ছে।

নুরুদ্দীন্

দাও ওকে কিনে, আমি শপথ করছি, বাড়ীতে থাকবো, হাঁ, সাতদিন না হয় অন্ততঃ চারদিন।

ইবনসরী

ওরে বদমাইস শুনে রাখ, আমি এখন রাজদরবারে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমার পিঠের চামড়া তুলবো, গরমজলে সেদ্ধ করে কাবাব বানাবো। (নেপথ্যে) ওর চোখটাকে অন্ধ করে রাখতে হবে—দশদিন আমি ব্যস্ত থাকবো নানা কাজে। হাঁ, তোমার বাঁদীর সাথ আমি যোচাচ্ছি, দালালকে বললেই হবে মেয়েটিকে রাখতে—আঃ আমি ত ভুলেই গেছি যে তোমার মাথার প্রত্যেকটি কোঁকড়ানো চুল তুলবো আমি শপথ করেছি, অনেক বেলেল্লাগিরি করেছো, আর নয়।

নুরুদ্দীন

না, মহাশয়, ওটি হবে না, আমার কুঞ্চিত কেশদাম আর আমার সম্পত্তি নয়, প্রত্যেকটি একটা-না-একটা স্মৃতিতে বাঁধা।

ইবনসরী

কী, কী বললি, পাজী, রাসকেল

(নেপথ্যে)

শুনছো আমিনা, তোমার দিলদরিয়া দুলালের কথা, আচ্ছা, দুনিয়া যেন আমিনের সঙ্গে প্রতিদিন রাত্রে শোয়—না, চলো, কথা আছে।

(আমিনার সহিত প্রস্থান)

নুরুদ্দীন

দুনিয়া, দুনিয়া সুন্দরী, বোনটি আমার, শোনো দিকিন কান দিয়ে—আমি প্রেমে পড়েছি, একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছি, দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে—মরে যাচ্ছি কামনার দমকা হাওয়ায়।

দুনিয়া

কেন? সারা পৃথিবীর সেরা ঐ ইরানী বুলবুলের জন্য—সে তো এর আগেই বিক্রী হয়ে গেছে।

নুরুদ্দীন

আমি মুরাহুজীনকে জিজ্ঞাসা করেছি।

দুনিয়া

আস্তো মিথ্যুক।

নুরুদ্দীন

তাই যদি হয়, তবে আমি আর সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে তারই খোঁজে এই শূন্য পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবো।

দুনিয়া

কী, একটি বঙ্কিম কটাক্ষের আঘাতেই কুপোকাৎ হলে তুমি?

নুরুদ্দীন

কেন, দুনিয়া?

দুনিয়া

ভাই হে, আমি একটি খবর জানি যা তুমি জানোনা,—একটি সুন্দর পাখী এসে কানে কানে গান গেয়ে বলে গেলো, এই বাড়ীরই উপরের একটি ঘরে।

নুরুদ্দীন

দুনিয়া, তোমার পেটে কিছু খবর আছে, আমায় বলতেই হবে।

দুনিয়া

কি দেবে বলো আগে—না, না তোমার ঐ গাজরঠোকরা চুমু কে চায়—আমি চাই ভাইবোনের ভালোবাসা মাখানো ছোট্ট একটি প্রতিশ্রুতি—তা হলে আমি বলবো।

নুরুদ্দীন

আমি জানি যোনাই আমার সারা জাহানের শ্রেষ্ঠ রমণীরত্ন—সব চেয়ে ভালো মেয়ে, সব চেয়ে দুষ্টু মেয়ে—সব চেয়ে মিষ্টি পাগলী মেয়ে—হতাশ প্রেমিকের এমন সুহৃদ আর কে আছে—না ও, এখন খোশখবরটা বলে ফেলো।

দুনিয়া

উহুঁ আরো খোশামোদ করতে হবে বন্ধু, অল্পে সুখ নেই।

নুরুদ্দীন

আর চালাকী নয়, কথাটা ফাঁসাই করো মনতাময়ী, আমাকে আর দগ্ধোনা, সংশয়ে রেখো না। (কান ধরে টান্)

দুনিয়া

হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, জানলে প্রেমিকঠাকুর,—ঐ পারসিক্ মনোমোহিনীটিকে—ভালো করে শোনো—মনোযোগ দাও—যতক্ষণ আমি গল্পের সুতোর পাকটা খুলি—আচ্ছা বেশী নয় — একেবারে শেষ অধ্যায়েই গুটিয়ে নিচ্ছি—ঐ ইরানী সুন্দরীকে তোমারই জন্য কেনা হয়েছে এবং ওপরের ঘরে আছে, বুঝলে বাবাজী।

নুরুদ্দীন্

দুনিয়া, দুনিয়া, এই দুটো স্নেহশীল নিথ্যাচারীদের নিয়ে কি করি বল দিকিন?

দুনিয়া

তোমাকে হঠাৎ চমকে দেবার উদ্দেশ্যে।

নুরুদ্দীন

এখন আর কোন আশ্চর্যই আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে না—আমার মধ্যে আগুন লেগেছে কোনদিকে, কোন ঘরে, উপরে?

দুনিয়া

থামো, থামো—তুমি জানোনা, ওর ঘরের দুয়ারে পাহারা দিচ্ছে একটা কালো জোয়ান

রাক্ষস। মস্তবড়ো বুলোর মত সাদা দাঁত, সুদৃঢ় পেশী, বিশ্রী জানোয়ার, এখুনি হৈ হৈ করে উঠবে এই ভাবশী দৈত্যটা, নাম তার হারকুশ।

নুরুদ্দীন

খোজা নপুংসক।

দুনিয়া

ক্ষান্ত হও ভাই—ওর আছে একটা চকচকে ধারালো তলোয়ার।

নুরুদ্দীন

আরে, রেখে দাও তোমার খোজা আর তার তলোয়ার। আমি এই পা বাড়ালাম স্বর্গের দিকে, কে আমায় রোখে দেখি? (প্রস্থান)

দুনিয়া

দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাইটি আমার, ছুটছেন যেন তীরের মত তূণ থেকে বজ্রগতিতে। এইবারে খেলা সুরু, বসোরার সুলতান, মহম্মদ আলজিয়ানী সাহেব, তোমার বাঁশীর জন্য শিস্ দাও—আমি চলছি বিধিলিপি—উজীর সুলতানরা যা ঠিক করে আমি দিই উল্টে —অঘটনঘটনপটীয়সী। (প্রস্থান)

ক্রমশঃ

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

(১)

প্রশ্ন "Thoughts & Glimpses" বইটিতে লেখা রয়েছে—"সেই হেতু ভগবান জগৎকে এমন হাতুড়িপেটা করছেন, একে পিষে দলে ময়দাঠাসা করছেন, পুনঃপুনঃ রক্তগলায় চুবিয়ে একে ঘনত্ব অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছেন....."

উত্তর অর্থাৎ দেখতে চান যে জগতের মানুষগুলো খাঁটি সোনায় পরিণত হতে পেরেছে কিনা, অথবা এখনো নুচোর মধ্যে ফেলে আরো পোড়াতে হবে। সে কথা তো জানাই যাচ্ছে যে তেমন খাঁটি অবস্থা এখনও আসেনি—চোখে স্পষ্ট দেখতেই পাচ্ছ।

তথাপি জগতের ইতিহাসে এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে মানবজাতির একটা বিশিষ্ট অংশ, হয়তো অল্পসংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তি খাঁটি সোনার মতো তৈরি হয়ে উঠেছে, আর তারাই এবার দেখিয়ে দেবে যে কেমন করে গায়ের জোর না ফলিয়েও শক্তি প্রয়োগ করা যায়, বিনাশ না করেও বীর্য প্রকাশ করা যায়, আর কোনো অত্যাচার না করেও শৌর্য দেখানো যেতে পারে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের আসল জবাব তো দিয়েই রেখেছেন : "শুধু যদি মানুষ আধ্যাত্মিক হতে রাজী হয়"। এখানে মানুষ মানে "মানবজাতি" না বলে বলতে হবে "ব্যক্তিমানব"। ব্যক্তিগত মানুষ যদি তাতে "রাজী" হয়ে এগিয়ে আসে।

তার ভিতরকার খানিকটা অংশ যদিও তাই চায় এবং তার জন্য আস্পৃহাও করে, কিন্তু বাকী অংশ থাকে বিমুখ হয়ে, যেমন অবস্থাতে আছে তেমনিই থাকতে চায় এই খাদ-মেশানো ধাতুটাকে তাই বার বার আগুনে ফেলে পোড়াতে হয়।

জগতের ইতিহাসে আবার আমরা উপস্থিত হয়েছি এক যুগ-পরিবর্তনের বিশেষ সন্ধিক্ষণে। নানাদিক থেকে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে : "এবার কী হবে?" তাই নিয়ে সর্বত্রই একটা প্রত্যাশা, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক। "কী হবে এবার?" এ প্রশ্নের অনুকূল জবাবের শুধু ঐ একটাই সর্ত, "মানুষ যদি শুধু আধ্যাত্মিক হতে রাজী হয়।"

মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি যদি খাঁটি সোনা হতে পারে তবে তাতেই হয়তো যথেষ্ট, তাদের দৃষ্টান্তে জগতের স্রোতের গতি বদলাবে। এই প্রয়োজনই এখন সব চেয়ে জরুরী।

ভগবান আমাদের কাছে চাইছেন এমনি শৌর্য-বীর্যের নিদর্শন, যা আমরা নিজেদেরই বিপত্তি ও অপূর্ণতা ও তামসিকতার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে দেখাই না কেন? নিজেরই শুদ্ধি-লাভের যে আভ্যন্তরীণ অগ্নিকুণ্ড তার মধ্যে কেন বীরের মতো ঝাঁপ দিই না? তাহ'লে সমস্ত সত্তাকে আমূল ধূলিসাৎ করে প্রলয় ঘটিয়ে আগাগোড়া সমস্ত ভেঙে গড়ার প্রয়োজন হয় না।

সমস্যা হলো তাই, প্রত্যেককেই নিজে নিজে তার সমাধান করতে হবে।

আজ সন্ধ্যার প্রশ্নটির ঐ একমাত্র উত্তর, যা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "মানুষ যদি শুধু আধ্যাত্মিক হতে রাজী হয়।"

এখানে আমি আরো বলছি "এবার সময় এসে গেছে"—বলছি মানুষেরই দিক থেকে।

(২)

প্রশ্ন আপনি এক স্থানে বলেছেন, "দিব্য প্রেমের প্রবল চাপ গ্রহণ করবার উপযুক্ত হতে তোমার নিজেকেও দিব্যে পরিণত হতে হবে।" তার অর্থ কি এই যে পৃথিবীতে দিব্য প্রেম অবতরণের পূর্বে মানবজাতিকে নিজেকেও দিব্য হতে হবে?

উত্তর তুমি বলতে চাও যে সকল মানুষ দিব্য হলে তবেই এখানে দিব্য প্রেম দেখা দেবে?

প্রশ্ন হাঁ, ও কথায় তাই তো বোঝাচ্ছে।

উত্তর ও, তুমি তাই বুঝেছ? কিন্তু কথাটা ঠিক তাই নয়।

প্রথমত, ঐতিহাসিক ঘটনাকে অনুধাবণ করে দেখ, যতদূর পর্যন্ত জানা যায়। প্রথমে বিচ্ছেদধর্মী শক্তির ক্রিয়াতে মূল চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলো নিশ্চেতনা, তার ভিত্তিতে হলো জড়ের সৃষ্টি, তা এমনই নিশ্চেতন, যে মূলের সঙ্গে তার সংযোগ থাকার কোনো সম্ভাবনাই রইল না। এমন নিরেট নিশ্চেতনার কারণেই তখন দরকার হলো তার মধ্যে প্রেরণস্পন্দন-রূপে দিব্য চেতনার সরাসরি অবতরণ, সমস্ত অন্তরালকে ভেদ করে। জড়ের মধ্যে সেই প্রেম ছড়িয়ে যাওয়াতেই তার মধ্যে এমন কিছু নতুন জিনিস ঢুকল যাতে অতঃপর শুরু হলো তার পুনরুত্থানের পালা, অর্থাৎ অচেতনার উত্থান চেতনার দিকে, অন্ধকারের উত্থান আলোর দিকে, আর আমাদের কাছে এর গতি খুব মন্থর হলেও তা চলছে অপ্রতিহতভাবে। সুতরাং

এমন কথা বলাই যায় না যে সৃষ্টি দিব্য হয়ে উঠলে তবে তার মধ্যে দিব্য প্রেম কাজ করবে, বরং দিব্য প্রেম কাজ করাতেই সৃষ্টি দিব্য হয়ে উঠছে।

কিন্তু আমি যা বলেছিলাম তার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

আমি জগৎ সম্পর্কে কিছু বলিনি, বলেছিলাম বিশেষভাবে মানব-চেতনা সম্পর্কে। দিব্য প্রেম সব কিছুকে অনুপ্রাণিত করছে, সবের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট থেকে ক্রমশ তাকে ভগবৎ মূলের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মানুষের চেতনা তার কিছুই জানে না, সমস্তই হচ্ছে তার অজ্ঞাতে; মানুষ কদাচিৎ কেবল এইটুকু টের পায় যে দিব্য প্রেমের চাপ সে যাহা সইতে পারে না, তাকে ধারণ করতেও পারে না, বহন করতেও পারে না; তার বিশুদ্ধতার তীব্র তেজ মানব-প্রকৃতির সহ্যসীমার বাইরে। অনেকখানি হীনপ্রভ, স্তিমিত, পাতলা, মৃদু মলিন ও বিকৃত হয়ে এলে তবেই মানুষের প্রকৃতি তাকে গ্রহণ করতে পারে। তার যা আসল স্বভাব ও গুণ তার থেকে অনেকখানি জোলো হয়ে গেলে তবেই মানুষ তাকে নিতে পারে এবং তাতেই গৌরবান্বিত হতে পারে। অর্থাৎ তার যথেষ্ট কাটছাঁট ঘটলে তবেই তা মানুষের গ্রহণযোগ্য হয়। যদি তাকে তার পূর্ণ শুদ্ধতায় ও পূর্ণ তেজে গ্রহণ করতে চাও তবে তোমার এই মানব-চেতনাকেও দিব্য হতে হবে।

এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি, তা ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো মানুষ যতক্ষণ দিব্যের অবস্থাতে না উঠছে ততক্ষণ সে ভগবৎ প্রেমকে বুঝতে বা জানতে বা গ্রহণ করতে পারবে না। সাধারণ মানুষের নেবার মতো হতে হলে তার মূল দিব্যত্ব কিছু থাকবে না।

কিন্তু এ হলো চেতনার বাহ্য ও আপাতদৃষ্ট অবস্থার কথা। তাই বলে কৃপা রূপে সেই প্রেমের কাজ হবার পক্ষে কোনো বাধা নেই, আমাদের অজ্ঞাতে তা সর্বদাই কাজ করছে। বরং অজ্ঞাতেই তার কাজ সব চেয়ে ভালো হয়, কারণ মানুষের সজ্ঞান বোধশক্তি তো নিজেই এক বিকৃত জিনিস।

উপরে বললাম যে কথাটি তার এই হলো মর্ম, অন্য কিছু নয়। বিশ্বের সম্পর্কে ও-কথা আমি বলিনি।

(৩)

প্রশ্ন : "Thoughts & Glimpses" পুস্তকে ২৬ পৃষ্ঠাতে রয়েছে, "সীমাবদ্ধ দেহ ঠিক যেন ছাঁচের মতো ; আত্মাকে ও মনকে তার মধ্যে ফেলে বারে বারে চালাই করা হয়, আর বারে বারেই তা ভেঙে ফেলে আবার তদপেক্ষা বড়ো করে তার ঢালাই হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সীমার মধ্যে অসীমের সঙ্গে একটা মিলনের অবস্থাতে পৌঁছনো না যায়।" এখানে ঐ "ছাঁচ" কথাটির মানে কি হবে?

উত্তর : তোমার ঐ নির্দিষ্ট শরীরের ব্যক্তিস্বব্যঞ্জক দেহকাঠামোর ঐ নির্দিষ্ট গঠনটি সেই ছাঁচ, ওটি যদি না থাকতো, তাহলে তোমরা সকলেই একটা গলিত অবস্থাতে পরস্পরের মধ্যে মিশে যেতে, কাউকে আলাদা করে আর চেনা যেতো না। এমন কি তোমাদের ভিতরের দিকে যে প্রাণসত্তা রয়েছে তার বাস্তবের মধ্যে যদি প্রবেশ করো তো দেখবে যে সেখানে পরস্পরের স্পন্দন এমন মিশে যাচ্ছে যে তাকে আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। দেহের সীমা না থাকলে এই হতো, সত্তাগুলিকে পৃথক করা যেতো না। সেইজন্যই দেহের এই বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট মূর্তি, যাতে প্রত্যেককে চেনা যায়। সেই দেহমূর্তিই এখানে ছাঁচের কাজ করে। (একটি ছেলেকে সম্বোধন করে) ছাঁচ কাকে বলে জানো তো ? হাঁ, সেই শক্ত ছাঁচের মধ্যে কোনো গলিত বা অর্ধগলিত জিনিস যদি ঢেলে দাও, তা যখন জুড়িয়ে কঠিন হয়ে যায় তখন ছাঁচটিকে ভেঙে দিলে সেই জিনিস একটা নির্দিষ্ট আকার নিয়ে বেরিয়ে আসে। দেহটাও তেমনি সেই ছাঁচের কাজ করছে, ওর মধ্যে থেকে তোমার প্রাণ ও মনঃশক্তি এমন গঠন নিচ্ছে যাতে তুমি নিজের ব্যক্তিচরিত্রে স্বতন্ত্র হয়ে প্রকাশ পেতে পারো।

বস্তুত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অনুভবাদি ও ভাবধারা খুবই অল্পে অল্পে তৈরি হয়ে ওঠে জীবনক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, নিত্যকার কত সময় শিক্ষার মাধ্যমে। খাঁটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ মন খুবই বিরল জিনিস, সুদীর্ঘ শিক্ষা ব্যতীত তা গড়ে ওঠে না। এমনি সাধারণপক্ষে যা হয়ে থাকে তা শুধু একরকম চিন্তাপ্রবাহের সঙ্কলন, তোমার মাথার মধ্যেও তাই হচ্ছে আবার অন্যের মাথার মধ্যেও তাই হচ্ছে ; বহুজনের মাথায় মাথায় একই চিন্তা নিত্য প্রবাহিত হচ্ছে, তার মধ্যে কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। তুমি যা ভাবছ তা সকলেই ভাবছে, অনেকটা নির্দিষ্ট ধরণে আবার বলছি, সেগুলি হলো সাধারণ চিন্তার স্পন্দনতরঙ্গ, যা এক থেকে অন্যজনের মধ্যে চলে যায়। নিজের অন্তরে লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝবে যে তোমার চিন্তা-গুলির মধ্যে খুব কমই তোমার নিজের ব্যক্তিগত জিনিস। কোথা থেকে তুমি তা আমদানি করলে ? কান দিয়ে তুমি যা কিছু শুনেছ, বইতে যা কিছু পড়েছ, যা কিছু শিখেছ, তার থেকেই তা এসেছে। তার মধ্যে কতগুলি রয়েছে তোমার আপন অভিজ্ঞতার জিনিস, যা নিজে অনুধাবন করে পর্যবেক্ষণ করে জেনেছ ? খুবই কম।

কেবল যখন তুমি নিবিড়ভাবে বুদ্ধিচর্চা করতে থাকো, যখন নিত্যই ভাবতে ও পর্যবেক্ষণ করতে ও ভাবধারাগুলিকে নিয়ে বিচার করতে অভ্যস্ত হও, তখনই খুব ধীরে ধীরে তোমার মধ্যে একটা মানসিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

অধিকাংশ লোকের বেলাতেই দেখবে—এমন কি শিক্ষিত লোকেদের বেলাতেও,—তাদের মাথার মধ্যে কত পরস্পরবিরোধী ভাবনা ও ধারণা একত্রে স্থান পেয়েছে, সে কথা তারা জানেও না। অনেক লোককেই আমি দেখেছি, তারা বুদ্ধির তথাকথিত উচ্চস্তরে উঠে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মতামত পোষণ করে, অথচ তার

বিরোধী ভাবটাও তাদের মধ্যে রয়েছে, সেটুকু তারা জানে না। নিজের মধ্যেই যদি খোঁজো তবে দেখবে যে অনেক বিচিত্র ধারণাই সেখানে একত্রে জড়াজড়ি হয়ে আছে, তার মাঝখানের চিন্তার যথেষ্ট বিস্তার ঘটিয়ে সেগুলিকে গুছিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যায়।

সুতরাং তোমার ব্যক্তিত্বকে যদি প্রকৃত ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে চাও তাহলে তাকে সব দিক থেকে গুছিয়ে একটি নির্দিষ্ট আধারগত করতে হবে, নতুবা তার কোনোরকম আকার গড়ে উঠবে না, পাতলা জলের মতো তা গড়িয়ে এদিক ওদিক গড়িয়ে পড়বে।

নিম্নস্তরের লোকেরা নিজেদের চেনে কেবল নামটির দ্বারা, ঐ নামের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া তাদের আর কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, নাম ছাড়া প্রতিবেশীদের ভিতর থেকে তাদের পৃথক করা যাবে না। যদি জিজ্ঞাসা করো, "তুমি কে?" তারা বলবে, "আমার নাম অমুক।" তার পরে কেউ কেউ বলবে তার পেশার কথা, যেমন, "আমি চিত্রকর।" কিন্তু ঐ স্তরে কেবল নামটি ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই।

কিন্তু নাম তো শব্দমাত্র, তার পিছনে কি আছে? অন্য কিছু না, কেবল বেছে নেওয়া কয়েকটা শব্দকে একত্রে জুড়ে বলা, নতুবা অন্যদের থেকে তাকে স্বতন্ত্র করা যাবে না। তার নামটা স্বতন্ত্র, তাই সে স্বতন্ত্র। ঐ একই নাম যদি সকলের হতো তাহলে কাউকে আলাদা করে বেছে নেওয়া খুব কঠিন হতো।

সম্প্রতি তোমাদের কাছে যে বই পড়ছিলাম তাতে আছে, একজন ক্রীতদাসের কথা, তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সে আগে নিজের "দাস" নাম নিয়ে তার জবাব দিতো; অন্যান্য ক্রীতদাসেরাও সেই "দাস" নামেই সাড়া দিতো, ঐ নামই সকলে মেনে নিয়েছিল, সুতরাং তারা সকলেই সমান, কারো কোনো ব্যক্তিত্ব নেই; আর তাদের কাজও এক, দলের পর দল ক্রীতদাস একই কাজ করে আর একই তাদের নাম!

লোকে জীবনযাপন করে অনেকটা নিজেদের অর্ধচেতন অভ্যাসের ধারাতে। তোমরা যখন যা করো তা কেন আর কিরূপভাবে করছ সেদিকে লক্ষ্য করে দেখ না। অভ্যাসের বশেই করে যাও। যে যেমন দেশে যেমন পরিস্থিতিতে জন্মেছে সে আপনা হতে তার স্থানীয় অভ্যাসগুলিকে নিয়ে নেয়, শুধু বাইরের অভ্যাসই নয়, কিন্তু চিন্তার, অনুভবের, কাজকর্মের সব কিছুরই অভ্যাস। স্বাভাবিক রূপেই তারা সেই অভ্যাস অনুসারে চলে, নিজেরা তা দেখতেও পায় না, কেউ দেখিয়ে দিলে তখন আশ্চর্য হয়ে যায়।

তেমনি ঘুমোনো, কথা বলা, খাওয়া, চলা, সবই তোমরা করছ একটা অভ্যস্ত রীতিতে —যেন স্বভাবতই আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কি করছ কেন করছ তা ভাবতে যাও না। নিজের দিকে লক্ষ্য না করে শুধু অভ্যাসের বশে নিত্যই সব কিছু যেমনভাবে করে যাচ্ছ। কিন্তু নিজের সব কাজের দিকে বিশেষ করে চেয়ে দেখলে আর কখন কি ভাবছো এবং বোধ করছ সেদিকে লক্ষ্য করলে নিজেকে একটা কিম্ভূত বলে মনে হবে।

অতএব ব্যক্তিত্ব সকলের মধ্যে নেই, বরং ওটা থাকা ব্যতিক্রম। আর তোমার যদি ঐ

নির্দিষ্ট দেহটি ও চেহারাটি না থাকতো তবে তোমাকে চেনাই যেতো না, যা আগে বললাম।

ব্যক্তিত্ব অর্জন করা মানে একটা জয়লাভ করা। শ্রীঅরবিন্দ এখানে তাই বলছেন যে ব্যক্তিত্বের ছাঁচ পাওয়া হলো প্রথম ধাপ। যখন তুমি আপন সত্তাকে আত্মচেতন রূপে কতকটা স্বাধীনসত্তা বলে উপলব্ধি করবে, তার পরে তোমাকে সেই আত্মরূপের ছাঁচ ভেঙে ফেলে আরো যেতে হবে এগিয়ে। যেমন, তুমি যদি চাও মানসিক অগ্রগতি, তবে তোমার বর্তমান মনের গঠনকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিলে তবেই তার নতুন গঠন হতে পারবে। সুতরাং প্রথম কথা হলো, আগে যথেষ্ট মেহনত করে নিজের ব্যক্তিত্ব অর্জন করো, তার পরে যেটা গড়লে তাকে চুরমার করে দিয়ে আরো যাও এগিয়ে। কিন্তু তুমি এখন যাকিছু করছ তা নিজের অজ্ঞাতে কেবল অভ্যাসের বশে—সকল ক্ষেত্রে না হলেও—পড়াশোনা ও কাজ-কর্মের দ্বারা যা কিছু উন্নতি করছ তা অভ্যাসের দ্বারাই, আর সে কথা নিজ কিছু জানো না।

কেবল যখন বাহ্যতঃ পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাও তখনই বোধ করো যে তুমি অন্যদের থেকে আলাদা। নতুবা তুমি কে তার পরিচয় কেবল নামে। কেবল যখন সংঘর্ষ হয়, যখন কিছু বিগড়ানো বেসুর ঠেকে, তখনই জানো আপন পার্থক্য, নতুবা নয়। বস্তুত তোমাদের মধ্যে অল্পই পার্থক্য।

মূল উৎপত্তি ছিল একটাই, নয় কি? তার থেকে হলো বহুধার সৃষ্টি। সেই বহুধাকে বহু ভাবে চেতন ক'রে আনতে যথেষ্টই মেহনত লেগেছে। ভালো করে বুঝলে দেখবে যে সৃষ্টির মূল উৎপত্তিকে যদি সকলের স্বরূপ থাকতো তাহলে এই বহুর বহু স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা আসতেই পারত না। প্রত্যেক সত্তার কেন্দ্রে থেকে যেতো পূর্ণ ঐক্যচেতনা, বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রকাশই পেতো না। একত্বের স্মৃতি ঘুচে গেছে বলেই নানা পার্থক্যবোধের সম্ভাবনা ঘটেছে। আবার যদি অচেতনার শেষ প্রান্তে চলে যাও, সেখানেও দেখবে অজ্ঞানের মধ্যে একত্ব, সেখানেও স্বাতন্ত্র্যবোধের অভাব মূলের মতই।

সুতরাং দুই প্রান্তেই রয়েছে স্বাতন্ত্র্যের অভাব। একদিকে পরম চেতনা হেতু একত্ব, অন্যদিকে চরম নিশ্চেতনা হেতু একত্ব।

আর ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে স্থায়ী রকমের একটা আধার থাকাই দরকার।

(৪)

প্রশ্ন : সৃষ্টির শুরু থেকেই স্ত্রী ও পুরুষে প্রভেদ, এর কারণ কি?

উত্তর : সৃষ্টির শুরু থেকেই? কোন সৃষ্টির কথা বলছ? পৃথিবীর সৃষ্টি?

কথাটা ঠিক হলো না। প্রথমত, এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের মধ্যে ঐ প্রভেদ নেই। আর এক নম্বর কথা এই, সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় এ প্রভেদ ছিল না। দুই নম্বর কথা, পৃথিবীর সৃষ্টি হলো নিতান্ত এক বস্তুজগতের সৃষ্টি, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ। আর বিশ্বসৃষ্টিতে এ প্রভেদের প্রয়োজন হয়নি। সম্ভাবনা সকল রকমেরই তার মধ্যে ছিল আর এখনও আছে, কিন্তু এরূপ প্রভেদকে আদৌ তার ভিত্তি করা হয়নি। অতএব তোমার প্রশ্নটাই ভুল, ধোপে টেঁকে না।

প্রশ্ন : কিন্তু এই বাস্তব পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে সে প্রভেদ রয়েছে কেন?

উত্তর : আবার বলছি, গোড়া থেকে এটা ছিল না। প্রাণীতত্ত্ববিদের কাছে শুনবে যে অনেক জাতের প্রাণীর মধ্যে এ প্রভেদ নেই। প্রকৃতি নানারকম ধরনের পরীক্ষা করেছে, একের মধ্যে দুইএর সমন্বয় ঘটিয়ে উভয়লিঙ্গও করেছে যতরকম সম্ভব সমস্তই সে করেছে। তার মধ্যে হয়তো এই ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা সুবিধার দেখে একেই এখন রেখেছে।

কিন্তু অস্তিত্বের আরো সব স্তরে, এমন কি এখানেও সূক্ষ্মদেহের এবং প্রাণের ও মনের স্তরে স্ত্রীপুরুষ ভেদ থাকা সত্ত্বেও এমন অনেক সত্তা রয়েছে যারা স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়। প্রকৃতই তা আছে। যেমন, প্রাণময় স্তরে এ প্রভেদ প্রায় নেই বললেই হয়, সেখানে সত্তাদের মধ্যে সাধারণত কোনো লিঙ্গভেদ নেই। দেবতাদের বেলাতেও মানুষ যেমন দেবদেবীর বর্ণনা দিয়ে থাকে, আমার খুবই মনে হয় যে সেটা প্রধানত মানুষেরই চিন্তারচিত। অন্তত-পক্ষে বিস্তর দেবতার মধ্যে লিঙ্গভেদ নেই। এখানকার এ প্রভেদ প্রকৃতিই ঘটিয়েছে তার নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, তদ্ভিন্ন আর কিছু নয়। একে তোমরা সেই ভাবেই নেবে। শাশ্বতের কোনো প্রতীক একেবারেই নয়।

অনেকে এই প্রভেদটাকেই খুব বড়ো করে দেখে। সে তাদের খুশি, কিন্তু এটাই কোনো চূড়ান্ত বা চিরন্তন কথা নয়। হয়তো অধিবাসনের সৃষ্টিতে এরূপ কিছু আদর্শ ছিল, কিন্তু তাও সম্পূর্ণ রকমে নয়, আংশিক ভাবে। যারা এ প্রভেদ থাকা পছন্দ করে, তারা ইচ্ছা করলে একে পোষণ করতে পারে। এতে সুবিধাও আছে, কিন্তু অসুবিধাও বিস্তর।

প্রশ্ন : আপনি বললেন, প্রাণময় জগতে এ প্রভেদ নেই। কেমন করে তা বদ্‌লে যায়?

উত্তর : একেবারেই নেই তা বলিনি। তবে সাধারণত নয়, বেশির ভাগ সত্তাই সেখানে অলিঙ্গ। আর যাও-বা কিছু লিঙ্গভেদের লক্ষণ আছে তাও এখানকার প্রভাবেই। কিন্তু তার পরে কি বলতে চাও? এ প্রশ্ন নিয়ে তুমি কোন বীমাংসায় আসতে চাও? আমিই

তোমাকে তাই প্রশ্ন করছি। কে তোমাকে বলেছে যে বিশ্বসৃষ্টির গোড়া থেকেই এ প্রভেদ রয়েছে? যারা এটা চিরদিন বজায় রাখতে চায় তারাই তো? তাই ধারণা করে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকে তো থাকুক, কেউ তাদের সঙ্গে ঝগড়া করবে না।

প্রশ্ন : দেহগত রূপান্তর ঘটবে কি প্রাণ মন রূপান্তরের পরে, অথবা সাথে সাথে?

উত্তর : রূপান্তর সাধারণত হয় উপর থেকে নীচে, নীচের থেকে উপরে নয়।

অবশ্য বাস্তববাদী হলে তুমি বলবে যে দেহাধারের উৎকর্ষ ঘটলে তবেই সেখানে নূতন নূতন গুণ দেখা দেবে। কিন্তু তা ঠিক কথা নয়, এ কাজটি অমনভাবে হয় না। মনের রূপান্তর না ঘটিয়ে তুমি নিজের দেহের রূপান্তর ঘটাও দেখি, তা পারো কিনা দেখা যাক্!

মনকে বাদ দিয়ে তুমি একটা আঙুলও নাড়তে পারো না, এক পাও চলতে পারো না, একটা কথাও বলতে পারো না। তাহলে মনকে আগে রূপান্তরিত না করে তুমি কোন যন্ত্রের দ্বারা দেহকে রূপান্তরিত করবে? মন যেমন পুরো অজ্ঞান হয়ে রয়েছে তেমনিই যদি থেকে যায়, তাহলে দেহঘটিত রূপান্তরের প্রত্যাশা কেমন করে করবে?

প্রশ্ন দেহই কখনো কখনো তাতে দারুণ বাধা দিতে থাকে। তার কারণ কি? মন যদিও অনুকূল থাকে, তবুও তো বাধা আসে।

উত্তর সব চেয়ে বড়ো বাধা কোনখানে? সে তোমার মাথার মধ্যে। এ শুধু ব্যক্তিগত কথা নয়। দেহাশ্রয়ী যে মন সেই হয় সর্বাপেক্ষা অবাধ্য, নিজেকে অভ্রান্ত ভেবে সে কোনোমতে বদলাতে চায় না, তার নিজের অজ্ঞতা ও চিন্তারীতি তার কাছে সব চেয়ে কাম্য। আর কিছু জানতে চাও?

প্রশ্ন : তা নয়, আমি এর শোধরাবার উপায় জানতে চাই।

(মা বহুক্ষণ নীরব থেকে বললেন)

উত্তর : এই, এই হলো উপায়।

(৫)

প্রশ্ন : এখন তো অতিমানস শক্তি পৃথিবীতে এসেছে, তাহলে কি এখন জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে না গিয়েও সরাসরি রূপান্তর ঘটা সম্ভব?

উত্তর দেখ, এ নিয়ে জটিলতা থাকিও না। সম্ভাবনা রয়েছে দুরকম। বিশুদ্ধ অতিমানসিক সৃষ্টিও হতে পারে, কিংবা স্থূলদেহেরই ক্রমিক রূপান্তরেও হতে পারে, অর্থাৎ মানব-দেহের রূপান্তর হওয়া অতিমানব-দেহে ; ক্রমে ক্রমে তা আসতে বহু বহু বছর লেগে যেতে পারে, শেষে যা দাঁড়াবে তাকে পশুজগতের ভিতরকার মানুষ বলা যাবে না। অথচ একেবারে পশুলক্ষণবর্জিত অতিমানসিক সত্তাও তা হবে না তখনও তার উৎপাদন হবে পশুদের মতোই। আর পাশবিক প্রজননরীতি থেকে মুক্ত হলেও এবং রূপান্তরের মাত্রা যথেষ্ট হলেও তা পুরোপুরি অতিমানসিক সৃষ্টি হবে না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে মাঝামাঝি ধরনের একরকম প্রজাতি দেখা দেবে (একটা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে বা কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে তা বলা যায় না.) এবং তা অন্তর্বর্তী কালের জন্য কিংবা বহুকালের জন্য, সৃষ্টির দিক থেকে যেমন প্রয়োজন হবে। কিন্তু এখনকার মতো দৈহিক জন্ম নিয়েই তা যদি শুরু হয়, তবে ফল পুরো অতিমানসিক প্রীতির ক্ষেত্রের চেয়ে অন্য রকম হবেই। অতিমানবের মতো হতে পারে যা পশুলক্ষণ-বর্জিত, কিন্তু আদর্শ অতিমানসিক গঠন তার হতে পারবে না।

প্রশ্ন কিন্তু সেই রূপান্তরিত মানুষের মধ্যেও কি স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ থাকবে ?

উত্তর তুমি কি বলো ?

প্রশ্ন অতিমানস যদি তেমন রূপান্তরিত দেহের সমর্থন করে...

উত্তর "সমর্থন" করে ? তার মানে কি বলছ ?

প্রশ্ন অর্থাৎ সেই অর্ধমানব দেহে অতিমানস নেমে এলেও কি ঐরূপ প্রভেদ থাকবে...

উত্তর কিন্তু জিনিসটা মোটেই তা নয় ! একটা বোতলের মতো নয় যে তার মধ্যে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে দেওয়া হলো, সে রকম ব্যাপার নয় !

তুমি জানতে চাইছ যে সেই রূপান্তরিত দেহে এখনকার মতো স্ত্রী পুরুষের আকৃতি-গত বিভিন্নতা থাকবে কিনা ? হয়তো তা নির্ভর করবে সেই গৃহবাসীর উপর, যে সত্তাটি সেই দেহাধারের মধ্যে যাচ্ছে তার উপর। কিন্তু সে কথা জানতেই বুঝি তোমার কৌতূহল ?

প্রশ্ন : আপনি বললেন প্রভেদ থাকবে না, কিন্তু তবু নানারকম পার্থক্য তো থাকবেই।

উত্তর : কোন দিক থেকে ? চেহারাতে কিছু তফাৎ হতে পারে, কিন্তু খুব বেশী নয়। আর কোন বিষয়ে তুমি বলছ ?

প্রশ্ন নিশ্চয়ই সম্পর্কেই বলছি। দুটো জাত তো আলাদা, এখনও তাই আছে।

উত্তর সেই কথা! কিন্তু সে তো যে যেমন ভাবছে তেমনি দেখবে। ও কথা আদৌ না ভেবেও তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো। নিজের রূপান্তর যদি চাও তাহলে মনের ভাবনার মধ্যে এই সব সংকীর্ণ সীমা টানা তোমাকে ছাড়তে হবে। এখনও যদি এমনি ক্ষুদ্র রকমের নিতান্ত পশুত্বের দিকের বিচারগুলোকে আঁকড়ে থাকো, তাহলে দেহগত রূপান্তরের দিকে একটুও অগ্রসর হতে পারবে না। প্রথমেই আনা চাই ভাবনার মধ্যে রূপান্তর। কিন্তু তোমার মনের তলে তলে এখনও কিছু ধুনায়িত হচ্ছে। একটি প্রাণবন্ত চিৎসত্তা যে যৌনভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিতে পারে, এ কথা অনুভব করতে যদি না পারো, তার মানে এখনও তুমি সেই আদিম পশুত্বের অবস্থায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

প্রশ্ন ভিতরে ভিতরে আপনার কথা বুঝি, কিন্তু বাস্তব জীবনে যা সত্যিকার...

উত্তর কী সত্যিকার?

প্রশ্ন বাহ্যিক জীবনে অমন উপলব্ধি এখনও আসেনি। আভ্যন্তরীণের বেলাতে...

উত্তর তুমি কি এই জিনিস নিয়েই সারাক্ষণ ভাবো? কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুরো চব্বিশ ঘণ্টাই ও কথা একবারও চিন্তামাত্র না করে থাকা যায়। কিন্তু এ বিষয়টা নিশ্চয় তোমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি কি ভাবো যে আমি তোমাকে যা বলি তা একজন বেটাছেলে ভেবে, আর তারাকে যা বলি তা একজন মেয়েছেলে ভেবে?

প্রশ্ন আপনি না ভাবলেও তবু প্রভেদটা তো আছেই।

উত্তর: সে প্রভেদ মেনে নেবার কোনো দরকারই নেই। না মানলেও চলে।

প্রশ্ন সে কথা বুঝি, আদর্শের দিক থেকে।

উত্তর: আদর্শ! কিসের আদর্শ?

প্রশ্ন: যে, প্রভেদ কিছুমাত্র নেই। কিন্তু কারো সংস্পর্শে গিয়ে দাঁড়ালেই তখন মনে হয় যে একজন পুরুষের সঙ্গে কিংবা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি।

উত্তর সেটা খুব দুঃখের কথা, তোমার পক্ষেও এবং তার পক্ষেও। যা হওয়া উচিত ছিল তার উল্টো। কারো সঙ্গে আলাপ করবার সময় তার পশুপরিচয়কে অতিক্রম করে যাবে ; তুমি তো তার দেহকে সম্বোধন করছ না, সম্বোধন করছ আত্মাকে। তার চেয়েও বেশী কথা, তুমি সম্বোধন করছ ভগবানকে—আত্মাকেও নয়, সর্বসত্তার মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁকেই সম্বোধন করছ—এ কথা চেতনার মধ্যে থাকবে।

প্রশ্ন : কিন্তু আমার চেতনা তেমন থাকলেও তার চেতনা যদি পাশবিক হয় ?

উত্তর তোমার একার চেতনাই তেমন, আর কারো নেই ? সে সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো ? কেমন করে তুমি জানবে যে অন্য লোকটির তেমন চেতনা নেই ?

প্রশ্ন তার কথার জবাব থেকে...

উত্তর কিন্তু সেও হয়তো এদিকে তোমার সম্বন্ধেও ঠিক তাই ভাবছে :

বলি শোনো, কারো সঙ্গে কথা বলার সময় যদি ভগবৎ-উপস্থিতির ধারণা না করো, তার মানে তোমার নিজের মধ্যেও ভগবৎ-অস্তিত্ব সম্বন্ধে তুমি সচেতন নও। সে অবস্থায় অন্য কারো চেতনা কেমন তা নিয়ে বিচার করতে যাওয়াই তোমার ধৃষ্টতা। এ বিষয়ে তুমি কতটুকু বোঝো ? ঐ লোকটির মধ্যে ভগবান আছেন সে চেতনা যখন তোমার নিজেরই নেই, তখন কোন অধিকারে তুমি বলো যে তার মধ্যে তেমন চেতনা আছে কিংবা নেই ? তোমার সেই ধারণার ভিত্তি কোথায় ? শুধু একটু বাহ্যবুদ্ধি ? কিন্তু সে বুদ্ধি তো কিছুই জানে না, প্রকৃত কোনো বোধই তার নেই।

যদি তোমার দৃষ্টি সর্বত্র ভগবানের অস্তিত্ব না দেখে, তাহলে অন্য কারো ভিতরের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করবার অধিকারও তোমার নেই আর সামর্থ্যও নেই। এমনি দৃষ্টিহীন হয়ে অবলীলাক্রমে কারো সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করার যে ধৃষ্টতা, তাই নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ নিত্যই বলতেন। আর এ কথাও জানবে যে তেমন দৃষ্টি ও চেতনা যার এসে গেছে, সব কিছুর ভিতরের সত্যকে যে দেখতে পাচ্ছে, তার অমন কোনো ধারণা করবার দরকারই হয় না। কারণ সে সমস্তই জানছে ও বুঝছে। তাই বলি, যখনই তুমি কোনো মানুষের কিংবা ঘটনার কিংবা কোনো কিছুর সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার করতে যাবে, তখনই জেনো যে তুমি মানবসুলভ অজ্ঞানতায় দখলেই পুরোপুরি রয়ে গেছ।

তাহলে মোট কথা এই : যখন কিছু বোঝো তখন আর তার বিচার করতে যাও না, আর যখন বিচার করতে যাও তখন তার কিছুই বোঝোনা।

এই বিচার করা জিনিসটা প্রথমেই চেতনা থেকে সম্পূর্ণরূপে ঘোচাতে হবে। তবেই

অতিমানসের দিকে যাত্রাপথে এক পাও এগোতে পারবে কারণ এটা বাস্তব জাতীয় অগ্রগতি নয়, আর দেহগত উন্নতিও নয়, কেবল মনেরই একটু উন্নতি। সেই মনের ভিতর থেকে যদি অজ্ঞানতাকে ঝেঁটিয়ে না তাড়াও তবে অতিমানসের দিকে এগোবার আশাই নেই।

বস্তুত তুমি একটা দারুণ বেফাঁস কথা বলে ফেলেছ। যখনই বললে, "অন্যের আত্মাকে আমি কেমন করে সম্বোধন করি, সে যদি হয় একজন পশু," তখন ওতেই তুমি নিজের গায়ে একটা লেবেল এঁটে দিলে। আর কিছু নয়।

ভগবৎ-উপস্থিতি যারা সত্যই অনুভব করেছে, ভগবানের সংস্পর্শ যাদের মিলেছে, তারা সকলেই একবাক্যে বলেছে যে মানববুদ্ধির কাছে যা নিন্দনীয়, যা নিতান্ত হেয়, নিতান্ত মন্দ, তার মধ্যে প্রায়ই দিব্য আলোকের ঝিলিক উঠতে দেখা যায়। এ কেবল কথার কথা নয়, জাগ্রত অনুভূতির কথা। ভালো আর মন্দ, উত্তম আর অধম, উচ্চ আর নীচ, এই নিয়ে যা কিছু ধারণা সমস্তই মানুষের মনের অজ্ঞানতার ফল; দিব্য জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলে এই অজ্ঞান-বোধ থেকে পার হয়ে চেতনার এমন স্তরে গিয়ে উঠতে হবে যেখানে এ সব একেবারে অবাস্তব ও অবাস্তব। উচ্চ নীচ বোধ করা লোপ পেয়ে সেখানে এসে পড়েছে অন্যরকম ভাব। সেখানে এসেছে আপাতদৃষ্টের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে দেখবার ক্ষমতা, এখনকার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গিয়ে মুখোশগুলিকে ভেদ করে দেখবার ক্ষমতা।

এ কেবল কথার কথা নয়; এ খুবই খাঁটি কথা যে তখন সব কিছুরই চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। জীবনকে এবং সব কিছুকেই বামুনী দেখার চেয়ে অন্যরকম দেখতে পাও। সাধারণ যা কিছু স্পর্শবোধ ও মূল্যবোধ সমস্তই হারিয়ে যায়, এগুলিকে তখন মনে হয় অবাস্তব কাল্পনিক মোহ ভ্রান্তি, নেতি নেতি। কেবল একটা কিছু আছে যা খুবই বাস্তব, খুবই নিরেট, তা হলো সত্তার বাস্তব, কিন্তু সাধারণ চোখে দেখার সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। সে বোধ যখন আসবে, চোখে দেখার সব কিছুর ভিতর দিয়ে তলে তলে ভগবৎ-শক্তির যে ক্রিয়া চলেছে তা যখন প্রত্যক্ষ করবে, তখনই তুমি সাধারণ জীবনের মিথ্যা রকমের বাঁচার চেয়ে সত্যিকার বাঁচা বাঁচবে। তার আগে নয়।

এটা কোনো রফাতে পৌঁছনোর কথা নয়। রোগের কবল থেকে আস্তে আস্তে সেরে ওঠার মতোও ব্যাপার নয়। তোমাকে চলে যেতে হবে অন্যরকম জগতে। যতক্ষণ দেখবে যে তোমার মনই তোমার কাছে সব চেয়ে বাস্তব বোধ হচ্ছে, যতক্ষণ সেই মনের চিন্তা-প্রণালীকে খুব নিখুঁত আর অভ্রান্ত বলে জ্ঞান করছ, ততক্ষণ জানবে যে সমুচিত অবস্থার গিয়ে পৌঁছওনি। প্রথমে তোমাকে চলে যেতে হবে এই সকলের অপর পারে। তখন বুঝবে এ কথা, যা আমি বললাম। আগে এপার ছেড়ে ওপারে চলে যাও।

আর এ ধারণাও ঠিক নয় যে ক্রমশ ধীরে ধীরে সব বোঝা যাবে, এ তেমন জিনিস নয়। এ উন্নয়ন ঐভাবে আসে না। এ রহস্য অনেকটা এইরকম, যেন তুমি মুরগির ডিমের মধ্যে অবরুদ্ধ বাচ্চাটির মতো খোলসের অভ্যন্তরে আটক হয়ে আছো, আর তারই ভিতরে ভিতরে

একটা কিছু ক্রিয়া হচ্ছে—ভিতরে ভিতরেই জিনিসটা পেকে উঠছে। সেখানে কি হচ্ছে তা কেউই দেখতে পাচ্ছে না, সবই হচ্ছে আড়ালে আড়ালে। যখন তুমি পেকে তৈরি হয়ে উঠবে তখনই শক্তি পেয়ে হঠাৎ খোলস ভেঙে মুক্তির আলোতে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু এমন নয় যে ক্রমে ক্রমে তুমি প্রকাশিত হবে, তোমাকে একটু একটু করে ক্রমশ দেখা যাবে। তুমি তো এখন আবদ্ধ হয়ে আছো—হাঁ, চারিদিকেই দেয়াল আঁটা—যথেষ্ট সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন হলেও বাইরের দিকে বেরোতে গেলেই ধাক্কা খাচ্ছ। চারিদিকেই দেয়াল, যতই ঠেলাঠেলি করো কোনোমতে বেরোতে পারবে না। যতক্ষণ রয়েছ ঐ খোলসের মধ্যে ততক্ষণ রয়েছ মিথ্যার রাজ্যে। ভগবৎ-কৃপার জোরে যেদিন খোলস ভেঙে আলোতে বেরোবে, সেদিন থেকে তুমি মুক্ত।

এ কাজ হঠাৎ একদিন আপনা হতে হয়ে যাবে, অপ্রত্যাশিত ভাবে। ক্রমশ যে সেই অবস্থায় পৌঁছবে তা আমার মনে হয় না। ধীরে ধীরে অন্ধকার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে একটু একটু করে দেখতে পাবে বলেও মনে হয় না। তেমন দৃষ্টান্ত কই আমি দেখিনি। বরং এই দেখেছি যে ভিতরে ভিতরে একটা শক্তি জমে ওঠে, প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে, জিদটা এমন বেড়ে ওঠে যে তার মধ্যে ভয়-ভাবনা বা বিচার-আচার কিছু থাকে না, আস্পৃহা যেন দুর্দান্ত হয়ে ওঠে।

তারপরে তুমি বোমার মতো ফেটে বেরিয়ে পড়ো তোমার অন্ধ কারাগার থেকে ব্যাপ্ত জ্যোতির মধ্যে, কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারে না।

তারপর আর ফেরা নেই। সে তখন প্রকৃতই এক নবজন্ম।

(৬)

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে সমবেত যোগ আমরা করি কিনা, ও তা কেমন ভাবে করা যায়।

গোড়াতেই বলি যে এর জন্য সকলে যথার্থরূপে একজোট হওয়া দরকার, আর কেমন-ভাবে তা হতে পারে সেই কথাটাই বলা দরকার। গতরাত্রেই এ সম্বন্ধে এক প্রতীক স্বপ্ন দেখেছি।

প্রথম রাত্রের স্বপ্নটি দেখে এক অপ্রীতিকর মনোভাব নিয়ে আমি জেগে উঠলাম। তখনই আবার ঘুমিয়ে পড়ে তা ভুলে গেলাম। কিন্তু এইমাত্র প্রশ্নটির কথা ভাবতে গিয়ে আমার সেই স্বপ্ন মনে পড়ে গেল। তা এমনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমি তোমাদের যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলতে দিলে না; বলতে চেয়েছিলাম সমবেত যোগের যে আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লিখেছেন সেই কথাই

—যে বিজ্ঞানময় ও অতিমানসগত সত্তাসম্মিলনের দ্বারা পূর্ণ যোগ সাধিত হতে পারে এবং তার ফলে একটা দিব্য মিলনী ক্রমশ গড়ে উঠতে পারে।

আমার এই স্বপ্নের প্রতীক চিত্রটি খুব স্পষ্ট, আর তা অতি পরিচিত জিনিস ; কিন্তু পরিচিত হলেও তা খুবই বাস্তব, তার মধ্যে ফাঁকি নেই। বিশদভাবে তার বর্ণনা করতে গেলে তোমরা হয়তো সমস্তটা বুঝবে না, কারণ অনেক জটিল ব্যাপার রয়েছে তার মধ্যে। মোটের উপর তা বিরাট রকমের এক হোটেলের চিত্র, তার বিস্তর রকমের বিভিন্ন দিকের বিভাগে সকল সম্ভাব্য জিনিসেরই স্থান আছে, আর সব দিকেই নিত্য একটা রূপান্তরের কাজ চলেছে।

লোকজন তার মধ্যে বাস করতে করতেই বাড়িটার এক এক অংশ ভেঙে ধূলিসাৎ করা হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং তুমি নিজের ঘর ছেড়ে যদি একবার অন্যত্র যাও তাহলে ফিরে এসে সেই ঘর খুঁজে পাবে না, সে দিকটা ততক্ষণে ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়া হচ্ছে। কিন্তু সেই অসাধারণ বিপর্যয়ের মধ্যেও একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। সমস্ত মিলিয়ে এমন একটা ছবি যা শ্রীঅরবিন্দের বিবৃতির সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে তিনি বলেছেন দৈহিক রূপান্তর আনতে ও জীবনকে দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করতে যেমন যেমন হওয়া প্রয়োজন তার কথা।

আমার স্বপ্নটি দেখলাম অনেকটা এইরকম সেই বিরাট অট্টালিকার ঠিক কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি ঘর, এক মা ও তার মেয়ের থাকার জন্য নির্দিষ্ট। মেয়ের মা এক বৃদ্ধা মহিলা, তিনি হলেন কর্ত্রী, সেখানকার সব কিছু কাজ তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। আর মেয়েটির এমন এক কর্মঠতা ও তৎপরতা যে এককালে সর্বত্রই সে উপস্থিত হতে পারে, এমন কি সেই ঘরের মধ্যে থেকেও—ঘর না বলে ছোট কামরা বলা চলে—সেই কেন্দ্রস্থ কামরার মধ্যে থেকেই। আর সেই মেয়ে তার মায়ের সঙ্গে সর্বদাই আলোচনায় নিযুক্ত। মা চায় যে সবই চলুক বর্তমানের ছন্দে, এক ভেঙে অন্য গড়া আবার তা ভেঙে আরো অন্য গড়া, বাড়ীটা যাতে ভয়ংকর অনিশ্চিতের রূপে দেখা দেয়। কিন্তু মেয়ে চায় অন্যরকম, সে চায় এমন এক নূতন গঠন, এমন পরম শৃঙ্খলা যাতে অনিশ্চিতের প্রয়োজনই হবে না। যখন সে দেখলে যে ঐ বিতর্কের কোনো মীমাংসা নেই, তখন সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সর্বত্র দেখাশোনা করতে। কিন্তু তার পরে যখন সে ঘরে ফিরে আসতে চাইলে তখন এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। কোন দিকে তার ঘর তা সে ঠিকই জানে, কিন্তু যেদিকে পা বাড়ায় সেই-দিকেই দেখে যে সেখানে যাবার সিঁড়িটাই হয়তো নেই, কিংবা সেদিকের সমস্তই হয়তো এমন পাল্টে গেছে যে পথের হদিস মিলছে না। তখন সে এদিক খোঁজে, ওদিক খোঁজে, উপরে নীচে ওঠানামা করে, ঘুরে ফিরে কেবলই পথ খুঁজতে থাকে, কিন্তু ঘরে যাবার কোনো পথই মেলে না। যা দেখছিলাম সবই পরিচিত জিনিস, যেমন হয়ে থাকে এই ধরনের প্রতীকী স্বপ্নে ; এক জায়গাতে হোটেলের অফিসও রয়েছে, সেখানে একজন স্ত্রীলোক ম্যানেজারও আছে সকল ঘরের চাবিগুলি নিয়ে, কার কোন ঘর তাও সে জানে। মেয়েটি তার কাছে গিয়ে বললে, "আমার ঘরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারো ?" সে বললে, "নিশ্চয়, এ আর

মুশকিল কি?" সকলেই তার দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল, ভাবটা এই যে "কেমন করে এ কথা বলছে?" সে কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে কর্তৃত্বের সুরে চাবিটা চেয়ে নিলে, বললে, "চলো তোমার ঘরে নিয়ে যাই।" অনেক আঁকাবাঁকা ঘোরাপথ দিয়ে সে তাকে নিয়ে চলল। মেয়েটি খুব সন্তর্পণে তার পিছু পিছু যাচ্ছে, যেন হারিয়ে না যায়, কিন্তু যেমনি কাছাকাছি পৌঁছেছে অমনি ম্যানেজার তার চাবিসমেত অদৃশ্য হয়ে গেল! শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই অদৃশ্য হলো।

এই স্বপ্নের হেঁয়ালির অর্থ বোঝবার জন্য বলে রাখি যে ঐ যা হলো জগৎপ্রকৃতি, আর মেয়েটি হলো নূতন সৃষ্টি। ম্যানেজার হলো মনশ্চেতনা, অর্থাৎ এখনকার যে সর্বোচ্চ চেতনা বাস্তব প্রকৃতির রাজ্যে কাজ করছে। এই হলো স্বপ্নটির মূল সূত্র। অবশ্য আমি জেগে উঠেই বুঝলাম যে ঐ দুরূহ সমস্যার মীমাংসা কি হবে। চাবিসমেত ম্যানেজারের অদৃশ্য হবার অর্থই এই যে নূতন সৃষ্টিচেতনাকে সে যথোচিত স্থানে পৌঁছে দিতে অক্ষম।

এ কথা আমি জানতাম তবু দেখতে পাইনি, কারণ এখনও তা অভিব্যক্তির মধ্যে আসেনি। অর্থাৎ সে ধরনের চেতনা এসে এই জগৎ-হোটেলে রূপান্তর ঘটিয়ে একে সঠিক সংকল্পানুযায়ী বাস্তবে পরিণত করবে, এবং যা হবে তার সত্য রূপ, যা তার কেন্দ্রগৃহকে সার্থকভাবে চিনিয়ে দিতে পারবে, তার অভিব্যক্তি এখনও ঘটেনি।

এই প্রতীক চিত্রটি খুবই স্পষ্ট সকল সম্ভাবনা ও সকল ক্রিয়াই এর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এলোমেলো ভাবে। মূল কেন্দ্রস্থ সত্য চেতনা ও সংকল্পকে ঘিরে একত্রে গুছিয়ে নেই। এবার আমরা সমবেত যোগের কথাতেই এসে পড়লাম, অর্থাৎ যে সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা ঐ সম্বন্ধে সাফল্য ঘটতে পারে। তা কেমন জিনিস হওয়া চাই?

অবশ্য আগেকার লোকেরা যেমন একটা মামুলী জিনিস গড়ে রেখেছে ঐ হোটেল-বাড়ির দেয়ালগুলোর মতো, সবই অনিশ্চিতের বাঁধনে যেমন তেমন ভাবে দাঁড় করানো, সেরূপ হলে চলবে না। সাধারণত যেমন করা হয়, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় একত্রে সমবেত হবার জন্য একটা মঠের মতো গড়ে, সকলে একই রকমের ভেক নেয়, একই রকমের ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসরণ করে, অর্থাৎ একই পোষাকে থাকা, এক ভাবে আচরণ করা, একই সময়ে নিদ্রাত্যাগ, একই খাদ্য খাওয়া, একত্রে উপাসনা করা, ইত্যাদি। সব কিছুই হচ্ছে সমান-ভাবে, কিন্তু তলায় রয়ে গেছে অব্যবস্থিতচিত্ত, প্রত্যেকের মন কাজ করছে তার আপন আপন রাস্তায়, সেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শের সমতা থাকলেও তার মধ্যে থেকে যায় বিস্তর ফাঁকি।

এই হলো প্রচলিত সমবেত প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত—একটা সাধারণ আদর্শকে বা কর্মমার্গকে বা উপলব্ধিকে কেন্দ্রস্বরূপ করে তাকেই ঘিরে সকলে একজোট হওয়া, কিন্তু তবু সেই সম্মেলনের মধ্যে সবটাই কৃত্রিম। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, এমন সত্যিকার জোট হওয়া চাই, যাকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানময় বা অতিমানসের গোষ্ঠি, যার মধ্যে প্রত্যেকেই আভ্যন্তরীণ উপলব্ধিতে পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃত একত্ব ও তাদাত্ম্য বোধ করবে, সকলেই এক, আমার মধ্যে

রয়েছে সকলেই, সকলের মধ্যেই আমি। আমার আপন দেহের মতো সকলেই, কেবল মনোগতভাবে বা কৃত্রিমভাবে নয়, আভ্যন্তরীণ চেতনার সত্য ঘটনা রূপে।

সুতরাং এমন উপলব্ধি আসার আগে প্রত্যেককেই হতে হবে বিজ্ঞাননয় সত্তা, অন্ততপক্ষে তারই সূচনা হওয়া চাই। তাতে সন্দেহ নেই। আগে হবে ব্যক্তিগত ক্রিয়া, তার থেকে আসবে পরে সমবেত ক্রিয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হয় যে কোনো ইচ্ছার ক্রিয়া ব্যতীত আপনা হতেই সমবেত অবস্থার প্রভাবে ব্যক্তিগত ক্রিয়া প্রভাবিত হয়, কিংবা একেবারে তার ফল ব্যর্থও হতে পারে। ব্যক্তিচেতনা ও ব্যষ্টিচেতনার পরস্পর-নির্ভরতা এমনই অকাট্য যে হাজার চেষ্টাতেও তা সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না। তুমি যদি তোমার যোগের প্রভাবে সমগ্র মানবচেতনা ও জগৎচেতনা থেকে নিজেকে মুক্ত ও তফাত করে রাখতে চাও, তথাপি তোমার অবচেতনের মধ্যে সমগ্রের অবস্থার সঙ্গে একটা বাঁধন থেকে যাবে, আর সেই বাঁধন তোমাকে আটকে রাখবে, তোমাকে পিছনে টানবে। সকল বাঁধন ও সকল দায়িত্বের বোঝা সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হবার প্রয়াস তুমি করতে পারো, এবং তাতে যদি বিবর্তনপথের শেষ প্রান্তে গিয়েও উপনীত হও, তবুও তোমার উপলব্ধি নির্ভর করবে সর্বজনের উপলব্ধির যাত্রার উপর, পৃথিবীর তাবৎ মানবের অবস্থার সঙ্গে তুমি জড়িত থাকবেই। সুতরাং পিছনের টান থাকবেই, তাতে এমনও হতে পারে যে পৃথিবী তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তোমার চরম উপলব্ধি মিলবে না, সেজন্য কত শতাব্দী অপেক্ষায় থাকতে হবে।

তাই শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বলেছেন যে প্রচেষ্টা উভয়মুখী হওয়া দরকার ; অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই সমগ্রকেও উপরে তোলার প্রচেষ্টা, তাতে ব্যক্তিগত উন্নতির মাত্রা আরো বাড়বে সমগ্রের উন্নতিতে তুমি আরো এক ধাপ এগোবে।

তাই আমার মনে হয় যে কখনো কখনো সমবেত ধ্যানও আমাদের দরকার ; যাতে একটা সমৃদ্ধ আবহাওয়া তৈরি হয়, ঐ স্বপ্নের হোটেলের আবহাওয়ার চেয়ে তা স্বচ্ছ হয়। ঐরূপ ধ্যানের ফলে এই হবে যে তুমি আপন অন্তরের গভীরতম প্রদেশে একটা ঐক্যভাবের সন্ধান পাবে কিংবা তা সৃষ্টিও করতে পারবে, এবং তার জোরে সকল বস্তুকে যথাযথ স্থান দিয়ে এই বিশৃঙ্খলার বাইরে এক নতুন শৃঙ্খলার জগৎ রচনা করতে পারবে।

(৭)

প্রশ্ন : "অতিমানস অভিব্যক্তি" ("The Supramental Manifestation P. 78") পুস্তকে লেখা হয়েছে—"অতিমানস এখানে উপস্থিত, কিন্তু তা রয়েছে নিবর্তিত অবস্থায়, আপাত অভিব্যক্ত মন প্রাণ জড়ের অন্তরালে তা গুপ্ত।" এখানে "নিবর্তিত অতিমানস" কথার অর্থ কি ?

উত্তর : অনিবর্তিত অতিমানস যা, সেও তাই, একই জিনিস।

একই কথা অনেক প্রকারে বলা যায়। শ্রীঅরবিন্দ আবার এ কথাও বলেছেন যে ঈশ্বর সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত না হলে এ জগতের অভিব্যক্তি ঘটতনা। একই কথা হলো। অর্থাৎ তিনি বলছেন যে ভিতরকার মূল গঠনে এই সৃষ্টিও ঐশ্বরিক, এই জগৎও ঐশ্বরিক ; আর একদিন স্বয়ং তিনি নিজেও অভিব্যক্ত হয়ে বাস্তবরূপে প্রকাশ পাবেন সমস্ত অবগুণ্ঠন ঘুচিয়ে ও সকল বিকৃতিকে দূর করে দিয়ে। এখনও পর্যন্ত জগতে তাঁর অভিব্যক্তি সীমাবদ্ধ, যেমন আমরা দেখছি ; কিন্তু সে অভিব্যক্তি হবে সীমাহীন। এখন দেখা দিয়েছে এই মনোময় জগৎ যার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হলো মানুষ ; কিন্তু এর পর আসবে আরো এক উচ্চতর বাস্তবের জগৎ যাকে তিনি বলেছেন অতিমানস। এই মনের ধাপের পরের ধাপই সেই অতিমানস—জগতের দিক থেকে দেখলে স্বভাবতই তা মনের উপরকার জিনিস। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে সেই নূতন উত্তরণে একরকম জগৎ বদ্‌লে গিয়ে অন্যরকম জগৎ হবে, কারণ এখনও পর্যন্ত সৃষ্টি রয়েছে যাকে তিনি বলেন "নিম্ন গোলার্ধের" অন্তর্গত, যা হলো নিশ্চেতনার ভিত্তিতে নির্জ্ঞানের রাজ্য, কিন্তু সেই জগতে তা সম্পূর্ণ উল্‌টে গিয়ে হবে অন্য-রকম রাজ্য ; এখনকার নির্জ্ঞানের ভিত্তির পরিবর্তে তখনকার ভিত্তি হবে সত্যের ভিত্তি। সুতরাং তা পুরোপুরি এক নূতন জগৎই হবে। কিন্তু তেমন জগতের বীজ যদি এই জগতের মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে না থাকতো তাহলে এর পক্ষে তেমন রূপান্তর আসার কোনো আশাই থাকত না ; আর তেমন জগতের সৃষ্টি হলেও দুটি বিপরীত ব্যাপার দাঁড়িয়ে যেতো, এর সঙ্গে তার কোনো যোগ থাকত না ; যেমনি কেউ সেই সত্য জ্ঞান ও আলোর রাজ্যে প্রবেশ করতো অমনি নির্জ্ঞানের জগতে তার অস্তিত্ব লোপ হতো।

তাহলে তেমন পরিবর্তন ঘটলে দুই জগতের সংযোগ কেমন হবে, পুরানোর উপর নতুনের কাজ কেমন করে হবে ? তা হতে পারবে এই কারণে যে পুরানো জগতের মধ্যে আগের থেকেই তার বীজ অন্তর্নিহিত ও নিবর্তিত হয়ে রয়েছে। যদিও তা অদৃশ্য হয়ে গোপনে রয়েছে এতই তলদেশে যে সম্পূর্ণ অপ্রকাশ—কিন্তু তবু তা রয়েছে এর মধ্যে। তথাপিও কিন্তু উপর থেকে অতিমানসের চেতনা শক্তি ও আলো এই পৃথিবীতে সরাসরি নেমে আসা দরকার, যেমন হয়েছে দেড় বছর পূর্বে, নতুবা এখানকার অতিগভীরে নিবর্তিত বীজ-স্বরূপ অতিমানসের, সম্যক বিকাশের সম্ভাবনাই থাকবে না। উপরের স্পর্শের সাড়া পেয়ে তবেই নীচেকার জাগরণ ও বিকাশ ঘটবে, সেই জিনিসের স্পর্শ এসেই ফুটিয়ে তুলবে এখানকার জড়ের তলায় লুক্কায়িত তার সমধর্মী জিনিসকে। আর সেই কাজই এখন হচ্ছে। কিন্তু যে কথা আমি কিছুদিন আগেও বলেছি, এখানকার বস্তুজগতের সাধারণ চেতনাতে তার বস্তুধর্মী শক্তি এমনই প্রচণ্ড যে অতিমানসের শক্তি ও চেতনা নেমে আসা মাত্রই সে তৎক্ষণাৎ তাকে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে ; তাই তাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত ও গোচরীভূত অবস্থায় আনতে এখনও সুদীর্ঘ প্রস্তুতির দরকার। আপাতত এই কাজেই সে নিযুক্ত রয়েছে।

কত সময় লাগবে, তা আগের থেকে বলা কঠিন। অনেকটাই নির্ভর করছে বিশেষ কতকগুলি ব্যক্তির গ্রহিষ্ণুতা ও শুভেচ্ছার উপর, কারণ ব্যষ্টিপ্রচেষ্টা অপেক্ষা ব্যক্তিপ্রচেষ্টাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, আর সৃষ্টির অন্যান্য অংশের চেয়ে বিশেষ করে মানবজাতির মধ্যেই স্বভাবত অতিমানসের অভিব্যক্তি প্রথমে হবে।

এর জন্য যে সহযোগিতা করা দরকার তার মূলে থাকা চাই পরিবর্তনকারী ইচ্ছা, যেমন আছি তেমনি থাকা চাই না, কিন্তু এই ইচ্ছা যে এখনকার এমন অবস্থা যেন আর না থাকে। পরিবর্তনের দিকে পা বাড়াবার বহু রাস্তা রয়েছে, অগ্রগতিতে সফল হতে পারলে সব রাস্তাই ভালো। যেমন অবস্থায় রয়েছি তাতে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে তার থেকে বেরিয়ে অন্য অবস্থায় যাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকেই করতে পারে। আর অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ ভাবে তুমি নিজের মধ্যে তার স্পর্শকে ধারণা করতে পারো, সত্য ও সুন্দরের আগমন যথার্থ বলে বোধ করে তুমি অনাত্মরূপ সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে চলতে পারো, যাতে সেগুলি তোমার ঐদিকের যাত্রাপথে গুরুভার বোঝা হয়ে না থাকে। আর সব চেয়ে অপরিহার্যরূপে চাই এগিয়ে যাবার জন্য এক জলন্ত আগ্রহ, যাত্রাপথের সকল বাধাকে স্বেচ্ছায় ও সহজে বর্জন, অজ্ঞানিতের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে যা কিছুই তোমাকে পিছনে টানতে তাকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া,—কারণ তুমি নিশ্চিত জেনো যে আগামী কাল এ সত্যের অনিবার্য বিকাশ হবে, কারো কোনো অশুভ ইচ্ছা ও এমন কি স্বয়ং প্রকৃতির ইচ্ছাও তাকে রোধ করতে পারবে না—আর তা সুদূর ভবিষ্যতের কথাও নয়, এখনই তার কাজ শুরু হয়ে গেছে, যারা পুরানো অভ্যাস ঘুচিয়ে নিজেকে বদলাতে জানে তারা নিশ্চয় সে জিনিস দেখবে ও তার আনন্দের ভাগ পাবে।

তোমরা বিস্মৃত হও, ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকো—সব সময়ই ভুলে থাকো। কিন্তু এই কথাটি যদি স্মরণ রাখো যে তোমরা জন্মেছ এক অদ্বিতীয় যুগের অপূর্ব সন্ধিক্ষণে, নব জগতের অভ্যুদয় দেখার পরম আনন্দলাভের অমূল্য সুযোগ তোমাদের ভাগ্যে মিলেছে, এ-কথা স্মরণ রাখলে তোমরা অনায়াসেই সকল বাধাকে তুচ্ছ করে অতিক্রম করে যেতে পারবে। সুতরাং সব চেয়ে দরকার এই কথাটি স্মরণ রাখা। এমন কি কোনো বাস্তব অনুভূতি না মিললেও, সুনিশ্চিত রকমের লক্ষণ কিছু না দেখলেও, এই স্মৃতিকে ও বিশ্বাসকে সর্বদা পোষণ করতে থাকবে, নিত্যই এ কথা বার বার স্মরণ করবে, এই কথা মনে রেখেই রাত্রে শুতে যাবে, এই কথা মনে করেই সকালে শয্যাত্যাগ করবে; যা কিছুই করো, তার পিছনের পটভূমিকাতে থাকবে এই সর্বোচ্চ সত্য যে নতুন জগতের সৃষ্টিমুহূর্তে তুমি এখানে উপস্থিত রয়েছ।

সেই জিনিসের মধ্যে তুমি কিছু অংশগ্রহণ করতে পারো, এই নতুন দিব্য জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো। আর প্রকৃতই যখন এমন অপূর্ব সুযোগ তোমার মিলেছে তখন তার জন্য তুমি কোনো কিছুই ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নও। *

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে)

৮১

ভগবান কখনো কখনো এমন উৎকট হাসি হাসেন যা ভদ্রলোকের কানে শোনার মতো নয় ; তিনি কেবল মোলিয়ের (Molière) হয়েই খুশি থাকেন না। তাঁকে এরিস্টো-ফেনিস (Aristophanes) এবং র‍্যাবলেও (Rabelais) হতে হয়।

৮২

মানুষ যদি জীবনকে এমন গুরুতর ব্যাপার করে না তুলত তাহলে শীঘ্রই জীবনকে নিখুঁত করে আনতে পারত। ভগবান তাঁর কোনো কাজকে খুব বেশী গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন না , তাই আমরা বিশ্বকে দেখতে পাই এমন অত্যাশ্চর্য।

৮৩

লজ্জা থাকা খুব ভালো কথা, আর তা সুরুচির ও সুনীতির দিক থেকেও অপরিহার্য ; তবু কিন্তু ওটা দুর্বলতা ও অজ্ঞানতারই লক্ষণ।

প্রশ্ন এই যে জীবনকে গুরুত্বের সঙ্গে নিলে তাতে জীবন নিখুঁত হতে বাধা কোথায় ?

উত্তর : অর্থাৎ জীবনে সততা ও সাধুতাকে সব চেয়ে গুরুত্ব দিলে প্রকৃত জীবনের অনেক কিছুকেই পিষে মারতে হয় ; জগতের সকল দেশে যতরকম সাধুতার আদর্শ আছে সেগুলিকে যদি একত্রিত করো তাহলে প্রকৃত জীবনের অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

সাধুতা যদিও পূর্ণতারই দাবি করে, কিন্তু পূর্ণতা হলো এক অখণ্ড জিনিস। দুটি পরস্পর-বিরোধী হয়ে দাঁড়ান। অনেক কিছুকে বাদ দিয়ে কমিয়ে দিয়ে এবং সীমার গণ্ডি দিয়ে তবে হবে সাধুতা—কিন্তু পূর্ণতার কোনো কিছুই বাদ নেই, সব কিছুকেই যথাযথ স্থান দিয়ে রাখা হয়। সুতরাং দুই জিনিসে আপোষ চলে না।

জীবনকে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে সাধারণত দুটি ক্রিয়া থাকে : প্রথম হলো, যার বিশেষ কিছু মূল্য নেই তাকে মূল্য দেওয়া, আর দ্বিতীয়ত তাতে এমন গুণের আরোপ করা যাতে মনে হবে জীবনের পক্ষে তাই সব চেয়ে পবিত্র ও কাম্য। কেউ-কেউ (যেমন শ্রীঅরবিন্দ যাদের বলেন "শুচিবাদী" ও "গোঁড়া সাধু", ("puritan or prudish") এই সততার ফলে হয়ে পড়ে শুষ্ক, নীরস, কঠোর এবং অত্যাচারী, তারা সব কিছুর মধ্যে বিশেষত মুক্ত আনন্দের মধ্যেও, কেবল খুঁত ধরে বেড়ায়।

জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে হলে (আমি পার্থিব জীবনের কথাই বলছি) অনেকটা উপরে উঠে তাকে সমগ্ররূপে দেখা চাই, কেবল তার বর্তমানটুকু নিয়ে নয়, কিন্তু তার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একত্রে মিলিয়ে ; কি ছিল, কি হয়েছে, আর কি হবে—তিনটিকেই একসঙ্গে দেখা চাই। তবেই সব কিছুকে তার যথাস্থানে রেখে দেখতে পারবে। কোনো কিছুকেই চাপা দিতে হবে না, আর তা করাও উচিত নয়, সব কিছুকেই তার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করে তখন তার মধ্যে একটা পূর্ণ সঙ্গতি খুঁজে পাবে। যাকে শুচিবাগীশের বিচারে মনে হয় "খুবই মন্দ" বা "ঘৃণার্হ" বা "অপাংক্তেয়", তাকেও তখন দেখবে ভগবৎসৃষ্ট জীবনেরই একরূপ মুক্ত ও আনন্দময় ক্রিয়া। ভগবান নিজেকে অসংখ্য রূপনে দেখে অনন্ত আনন্দে যে আশ্চর্য হাসি হাসেন, তা জানতে বুঝতে আর অনুভব করে আমোদ পেতে তখন আর কোনো বাধাই থাকবেনা।

তাঁর সেই অত্যাশ্চর্য আনন্দের হাসি যে সমস্ত অন্ধকারকে ও সকল দুঃখ বেদনাকে একেবারে গলিয়ে দেয় ! নিজের ভিতরকার গভীরতম অন্দরমহলে চলে গিয়ে যদি সেখানকার সূর্যালোকের মধ্যে ডুব দাও তো দেখবে যে সেখানে এক সর্বসঙ্গতিপূর্ণ জ্যোতির হাসি ছাড়া অন্য কিছুই নেই, মলিন ছায়া বা ব্যথাবেদনা কিছুই না। বস্তুত সেখানে দাঁড়িয়ে যদি মারাত্মক বিপত্তিগুলিকে ও এমন কি তীব্রতম দৈহিক যন্ত্রণাকেও লক্ষ্য করো, তবে দেখবে যে সবই অবাস্তব, দুঃখও অবাস্তব, যন্ত্রণাও তাই—সব কিছুই সেই আনন্দজ্যোতির নানারূপ তরঙ্গ স্পন্দন। সব কিছু দুঃখ দুর্দৈব ও যন্ত্রণাকে দূর করতে এই হলো সব চেয়ে জোরালো উপায়। প্রথম দুটিকে দূর করা অপেক্ষাকৃত সহজ (আমি অপেক্ষাকৃতই বলছি), আর শেষেরটিকে দূর করা তার চেয়ে কঠিন ; তার কারণ দেহকে তুমি সব চেয়ে নিরেট বাস্তব ও প্রত্যক্ষরূপে নিতেই অভ্যস্ত হয়েছ ; কিন্তু তাও একই জিনিস, কেবল আমরা সেটা শিখিনি বলে তাই, যেহেতু দেহকে আমরা তরল নমনীয় ও নিত্য পরিবর্তনীয় অনিশ্চিত জিনিস বলে ভাবতে অভ্যস্ত হইনি। যে জ্যোতির হাসি সমস্ত অন্ধকার, অসঙ্গতি ও দুঃখের কান্নাকে গলিয়ে দিতে পারে, তাকে এই দৈহিক ব্যাপারের মধ্যেও আমরা এনে ফেলতে শিখিনি।

আর সেই দিব্য হাস্যময় জ্যোতি রয়েছে সকল বস্তুরই কেন্দ্রে, তার অন্তরতম সত্যবস্তু রূপে। দরকার শুধু তাকে দেখতে বুঝতে ও চিনতে শেখা। আর সেজন্য দরকার এমন সব লোককে তফাতে রাখা যারা জীবনকে করে তুলেছে গুরুগম্ভীর, যাদের সঙ্গ দারুণ অস্বস্তিকর।

আবহাওয়াটা যেমনি ভারী ভারী বোধ করবে অমনি জানবে যে কোথাও ভুল কাজ হচ্ছে, অন্তত প্রভাব আসছে, মানুষী পূর্বাভ্যাসগুলো আবার এসে পড়ছে, তাকে যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়। আর সেই সঙ্গে এসে পড়বে যত কিছু অভিযোগ, বিলাপ, অযোগ্যতা ও অপরাধের মনোভাবের গ্লানি, আর এক ধাপ নামলেই নিজেকে পাপী ও হেয় বোধ করা। ওঃ! এসব হলো সেকেলে অন্ধকার যুগের কথা।

কিন্তু এখনও এগুলো টিকে আছে। এই সব যত নিষেধ বিচার ও জীবনকে দুই ভাগে কেটে ভাগ করা—ছোটো আর বড়ো, পবিত্র আর অপবিত্র! তথাকথিত আধ্যাত্মিক জনেরা বলবে, "সে কি কথা! তুচ্ছ জিনিস কখনো অনুভূতির বিষয় হতে পারে?" কিন্তু তুচ্ছও যে অতুচ্ছ হয়ে এমন কি স্থূলভাবেও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। ভগবান এতে আছেন আর ওতে নেই, এমন কখনো হয় না। সবের মধ্যেই তিনি সর্বক্ষণ রয়েছেন। কোনো কিছুকেই তিনি গুরুত্বের চোখে দেখেন না, সব কিছুতেই আমোদ পান, আর খেলতে জানলে তোমার সঙ্গে তিনি খেলাই করেন। কিন্তু তা তুমি জানো না, লোকেরা কেউ খেলতে জানে না। অথচ তিনি জানেন, আর কি সুন্দর তাঁর খেলা! এমন কি সামান্য তুচ্ছ জিনিস নিয়েও তিনি খেলা করেন। টেবিলে কিছু রাখবে? তাই নিয়ে ভাবনার দরকার নেই, সাজানো গোছানোর দরকার নেই, কারণ তা খেলাই হচ্ছে, যেমন খুশি তেমনিভাবে রেখে দাও। আবার একটু পরে অন্যরকম ক'রে রাখো।...এই হলো খেলা, যথেষ্ট আমোদ আছে এতে।

তাহলে এখন বোঝা গেল, ভগবানের সঙ্গে কেমন করে হাসতে হয় তারই কৌশল জানতে আমরা চেষ্টা করব।*

---

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[চতুর্থ পাদ—পূর্ণযোগ]

১

পূর্ণযোগের মূলতত্ত্ব

চিৎশক্তিকে অন্তরাবৃত্ত এবং ঊর্ধ্বস্রোতা করে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করাই যোগ। শক্তি একরকমের নয়। প্রচলিত যোগবিধিগুলিতে আছে এক বা একাধিক শক্তির সাধনা। আর পূর্ণযোগের সাধনা সব শক্তির সমাহারে এবং সমন্বয়ে। প্রাচীনে-নবীনে গোড়াতেই এই একটা বড়রকমের তফাত।

এদেশের যোগপন্থাগুলিকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা যেতে পারে—হঠযোগ রাজযোগ কর্মযোগ জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ। পূর্ণযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এতক্ষণ ধরে আমরা এদের নিয়ে আলোচনা করে এসেছি। দেখেছি, হঠযোগ আশ্রয় করে মুখ্যত দেহ আর প্রাণের শক্তিকে, রাজযোগ মনের শক্তিকে আর এ-দুটি যোগই নিরোধপ্রধান। বাকী তিনটি যোগের সাধন হল আত্মশক্তি, তারা মুখ্যত ভাবনাপ্রধান। সঙ্কল্প (will) ভাবনা (thought) এবং বেদনা (feeling)—আত্মশক্তির এই তিনটি বিভাব যথাক্রমে তাদের অবলম্বন।

কিন্তু যে-শক্তিকেই আশ্রয় করে আমরা যোগ করি না কেন, মূলত সব শক্তি আত্মার শক্তি। যোগপথের গোড়াতে রুচি ও সংস্কার অনুসারে আমরা একেকটি শক্তিকে বেছে নিই বটে, কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে গেলে দেখি, শক্তির ধারাগুলি বাইরে থেকে যেমন আলাদা-আলাদা বলে মনে হয়েছিল, আসলে তারা তা নয়। নিজের মত বা পথকে গোঁড়ার মত আঁকড়ে না থাকি যদি, তাহলে একসময় দেখতে পাই, সব যোগের মধ্যে অন্যোন্য-প্রবেশের একটা সম্ভাবনা আছে, এমন-কি এক যোগের সাধনায় আরেক যোগের ফল পাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কারণ সুস্পষ্ট। চিৎ-শক্তিকে বিভিন্ন বৃত্তিতে আমরা ভাগ করি আমাদের গরজে। আসলে সে আগাগোড়া আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছে একটা সংহত (organised) এবং সুসমন্বিত রীতিতে। বৃত্তিগুলি অন্যোন্যনির্ভর এবং এক অখণ্ড শক্তির বিভাব মাত্র। গোঁড়াতে তাদের মধ্যে সমন্বয় আছে বলে যোগের পথেও তাদের সমন্বয় সম্ভব।

এদেশের সাধনপন্থাগুলির মধ্যে একমাত্র তন্ত্রই সমন্বয়ের পথে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তন্ত্রের মধ্যে একটা সার্বভৌম উদার দৃষ্টি আছে, সাধনা ও সিদ্ধির পথে জীবনের কোন-কিছুকেই বাদ দিতে সে রাজী নয়। 'যে-মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তা-ই ধরে'—এই হল তন্ত্রসাধনার একটা মূল নীতি। তাই সে দুঃসাহসিকের মত জীবনের অনেক অন্ধশক্তিকেও যোগে রূপান্তরে এনে ভাস্বর করে তোলবার চেষ্টা করেছে। সব যোগেরই লক্ষ্য মুক্তি, তন্ত্রেরও তা-ই। তবুও সে জোরের সঙ্গেই ভুক্তিকেও মুক্তির অনুগামী করেছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক প্রায় সব যোগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করায় এদেশের সাধনায় বৈরাগ্যবাদ প্রবল হয়েছে। একমাত্র তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকের উপর নয় —যুগনদ্ধতার উপরে, এমন-কি কখনও-কখনও শক্তিকে সে শিবের চাইতে বেশী মর্যাদা দিতে চেয়েছে।

*

পূর্ণযোগও সমন্বয়ের পথে তন্ত্রের সহচারী, যদিও তন্ত্রের সঙ্গে তার তফাতও আছে। শিব-শক্তির যুগনদ্ধতা পূর্ণযোগেও অঙ্গীকৃত। কিন্তু তন্ত্র সাধনা শুরু করে শক্তিকে দিয়ে, আর পূর্ণযোগ করে শিবকে নিয়ে। তন্ত্র ক্রিয়াপ্রধান, আর বেদান্তের মতই পূর্ণযোগ ভাবনাপ্রধান। তাইতে পূর্ণযোগের মধ্যে গীতোক্ত ভাবনাপ্রধান যোগত্রয়ের অর্থাৎ কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ অতিসহজেই হয়েছে। পূর্ণযোগে এদের সাধনাই মুখ্য, রাজযোগ প্রাসঙ্গিক, হঠযোগ না করলেও চলে। তন্ত্রের সাধনার সঙ্গে মিল না থাকলেও তার দর্শন আর লক্ষ্যের সঙ্গে পূর্ণযোগের অনেকাংশে ঐক্য আছে।

পূর্ণযোগেরও লক্ষ্য মুক্তি—অবিদ্যার বন্ধতা হতে অপরা-প্রকৃতির বশ্যতা হতে চেতনার ও শক্তির মুক্তি। সব যোগেরই তা-ই লক্ষ্য। কিন্তু পূর্ণযোগে এ-লক্ষ্য প্রাথমিক মাত্র। তাছাড়া পূর্ণযোগের মুক্তি চেতনার নির্বাণে নয় শুধু—চেতনার বিস্ফারণে। বলতে গেলে নির্বাণে যেখানে মুমুক্ষুর সাধনার শেষ, পূর্ণযোগের প্রকৃত সাধনার শুরু সেইখান থেকে। ভুক্তি এবং শক্তি তার মুক্তির সহচারী। মুক্তি যদি পুরুষের স্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে ভুক্তি আর শক্তি হল প্রকৃতির স্বধর্ম। পূর্ণযোগে পুরুষ আর প্রকৃতি যুগনদ্ধ। তাইতে পুরুষের মুক্তি (liberation) সেখানে বস্তুত স্বাতন্ত্র্য (freedom)। আর এই স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ প্রকৃতির উল্লাসে—ভুক্তিতে ও শক্তিতে, আনন্দে ও বীর্যে।

পূর্ণযোগীর চেতনা বিস্ফারণকে মুখ্য সাধনরূপে গ্রহণ করে বলে বিশ্বাত্মতার তার সহজ ধর্ম। আমার চেতনা যেখানে বিশ্বের সঙ্গে এক, সেখানে আমার শক্তিও বিশ্বশক্তির মূল প্রবর্তনার সঙ্গে এক। সে-শক্তির প্রবর্তনা জড়ের চিন্ময় রূপান্তরে। আমারও শক্তিযোগের তা-ই তাৎপর্য। একার মুক্তিই আমার সাধ্য নয়, আমার হৃত সমষ্টির রূপান্তর। এই সচেতন ব্রতদীক্ষাও পূর্ণযোগের একটি বৈশিষ্ট্য।

*

বিশ্বোত্তীর্ণের তুঙ্গতায় প্রতিষ্ঠিত থেকে বিশ্বরূপা প্রকৃতিকে আনন্দে প্রেমে জড়িয়ে ধরা, তার সূর্যমুখী আকূতিকে উদ্ভাস্বর মহিমায় সার্থক করা অযোধ চিদ্‌বীর্যের নিরন্তর অভিষেকে—এই হল ব্রহ্মের ঐশ্বরযোগ। পূর্ণযোগ এই ব্রহ্মযোগের অনুগামী। তাই তার সত্যকার সাধক প্রাকৃত কামপুরুষ নয়—অন্তর্যামী চিৎপুরুষ। সাধনা আমি করছি না, করছেন তিনিই। আমি তাঁকে ফুটিয়ে তুলছি—এ-অহন্তায় নয়; মহাবৈপুল্যের সহজ আনন্দে তিনিই আমার মধ্যে ফুটে উঠছেন—এই প্রসাদ। যোগের সিদ্ধি তাঁর দায়; আমার দায় শুধু আত্মসমর্পণের, সমস্ত প্রযত্ন শিথিল করে নিঃশেষে সেই আনন্ত্যের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার, বিলিয়ে দেবার। এই অকিঞ্চন আত্মসমর্পণকে বলতে পারি পূর্ণযোগের মূল সূত্র। অথচ এ কিন্তু তামসিক আত্মসমর্পণ নয়। এ যেন রুদ্ধ ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিয়ে আলোর স্বতঃপ্রবেশকে অব্যাহত করা এবং প্রতিনিয়ত তার স্পর্শে রোমাঞ্চিত এবং শক্তিতে উদ্দীপিত থাকা।

আত্মসমর্পণের ফলে এই আত্মোন্মীলন এবং আবেশের মুখ্যত দুটি পরিণাম: এক, বিবিক্ত অহংএর সঙ্কীর্ণতা হতে সর্বাবগাহী অদ্বৈতচেতনার প্রমুক্তিতে উত্তরণ; আর, ঊর্ধ্ব-শক্তির ভারণায় আধারের অপরা-প্রকৃতির দিব্য পরা-প্রকৃতিতে রূপান্তর। যোগের পূর্ণতা যেমন আধারের সমস্ত শক্তির সমাহারে এবং সমন্বয়ে, তেমনি অদিব্য প্রকৃতির দিব্য রূপান্তরে। সাধনার প্রথমে যে-কোনও শক্তিকে সাধনরূপে অবলম্বন করা যেতে পারে—নিজের রুচি ও সংস্কার অনুসারে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, একদেশদর্শিতায় কোথাও অখণ্ড সত্যকে যেন খণ্ডিত না করা হয়। মনকে মুক্ত রেখে সাধনার পথে অগ্রসর হলে ক্রমে দেখতে পাব, বুদ্ধির শুদ্ধিতে আমার পথ এসে পৌঁছেছে সেই পরম বিন্দুতে যেখানে মিলেছে আর-সব পথ, আর সেখান হতে বোধির আলোতে চলেছে সর্বসমঞ্জস সত্যের পথে অসঙ্কোচ অভিযান। উদার বুদ্ধিতে গোড়া হতেই সমন্বয়ের পথ অবশ্য ধরা যেতে পারে; সে হবে 'সহজ সাধনার' কঠিন পথ। তার কথা পরে।

২

পূর্ণ সিদ্ধি

সব মানুষই অল্প-বিস্তর একটা আদর্শের প্রেরণায় চলে। সে যা আছে তাতে তৃপ্ত হতে পারে না, চায় আরও কিছু হতে। এই হওয়াই তার সিদ্ধি। কিন্তু সিদ্ধির কল্পনা সবার বেলায় এক নয়। সাধারণত দু'রকম সিদ্ধির কথা আমরা জানি—ঐহিক আর পারত্রিক। পূর্ণযোগের সিদ্ধি কিন্তু এ-দুয়ের কোনটাই নয়, যদিও পূর্ণযোগ ইহলোক বা পরলোক কোনটাকেই অস্বীকার করে না।

ঐহিক সিদ্ধির একটা প্রাচীন সংজ্ঞা হচ্ছে 'অভ্যুদয়'। চেতনার উন্মেষের স্তরভেদে তার নানা রূপ। অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি দেহ-প্রাণের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় না; তাদের কাছে অভ্যুদয়ের চরম হল থাকে বলে 'দুধে-ভাতে থাকা'। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিতে এবং প্রয়োজনে মুখচর জীব। সুতরাং এই দুধে-ভাতে থাকাকে সর্বজনীন করবার একটা দায় তার আছে। তা-ই থেকে এসেছে সামাজিক রাষ্ট্রিক এমন-কি আন্তর্জাতিক অভ্যুদয়ের কল্পনা। কিন্তু যাঁদের মধ্যে মন জেগেছে, তাঁরা বাইরের চাইতে ভিতরটাকে দাম দেন বেশী। তাঁরা চান নানাভাবে মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষ—সাহিত্যে বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে নীতিতে এবং রীতিতে। সব মিলিয়ে অভ্যুদয়ের একটি পূর্ণ আদর্শ কল্পনা করা যায়—যার সাধন হবে মানুষের দেহ প্রাণ মনের উৎকর্ষের অনুকূলে তার পারিপার্শ্বিককে গড়ে তোলা।

কিন্তু মনের চাওয়ার পরেও মানুষের চাওয়া আছে। ভোগের প্রতুলতার মধ্যে থেকেও তার চিত্ত অধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, প্রবৃত্তি ছেড়ে সে ধরে নিবৃত্তির পথ, শুরু হয় অন্তরের নিঃসঙ্গ অভিযান। ইহ সে কোনও তৃপ্তিই খুঁজে পায় না, তার আরাম সকল তৃপ্তি পরত্র। সাধারণ সমাজের সে কেউ নয়, তার সমাজ আলাদা—সাধুর সমাজ, বৈরাগীর সংঘ। মানুষের মধ্যে যখন এই দেওয়ানার ভাব জেগে ওঠে, তখন সে হয় পারত্রিক সিদ্ধির সাধক—যার প্রাচীন সংজ্ঞা হল 'নিঃশ্রেয়স'।

অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স দুয়েরই প্রেরণা আসে মানুষের স্বভাব থেকে। সুতরাং পূর্ণযোগ দুয়েরই সত্যতাকে স্বীকার করে। তবে দুয়ের মাঝে স্পষ্টতই যে-বিরোধ আছে, সে চায় তার সমন্বয় এবং উত্তরণ। অভ্যুদয় খোঁজে ভুক্তি, মুক্তির প্রতি সে অন্ধ; আবার নিঃশ্রেয়স খোঁজে মুক্তি, ভুক্তির প্রতি সে বিতৃষ্ণ এবং বিরক্ত। কিন্তু আগেই বলেছি, পূর্ণযোগ ভুক্তিতে-মুক্তিতে কোনও বিরোধ দেখে না। তবে একথাও সে জানে, ভুক্তিবাসনা এবং মুক্তিবাসনা দুয়ের উর্ধ্বে না উঠতে পারলে দুয়ের মাঝে সমন্বয়সাধন সম্ভব নয়।

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে জীবনের মধ্যে অলক্ষ্যে চলছে চেতনার উত্তরায়ণের কাজ—তারই নাম যোগ। মানুষ যে দেহ-প্রাণ-মনের উৎকর্ষ চাইছে অভ্যুদয়ের পথে, তাও সেই যোগশক্তির কাজ। কিন্তু উৎকর্ষ সম্যক্ সিদ্ধ হয় না, যদি উর্ধ্বতন শক্তির আবেশ না ঘটে। দেহের চাইতে প্রাণ উর্ধ্বতন, প্রাণের চাইতে মন। মানুষ মনের সহায়ে সচেতনভাবে দেহ-প্রাণ-মনের উৎকর্ষ চাইছে। কিন্তু মনই তো চিৎশক্তির শেষ নয়। মনের উর্ধ্বতন শক্তি হচ্ছে বিজ্ঞান। মানুষ যদি দেহ-প্রাণ-মনকে বিজ্ঞানের অধীন করতে পারত, তাহলে তাদের উৎকর্ষ পূর্ণতর হত। এই বিজ্ঞানশক্তিও মানুষের মধ্যে কাজ করছে। তারই প্রেষণায় সে হয় অধরার সন্ধানী। হতে গিয়ে দেহ-প্রাণ-মনকে সে ছেড়ে যেতে চায়—এইখানে তার ন্যূনতা। পূর্ণযোগ চায় এই ন্যূনতার আপূরণ। ইহ এবং পরত্রকে সে মিলিয়ে দিতে চায় ঐশ্বরযোগের মধ্যে।

*

দেহ প্রাণ আর মন এই নিয়েই মানুষ, এর ওপারে যদি তার মধ্যে কিছু থেকে থাকে, তাহলে সে কেবল ধোঁয়া—মানুষের স্বরূপসম্বন্ধে এই হল ঐহিক দৃষ্টি। পারত্রিক দৃষ্টিতে মানুষ চিন্ময়, দেহ-প্রাণ-মন একটা বিভ্রম। পূর্ণযোগের দৃষ্টিতে মানুষ এই দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে থেকেই চিন্ময়। দেহ-প্রাণ-মন চৈতন্যের প্রকাশের আধার। চৈতন্য পুরুষ, দেহ-প্রাণ-মন প্রকৃতি। পুরুষেরই আত্মপ্রকৃতি, সুতরাং মূলত তাদের মাঝে কোনও বিরোধ নাই। নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রকাশের একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে—যেমন দেখি প্রাণের অবরভূমিতে, মানুষের শৈশবে বা কৈশোরে। এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে প্রকৃতির সিদ্ধ পরিণাম। ততক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের কোনও বিরোধ নাই। কিন্তু পরিণামের আরেক পর্ব এগিয়ে যেতে হলেই বিরোধ শুরু হয়। পুরুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে-সংবেগ আছে,তা বাধা পায় প্রকৃতির জড়ত্ব অর্থাৎ নিয়তিকৃতনিয়মের অনুবর্তিতার কাছে। বাধার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় বিক্ষেপের, পুরানো নিয়ম ছেড়ে নতুন নিয়মে চলতে গিয়ে প্রকৃতি যেন বানচাল হয়ে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের দৃষ্টিও হয় আচ্ছন্ন। এই বিক্ষেপ ও আচ্ছন্নতার পর্ব হল চিৎপরিণামের সন্ধিপর্ব। তার একদিকে আছে মৃত্যুতায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা, আরেকদিকে প্রকাশে উত্তরণের। যেমন অগ্নিগর্ভ ইন্ধনের ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে জ্বলা। এইটাই সন্ধিকাল, সাধনজীবনে একটা নিদারুণ অস্বস্তির সময়। অথচ এই সন্ধিপর্বকে ডিঙিয়ে যাবার কোন উপায় নাই।

বাধাটা অপরা-প্রকৃতির। কিন্তু প্রকৃতির সবখানিই তো অপরা নয়। ঐ অপরা-প্রকৃতির অন্তরালেই কাজ করছে পরা-প্রকৃতি—অভীপ্সা শ্রদ্ধা উৎসাহ বীর্যের আকারে। ভিজা কাঠে আগুন ধরাতে গেলে ধোঁয়া হয়। দোষ কাঠের নয়, ভিজা হওয়াটাই দোষের। পুনো-পুনো আগুন জ্বলে না। প্রকৃতিকে নিয়েই পুরুষের সাধনা, তাকে বাদ দিয়ে নয়। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণই সাধনা। সে-সাধনা যদি মরণের হয়, তবুও জীবন দিয়েই তার সাধনা।

প্রকৃতির সঙ্গে অবিবেককে বজায় রেখে যে ঐহিক সিদ্ধি তা যেমন একটি অন্ত, তেমনি প্রকৃতি থেকে ছিটকে পড়ে পারত্রিক সিদ্ধি খোঁজা এও আরেকটি অন্ত। পূর্ণযোগীকে এ-দুটি অন্তই পরিহার করতে হবে। অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থাকতে চাই না, তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে ঐকান্তিক ছাড়াছাড়িই পুরুষার্থ একথাও বলতে চাই না। একটা মধ্যপথ আছে—প্রকৃতির রূপান্তর। আগুন ভিজা কাঠকে শুকিয়ে তাকে পুরাপুরি আগুন করে তুলতে পারে; তখন কাঠ আগুনেরই ঘনবিগ্রহ।

রূপান্তরই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। তার আদিপর্ব হল তপস্যা। তপস্যা অপরা-প্রকৃতির শুদ্ধির জন্য—ভিজা কাঠে আগুন ধরাবার জন্য তাতে তাপসঞ্চার করা, তাকে আগুনের সংস্পর্শে আনা। এইখানে আত্মপ্রচেষ্টার দরকার। সাধনায় উৎসাহ থাকা চাই, আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা চাই। যে-'আমি' অপরা-প্রকৃতির গোলাম ছিল এতদিন, তাকেই

এখন করতে হবে তার প্রভু। সমর্পণের মানে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে তার চলবে না, তাকে লড়তে হবে। কিন্তু লড়বে সে খুঁটির জোরে। আমি তাঁরই 'অংশঃ সনাতনঃ', আমার শক্তি তাঁরই শক্তি, আমার সিদ্ধি সুনিশ্চিত কেননা আমার সাধনার মূলে তাঁরই দিব্যসঙ্কল্পের প্রেরণা—এই দৃঢ়মূল শ্রদ্ধাই সাধককে বীর্য দেবে। শক্তির যোগান আসবে উপর থেকে।

বৃহতের সঙ্গে অহংকে এমনি করে নিত্যযুক্ত রাখতে-রাখতে তার রং বদলে যায়, সে আতপ্ত হয়ে ওঠে। এই হতে রূপান্তরের শুরু: তা অহংএর বিলোপ নয় —কাঁচা আমির পাকা হওয়া। কাঁচা আমিতে চেতনার সঙ্কোচ আছে, তা-ই হল সবরকম যোগবিঘ্নের মূল। পাকা আমিতে এই সঙ্কোচ নাই, তার চেতনা আকাশের মত উদার স্বচ্ছ এবং প্রসন্ন। এই ব্যষ্টি-চৈতন্য হতেই আধারে অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির স্ফুরণ হয়—ভোরের আকাশে আলো ফোটার মত। সে-আলো সবার উপর নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ে। কাউকে সে প্রত্যাখ্যান করে না, নিজের শুভ্র ঔজ্জ্বল্যে সবাইকে সে বর্ণাঢ্য করে তোলে। তপঃপ্রবুদ্ধ চৈতন্য অভ্যুদয়ের বাধক নয়, সাধক।

আলোতে থাকতে হবে—স্বচ্ছ লঘু শুভ্র পরিব্যাপ্ত আলোতে। সে-আলোর উজানে আকাশ, আর তার আলিঙ্গনে পৃথিবী। তার স্পর্শে আবেশে ভারণায় পৃথিবী অপরূপা। অন্তরিক্ষের ওপারে দ্যুলোককে ছাপিয়ে সে-আলো—তাই সে অকুণ্ঠ, অম্লান। সে আকাশের আলো। সেই আকাশ—যা অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অসম্ভূতির মহাশূন্যতা। অথচ তারই পরঃকৃষ্ণতা হতে উৎসারিত এই 'শুক্রং ভাঃ'। আকাশ আলো আর পৃথিবী—তিন নিয়ে অখণ্ডমণ্ডলাকার এক পূর্ণতা। মনের উজানের আলো—বোধির আলো আবার অগম শূন্যতা ছুঁইয়ে-পড়া আলো। অতিমানসের আলো, বিজ্ঞানের আলো। রূপান্তরের তপস্যা সিদ্ধ হয় নিরন্তর অভিষেকে সে-আলো যখন হয় স্বভাবগত।

*

এপার-ওপার উজলে-তোলা উছলে-তোলা এই আলোতে নিরন্তর বাস করাতেই সিদ্ধির পূর্ণতা। এ-আলো সর্বত্র অন্তরের গহনে অন্তর্যামী, বিশ্বের পরিব্যাপ্তিতে বিশ্বরূপ, আকাশের অগমে লোকোত্তর। অস্তিত্বের তিনটি মান (dimension)—অন্তরে বাইরে ঊর্ধ্বে, ব্যক্তিতে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে: তিনটিই এই আলোতে পূর্ণ। একই বিজ্ঞান আত্মচৈতন্যে আবির্ভূত হয়েছে দৈবী সম্পদ্‌রূপে—বুদ্ধিকে করেছে প্রজ্ঞায় ভাস্বর, কর্মকে ঋতচ্ছন্দা, হৃদয়কে মিলনের মাধুরীতে লাবণ্যময়, রসচেতনাকে দিব্যশ্রীর সম্ভোগে তৃপ্ত ও সিসৃক্ষায় উচ্ছল, দেহ-প্রাণকে সৌম্যসুধায় নির্ঝর। সেই বিজ্ঞানই এই দিব্যবিভূতির উচ্চাবচতায় বিশ্বে পরিকীর্ণ অথচ নিগূঢ় উৎসবনে (upsurge) ঊর্ধ্বস্রোতা, বিশ্বোত্তীর্ণে অমের অনির্বচনীয়ের অনিবার্য বিচ্ছুরণ।

সত্তার এই তিনটি মানেই পরমকে পাওয়া, তাঁর দ্বারা আবিষ্ট এবং রূপান্তরিত হওয়া, ব্যষ্টি আধারকে তাঁর অমোঘ বীর্যের তেজস্ক্রিয়তায় বাহন করা—এই হল পূর্ণসিদ্ধির স্বরূপ।

৩

গোড়ার কথা

পূর্ণসিদ্ধিই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। আর পূর্ণসিদ্ধির স্বরূপ হল 'সাদৃশ্যমুক্তি' বা গীতার ভাষায় সাধর্ম্যপ্রাপ্তি—মৃন্ময়ের চিন্ময়ে রূপান্তর। মৃৎ হতে চিৎ পর্যন্ত প্রকৃতিপরিণামের অনেকগুলি পর্ব। তাদের স্বরূপ না জানলে এই দুস্তর পথ অতিবাহন করা সম্ভব হবে না। মাটির মানুষকে খাঁটি হতে হবে; কিন্তু তার জন্য মাটি আর খাঁটি দুয়েরই তত্ত্ব জানা চাই। চাই মানুষের সমগ্র পরিচয়।

মানুষ মনোময় জীব। কিন্তু চলতি বা বৈজ্ঞানিক কোনও মনোবিদ্যাতেই তার সমগ্র পরিচয় আমরা পাব না, কেননা এসব বিদ্যার কারবার গড়পড়তা মানুষকে নিয়ে। যে ঐহিক সিদ্ধির কথা আগে বলেছি, গড়পড়তা মানুষ তার বেশী কিছু চায় না। জড় কুঁড়ে প্রাণের বেগে সে মন পর্যন্ত উঠেছে, মনকেও যে সে ছাড়িয়ে যেতে পারে, এটা তার ধারণায় আসে না, তার প্রয়োজনও সে অনুভব করে না। কিন্তু মনই যে মানুষের চৈতন্যের সবখানি নয়, একথা কেউ-কেউ বোঝে। তারা মৃৎকে জীবনের নিয়ামিকা শক্তি বলে করে না, করে চিৎকে। অর্থাৎ পশুর মত পিছনের ঠেলায় তারা চলতে চায় না, সভ্যকার মানুষের মতই চলতে চায় সামনের আকর্ষণে। এই আকর্ষক শক্তি হল বিজ্ঞান—স্বনিষ্ঠ সামান্যপ্রত্যয় অন্তরাবৃত্তি আর আত্মসচেতনতা যার বৈশিষ্ট্য। এইগুলির আবির্ভাবে মানুষ দ্বিজ হয়—ধরে যোগের পথ, চিন্ময় আত্মোৎকর্ষণের পথ। সে-পথ গড়পড়তা মানুষের নাগালের বাইরে। বিজ্ঞান তার দিশারী। কিন্তু বিজ্ঞানভূমির খবর মনোবিদ্যাতে পাওয়া যাবে না, যাবে অধ্যাত্মবিদ্যায়।

উপনিষদে আছে, 'ইন্দ্রিয়ের মুখ বাইরের দিকে, তাই মানুষ বাইরটাই দেখে, ভিতরটা নয়। কদাচিৎ কোনও ধীর দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে আত্মাকে মুখামুখি দেখতে পায়—অমৃতের পিপাসায়।' এই দেখাতে উপলব্ধ হয় আত্মার মহিমা। মানুষ অনুভব করে, আপাতত সে যা হয়ে আছে তা-ই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। তার গভীরে নিগূঢ় হয়ে আছে এক অনন্ত সত্তার শান্তি, চৈতন্যের দীপ্তি, শক্তির উদ্যতি, আনন্দের আন্দোলন। সে সৎ-চিৎ-আনন্দ —এই তার নিত্য স্বরূপ; তার প্রাকৃত জীবন এই নিত্যের লীলা। এই নিত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার আলোতে আর শক্তিতে লীলার স্ফুরত্তাকে (dynamism) সার্থক করাই তার জীবনের দিব্য নিয়তি। এই অনুভবই অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রবর্তক।

*

সিদ্ধির চারটি সাধন—দেহ প্রাণ মন আর অতিমানস। এদের কথা বিস্তারিতভাবে অন্যত্র বলেছি এবং বলবও, এখানে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে যাই শুধু।

মনকে দিয়ে শুরু করি, কেননা চেতনার স্বরূপ ও শক্তির প্রাথমিক পরিচয় আমরা

পাই আমাদের মনেই। মনের মুখ্য শক্তি হল জানবার শক্তি। সে অনেক-কিছুই জানে এবং জানতে পারে, কিন্তু সব জানে না। তার জানার সীমা আছে, তার মধ্যে নৈশ্চিত্যের অভাবও আছে। বাইরের জানার পরিধি সে প্রসারিত করে অনুমান দিয়ে। অনুমানের নির্ভর হল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ। তার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। মনের পরাক্-বৃত্ত (objective) অনুভব সে-সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। তাই জ্ঞানের পরিধি চেতনার একটা তলেই প্রসারিত হতে পারে, উপরে উঠতে পারে না। মনের প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective) অনুভব অতীন্দ্রিয় হতে পারে, এবং এই পথে জ্ঞান চেতনার আরেকটা তলে উঠতে পারে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যে কত সঙ্কীর্ণ তা আমরা সবাই জানি। হয়ে জানা হল জানার চরম, জ্ঞানের এটি একটি বিশিষ্ট প্রকার (mode)। কিন্তু মন এটিকে বাইরের বস্তুর বেলায় অতি সামান্যই প্রয়োগ করতে পারে।

অথচ এইধরনের জানার একটা প্রবণতা মনের মধ্যেও আছে। মন 'ন চিকেত' অর্থাৎ এখনও জানেনি, কিন্তু বিদ্যার অভীপ্সা তার মধ্যে আছে। সে-অভীপ্সা কখনও-কখনও তাকে হয়ে জানার পথে ছোটায়—দৃষ্টিকে অন্তরাবৃত্ত ক'রে। তখন সে চেতনার আরেকটি বৃত্তির সন্ধান পায়—যার নাম ব্যক্তিতে 'বিজ্ঞান', আর বিশ্বে 'অতিমানস'। অতিমানস জ্ঞান অপরোক্ষ অতএব নিশ্চিত এবং বাইরে-ভিতরে সর্বত্র নিঃসীম। যোগে তার নাম 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'। এই প্রজ্ঞার আভাস মনশ্চেতনায় ফুটে ওঠে প্রাতিভসংবিৎ (intuitional flashes) এবং বোধির আকারে, প্রাণের ক্রিয়ায় সহজাতবৃত্তি (instinct) হয়ে, জড়ের মধ্যে নিয়তিকৃতনিয়মের প্রবর্তনায়।

তারপর প্রাণ, যা চৈতন্যের রূপকৃৎ শক্তি। দেহ আর মনের মাঝে সে সেতুর মত। চৈতন্যের প্রকাশ প্রবৃত্তি (function) এবং উল্লাসের জন্য সে জড়কে উপাদান করে রূপ গড়ে চলেছে। জড়ের মধ্যে যে রূপের আবর্তন বিবর্তন এবং উদ্‌বর্তন (emergence), তাও প্রাণের অর্থাৎ নিগূঢ় চিৎশক্তিরই ক্রিয়া। প্রাকৃত ভূমিতে প্রাণের ক্রিয়া ব্যাবিদ্ধ এবং কুণ্ঠিত। কিন্তু এর উর্ধ্বে তারও একটা স্বধাম আছে, যেখানে সে বিশুদ্ধ এবং স্বচ্ছন্দ।

তারপর জড়, যা আমাদের দেহের মুখ্য উপাদান। প্রাণ যেমন রূপকৃৎ, জড়ও তেমনি রূপধাতু বা রূপায়ণের বস্তুভিত্তি। মন প্রাণ এবং জড়—এ-তিনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। সাংখ্যের ভাষায় মন সত্ত্বপ্রধান, প্রকাশ তার সহজ ধর্ম; প্রাণ রজঃপ্রধান, তার সহজধর্ম হল প্রবৃত্তি; আর জড় তমঃপ্রধান, তার ধর্ম স্থিতি (inertia), যার দরুন সে প্রাণের সাবলীল ক্রিয়ার আধার হতে পারে। তিনটির মাঝে প্রকৃতির পরিণাম চলছে যেন রাতের অন্ধকার (তমঃ) হতে পুবের আকাশ লাল (রজঃ) হয়ে আলো (সত্ত্ব) ফোটার মত। আপাত-দৃষ্টিতে অন্ধকার আলোর একেবারে বিপরীত; কিন্তু বস্তুত আলো তার মধ্যে রয়েছে নিগূঢ়হিত (involved) হয়ে। সূর্যাস্তের সময় পশ্চিমের আকাশ আবার লাল করে আলো মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের গভীরে। এমনি করে প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে চলছে ত্রিগুণের লীলা।

আরেক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, চৈতন্য হল ভাব আর জড় হল রূপ—দুয়ের মাঝে 'অবিরাম যাওয়া-আসা'র খেলাই হল প্রাণ। রূপ ছাড়া ভাবের প্রকাশ হবে কি করে? তাই যেখানে ভাব, সেখানেই রূপ আছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অনুভবের অনুকূল দেহ আছে। কল্পনা না হলে আগুন ধরত কিসে? আগাগোড়া আগুন ধরে উঠল যখন, তখন তাকে কি বলব—কল্পনা, না আগুন?

*

অধ্যাত্মসিদ্ধির এই চারটি সাধন। এদের সহায়ে কি করে চিৎশক্তির উদ্বর্তন সম্ভব তা বুঝতে গেলে চিৎপ্রকাশের আরেকটি ধারা নিয়ে কিছু আলোচনা দরকার।

একই চৈতন্যের দুটি দল: পুরুষ তার স্বরূপ, আর প্রকৃতি তার শক্তি। পুরুষ প্রকৃতির দ্রষ্টা ভর্তা এবং ভোক্তা। প্রকৃতির সমস্ত পরিণাম 'পরার্থে' কি না পুরুষের জন্যে। অর্থাৎ চৈতনা আছে বলেই ক্রিয়ার সার্থকতা, নইলে ক্রিয়া থাকলেই-বা কি না থাকলেই-বা কি। পুরুষের দৃষ্টির সামনে প্রকৃতির রূপ খুলছে। স্বরূপের উন্মোচনে পুরুষকে নন্দিত করে ক্রমেই প্রকৃতি তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথম দৃষ্টিতে প্রকৃতি শুধুই 'প্রকৃতি'—'সর্বং করোতি ইতি প্রকৃতিঃ'। প্রকৃতির ক্রিয়া বিশ্ব জুড়ে, পুরুষ তার উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতির করারও কোনও উদ্দেশ্য নাই, পুরুষের দেখারও কোনও আনন্দ নাই। ছবির পর ছবি ভেসে চলেছে আয়নার বুকে, আয়না নির্বিকার। এই দৃষ্টি মনের। পুরুষ এখানে প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত। সাধনার গোড়ায় এরও একটা সার্থকতা আছে। বিবেক অপরা-প্রকৃতির আবর্তন থেকে মুক্ত করে পুরুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ করে।

কিন্তু চেতনার গাঢ়তায় পুরুষ যখন স্বচ্ছন্দ, তখন প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই ঔদাসীন্য আর থাকে না। প্রকৃতি তখন পুরুষের আরও কাছে এগিয়ে আসে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষ দেখেন, বাইরের প্রকৃতি তাঁর অন্তঃপ্রজ্ঞারই প্রতিচ্ছবি, তাঁর চেতনার বিবর্ত্ত। আয়নার বুকে ছায়া পড়ছে না, তার ভিতর থেকেই যেন ছবি ফুটছে। যেমনটা হয় স্বপ্নে—ভাবই বস্তুরূপে বিবিক্ত হয়ে দেখা দেয়। প্রকৃতি তখন পুরুষের ভাবাভাবলীলাপটীয়সী আত্মমায়া—বৈদিক অর্থে। পুরুষ তার ভর্তা।

আরও কাছে এলে প্রকৃতি পুরুষের আত্মশক্তি—স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে মহাকারণে, জাগ্রতে স্বপ্নে সুষুপ্তিতে তুরীয়ে, বহিঃপ্রজ্ঞার অন্তঃপ্রজ্ঞার প্রজ্ঞানঘনতার প্রপঞ্চোপশমে বিলসিতা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ারূপিণী চিন্ময়ী মহাশক্তি, পুরুষ ভোক্তা মহেশ্বর।

এমনি করে চেতনার গাঢ়তার তারতম্যে পুরুষের মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকৃতির স্ফুরন্তার বৈচিত্র্য। পুরুষ সে-বৈচিত্র্যের স্ব-তন্ত্র ঈশ্বর। পুরুষ যুগপৎ আত্মারাম হয়ে প্রকৃতিকে আত্মচৈতন্যে নিগৃহিত করে রয়েছেন, বিশ্বরূপ হয়ে উন্মেষের উচ্চাবচতায় তাকে স্ফুরিত করছেন, আবার ব্যক্তিরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে তার ক্রিয়াকে একেকটা বিশিষ্ট খাতে বইয়ে দিচ্ছেন। এই নিয়ে তাঁর প্রকট-অপ্রকটের লীলা। সবসময় তাঁর সবটুকু প্রকট নয়।

যেটুকু প্রকট, তার পিছনে রয়েছে অপ্রকটের আবেশ এবং প্রেষা (pressure)। আমাদের মধ্যে তা-ই অভীপ্সার রূপ।

অভীপ্সাই আমাদের মধ্যে যোগশক্তি, প্রকৃতির অব্যক্ত বীর্যকে ব্যক্ত করবার দিব্য সামর্থ্য। আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চেতন প্রকৃতির মধ্যেও চিদভিব্যক্তির কাজ চলছে—কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে। এই মন্থরতা দূর হয়, পুরুষ যখন প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে আত্ম-সচেতন হয়, তার স্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্কার করে। তখন হতেই যোগের শুরু। যোগের লক্ষ্য প্রকৃতির বশীকার। বশীকার সিদ্ধ হয়, যোগী যখন যোগেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর ঐশ্বরযোগের সামর্থ্যকে আধারে প্রবর্তিত হতে দেন।

*

অন্যত্র বলেছি, সত্তার সাতটি তত্ত্ব (principle)—বিশুদ্ধ সত্ত্ব চিৎ-তপঃ আনন্দ অতিমানস মন প্রাণ এবং জড়। প্রথম তিনটিতে পুরুষের পরার্ধ, পুরুষকে তখন বলি ব্রহ্ম। শেষের তিনটিতে পুরুষের অপরার্ধ, তাঁকে তখন বলি জীব। দুয়ের মাঝে অতিমানস—ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি, জীবের জননী। পর শক্তি এবং অবর—সব নিয়ে পুরুষ অখণ্ড। পুরুষের অবরভাগে অর্থাৎ দেহ-প্রাণ-মনে তাঁর পরভাগ এবং স্বরূপশক্তি অপ্রকট, কিন্তু গুহাহিত। বীজের মধ্যে বনস্পতি যেমন ঘুমিয়ে থাকে, তেমনি শিব-শক্তি জীবের মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন যেন। একেবারে ঘুমিয়ে নাই। তাহলে জাগা সম্ভব হত না। অবরভাগের মধ্যে পর-ভাগের আবেশ গভীর গহনে অর্ধমাত্রারূপী চিদ্‌বিন্দু হয়ে জেগে আছে। জীবনে চেতনার উত্তরায়ণের মূলে এই বিন্দুর বিস্ফারণ।

অবরভাগের বিস্ফারণ হচ্ছে ধীরে-ধীরে। তার গতিবেগ বাড়ে যখন ঊর্ধ্বশক্তির সঙ্গে তার যোগ হয়। তারও আবার একটা কাল আছে। সে-কাল যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ অবরভাগের মধ্যে চলে একটা দোটানা ; দেহ-প্রাণ-মন একবার ঝোঁকে আলোর দিকে—একত্ব আনন্ত্য ও বিশ্বাত্মভাবনার দিকে, আবার ঝোঁকে আলো-আঁধারির দিকে—ভেদবুদ্ধি চেতনার সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণ অহন্তার দিকে। দীর্ঘকাল ধরে দোটানা, আগুন জ্বলবার আগে ধোঁয়ার অত্যাচার। সাধকের পক্ষে মর্মান্তিক।

কিন্তু উপায় নাই। এই আলো-আঁধারির রাজ্য হতেই শুরু করতে হবে আলোর অভিযান—শ্রদ্ধা নিয়ে, বীর্য নিয়ে।

৪

মনোময় পুরুষের সাধনা

মানুষ এখন দেহ প্রাণ মন আর অহংএর একটা সমবায়। অহং পুরুষ নয়। পুরুষ

স্বরাট্, প্রকৃতির ঈশ্বর ; কিন্তু অহং প্রকৃতির সৃষ্ট, বিবিক্ত এবং সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিচেতনার আধার। পুরুষের অভিমান তার আছে, কিন্তু সামর্থ্য নাই। আসলে সে প্রকৃতির যান্ত্রিক আবর্তনের দাস। মনে হয় দেহ-প্রাণ-মনের সে নিয়ন্তা ; কিন্তু বস্তুত তার নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির হুকুমে বাঁধাধরা কতকগুলি নিয়মের অনুবর্তন মাত্র। ব্যক্তিচৈতন্যকে এই যন্ত্রাচার হতে মুক্ত করে স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা, তাকে দেহ-প্রাণ-মনের সত্যকার ঈশ্বর করা আত্মসিদ্ধি-যোগের লক্ষ্য।

*

এই যোগের প্রথম সাধন হল প্রত্যাহার (withdrawal)—অহন্তার বহির্মুখ প্রেরণায় দেহ-প্রাণ-মনের ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে না গিয়ে অন্তরের গভীরে আত্মবোধে বেঁচে থাকা অর্থাৎ বাইরে প্রকৃতির ক্রিয়া চলতে থাকলেও আপনাতে আপনি থাকা। অভ্যাসে আত্মবোধ একটু সুস্থিত হলে নিজের মধ্যে নিজেকে তখন আবিষ্কার করি মনরূপে নয়, অহংরূপে নয়—তাকেও ছাপিয়ে মনোময় পুরুষরূপে। মনোময় পুরুষ মন নন, মনের তিনি অধিষ্ঠানচৈতন্য, প্রাণ ও শরীরের ঊর্ধ্বে। প্রাণ ও শরীর তাঁর উপাধি মাত্র, তাদের সত্তা না থাকলেও তাঁর সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে—এই বোধ অন্তরে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পুরুষরূপে মনশ্চেতনার এই যে বিবিক্ত এবং স্ব-তন্ত্র বোধ, তার তিনটি প্রকার আছে। একটি হল সাক্ষিত্বের বোধ। প্রাকৃত মনের মধ্যে যে বৃত্তির খেলা চলছে, মনোময় পুরুষ তার সাক্ষী। শুধু উদাসীন সাক্ষীই নন, তিনি তাদের নিয়ন্তাও। মনের বীণায় তিনি খুশিমত সুরের আলাপ করতে পারেন, আর তাঁর সে-সুরের যোগান আসে বিশুদ্ধ মনো-লোকের উৎস থেকে—যা প্রাকৃত মনের অগোচর। এই থেকে তাঁর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অধিচেতন (subliminal) লোকের বোধ—যা এই পার্থিব লোকের চাইতে বৃহৎ ভাস্বর এবং সমর্থ, এ-লোক যার উপসৃষ্টি মাত্র। এই হতেই জাগে আরেকটি বোধ—বিশুদ্ধ মনশ্চেতনারও ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানচেতনার বা অতিমানস চিন্ময় স্থিতির বোধ।

এই মনোময় পুরুষের বোধ চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগে। ততক্ষণ পর্যন্ত সাধকের মধ্যে ওঠা-নামার খেলা চলে, কিন্তু প্রাকৃত মনের মধ্যে নেমে এলেও ঊর্ধ্বস্থিতির স্মৃতি ও সংস্কার তাঁর লোপ পায় না। এখানে তিনি তখন প্রবাসী মাত্র, তাঁর স্বধাম হল ঐখানে। অভ্যাসের ফলে বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সহজ হয় যখন, তখন জাগে আবেশের সামর্থ্য : মনোময় পুরুষ হন 'প্রাণ-শরীর-নেতা'। যেমন প্রাকৃত মনের পিছনে আছেন মনোময় পুরুষ, তেমনি প্রাকৃত শরীর ও প্রাণের পিছনে আছেন অন্নময় এবং প্রাণময় পুরুষ। অন্নময় পুরুষের অধিকার ব্যাপ্ত রয়েছে জড়লোকে। ঐটিই তাঁর আধার, যদিও প্রাণ তাঁর প্রবৃত্তির এবং মন তাঁর প্রকাশের বিভূতি। তেমনি প্রাণময় পুরুষের অধিকার ব্যাপ্ত কালিক সম্ভূতির (becoming in time) লোকে—দেহ তাঁর রূপায়ণের আধার, আর মন তাঁর আত্মস্পন্দের সংবিৎ। তিনটি পুরুষ চিৎপুরুষেরই স্বগত বিভূতি, যাদের আশ্রয় করে তিনি

হয়েছেন বিশ্বরূপ। দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে শুধু একটা উপরভাসা অহংএর বোধে নয়, তাদের গভীরে বিশ্বাত্মক এক পুরুষের বোধে উদ্দীপ্ত হতে পারলেই মুক্তির শক্তি হাতে আসে। মনের পিছনে মনোময় পুরুষকে আবিষ্কার করা—এই হতে এই বোধের শুরু। তারপর সেই পুরুষের শক্তিতে প্রাণ ও মনের প্রণয়নে বা প্রশাসনে তার সার্থকতা।

*

মানুষ বিশেষ করে মনোময়। তাই অধ্যাত্মসিদ্ধিতে মন হল তার প্রকৃষ্ট সাধন। মনকে তার মুক্ত করতে হবে—সাক্ষিচেতনা অধিচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনার বোধকে উদ্দীপ্ত করে। দেহ আর প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে তার চলবে না—এমন-কি অন্নময় ও প্রাণময় পুরুষের সঙ্গেও নয়। বোধির সহায়ে মনকে ধরেই যেতে হবে মনের উজানে।

কিন্তু এই উজান-বওয়ার দুটি রীতি আছে। একটির লক্ষ্য হল অনাবৃত্তি অথবা উৎক্রান্তি—মনের বেগেই মনকে ছাড়িয়ে যাওয়া, আর এখানে ফিরে না আসা। এটি হল অমনীভাবের সাধনা বা নিরোধযোগ। বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের লক্ষ্য তা নয়। মুক্তির পরিণামে সে চায় শক্তির স্বাতন্ত্র্য, যাথেকে সে মুক্ত হল তার রূপান্তরের সামর্থ্য।

মুক্তির সাধনা শুরু হয় প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে সাক্ষিচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে। সাক্ষী অনাসক্ত, প্রকৃতি-পরিণামের লক্ষ্যের প্রতি তাঁর কোনও ঔৎসুক্য নাই। তাঁর কাছে ভালও নাই মন্দও নাই। প্রকৃতির ক্রিয়া চলছে যেন এক যান্ত্রিক ব্যবস্থায়। চাকা ঘুরছেই। তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলে ঝাঁকুনি খেতে হবে, এই ভয় থেকে সাক্ষী সরে এসেছেন। এসে ভালই আছেন একথাও এখন তিনি আর বলতে চান না। আছেন শান্ত হয়ে। সে-শান্তি কৈবল্যের গহনতায়, ভাল-মন্দের অতীতে।

সাক্ষী হলেও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির কাজ কিন্তু চলতেই থাকে। কিন্তু চলে কার প্রেষণায় (urge)? একটা জবাব হচ্ছে, কারও প্রেষণায় নয়—প্রকৃতির নিজের খেয়াল-খুশিতে। চলা তার স্বভাব বলেই সে চলে: প্রকৃতি পরিণামধর্মিণী। কিন্তু এই প্রকৃতির মধ্যেই একসময় দেখা দিয়েছিল প্রাকৃতপুরুষের অহংএর প্রশাসন। অহং মনে করত সে স্ব-তন্ত্র, প্রকৃতির সে শাস্তা। মনে করাটা একেবারে মিথ্যা নয়, সম্পূর্ণ সত্যও নয়। পুরুষের সংস্পর্শে না এলে প্রকৃতির ক্রিয়ার কোনও অর্থ থাকে না। চৈতন্য পুরাপুরি কর্তা না হক, দ্রষ্টা এবং ভোক্তা তো বটেই। পুরুষ দেখছে অর্থাৎ প্রকৃতির ক্রিয়াকে অনুভব করছে এবং তার ফলে সুখ-দুঃখে আন্দোলিত হচ্ছে, তাতেই প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ এবং সার্থকতা। নিজের ইচ্ছাতে প্রকৃতিকে চালাবার খানিকটা ক্ষমতাও তার আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই বলে তার ভোগ আর ইচ্ছা ব্যাহত বলে মনের দুঃখে সে প্রকৃতির সঙ্গে অসহযোগ করে বিবেকী হয়েছে, সাক্ষী হয়েছে।

এই সাক্ষিত্বের মধ্যে পুরুষ খুঁজে পেলেন আরেকধরনের স্বাতন্ত্র্য—নিজের ইচ্ছামত প্রকৃতিকে চালাবার স্বাতন্ত্র্য নয়, কিন্তু নিজের মধ্যে নিজে অচল থাকবার স্বাতন্ত্র্য। বলা

বাচনা, এই বাসটানাতেও কিন্তু পুরুষের শক্তিরই পরিচয় নেলে। আর এই শক্তিও তো পুরুষের আত্মপ্রকৃতি।

প্রকৃতির সঙ্গে তাহলে পুরুষের দুরকম সম্পর্ক দাঁড়াল। একদিক দিয়ে পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত এবং স্ব-তন্ত্র, প্রকৃতির ক্রিয়া এবং তদ্‌জনিত ভোগ তিনি স্বীকার করতে বাধ্য নন। এমন-কি চেতনার দীপ নিবিয়ে দিয়ে প্রকৃতিকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতেও তিনি পারেন—যদিও কতকালের জন্য সেসম্বন্ধে সংশয় করবার কারণ আছে। আরেকদিক দিয়ে স্বচ্ছন্দচারিণী প্রকৃতির তিনি ভর্তা, অনুমন্তা এবং আংশিক শাস্তাও বটে। তাঁকে নাহলেও প্রকৃতির চলে না। চৈতন্য বা অনুভব না থাকলে প্রকৃতির খেলার সার্থকতা কোথায়?

প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃতি-পুরুষের মাঝে এই-যে সম্পর্কের দ্বৈধ, এর কি কোনও সমাধান নাই? প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে, তার অভোক্তা অকর্তা দ্রষ্টা হয়ে তিনি আত্মস্বাতন্ত্র্যের এবং আত্মশক্তির পরিচয় দিলেন। সেও জীবনের একটা সিদ্ধি। কিন্তু দ্রষ্টা থেকেও তিনি কি তার 'ভোক্তা মহেশ্বর' হতে পারেন না? প্রাকৃতপুরুষের অহন্তায় ভোগৈশ্বর্যের যে আংশিক প্রকাশ দেখা দিয়েছিল, তার পূর্ণতা কি সম্ভব নয়?

সম্ভব। কিন্তু মনের ভূমিতে নয়—তার ঊর্ধ্বে বিজ্ঞান এবং আনন্দের ভূমিতে। সাক্ষীর যে বিবিক্ত তটস্থতা, এমন-কি চেতনার যে-দীপনির্বাণ, অকল্পনীয় শক্তির পরিচয় হলেও তা মনোধর্মিত। যে-দ্বৈত মনের স্বধর্ম, এখানেও দেখছি তারই সংস্কার অখণ্ড সত্তাকে বিখণ্ডিত করেছে, তাইতে পুরুষ প্রকৃতির বাইরে পড়ে যাচ্ছে। সাক্ষী-পুরুষের প্রকৃতি সম্পর্কে যে-চেতনা, সে হল মানস চেতনা। তাকে জ্ঞান বলতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞান বলব না; কেননা তার মধ্যে উপলব্ধির সামর্থ্য থাকলেও উল্লাসের সামর্থ্য নাই। তিনি খেলা দেখছেন—তাও নিরুৎসুক ঔদাসীন্য নিয়ে; কিন্তু খেলার পাণ্ডা হয়ে তাকে চালিয়ে নিচ্ছেন না। এইখানে তাঁর শক্তির দৈন্য। প্রকৃতিকে জানছেন তিনি শুধু মনের স্তরে—যেখানে সুখ-দুঃখের আন্দোলন। ওখান থেকে তো প্রকৃতির ঈশ্বর হওয়া যায় না। তাকে জানতে হবে আরও গভীরে—বিজ্ঞান দিয়ে। আর সে-বিজ্ঞান উৎসারিত হয় পুরুষের স্বরূপের আনন্দ হতে। মনোময় পুরুষ হয়ে নয়, বিজ্ঞানময় আনন্দময় পুরুষ হয়েই প্রকৃতির ঈশ্বর হওয়া যায়।

*

এই পরিপূর্ণ আরোপলব্ধিই হল পুরুষের স্বারাজ্যসিদ্ধি। অনেক দূরের পথ, আর পথের গোড়াতেই অনেক বাধা। প্রথম বাধা হচ্ছে অবিদ্যার মূঢ়তা। লক্ষ্যের সম্পর্কে যদি মানুষের চেতনা না থাকে, তাহলে সে পথ চলবে কিসের গরজে? বেশীর ভাগ মানুষেরই মনের ভাব, যেমন আছি বেশ আছি। কিন্তু সংসার যখন বেশ থাকতে দেয় না, তখন সে আপদের প্রতিকার খোঁজে বাইরে, ভিতরে নয়। মনে পড়ে উপনিষদের সেই কথা—সবাই দেখে বাইরটাকে, ক্বচিৎ কারও দৃষ্টির মোড় ফেরে ভিতরপানে।

যায় ফেরে, বৃত্তির বাধা কেটে গিয়ে তার সামনে দেখা দেয় নিক্ষেপের বাধা। প্রাকৃত সংস্কারের অত্যন্ত ধারার বিপরীতে জীবনকে চালাতে গেলেই আধারের শক্তিগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে—দেহ-প্রাণ-মনের মাঝে আনুকূল্য আর প্রাতিকূল্যে সংঘর্ষ বাধে। চেতনা তাতে আবিল হয়ে পড়ে। আবিলতা দূর হয় আধারের শুদ্ধিতে—অনেক-কিছু অবাঞ্ছিতের বর্জনে এবং সংযমে, আর প্রতিপক্ষভাবনায়। প্রতিপক্ষভাবনা হল যেমন আঁধার দূর করতে আলোর ভাবনা। আঁধারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তাকে দূর করা যায় না। অবিশুদ্ধি অপরা-প্রকৃতির ধর্ম; তাকে দূর করবার জন্য বিবেকের সাধনা চাই। বিবেক আনবে মুক্তি, স্বরূপ-স্থিতির প্রশান্তি। প্রশান্তিতে ঊর্ধ্বশক্তির আবেশ হলে ঘটবে প্রকৃতির রূপান্তর এবং তাহতে ঋতচ্ছন্দ আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি। মোটামুটি এই হল পথের ছক।

কিন্তু সিদ্ধির পক্ষে সবচাইতে বড় বাধা হল অহন্তার সঙ্কোচ। প্রকৃতির অব্যাকৃতির (indeterminateness) মধ্যে ব্যাকৃতির প্রথম নিশানা হল অহন্তা। তাকে চৈতন্যের সূচীমুখ বলতে পারি, অন্ধকারের মধ্যে সে যেন একটি নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। সে বিবিক্ত, গোড়া হতেই আত্মা এবং অনাত্মা এই দুভাগে বিশ্বকে সে ভাগ করে নিয়েছে। তার বাইরে যা-কিছু সবই তার অনাত্মীয়। এই হতে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে ভেদ ও নিষেধের বুদ্ধি, বিশ্বের প্রতি একটা যুযুৎসার ভাব। কিন্তু বস্তুত সে বিশ্বের অঙ্গীভূত, তার সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু সংঘর্ষের নয়, সংশ্লিষ্ট ও সংশ্লেষণেরও। আলোর মতই চৈতনা ব্যাপ্তি-ধর্মা। অহং-চেতনাও নিজেকে ব্যাপ্ত করতে চায়। পরকে আত্মসাৎ করে নিজেকে সে পুষ্ট করতে চায়—এই যেমন তার প্রাণের ধর্ম, তেমনি সমবেদনায় অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকে সে বৃহৎ করে পায়—এই তার প্রেমেরও ধর্ম।

প্রেম হৃদয়কে বিস্ফারিত করে, অহংচেতনাকে মুক্ত শুদ্ধ এবং আনন্দময় করে। তার পরিণাম সর্বাত্মভাবে 'আমার আত্মা সবার আত্মা'—এই অনুভবে। তখন আর আমি অহং নই, আমি আত্মা। নক্ষত্রচেতনা তখন সৌরদ্যুতিতে প্রভাস্বর। দেহে প্রাণে মনে তখন আমি সবার সঙ্গে এক। আত্মা ব্রহ্ম সর্বভূত—তিনে এক, একে তিন।

এই হল পরমা সিদ্ধি। একদিকে পুরুষের পরিপূর্ণ সংবিৎএ স্বারাজ্যসিদ্ধি, আরেক-দিকে আত্মভূত প্রকৃতির ঈশনায় সাম্রাজ্যসিদ্ধি। পুরুষ তখন আদিত্যস্বরূপ সূর্যরূপে সবার উদ্ভাসক, সবিতারূপে সবার প্রচোদয়িতা, ভগরূপে সবার হৃদয়ে-হৃদয়ে আবিষ্ট।

চিন্ময় মনে এই সিদ্ধির আভাস ফোটে বিদ্যুৎঝলকের মত। কিন্তু তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা অতিমানসেই।

[ক্রমশ]

দৃঢ়সমর্থ ও আঁটসাঁট তলপেট*

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের অপরিহার্য অঙ্গ

তারা জহর

সুঠাম ও সবল দেহ যেমন সকলের মনেই প্রশংসা জাগায় তেমনি বেঢ়ক বেয়ারা দেহ মনকে পীড়া দেয়। এই প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রত্যেকের মনে একটা দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা জাগা উচিত যে, নিজের দেহকে করতে হবে সুন্দর সুগঠিত ও লাবণ্যময়। কিন্তু আমাদের চারপাশে যখন তাকাই তখন দেখি যে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সব মানুষেরই—রোগা হোক আর মোটা হোক—কমবেশি একটি স্ফীত উদর বা তলপেট (abdomen) আছে। অত্যুক্তি না করেই বলা চলে যে শতকরা প্রায় আশী জনেরই এই অবস্থা—কি পুরুষের, কি মেয়েদের! আশ্চর্য এই যে, এই স্ফীত তলপেটের জন্য তাদের কোনো অস্বস্তিবোধ পর্যন্ত নেই। এমন কি, এবিষয়ে তারা সচেতনও নয়। অথচ এইটির জন্য তাদের কত রোগে ভুগতে হয় তাও তারা জানেনা। আমরা এবিষয়টিরই আলোচনা করব।

আমাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে আমাদের মস্তিষ্কের মগজ বা বুকের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস্ সবই হাড়ের একটা বেষ্টনী বা খাঁচার মধ্যে সুরক্ষিত আছে, কিন্তু উদরের বেলায় তেমন কিছু নেই। যদিও পিছন দিক মেরুদণ্ড, উরুসন্ধি ও নিতম্বের ত্রিকোণাস্থি দ্বারা সংরক্ষিত আছে, সামনের দিকের বর্ম বা বেষ্টনীর কাজ নির্ভর করে তলপেটের মাংসপেশীর উপর। এই মাংসপেশীগুলি যদি ব্যায়ামদ্বারা মজবুত ও দৃঢ়বদ্ধ না রাখা যায় তাহলে তলপেটের ভিতরের কলকব্জা শক্ত বাঁধনে আটকে থাকতে পারে না। মাংসপেশী হয়ে যায় ঢিলে ও শিথিল। ফলে তলপেট ঝুলে পড়ে। এই ঝুলে পড়ার দরুণ আধার অনেক উপদ্রবের সৃষ্টি হয়। ভিতরের অন্ত্রগুলি আপন আপন স্থান হতে সরে গিয়ে একটা অন্যটার উপর চাপ দিতে শুরু করে। এই চাপের জন্য অন্ত্রের জৈব-ক্রিয়া সব বাধাপ্রাপ্ত হয়। তারপর বিভিন্ন অংশের সংযোগগ্রন্থীগুলি শুখ হয়ে যায়। ফলে ভাই-

* Your Health থেকে গৃহীত। অনুবাদক—[illegible]

আক্রান্ত বা যথাচ্ছন্দা, যা শ্বাসপ্রশ্বাসকে স্বয়ংক্রিয় করে, তা ঠিকমত কাজ করতে পারে না। তাতে দেহের সৌষ্ঠব ত নষ্ট হয়-ই, অছাড়া কতকগুলি রোগেরও সৃষ্টি হয়, যথা কোষ্ঠবদ্ধতা, হার্নিয়া, অ্যাপেনডিসাইটিস্, বাধক, ইত্যাদি।

এখন এই তলপেট কেন ঝুলে পড়ে তার কারণ ও প্রতিকার দুই-ই আমাদের দেখতে হবে। প্রথমত: শরীরের সাধারণ দুর্বলতার সঙ্গে তলপেটের মাংসপেশীর দুর্বলতাও এর একটা কারণ। এ ছাড়া কতকগুলি অভ্যাসও এর জন্যে দায়ী। যাঁদের বসে কাজ করতে হয়, তাঁদের মধ্যে সাধারণত: অফিস-এসিসটেন্ট এবং শিক্ষকগণ প্রায় সময়ই শিথিল আয়াসে বসে কাজ করে থাকেন। কাজ করার সময় এই যে অলস আয়াস এও একটা কারণ। তারপর কাপড় বা পোষাক ঠিকভাবে না পরার দরুণও এমন হয়। শক্ত করে কোমর বাঁধলে রক্ত ঠিকমত চলাচল করতে পারে না এবং এই শক্ত বাঁধনের বজ্রআঁটুনিতে তলপেট বড় হয়ে যায়। আবার পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবও এর কারণ হতে পারে।

ব্যায়ামের সাহায্যে পেটের মাংসপেশী সুদৃঢ় ও সবল করার উপায় সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার কি কি কারণে তলপেট ফুলে ঝুলে পড়ে। তাহলে আমরা গোড়া থেকেই এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারি। আমরা দেখতে পাই যে আফিসে বা স্কুলে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা চেয়ারে বসে টেবিলে অনেকক্ষণ কাজ করার পর যখন শ্রান্তি আসে, তখন অবসাদের দরুণ দেহটি ঠিকভাবে সোজা রাখতে পারেন না। শিথিলতায় দেহ নুয়ে পড়ে। তাই এইভাবে বসে অনেকক্ষণ কাজ করতে নেই। দু'এক ঘন্টার পর অন্তত:পক্ষে পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও একটু বিরতি দিতে হয়। তখন মুক্ত জায়গায় গিয়ে কয়েকবার লম্বা শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া উচিত। সম্ভব হলে চিৎ হয়ে শুয়ে পা দু'টি টেনে এনে কয়েকবার ঐভাবে শ্বাস নিতে পারলে দেহের অবসাদ দূর হয়ে যায়, দেহে একটা সতেজতাও পাওয়া যায়। তারপর কোন সময়ই শক্ত করে কোমর বাঁধা উচিত নয়। এতে হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস, লিভার ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত ও সঙ্কুচিত হয়ে একটা আক্ষেপ বা খিঁচুনীর সৃষ্টি করে এবং তাতে শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-চলাচল, পরিপাক-শক্তি ও ক্লেদাদি-নি:সরণ ইত্যাদি ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে সামান্য পরিশ্রমেই শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

খাদ্য বিষয়ে এটা জানা দরকার যে অতিভোজন বা অত্যল্পভোজন দুই-ই ক্ষতিকর। যদি কেউ স্বল্পাহারী হন তাঁকে পুষ্টিকর খাদ্যদ্বারা পরিমিত আহারের প্রয়োজন মেটাতে হবে। শুনলে আশ্চর্য মনে হবে যে বেশী ভোজনেই শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না। তার একটা কারণ আছে। আমাদের পেটের ভিতরে অন্ত্রগুলি রবারের টিউবের মত ঝুলে থাকে। অত্যধিক খাদ্যের চাপে বা গৃহীত অতিরিক্ত খাদ্যের ভারে সেই অন্ত্রগুলি লম্বা হয়ে যায় এবং ভারে ও পরস্পরের টানাটানিতে অন্ত্রগুলি স্থানচ্যুত হয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। এই জন্যে হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহের পুষ্টির অভাব হয়। আমাদের খাদ্যদ্রব্যের

মধ্যে থাকা উচিত সব্জি, ফল, চিনি, আটা, আটার রুটি, স্নেহদ্রব্য ইত্যাদি পুষ্টিকর জিনিষ।

কোষ্ঠপরিষ্কারের জন্য রেচকজাতীয় ঔষধ কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। তাতে অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি লোপ পায়। যদি কারো জোলাপ নেওয়ার অভ্যাস হয়ে থাকে তবে তার পরিমাণ ক্রমে কমিয়ে এনে এই অভ্যাস থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে হবে। নিয়মিত কোষ্ঠপরিষ্কার রাখবার অভ্যাস নিজের চেষ্টায় সৃষ্টি করা উচিত। তা নাহলে স্বাস্থ্যরক্ষার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। এই স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। ইংল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত ডাক্তার তাঁর জীবনে সাফল্যের মূল রহস্য সম্পর্কে একটি বিশেষ বই লিখে, তা না-কি বাক্সবন্দি করে গোপন রেখেছেন, সবারই এরূপ ধারণা হয়। বই-এর বিষয়বস্তু জানবার জন্যে লোকের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তারপর যখন তাঁর মৃত্যু হল, বইটি বার করে দেখা গেল যে, তাতে প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে—নিজের মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখবে, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লেখা—আপন অন্তঃকরণ সহৃদয়তাপূর্ণ রাখবে, আর তৃতীয় পৃষ্ঠায় লেখা আছে —সর্বদাই কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখবে। মোট কথা পেটের স্বাভাবিক গঠন ও মাংসপেশী দৃঢ় ও সবল রাখতে হলে এবং আন্ত্রিক ক্রিয়াসকল ঠিকমত চালিত রাখতে হলে একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে শরীরচর্চা।

ব্যায়াম যে শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে কত উপকারী, তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। এই ব্যায়াম দেহে আনে একটা অঙ্গসৌষ্ঠব বা দেহছন্দ, নমনীয়তা, গতির ঢেউ, কান্তি, শক্তি-বত্তা, সহনশীলতা, এমনি আরও কত গুণ। এই ব্যায়ামের ফলে দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া সুন্দর মসৃণ ভাবে কাজ করে এবং শরীরে রক্ত-চলাচল বাড়িয়ে দিয়ে খাদ্যের সারাংশ এবং অক্সিজেন প্রতি স্নায়ুতে পৌঁছে দেয়। সমস্ত ক্লেদ নিঃসারিত করে দেহকে করে সর্বপ্রকার দোষমুক্ত। তারপর পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারলে স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হবেই এটা নিশ্চিত বলা যায়। ব্যায়াম দেহের প্রতি স্নায়ুতে একটা স্নিগ্ধভাব এনে দেয় এবং মনকে করে চাঙ্গা। ব্যায়ামের দ্বারা অতীতের অবহেলাজনিত দেহের সমস্ত প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর হয়ে যায়। শুধু, নির্জীব পেশীগুলি সবল ও শক্তিপূর্ণ হয়ে উঠে। কর্মক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেয় এবং ক্লান্তি কোন সময়ই শরীরকে কাবু করতে পারে না। অতি সহজেই সব শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

সহজ ব্যায়ামগুলি কতক দিন অভ্যাস করলেই উপকারিতা বোঝা যাবে। তখন পেট টান করে সোজা হয়ে চলা আমাদের পক্ষে কত সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এই প্রকার কতকগুলি সহজ ব্যায়ামের নমুনা আমরা উল্লেখ করছি এবং ছবিতেও তার প্রণালী দেখাচ্ছি।

১নং ব্যায়াম

তলপেটের স্বাভাবিক সমতল অবস্থার মর্ম বুঝতে হলে সোজা দাঁড়িয়ে হাঁটু একটু শিথিল করে দাও যাতে ত্রিকাস্থি (sacrum) নীচে টেনে নাবে। এমনি করে গোড়ালি শুদ্ধ পা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত তলপেটের উপর রেখে ডান হাত চিৎ করে ত্রিকাস্থি (sacrum) উপর নিতম্বের দিকটা নীচের দিকে ঠেলতে হবে এবং পেটের দিকটা উপরের দিকে টেনে তুলতে হবে। এই অভ্যাসে পেট ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যায়। আয়নার সামনে এই ব্যায়াম করলে পেট কতটুকু স্বাভাবিক অবস্থায় এলো তা বোঝা যাবে।

২নং ব্যায়াম

প্রাতে শয্যাত্যাগের সময় তড়াক করে লাফিয়ে না উঠে এই ব্যায়াম শোয়া অবস্থাতেই করতে হয়। এই ব্যায়ামের প্রধান উপকারিতা হল কোষ্ঠশুদ্ধি। প্রথমত: চিৎ হয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে। তারপর ডান পা হাঁটু ভেঙ্গে টেনে আনতে হবে পেটের উপর পর্যন্ত। তখন দু'হাত দিয়ে হাঁটুর নীচে ঐ পা ধরে পেটের সঙ্গে একটু চেপে রাখতে হবে। আধ মিনিট পর ছেড়ে দিয়ে পা লম্বাভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর বাঁ পাটি ঠিক ঐ ভাবে টেনে নিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে পেটের সঙ্গে চেপে ধরে আবার আধ মিনিট রেখে ঐ পা ছড়িয়ে দিতে হবে।

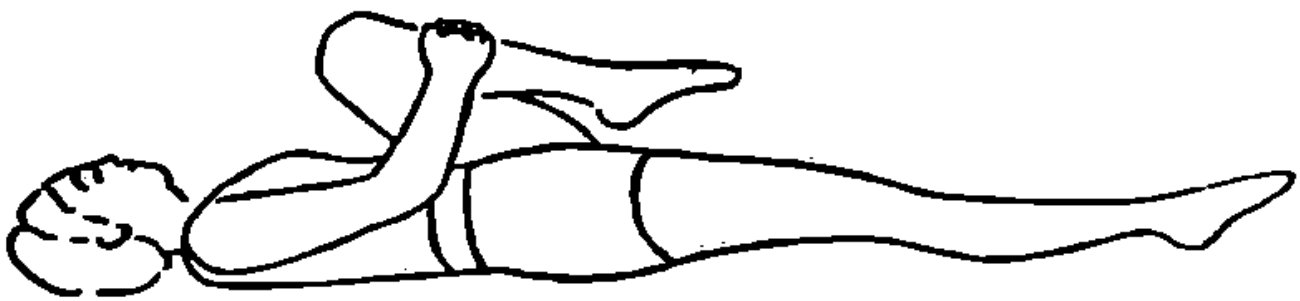

এই ভাবে কয়েক বার করতে হবে। তারপর দু'টি পা-ই এক যোগে পেটের উপর তুলে আনতে হবে এবং হাঁটুর নীচে দু'পা ধরে পেটের সংলগ্ন অবস্থায় একটু আলগা ভাবে চেপে রাখতে হবে। এইভাবে আধ মিনিট চেপে রাখা এবং আধ মিনিট ছেড়ে সোজা রাখা। বার তিনেক এরকম করতে হবে।

৩নং ব্যায়াম

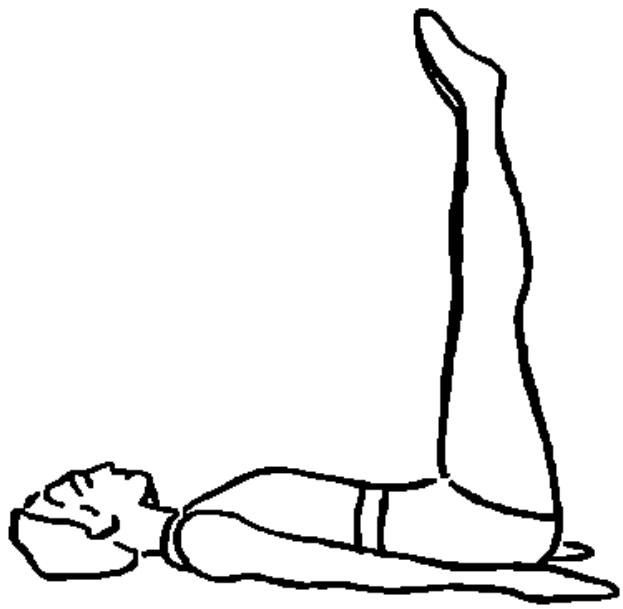

চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় হাত দু'টি কোমরের দিকে লম্বা করে রেখে পা দু'টি আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলতে হবে। পাছা থেকে সোজা উপরের দিকে। উরুর দিকটা এবং নিতম্ব যেন সমকোণে থাকে। তারপর দু'টি পা-ই একসঙ্গে নীচে নামিয়ে আনতে হবে এবং আবার উপরের দিকে উঠাতে হবে। ছয় থেকে আট বার এইরূপ করতে হবে।

৪নং ব্যায়াম

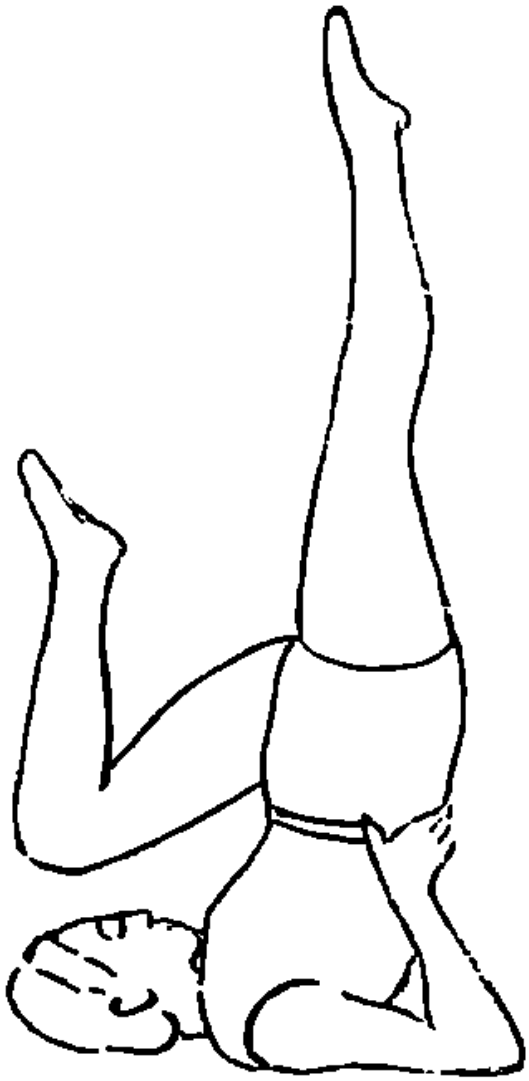

এই ব্যায়ামটি একটু কঠিন। বিশেষ-করে শিক্ষানবিশদের পক্ষে। প্রথম তাদের এটি অভ্যাস না করাই ভাল। করতে পারলে এই ব্যায়াম উৎকৃষ্ট। আমাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি সর্বদাই নীচের দিকে ঝুলে থাকে। এই ব্যায়াম সেই নাড়িভুঁড়ি বা অন্ত্রসব বুকের দিকে এনে স্থিত অবস্থায় স্থাপন করে এবং এতে অন্ত্রগুলি একটু আয়াসে থাকে। শোয়া অবস্থায় কাঁধ থেকে শরীর শুদ্ধ দু'টি পা সোজা উপরের দিকে খাড়া করে তুলে নিতে হবে। তারপর পা দু'টি দিয়ে যেন শূন্যে বাইসিকেলের পেডাল করা হচ্ছে এরূপভাবে পা নাড়াতে হবে। এই ভাবে বিশ পঁচিশ বার পায়ে পেডাল করার ভঙ্গী করতে হবে। শেষ হলেই না উঠে অন্ততঃ আধ মিনিট কাল শোয়া অবস্থায় থেকে উঠতে হবে।

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

-The Mother

NATIONAL GENERAL TRADING

19, STRAND ROAD

CALCUTTA-1.

GRAM: DONWEL

PHONE: 22-3577
35-3314

POWER PLANT

at DHUVARAN
promise of plenty for GUJARAT

In about two years' time, at the small village of Dhuvaran, near the confluence of the river Mahi and the Gulf of Cambay, a fine project of Gujarat will materialise. The Rs 250-million thermal power plant, with its four turbo-generators, will feed the power hungry industries of Gujarat with 250 mw of motive power. As at Bokaro, Barauni and Bandel, Delhi and Durgapur, the Kuljian Corporation, with its world-wide experience of power-engineering, is already there helping the State of Gujarat build this key power project.

The **Kuljian** *Corporation*
engineers & constructors

1200, NORTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, U.S.A.
India Office : 24-B, Park Street, Calcutta-16

kuljian helps bring more power to the grid

KULJIAN

Design • Engineering • Procurement • Construction • Reports • Initial Operation

It's Spencer's

at home or in a party this invigorating and refreshing drink is sheer delight.

SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14

PHONE : 47-2639

FAMOUS GROCER AND SPICES DEALER
OF
SOUTH CALCUTTA

ASWINI KUMAR NANDI & SONS

JADU BABU'S BAZAR
BHOWANIPORE
CALCUTTA - 25

"Having realised infinite unity in ourselves, then to give ourselves to the world is utter freedom and absolute empire."

— *Sri Aurobindo*

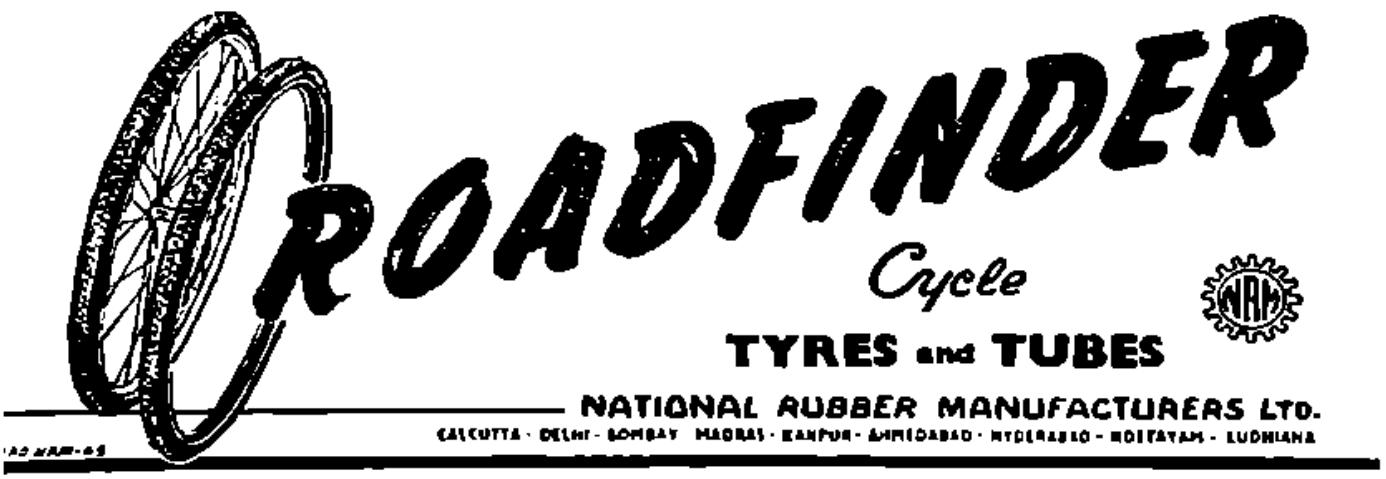

To work for the Divine is to pray with the body.

-The Mother

For all sorts of glasses for Buildings, Furniture and Cars, please send your enquiry to :—

B. K. SHAW & CO.,

P - 20, Radha Bazar Street,
CALCUTTA - 1

Cable : BIKEGLAS

Phone : 22-5613

Telegrams: **'Vessel' Cal**
Codes { Scott's 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : 23-1393 Dock Office: Residence: { 55-6464 55-3724 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLSKI OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

Eastern Carrying Company (P) Ltd.

(Transport Contractors)

Daily Service to West Bengal Towns
Bihar, U. P. and Nagpur

29, Waterloo Street,
CALCUTTA-1

Phone : 23-1944
33-8558

PHONE : 34-2665 GRAM : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

"One who has given himself to the Divine has no longer any other duty than to make that consecration more and more perfect."

The Mother

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

Beauty shall walk celestial on the earth,
Delight shall sleep in the cloud-net of her hair
And in her body as on his homing tree
Immortal Love shall beat his glorious wings.

Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

"Love in her was wider than the universe,
The whole world could take refuge in her single heart."

Sri Aurobindo

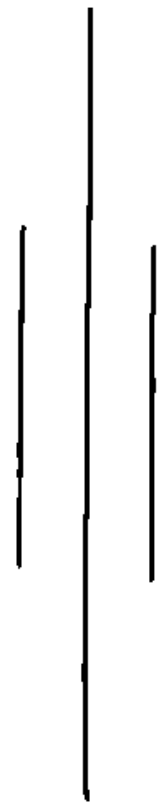

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

There is nothing impossible in the world except that which is outside your consciousness. And as your consciousness can grow, as what is not in your consciousness today may be there after some time, because the consciousness increases, there is nothing then in the eternity of time that is impossible.

—The Mother

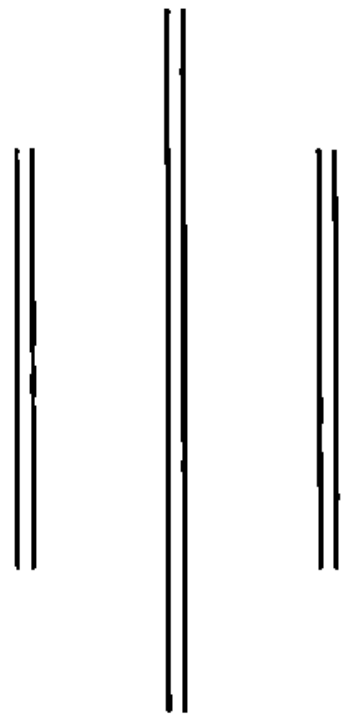

BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA–33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

Try to take pleasure in all you do, but never do anything for the sake of pleasure.

-The Mother

Independence Transport & Shipping Agency,
P. 40, Princep Street,
CALCUTTA-13.

Phone : **23-6503**

Cable : **ITSACINCH**

Troubled by insects ? ?

If so, please do not hesitate to make use of our up-to-date scientific and efficient servicing arrangements by specially trained staff for completely disinfecting your premises with :

I.C.I.'s " GAMMEXANE " FORMULATIONS

Eastern Insecticide & General Merchandise Pr. Ltd.

(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)

4, Lyons Range
CALCUTTA-1

For your Electrical Services

CONSULT

FARADAY ELECTRICALS

79, DHARAMTALA STREET

Show Room: 9, Lower Circular Road
CALCUTTA—16.
PHONE—24-2012.

Beauty and plenitude, a hidden sweetness and laughter in things, a sunshine and gladness of life are also powers and expressions of the Spirit.

—*Sri Aurobindo*

With compliments from:-

Tata Scob Dealers (Controlled Stock) Cal. Ltd.,

20, Strand Road,

CALCUTTA-1.

Telephone : **22-1101-1107** *Telegram :* **TASCOB**

With best compliments of

Russa Road Service Station

Authorised service agents for
Ambassador, Bedford, Chevrolet

Distributors
Esso Standard Eastern Inc.
4/2 & 5 Russa Road, Calcutta-25
Phone 47-3467

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্তের

★ কবির্মনীষী

★ রবীন্দ্রনাথ

(রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক)

★

শ্রীমৎ অনির্বাণের

দিব্যজীবন প্রসঙ্গ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির—১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম—পণ্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক অভিব্যক্তি	শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত	৩৸০
শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও বর্ত্তমান জগৎ	শ্রীঅনিলবরণ রায়	৸১
কবিমনীষী	ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী	১৸০
রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে। পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ)		৩৸০
সাধনার জীবন	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত গুপ্ত	১৲

: শ্রীঅরবিন্দ :

বিবিধ রচনা

মূল বাংলায় লেখা পুরাতন খাতাপত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রথম মুদ্রিত

মূল্য ১৲

ভারতের নবজন্ম	১৷৹
কর্ম্মযোগী	১৷৹
জগন্নাথের রথ	১৲
গীতার ভূমিকা	২৲
শ্রীঅরবিন্দের পত্র	১৲
পত্রাবলী	১৷৹

: শ্রীমা :

উত্তম রহস্য

[একাঙ্ক নাটিকা]

রাজনীতিজ্ঞ, লেখক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী ও ব্যায়ামী ছ'জনের ছয়টি আত্ম-কাহিনী ও তার উপসংহার

মূল্য ১৲

ছোটদের গল্প	১৷৹
পুরাণো লেখা	১৷৹
শিক্ষা	১৷৹
মায়ের আলাপ	২৷৹

মিথ্যা-জীবন (দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম খণ্ড ৮৲ ; ২য় খণ্ড ১৷৲

1. Loving Homage Rs. 10/-
2. The Golden Book of The Mother ,, 100/- (De Luxe Edn.)
   60/- (Ord. Edn.)

সরিষার তৈল

১, ২, ৪ ও ১৬॥০ কে. জি. টিন
এবং ৪০ কে. জি. শীল করা
ড্রামে পাওয়া যায়।
এখন হইতে ৫০০ গ্রাম শীল
করা বোতলেও পাওয়া যায়।

গণেশ
সরিষার তৈল

প্রাগ অয়েল মিলস · আলীগড়।

What is the duty of every Indian today
in the present emergency ?

30 APR 1963

Overgrow your small egoistic personality and become a worthy child of our Mother India, fulfil your duties with honesty and rectitude, and always keep cheerful and confident with a steady trust in the Divine's Grace.

30 APR 1963

বর্তমান সংকটে প্রত্যেক ভারতবাসীর আজ কর্তব্য কী ?

"তোমার সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে যাও এবং আমাদের ভারতমাতার যোগ্য সন্তান হয়ে ওঠো, নিজের কর্তব্য করে যাও সততা এবং অব্যভিচারিতার সঙ্গে, আর ভগবানের করুণার উপরে অবিচল নির্ভরতা রেখে সর্বদা প্রফুল্ল এবং প্রত্যয়শীল হও।"

শ্রীমা

CALCU
UNIVE

বর্তিকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

১৫ই আগস্ট, ১৯৬৩

বর্ষ—২৩ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৬৩)

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

১। চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	শ্রীঅরবিন্দ	১
২। রাত্রি-সূক্ত	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩
৩। আমার এথলেটিক্স	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১০
৪। বলোরার উজীররা	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
৫। ভেড়াদ্বন্দ্ব বিহঙ্গ-বিহার	শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত	৩৮
৬। মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৪২
৭। প্রশ্নোত্তর	শ্রীমা	৫৭
৮। যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	৬৩

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৯শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
মুদ্রক—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

১৫ আগস্ট, ১৯৬৩

এই যে বর্ত্তমান সভ্যতা একেই যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তা নয় বাঁচিয়ে রাখতে হবে জগৎকে এবং তা নিশ্চয় করা হবে; যদিও অনেকে যেমন ইচ্ছা করে, কল্পনা করে বা যেমনভাবে কল্পনা করে তেমন সহজে বা সত্বরে তা নাও ঘটতে পারে। বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তন অবশ্যই চাই—তবে ধ্বংসের ভিতর দিয়ে কি মহত্তর একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নব-সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, তাই হল সমস্যা। প্রশ্নটি আপাতত মা শিকেয় তুলে রেখেছেন, আমিও তবে তাই করছি।

১৯৪৫ শ্রীঅরবিন্দ

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

ভক্তি

ভগবানকে দেখ সর্ব্বত্র, তাঁর মুখোসে ভয় পেয়ে যেও না। বিশ্বাস কর, সব মিথ্যাই হল সত্যের গড়ন না হয় ভাঙ্গন, সব ব্যর্থতা হল প্রচ্ছন্ন সার্থকতা, সব দুর্ব্বলতা দৃষ্টিহারা আত্মহারা সবলতা, সব বেদনা একটা গোপন ও প্রচণ্ড পুলক। যদি তোমার থাকে অবিচল অবিশ্রান্ত বিশ্বাস, তবে একদিন তুমি সর্ব্বসত্যময়ের, সর্ব্বশক্তিময়ের, সর্ব্ব-আনন্দময়ের সাক্ষাৎ পাবে, উপলব্ধি পাবে।

*

মানুষী প্রেম ব্যর্থ হয় নিজের তীব্রানন্দেরই ফলে, মানুষী শক্তি নিঃশেষ হয় নিজের প্রচেষ্টার ফলে, মানুষী জ্ঞান অখণ্ডমণ্ডলাকার জ্ঞানসূর্য্যের অর্দ্ধেক ঢেকে ফেলে তার নিজের ছায়া ফেলে। ভাগবত জ্ঞান কিন্তু বিরোধী সত্যকে আলিঙ্গন করে, তাদের সমন্বয় করে— ভাগবত শক্তি নিজের অমিতব্যয়ের ফলেই বেড়ে চলে, আর ভাগবত প্রেম নিজেকে বিলিয়ে ছড়িয়ে দেয় অকুণ্ঠভাবে, তাতে ক্ষয় নাই ক্ষতি নাই।

*

পূর্ণসত্যের অন্বেষু মন কেন যে অপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীণ ধ্রুব সত্যকে লাভ করে না তার এক প্রধান কারণ, মন মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে। দিব্যজনের প্রয়াস হল মিথ্যাকে পরিহার করে চলা নয়, পরন্তু অতি বিস্তৃত অতি বিভ্রান্ত ভ্রান্তির পিছনেও রয়েছে যে সত্য তাকে আবিষ্কার করে ধরা।

*

একটি বস্তুর সমগ্র-সত্য হল একটা চক্রাকার সর্ব্বগ্রাহী মণ্ডল—তা জ্ঞানের যে একমাত্র বিষয় ও বস্তু সেই ভগবান—তার চারদিকে ঘুরে চলে বৃত্তাকারে কিন্তু তাকে কখন স্পর্শ করে না।

*

অনেক গভীর সত্য সব আছে যা আনাড়ীর হাতে অস্ত্রের মত বিপজ্জনক। যথাযথ ব্যবহৃত হলে, ভগবানের অস্ত্রাগারে তারাই সবচেয়ে মূল্যবান শক্তিমান।

*

আমাদের যে স্বল্প, খণ্ডিত, রাত্রি-ঘেরা, দুঃখ-ঘেরা ব্যক্তিগত জীবন, তাকে এমন শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকি ঠিক যখন আমাদের বিশ্বভূত জীবন তার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নিয়ে আমাদের ডাকছে—এই হল ভগবানের একটা অতি বিচিত্র রহস্য। এর সমান একমাত্র রহস্য হল এই যে আমরা আমাদের অনন্ত অজ্ঞান আশ্রয় করে আমাদের অহংএর ছায়া ফেলি সমস্ত জগতের উপর—আর তাকে নাম দেই বিশ্ব-সত্তা। এই দুটি অন্ধকার নিয়ে হল মায়ার নিজস্ব স্বরূপ ও শক্তি।

*

নাস্তিকতা হল ভগবানের যে উর্দ্ধতম উপলব্ধি তার ছায়া বা অন্ধকার দিকটা। ভগবানের যে কোন সংজ্ঞা আমরা দেই না কেন, প্রতীক হিসাবে সর্ব্বদা তা সত্য হলেও, তা হয় মিথ্যা যদি তাকে গ্রহণ করি পূর্ণ-সংজ্ঞা হিসাবে। নাস্তিক আর অজ্ঞেয়বাদী এসে আমাদের ভুল স্মরণ করিয়ে দেয়।

*

ভগবান সম্বন্ধে নাস্তিবাদ আমাদের উপকারে আসে তাঁর অস্তিবাদেরই মত। তিনিই নাস্তিক হয়ে তাঁর নিজের অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন, মানুষের জ্ঞানকে আরো পূর্ণতর করে তুলবার জন্যে। খৃষ্টের মধ্যে কি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ভগবানকে দেখা বা তাঁর বাণী গ্রহণ করা যথেষ্ট নয়, তাঁকে দেখতে হবে শুনতে হবে হাক্সলীর মধ্যে, হীকেলের মধ্যে।

*

ভগবানকেই দেখতে পাও না কি তোমার উৎপীড়কের মধ্যে, হন্তার মধ্যে, এমন কি মৃত্যুর মুহূর্ত্তে, কি পীড়নের অবস্থায়? দেখতে পাও না ভগবানকেই, যাকে তুমি হত্যা করছ তারই মধ্যে, দেখতে পাও না কি, ভালবাস না কি ঠিক তখনই যখন তুমি হত্যাকর্ম্মে লিপ্ত? তাহলে তোমার করতলগত হয়েছে বটে পরাজ্ঞান। কৃষ্ণকে সে পাবে, কালীকে পূজা কখন যে দেয় নাই?*

* Thoughts and Aphorisms থেকে। অনুবাদক—শ্রীঅনিলবরণ রায়

রাত্রি-সূক্ত

ঋগ্বেদ—১০ম মণ্ডল—১২৭ম সূক্ত

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১

আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে এই যে রাত্রি আসছেন, চক্ষু সব খুলে ধরেছেন চার দিকে—সকল শ্রীর অধিষ্ঠাত্রী হয়ে আসীন তিনি।

২

অমর দেবী ঊর্দ্ধ হতে, অধঃ হতে সকল প্রসার পূর্ণ করে রেখেছেন—তাঁর জ্যোতি দিয়ে তমঃকে ব্যাহত করেছেন।

৩

আপন ভগ্নী উষাকে সরিয়ে দিয়ে আসছেন—তমসাও তবে অপসৃত হয়।

৪

তিনি আজ আমাদের হয়েছেন সেই বস্তু যেখানে আমাদের আশ্রয়, বৃক্ষ যেমন পক্ষীকুলের আশ্রয়।

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১ ॥

ওর্ব্বপ্রা অমর্ত্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২ ॥

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী।
অপেদু হাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষহি।
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ ॥ ৪ ॥

৫

ওঁরই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে যত জনপদ, যত জীব যারা পায়ে চলে বা ডানায় চলে, এমন কি ছুটে চলে যে শ্যেনপক্ষী।

৬

বৃকা হোক, বৃক হোক বা তস্কর হোক, তাদের দূরে রাখ তুমি হে সাগরিকা। তোমাকে আমরা পার হয়ে যাই যেন সহজে।

৭

ঘোর অন্ধকার আমাকে ঘিরে আবির্ভূত—
হে উষা, আমার ঋণরাশির মত তাকে তুমি মুছে ফেল।

৮

স্বর্গের দুহিতা, হে রাত্রি! উজ্জ্বল গো-রাজির মত, তোমার উদ্দেশ্যে বিজয়-যাত্রায় চলেছে আমার কৃত এই স্তব।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ।
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫ ॥

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব ॥ ৬ ॥

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং বাস্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয় ॥ ৭ ॥

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য

সূর্য্যের দুই মা—উষা ও রাত্রি, একজন কৃষ্ণা আর একজন শুভ্রা—দু'জন আবার ভগ্নী, সহোদরা। এক হিসাবে আবার রাত্রি হলেন সূর্য্যের মাতামহী—কারণ ঋষি দীর্ঘতমা বলেছেন রাত্রি দেয় উষার জন্ম, উষা আবার দেন সূর্য্যের জন্ম। সূর্য্য অর্থ অধ্যাত্মজ্ঞান, ভাগবত চেতনা।

রাত্রি হল প্রশান্তি, আত্ম-নিমগ্নতা, আর উষা বা দিন হল প্রকাশ সক্রিয়তা। সমস্ত চেতনাকে গুটিয়ে নিয়ে ভিতরে আত্মস্থ থাকা, যা অর্জ্জিত আহরিত হয়েছে দিনের আলোয়, তাকে সঞ্চিত করে আত্মভূত করা—রাত্রির হল এই কাজ।

বাহ্যত দেখা যায় বটে রাত্রি যেন দিনের বিপরীত, বিরোধী—বস্তুতঃ তা নয় —রাত্রি গোপনে ধারণ করে পোষণ করে দিনের আলো; রাত্রি দিনের এক ঘনীভূত মূর্ত্তি—হীরকের গুপ্তরূপ নয় কি অঙ্গার? ঋষি বলেছেন, দেখতে তারা দু'রকম কিন্তু অন্তর তাদের এক।

তবে রাত্রির চেতনায় ফুটে ওঠে আমাদের গুপ্ত বা সুপ্ত শত্রু সব, ভূত প্রেত শ্বাপদ—নিশাচর, দিনে যারা লুকিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। তাদের সম্মুখীন হতে হবে তখন, তখনি জয় করতে হবে—পার হয়ে যেতে হবে তাদের। রাত্রি দেয় সেই সুযোগ ও সার্থকতা।

আমার এথলেটিক্‌স

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

উপনিষদ যে বয়সের বর্ণনা দিয়ে বলছেন—

স্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি

জরাজীর্ণ তুমি, দণ্ডে ভর করে চলেছ—ঠিক সেই বয়সে আমাদের ডাক এলো খেলার মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়তে—সকলের মধ্যে আমিই তখন হয় ত' বরিষ্ঠ—পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ যে বিধি আছে তা পার হয়ে ঘাটের কোঠায় প্রবেশ করেছি—তার আগে বিশ বৎসর অন্ততঃ কাটিয়েছি যাকে বলা যেতে পারে শুয়ে বসে, বাহ্যতঃ কোন পরিশ্রম বা অঙ্গ-সঞ্চালন কিছু না করে—সেটা ছিল বলা যেতে পারে আমাদের স্বাধ্যায়ের যুগ—ধ্যান-ধারণা পড়াশুনা এই সব নিয়ে। তবে দেহটা একেবারে অথর্ব না হয়ে পড়ে এই জন্য দুটি পরিশ্রমের সুযোগ আমি গ্রহণ করি—এক হ'ল সাইকেলে চড়ে সপ্তাহে একবার করে ফরাসী পোষ্ট আফিসে যাওয়া ও আসা—মায়ের পোষ্ট তখন আসত ঐ ফরাসী পোষ্ট আফিস দিয়ে—এবং আমাকেই তার দেওয়া হ'ল তা বয়ে আনতে। এখানে তবে বলি—কারণ এ কাজ থেকেই তার উদ্ভব হয়েছিল—আমার মাথার টুপীর কথা। গ্রীষ্মে—পণ্ডিচেরীর গ্রীষ্ম, নিদারুণ রৌদ্র ভেদ করে আমাকে যেতে হত পোষ্ট আফিসে—বেশ দূর ছিল তখন তা। সুতরাং মাথায় protection দরকার অনুভব করতাম। একটা উদ্ভাবন হল—ডাক আনতে ব্যাগ নিয়ে যেতাম—সাদা ব্যাগ একটি কি দুটি—তাই দুভাঁজ করে মাথায় পরে নিতাম। ব্যাগের দুটি কোণ সিংএর মত মাথার দুদিকে বের হয়ে থাকত। একদিন স্কুলের ছেলেরা দেখে ত হেসেই খুন, বলে উঠল: Quel bonnet! Quel bonnet! এই গল্প মায়ের কাছে করলাম। মা বললেন—আচ্ছা দেখছি—তখন সরলা নামে একটি ফরাসী মহিলা থাকতেন (স্বামী-স্ত্রী, তাঁদের নাম ছিল শুচি-সরলা—থাকতেন Belle Vue নামের বাসাতে। শুচি এখানে মারা যান, তাঁর সমাধি আছে খ্রীষ্টানদের সাধারণ সমাধিস্থলে)। সরলাকে কিছু আবিষ্কার করতে বলা হল—তিনিই সর্ব্বপ্রথম তৈরী করে দিলেন আমার প্রথম টুপী যার অনুসরণে ও অনুকরণে পরে অনেকে বানিয়ে দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মজার কাহিনী বলি। ফরাসী পোষ্ট আফিসে একদিন একটা প্যাকেট এল, মায়ের নামে জাপান থেকে; তখন যুদ্ধের সময়, নিয়ম ভয়ানক কড়াকড়ি, কর্ম্মচারীরা শ্যেনদৃষ্টিতে ক্ষুদ্রতর প্যাকেট—বড় বড় পার্শ্বেল ত কথাই নাই, তাতে বোমা পিস্তল আসতে পারে,—চিঠি কাগজ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করত পাছে অসৎ-সাহিত্য এসে

যায়। কর্মচারী একজন ফরাসী, তিনি প্যাকেটটি খুললেন আমার সম্মুখে, একখানা কাগজ —খুলে ধরলেন দরটা—কিছুই নেই ভিতরে—শুধু একটা কাগজ—তাতে ছবির মত কি আঁকা রয়েছে—একটা গাছের ডাল—ভদ্রলোক নিরাশ হয়ে আমার হাতে কাগজখানা ফিরিয়ে দিলেন এই টিপ্পনী করে—Une branche quelconque—একটা কিছু গাছের ডাল। কিন্তু brancheটি ছিল একটি সুন্দর জাপানী ছবি—তবে সে কথা বুঝবে কে? পোষ্ট আফিসের গোয়েন্দা ত? গল্পটি আমি শ্রীঅরবিন্দের কাছে করি। শ্রীঅরবিন্দ কখন ভুলতে পারেন নাই সে কথা, মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে বলে উঠতেন une branche quelconque !

যা হোক, বলছিলাম আমার শারীর ব্যায়ামের কথা সেই যুগে—নব্য-যুগে বলতে পার। দ্বিতীয় ব্যায়ামটি আরো চমৎকার—স্নানের সময় কাপড় কাচতাম বেশ মনোযোগ দিয়ে, দেহ সঞ্চালন করে। মনে করতাম এ টুকু নেহাৎ দরকার শরীরের পক্ষে—ঐ ছিল আমার ডন-বৈঠক ডাম্বেল-মুগুর সব। আর একটা যোগ করে দিতে পারি—একটু হাঁটাহাটি; প্রাতঃভ্রমণ বলা চলে—ভোরে তখন বাড়ী বাড়ী গিয়ে না বা শ্রীঅরবিন্দের লিখিত চিঠি বিলি করে আসতাম, তবে তখন এত বাড়ী এবং এত দূরে দূরে ছিল না—সুতরাং এ হাঁটা ১৫০০ কি ২০০০ মিটার fast walk নয়।

বলেছি ডাক এল playground-এ নামতে। ৪ গ্রুপে নাম উঠে গেল। তখন না নিজে ঠিক করে দিতেন কে কোন গ্রুপে যাবে—অন্ততঃ তা হত নামের জ্ঞাতসারে ও অনুমোদন ক্রমে। "উপর" হল আমার কাপতান। শিখতে শুরু করলাম এঁা, দো, এঁা, দো—সেই কবে স্বদেশীযুগে মার্চিং চেষ্টা করেছিলাম স্বেচ্ছাসৈনিক সেজে—কিন্তু এক আধ দিনের বেশি নয়। মনে আছে স্বদেশীর বন্যায় তখন অর্ডারগুলি দেশীভাষায় দেওয়ার রেওয়াজ হয় —ডাইনে ফেরো, বাঁয়ে ফেরো খসে পড়ো (dismiss বা rompez vos rangs)!

এথলেটিক্স্ শুরু করতে হ'ল বিনা practiceএই। প্রথম competitionএ যোগ দিলাম—তোমাদের অনেকের মনে আছে নিশ্চয়—সমুদ্রের ধারে এখন যে টেনিস-গ্রাউণ্ড—তখনো তৈরী হয় নি সেটা—সেখানে নাম ছিল ৬০ মিটার দৌড়ে। কিছু জানা-শুনা নেই, কোন রকম warming up নেই, একেবারে সোজা লাইনে গিয়ে দাঁড়ান আর হুইসেল দেওয়া মাত্র ছুট পড়ি কি মরি করে। ফল দুর্যোধনের উরুভঙ্গ—অর্থাৎ কিছুদূর গিয়ে সৌভাগ্যবশতঃ, শেষের কাছে কাছে গিয়ে muscle pull উরুর—কোন রকমে শেষ করা গেল। ফল মন্দ হয়নি—আমি পবিত্র আর যোগানন্দ 2nd place পেলাম আর first place পেল—তিনি এখন আর এখানে নেই, একজন সাধু। এই রকমেই কোন কিছু practice না করে, warming up না করে দিলাম long jump—দু-একজন উপদেশ দিলে একটু তৈরী হতে—আমি উত্তরে বলেছি, বছরে আমার এই একটি দৌড় আর তিনটি jump ব্যস, এই যথেষ্ট! এ হল আদিপর্ব্বের ইতিহাস।

তখন ভাবিনি রীতিমত এথলেট হয়ে উঠব অর্থাৎ সব রকম কসরত ওস্তাদীর মধ্য দিয়ে যাব। আমি পূর্বে একবার তোমাদের বলেছি এখনকার খেলাধুলা আর আমাদের যুগের খেলাধুলায় কি পার্থক্য। এখন হল বৈজ্ঞানিক যুগ, আর তখন অশিক্ষিতপটুত্ব। ফুটবলে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি—খেলার পূর্বে যে বেশ warming up দরকার সে রকম কোন নিয়ম অনুসরণ করা হত না। তাই অনেকবার এ রকম হয়েছে আমার, যে সোজাসুজি মাঠে নেমে খেলার সুরুতে একটা দৌড় দিলেই একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছি—তখন মনে হয়েছে 'পুরো একঘন্টা খেলব কি করে।' অবশ্য ক্রমে "রক্ত গরম" হয়ে ওঠার ফলে—আমরা বলতাম রক্ত গরম হওয়া—warming up—সব ঠিক হয়ে যেত এবং ক্রমেই energy বেড়ে যেত। এখন সব রকম খেলার বা শরীরচর্চার প্রধান কথা হ'ল training অনুশীলন, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন। আগে ছিল, খেলার নিয়মগুলি—তা' ভাল করে জানলেই সে ওস্তাদ—ফুটবল ক্রিকেট ত কথাই নেই—আমাদের কুস্তী ও লাঠি অভ্যাস করা অর্থাৎ নিয়মনাফিক সব জানা ও ঠিকমত প্রয়োগ করা। কিন্তু এখন training অর্থ তা নয়—এখনকার training হল কোন একটি ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে শরীরকে প্রস্তুত করা, অর্থাৎ সমর্থ করা। প্রথমত: সাধারণভাবে শরীরের fitness যোগ্যতা তৈরী করা। তারপর একটা বিশেষ ক্রিয়ায় শরীরের কোন কোন অঙ্গ বিশেষভাবে সঞ্চালিত হয়, কোন কোন পেশী প্রযুক্ত হয় তা আবিষ্কার করে তাদের বিশেষভাবে অনুশীলন করা—সহ্যক্ষমতা, বল সামর্থ্য, প্রয়োগ-নৈপুণ্য—ঠিক স্থূল উপকরণের মত, একেবারে জড়খণ্ডের মত। তুমি যে ক্রিয়াতে বিশেষজ্ঞ হতে চাও—বিশেষজ্ঞ হওয়াই আজকাল শারীর অনুশীলনের লক্ষ্য—তবে তার প্রস্তুতিটাই আসল প্রয়োজন হয়ে পড়ে, মুখ্য লক্ষ্যটা হয়ে পড়ে গৌণ। তোমায় দৌড়াতে হবে ১০০ মিটার—আসলে কয়েক সেকেণ্ডের কাজ—কিন্তু এর জন্য দিনের বহুঘন্টা এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর পর্য্যন্ত তোমাকে শরীরকে নানাভাবে তৈরী করে তুলতে হয়।

আগের যুগে সমস্ত ঝোঁক দেওয়া হত খেলার দিকে, খেলোয়াড়ের দিকে তত নয়। তখন বলা হত খেলতে খেলতেই খেলোয়াড়। কিন্তু আজকাল পাল্লাটা ঝুঁকেছে, তাকে তৈরী করে—এমন কি তার খেলার থেকে আলাদা করেই—প্রথমত: তার দেহ-তৈরী তারপর তার প্রাণ অর্থাৎ প্রাণশক্তি তৈরী, শেষত: মনকে মন:শক্তিকে পর্য্যন্ত তৈরী করা প্রয়োজন। আন্তঃকরণিক উপাদানগুলির খতিয়ান গ্রহণ করা হয় আজকাল বিশেষভাবে। আমাদের বিজ্ঞান—জড়বিজ্ঞানচর্চ্চাও কি তাই করছে না? আগে প্রকৃতির পৃথক স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার, তাকে নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ তার কলকব্জা আবিষ্কার এই ছিল সমস্ত প্রচেষ্টা। আজকাল বলা হচ্ছে পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ ঠিক কথা, কিন্তু পর্য্যবেক্ষক ও পরীক্ষকের কথাটা ভুললে চলবে না—তারও রয়েছে একটা প্রধান এমন কি মুখ্য স্থান

এই যে অনুশীলনের পালা তা আমি কিছু কিছু অনুসরণ করেছি তোমরা জান। অশিক্ষিতপটুত্বের পাঠ ত্যাগ করে শিক্ষিত-চাতুর্য্য অর্জন করতে চেষ্টা করেছি—তোমাদের অনেকের পন্থা অনুসরণ করে। কিন্তু তাই বলে মদনলালজীর পথ ধরতে পারি নি। তার মত এই যে যত খাটতে পার তত ওস্তাদ হয়ে উঠবে—এমন খেলা নেই যা পরিশ্রমের ফলে আয়ত্তে আসে না মদনলাল নিজে তার জ্বাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সারাটা বৎসর এমন খেটে অভ্যাস করতে তার জুড়ি নেই। দু রকম ভাল ছাত্র আছে তোমরা জান, বা দু রকমে ভাল ছাত্র হওয়া যায়—এক যারা স্বভাবতই চতুর ও বুদ্ধিমান, সারা বৎসর যারা কাটিয়ে দেয় অন্যরকম কাজে কর্ম্মে উৎসবে-ব্যসনে—পরীক্ষার সময় একটি কি দুটি মাস খুব খেটে দিনে রাতে সমানে পড়াশুনা করে ও পরীক্ষায় পাশ করে যায়, শুধু পাশ করে না উচ্চস্থান পর্য্যন্ত পেয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর পড়ুয়া আছে যারা সারা বছর সমানে খেটে পড়ে, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পরিশ্রম করে যায়, পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে অসুখে বিসুখে পড়বার বা nervous break-down হবার প্রয়োজন ঘটে না। আমাদের মদন-লাল প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। সে সত্য সত্যই প্রমাণ করতে চায় genius-এর সেই definition —Genius is nothing but the capacity for taking infinite pains.

এথলেটিক্সের ক্ষেত্রে আমার আর একজনের নাম করতে হয়—এ বিষয়ে আমার যে কৃতিত্ব তার জন্য আমি বহুলাংশে ঋণী চিন্ময়ের কাছে। চিন্ময় ছিল আমার কোচ্। তার কাছ থেকে কি পেয়েছি? উৎসাহ—উৎসাহ অর্থ কি? শরীর-চর্চ্চার একটা গুপ্ত তথ্য হল এই যে তোমার সামর্থ্য যা, বা যতটুকু তুমি মনে কর তোমার শক্তির সীমা, তার চেয়ে কিছু বেশি চেষ্টা করবে।

এই উদ্দেশ্যেই হয়ত আমাদের যুগে যখন কোন বিশেষ অঙ্গের ব্যায়াম করতে হত তখন নির্দ্দেশ ছিল যতক্ষণ শ্রান্ত না হয়ে পড়বে, গলদ্‌ঘর্ম্ম না হবে, ততক্ষণ সে ক্রিয়াটা করে যাবে—ডাম্বেল বা মুগুর ভাঁজা কোন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে,—কতক্ষণ? চার্টে লেখা ছিল till tired অর্থাৎ যতক্ষণ না বোধ হয় আর পারছ না। আজকাল অবশ্য ও-রকম আন্দাজে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছু হয় না—করতে হয় সংখ্যা ঠিক করে, গুনে গুনতি করে। প্রথম দিন ধর ৫ কি ৭, তারপর প্রতিদিন এক কি দুই করে বাড়িয়ে চলবে, তারপর প্রত্যেকে হয়ত একটা নিজস্ব সীমা ঠিক করবে—এই হল আজকালকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

তা যে উপায়ে হোক, সামর্থ্য শক্তি এই রকমে বাড়াতে হয়—তবে সীমার অতিরিক্ত বেশি যদি চেষ্টা করা হয় তাতে দুর্য্যোগ ঘটতে পারে। কিন্তু ক্রীড়াসঙ্ঘেরা এ বিপত্তি স্বীকার করে নেয়। উৎসাহী বেপরোয়ারা বলে থাকে—Hitch your wagon to the stars; —তোমার গাড়ীখানা তারার সঙ্গে জুড়ে দাও—কিন্তু সাবধানীরা Icarus-এর tragedyর উল্লেখ করেন। গ্রীকবীর আইকেরাস উড়বার ডানা উদ্ভাবন করলেন কিন্তু তৈরী করলেন তা মোম দিয়ে—উড়ে চললেন সূর্য্যের দিকে—কিন্তু কাছে কাছে গিয়ে সূর্য্যের

তাপে মোম গেল গলে, তাঁর ডানাও মিলিয়ে গেল—পড়লেন তিনি পৃথিবীর ডাঙায় মৃত্যুর কবলে।

সে যাক্, চিন্নয়ের কাছ থেকে এই রকম চেষ্টা করবার সাহস বা দুঃসাহস পেয়েছি, তাতে উন্নতিও হয়েছে বেশ। তবে বয়সের একটা বাধা এসে যায়—যদিও আমরা তা নিরাকরণেরই সাধনায় আছি। এ বিষয়ে বাধা দু দিক থেকে—এক তোমার নিজের চেতনায়, কুড়িতে বুড়ি হওয়ার কথা তোমাদের পরিচিত। যদিও এখানে আমরা সহজেই বয়সের হিসাবটা অনেক সময়ে ভুলে যাই বা ভুলে যেতে চাই। ষাট বৎসর বয়সেও আমার মনে হয় নি, অর্থাৎ শরীরের মনে হয় নি, মনের মনে হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু শরীরের মনে হওয়া চাই, যে ২৫ কি তিরিশের বেশি তার বয়সের ভার। এখানে অনেক বয়স্করাই নিশ্চয় এ রকম অনুভব করেছে ও করে। আমরা যে বয়স ঢেকে রাখতে চাই, যতখানি বয়স তার থেকে কম হিসেব নিয়ে থাকি তার মর্মকথা এইখানে। চেতনায় বা প্রাণে যে তারুণ্য সত্যিকার বয়স সত্ত্বেও, তারই সত্য প্রকাশ করবার ও বজায় রাখবার প্রয়াস হল এই একটু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ। তবুও ত বাহ্য জড়বস্তুর অবোধ নিয়ম এখনো চলছে জগতে আমাদের মনকে তা আক্রমণ করে এবং পীড়িতও করে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত চেতনায় বা মনোভাবে এই বাধা ছাড়া সমষ্টিগত অর্থাৎ আর-সকলের, তোমার চার পাশের পাড়াপড়শীদের চেতনায় ও মনোভাবের চাপ রয়েছে। তুমি ভুললেও তারা স্মরণ করিয়ে দেবে তোমার বয়সের প্রগতির চাপ। এই দুই চাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া সাধারণভাবে কঠিন কিন্তু আমাদের সাধনা ও লক্ষ্য ঠিক তাই নয়?

শরীরচর্চায় শক্তির প্রয়োগ বা খরচের দিক একটা আছে: তুমি যখন কোন বিশেষ ক্রিয়াসম্পন্ন করে চল এবং ক্রমে শেষ পর্যন্ত পৌঁছও। কিন্তু এ ছাড়া এবং এর জন্যই আছে আর একটা দিক, শক্তি-সঞ্চয়ের দিক। শরীরের শ্রম আছে, সেজন্য প্রয়োজন শরীরের বিশ্রাম। এই ভাবেই শক্তির হয় সঞ্চয়। মানুষ দিনে কাজ করে, রাত্রিতে ঘুমায়; দিনে শক্তি ব্যয় করে, রাত্রিতে সঞ্চয় করে। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার—আহারটা কোথায় গেল? আহার —যথাযোগ্য আহার শক্তিসঞ্চয়ের একটা প্রধান প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের উল্লেখ আমি বর্তমান প্রসঙ্গে করছি না, আমি স্থূল জড় প্রয়োজনের অর্থাৎ উপকরণের কথা বলছি না, আমার বক্তব্য হল শরীরের প্রাণশক্তি বা energy-র বিষয়। এ শক্তির সঞ্চয় ও উপচয় হয় যে প্রক্রিয়া অবলম্বনে তাকে বলি relaxation—গা ছেড়ে দেওয়া, আলগা করে দেওয়া, পেশী শিথিল করে ধরা। এই প্রক্রিয়া আমরা সকলেই করে থাকি। আমি এ relaxation-এর একটু বিশেষ বিবরণ দিতে চাই, কারণ আমার অভিজ্ঞতায় এর একটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছি।

প্রথম লক্ষ্য করবার বিষয়—যারাই শারীরিক ব্যায়াম করে, তারা সকলেই নিশ্চয় এ রহস্যটি জানে বা তাদের জানতে হয়। Relaxation ব্যায়ামের শেষ নয়, ব্যায়ামের মধ্যেই এর স্থান রয়েছে। ব্যাখ্যা করছি।

শরীর চর্চায়, ব্যায়াম বিশেষে একটা দিকে খুব লক্ষ্য রাখতে হয়, সাফল্য নির্ভর করে অনেকখানি এরই উপর। সাধারণতঃ আমাদের ঝোঁক হল শরীরের সমস্ত পেশীগুলি রগগুলি একসঙ্গে সক্রিয় করে তোলা, যেখানে বিশেষ কয়েকটি পেশী ও রগের প্রয়োজন সেখানেও—এরই অন্য নাম tension এবং অতিরিক্ত হলে এর ফলে আসে যাকে আমরা বলি stiffness, rigidity, আড়ষ্টতা, কঠিনতা। তা নয়, করা উচিত অন্যান্য অঙ্গগুলির যথাসম্ভব শিথিলতা (relaxation)। শুধু যে অঙ্গটি কাজ করবে—শুধু কাজটি করবার সময় তার সক্রিয় হয়ে ওঠা। কাজটি করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে থাকবে নিষ্ক্রিয় যদিও সজাগ অর্থাৎ relaxed। একটা গল্প তোমরা নিশ্চয় জান—ঘড়ীর গল্প—ঘড়ী একদিন সচেতন হয়ে উঠল নিজের সম্বন্ধে, দেখল সে নিরন্তর, না খেয়ে, বিনা বিশ্রামে ২৪ ঘন্টা কাজ করে চলেছে, তার অধিকারীকে তাই একদিন অনুযোগ করে বললে, "দেখুন মশাই, আপনারা সবাই কাজ করেন, কিন্তু সবাকে বিশ্রামও উপভোগ করেন, সমস্ত দিনে যদি কাজ করেন, সমস্ত রাত্রিরটা ঘুমিয়ে কাটান, আর আমাকে কিনা দিনে রাত্রে সমানে জেগে পরিশ্রম করে চলতে হয়।" অধিকারী উত্তরে বললেন, "কেন বাপু! তুমি ত চল্‌ছ টক্‌-টক্‌ করে—দুই টকের মাঝখানটায় ত' তোমার বেশ বিশ্রাম হয়ে যায়, জান না বুঝি?" উপমাটি বড় সুন্দর। এই ধর আমরা যখন দৌড়ই (running করি) তখনো ঠিক এই ঘটে। দুটো পা'কে জোরালো করে ধরবার প্রয়োজন নাই এক সঙ্গে একই সময়ে ; যে পা'টি মাটিতে পড়বে, ঠিক মাটিতে আঘাত দেবার সময়ে তার পেশীর সমস্ত জোর প্রয়োগ করতে হবে কিন্তু শুধু সেই মুহূর্তের জন্য, পরে নিজেকে শিথিল করবে দ্বিতীয় আঘাত পর্যন্ত অপর পা'টি ইতিমধ্যে থাকবে শিথিল এবং সজাগ (সজাগ, কিন্তু সক্রিয় নয়), তার পালার জন্য। সমস্ত শরীরের সকল অঙ্গের সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি হৃৎপিণ্ডের দুটি ধুক ধুক systole ও Diastole —আকুঞ্চন ও প্রসারণ—মাঝে বিরতি বা যতি।

ফলতঃ এই ভাবেই অঙ্গের ক্রিয়া হয় সুক্রিয়া অর্থাৎ প্রথমতঃ সফল এবং দ্বিতীয়তঃ সুন্দর। সফল অর্থাৎ বেশি ফলদায়ী, বেশি সবল ও জোরালো। কারণ এতে যে পেশীগুলি প্রয়োজন এবং ঠিক যখন প্রয়োজন তখনি ব্যবহৃত হয় অন্যান্য পেশীগুলি যদি সংক্রামকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে তবে শক্তির অনেকখানি তাতে বিপথে অনর্থক ব্যয়ে চলে যায়, সমস্তটা যখন যেখানে প্রয়োজন তা প্রযুক্ত হয় না। দ্বিতীয়তঃ বলছি এতে ক্রিয়া সুন্দর হয়, পায় সুছন্দ, লীলায়িত গতি, সহজ স্বচ্ছন্দতা—ছন্দে থাকে বলা হয় যতি (pause) তারই অন্য নাম relaxation। গতি ও যতি নিয়েই ত ছন্দ।

শুধু তাই নয়—আমি বলেছি শিথিলতা অর্থ বিশ্রাম বিরাম বটে, এর অর্থ তাই বলে ঘুম নয়—ঘুম অর্থ অচেতনা, তাতেও আসে অসাড়তা, আড়ষ্টতা। বিরামের মধ্যে জেগে থাকবে, সচেতন থাকবে, ক্রিয়ার মধ্যেও যেমন থাকবে সচেতন। কর্মে অচেতনা

ক্রিয়াকে করে যন্ত্রের মত, এনে দেয় প্রাণহীন আড়ষ্টতা। জাগ্রত চেতনা দিয়ে অঙ্গ-সঞ্চালন ভরে তুলতে হয়, বিরামের চেতনা তাতে সাহায্য পায় যাতে নূতন শক্তিতে সে ভরে উঠতে পারে—ঠিকমত চেতনা হলে এই নূতন শক্তি শরীরাতিরিক্ত জগৎ থেকেও নেমে আসতে পারে, এসে শারীর ক্রিয়াকে দিতে পারে নূতন পরম সৌম্য সবল রূপায়ণ।

ফলতঃ শিথিলতা আসলে হল আমাদের ভাষায়, হঠযোগের সংজ্ঞায়, যাকে বলে শবাসন। তবে মরণাসন না করে একে জীবনাসন করা যায় এবং তাই হল এর আসল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এটা একটা কিছু না-করা—নেতি-মূলক—অবস্থা নয়, কিছু করা—ইতিমূলক—অবস্থায় একে পরিণত করা যায়। আমরা মনে করি এ হল একেবারে নিষ্ক্রিয় অবস্থা তা নয়, একে সক্রিয় অবস্থায় তুলে ধরতে হবে, অন্ততঃ সজাগ অবস্থায়; সাধারণতঃ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এলিয়ে দিয়ে চুপ করে নিস্পন্দ হয়ে থাকা অর্থ ক্রমে ঘুমের মধ্যে চলে যাওয়া। ঘুমে বিশ্রাম হয় বটে কিন্তু ঘুমন্ত ঘুমের চেয়ে সজাগ ঘুম আরো ভাল। সজাগ ঘুম অর্থ সচেতন নিস্পন্দতা।

এই প্রক্রিয়াটির দু' তিনটি স্তর আছে। প্রথমতঃ গোড়ায় সাধারণভাবে সর্ব্বাঙ্গে একটা শিথিলতা ও নিস্পন্দতা। তারপর প্রতি অঙ্গ আলাদা আলাদা, একে একে শিথিল করে ধরা। আরম্ভ কর পায়ের আঙুল—পায়ের আঙুলের পেশীগুলি গাঁটগুলি এলিয়ে দিলে, তারপর গুলফ, ankle-এর পেশী ও গাঁট, তারপর পা, হাঁটু, কোমর, তলপেট, বুক, কণ্ঠ, মুখ (দুই ঠোঁটের, চিবুকের), চোখের পাতা, কপাল এবং সকলের শেষে মাথার চাঁদি পর্য্যন্ত শিথিল নিস্পন্দ করে দেওয়া, তারপর আবার ঐভাবে উপর থেকে স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে নীচে নেমে পায়ের আঙুল পর্য্যন্ত আসতে পার। শুধু দেখে যাবে—শুধু দেখে যাবে—কেমন এলিয়ে সব শান্ত হয়ে গিয়েছে, মনের তরঙ্গ যেমন শান্ত হয়ে যায়।

এ তোমরা সকলেই করতে পার এবং অনুভব করতে পার এতে শরীর কতখানি তাজা হয়ে উঠে, সজীব ও সবুজ (fresh) হয়ে ওঠে।

কিন্তু আর এক পর্য্যায়ে যদি উঠতে পার, তবে ফল আরো গভীর ও গাঢ় হয়, তা যোগসাধনা ও অধ্যাত্ম-অনুশীলনের পর্ব্বে উঠে যায়। প্রতি অঙ্গকে শিথিল করে দেওয়া অর্থ তার একটা পাক বা জট খুলে দেওয়া। যেটা ছিল সীমায় সঙ্কীর্ণ ও আত্মমুখী, তাকে বিস্তৃত করে, ছড়িয়ে ধরা—তার অর্থ চারিদিকের সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে ধরা। তোমার ভিতরে একটা নল যেন ছিপি আঁটা ছিল, এখন খুলে গিয়েছে, তার ভিতর দিয়ে বিশ্বের প্রাণশক্তি স্রোতের মত ধীরে ধীরে এসে যায়—এরই পণ্ডিতী নাম হল চক্রভেদ। শরীরে যে ছটি চক্র আছে—অন্য হিসাবে যার কি আরো বেশি—চিৎশক্তি বা চেতনার কেন্দ্র, তাদের মুক্তি দেওয়া, শবাসনের ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্ব জীবনীশক্তির সঙ্গে একীভূত হয়ে যাও, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বয়ে যায় সমস্ত প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সজীবতা।

আরো এগিয়ে যাওয়া যায়, আরো উর্দ্ধতর পর্ব্বে। আমি বললাম, শরীরের অঙ্গ অঙ্গ

ঘরে উঠে যাওয়া ও নেমে আসা, যেন সব সময়ে পালিশ করে, শান্ত স্তব্ধ করে, কিন্তু চারিদিকে খুলে প্রসারিত করে নয় কেবল—সত্তা বা চেতনা যাথার যখন স্থির স্থিতির জন্য পৌঁছেছে—তখন আরো একটু উঠে যেতে পারে সঠিক কিছু না জেনেও, কোথায় যেন চলে গিয়েছে এই ভাব নিয়ে। স্মরণে রাখতে পার ও-দিকে মাতৃশক্তি শ্রীমা রয়েছেন কোথাও। তাঁর সান্নিধ্য ও অধিষ্ঠানের স্পর্শ যদি পাও এই ভাবে, তবে তোমরা ষটচক্র-ভেদ-সিদ্ধ। শুধু উদার শান্তি নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আসবে একটা সানর্ঘ্য ও প্রোজ্জ্বলতা—এ হল বলতে পার ষট্‌চক্রভেদের সহজ কি সরল পাঠ।

সচেতনা আর অচেতনার মধ্যে একটা বিপুল পার্থক্য রয়েছে—দুটি দুই জগতের বস্তু। একই কাজ যদি অচেতনভাবে কর তবে তার ফল এক আর সচেতনভাবে যদি কর তবে তার ফল অন্য। মা একবার বলেছিলেন এ কথা, সিঁড়ি বেয়ে কতবার আমরা ওঠানামা করি কিন্তু অচেতনভাবে, যন্ত্রের মত, জড়বস্তুর মত। কিন্তু এই অঙ্গ-চালনা বা ব্যায়ামের ফলে বিশেষ কিছু শরীরের লাভ হয় না। ঐ একই ওঠানামা কর যদি সচেতনভাবে, পা যদি চলে, পদক্ষেপ যদি হয় সজ্ঞানে তবে সুফল হয় দুটি, প্রথমতঃ দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাও অর্থাৎ হোঁচট খাওয়া, পা ফসকে পড়া, এ সব আর ঘটেই না, আর দ্বিতীয়তঃ তোমার পেশী সুস্থ সবল হয়ে ওঠে সমস্ত শরীরই সতেজ হয়ে উঠতে পারে এই সামান্য সজ্ঞান কসরতের ফলে।

ইতর প্রাণীর মধ্যে এ রকম সজ্ঞান অনুশীলন ত নাই-ই—কোন রকম অনুশীলনই সম্ভব নয়। তাদের শারীরিক পুষ্টি ঘটে, পেশীসামর্থ্য বেড়ে যায় স্বাভাবিকভাবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অব্যর্থভাবে, আবার অব্যর্থভাবে স্বাভাবিকভাবেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়, বার্দ্ধক্যে গলিত-নখ-দন্তের কথা তোমরা জান। মানুষেরই আছে এই অলৌকিক ক্ষমতা—স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করে যাওয়া এবং তা সে পারে তার সচেতন, সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তি বা চিৎ-শক্তির কল্যাণে।

তাই ত মা বলে থাকেন যে সকল ক্রিয়ার, সত্যকার ক্রিয়ার, প্রতিষ্ঠা হল প্রশান্তি, গভীর শান্তিকে আশ্রয় করেই চলেছে এই বিশ্বের বিপুল বিচিত্র গতি, নীরবতার ভিতর থেকেই ফুটে ওঠে সত্যের ছন্দায়িত বাণী।

তাহলে এবার উপসংহার করি—

বৃদ্ধের ব্যায়াম যে আয়াসের বা উপহাসের বিষয় তা নয়। তাতে আছে একটা বিশেষ লাভের অঙ্ক শুধু খরচ যোগানর প্রয়াস তা নয়। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা"—বটেই ত। রাজা দশরথ সম্বন্ধে তোমরা জান ত বাল্মীকির বিখ্যাত বাক্য—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী—ঠিক সেই রকমেই বৃদ্ধ ভালবাসতে পারে তার ব্যায়ামকে। তরুণ তার তারুণ্যের প্রাণ-প্রাচুর্য্যে অনেক সময় শারীরিক চর্চ্চার প্রয়োজন বোধ করে না। ব্যায়াম-আগারের যন্ত্র-নিয়মকে আমাদের "গ্রীনেরা," সবুজেরা কি রকমে যমের মতই ভয়

করে, ফাঁকি দিতে চায়, তার তালিকা তাদের ক্যাপ্টেনদের কাছে পাবে। বৃদ্ধের একদিন যদি বাদ যায়, তবে মনে হয় দিনটা বৃথা গেল, শরীরটা যুতসই নয়,—রাত্রেনকে জিজ্ঞাসা কর। অবশ্য রাত্রেন ঠিক বৃদ্ধ নয়—কেবল পঞ্চাশোর্দ্ধে।

কিন্তু শুধু ভালবাসার দিক দিয়ে নয়, দুটির ধরণে একটা পার্থক্য, একটা গুণগত পার্থক্য আছে। তরুণের শরীরচর্চা সহজ—স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত। তার অঙ্গ-সঞ্চালন হল শরীরের একটা নৈসর্গিক অনুকরণ-সামর্থ্য, সহজাত প্রতিক্রিয়ায় বা সংস্কারের কল্যাণে। শিশু যখন হাঁটতে শেখে, সে দেখে একজনকে হাঁটতে তারপর সে সুরু করে হাঁটতে—যদ্দৃষ্টং তৎকৃতং। দৃষ্টির ভিতর দিয়ে সরাসরি অঙ্গে সংক্রামিত হয় অঙ্গভঙ্গী। কিন্তু বয়স হলে তা ঠিক ঘটে না—অঙ্গভঙ্গীকে প্রথম দেখে, মনে ধারণা করে, তারপর যেন ভেবেচিন্তে অঙ্গ-সঞ্চালন করতে হয় অর্থাৎ মনটা এসে দাঁড়ায় মাঝখানে। প্রথমে মনে মুখস্থ করে তবে শরীরকে দিয়ে করাতে হয়, চাকরের মত হুকুম দিয়ে। এতে সুফল ও কুফল দুই-ই আছে। কুফলটা এই যে প্রক্রিয়াটা শিখতে বিলম্ব হয় এবং তার চেয়ে বেশি ত্রুটি হল যে প্রক্রিয়াটি হয় আড়ষ্ট, প্রাণহীন, অসুন্দর। কিন্তু সুফল হয় ও হতে পারে যদি নজর থাকে ও নজর দিলে অর্থাৎ অঙ্গ-চালনা হতে পারে সজ্ঞানে সচেতনভাবে—সাধারণতঃ যখন তরুণ আমরা—তখন আমরা চলি ফিরি, শরীরচর্চা করি অজ্ঞানে অচেতনভাবে, প্রাণীরা যেমন চলে ফেরে সহজভাবে সংস্কারের প্রেরণায় স্বতঃসিদ্ধভাবে। কি করি তা জ্ঞানে সব সময় থাকে না কিন্তু বয়সের সঙ্গে যখন অঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ততা চলে যায়, তখন অঙ্গকে সাধাসাধি করতে হয়, অন্য কথায়, করতে হয় সজ্ঞানভাবে। আমি পূর্বে একবার বলেছি, বয়সের দান হল এই সজ্ঞানতা। বলা বাহুল্য, এই সজ্ঞানতা আর বুদ্ধির মস্তিষ্কের বিচার-বিতর্ক এক নয়—বিচার-বিতর্ক সজ্ঞানতার আরম্ভ, কিন্তু শুধু বিচার-বিতর্ক অঙ্গের আড়ষ্টতাকে বাড়িয়েই দেয়, তবে এ হল সচেতনতার পথে প্রয়োজনীয় ধাঁচি বা প্রথম পদক্ষেপ।

আমাদের জীবনের লক্ষ্যই হল সচেতন হওয়া। আমরা অজ্ঞানে অচেতনায় প্রকৃতির বশীভূত হয়ে চলে যাই তার পরিবর্তে সচেতন হয়ে, শুধু সাধারণভাবে নয়, প্রতি অঙ্গে চৈতন্য ভরে দিয়ে ক্রিয়াশীল হতে হবে। তার ফল অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশ পাবে একটা জ্যোতি, একটা সুষমা, ক্রমে তার মধ্যে দেখা দেবে শুধু এ লোকের নয়, উত্তর-লোকের আলো ও সামর্থ্য।

বসোরার উজীররা

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

ইবনসরীর গৃহ—উপরে অন্তঃপুরিকাদের কক্ষ
দুনিয়া একটি সুখাসনে নিদ্রিতা
(নুরুদ্দীন ও আনিসের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন

আমি তোমায় বললাম যে সকাল হয়েছে।

আনিস-আলজালিস্

এত তাড়াতাড়ি সকাল হোল ? এই ত কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যাতারাকে দেখেছি—আর এরি মধ্যে ভোরের দীপ্তি ?

নুরুদ্দীন

এই শেষরাতের চাঁদ ছাড়াও আর একটি তারা তোমার অপেক্ষায় আছে—আকাশ ছেড়ে যাবার আগে তোমায় দেখতে চায়—তোমারই ভগিনী বুঝি—পবীর রাজ্যের সুন্দরী শুকতারা।

আনিস্-আলজালিস

ওতো আমাদেরই যুগলতারা—আমাদের রক্ষাকর্ত্রী।

নুরুদ্দীন

না, ও হচ্চে আনিসের তারা, যে আনিস্-আলজালিস্ ইরাণ দেশ থেকে এসেছে ওরই রজত কিরণে পথ দেখে এই হতভাগ্য নুরুদ্দীনের হৃদবিহারিণী হবে বলে শেষদিন পর্য্যন্ত।

আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে তোমায় পেলাম—অদ্ভুত নয় কি যে আমার কী যোগ্যতা আছে তোমায় লাভ করবার—তুমি হচ্চো রূপসন্ধ্যা সকলজন কাম্য একটি রমণী-রত্ন। সত্যি, আমরা কেন যে মণির বদলে ছেলেমানুষের মত তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে খেলা করি, মনে করি সেই বুঝি আকাশের তারা। কিন্তু অনেক পথ বেয়ে অনেক বেকিঝুঁকি বেঁচে আজ পেয়েছি তোমার দেখা—সোজা স্বর্গে এসেছো—প্রেমের অনেক কাঁচা ও টক্ ফল খেয়েছি, আজ ভাগ্যের ফলে পেয়েছি একটি পরিপূর্ণ আনন্দ ও সৌন্দর্যকে—মূর্খ আমি যদি পূর্বে জানতাম কিসে আর কিসে। আমার বলবার কিছু নেই, তোমায় পাবার যোগ্যতাও আমার নেই—তবু পেয়েছি এইটেই সত্য, কিন্তু এই সত্যটাকে আরো সত্যতর, মহিমতর করতে হবে, যাই আসুক না কেন।

আনিস-আলজালিস্

বাড়ী মাথায়ে।

নুরুদ্দীন্

কে ঘুমুচ্চে এখানে? দুনিয়া নাকি।

দুনিয়া

(জেগে উঠে)

ভোর হলো? আশীর্বাণী জানাই,
ভালো ভাবে থেকো, ভালো খেয়ো, লক্ষ্মী ভাই বোন আমার।

নুরুদ্দীন্

সাক্ষাৎ পূর্ণ চৌদ্দচৌদপটীয়সী, ধন্যবাদ, নমস্কার, মস্ত মাতাজী।

দুনিয়া

তারপর, এখন কি করবে?

নুরুদ্দীন্

স্বর্গ থেকে বিদায়, মর্ত্যে পতন।

দুনিয়া

থামো, থামো, এখনো অভিনয়-মঞ্চে তোমার পালা শেষ হয়নি। ব্যাপারটি কতদূর

গড়াতে পারে সে বিষয়ে খেয়াল আছে? শুধু হাত তুলে যার বুকেই অস্ত্রের অবসান হতে পারে, নাটোর সমাপ্তি নয়। আনিসের পিঠে আছে বেত্রাঘাত, যার তুমি নুরুদ্দীন যাবে মরুকান্তার দুর্গম রাস্তায়, তীর্থযাত্রায় ক্লান্তপদে, পাপস্খালনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আর আবার হবে শুভ পাণিপীড়ন।

(দরজা খুলে)

আরে আমাদের হাবশী খোজা সাহেব এখনও নাক ডাকাচ্ছে দেখছি, ঘুমোও যে আমার বীর দৈত্য, নাক ডাকাও যত জোরে পারো, তারপর ঐ কালো আবলুশ রংএর পিঠে যখন কড়া রংএর তুবড়ি ছুটবে—নুরুদ্দীন অপেক্ষা করো, আমি আসছি।

(প্রস্থান)

আনিস্-আলজালিস

ওঁরা রাগ করবেন।

নুরুদ্দীন

দুবার মুচকি হেসেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবো।

আনিস্-আলজালিস

যাই ঘটুক্, তুমি আমার, আমি তোমার।

নুরুদ্দীন

কিছুই হবেনা, আমি ত মশগুল হয়ে আছি কবে সেই আনন্দময় দিনগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তুমি থাকবে আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে এক অপূর্ব মণিমুক্তার হারের মত আমার বুকের স্পন্দনের চেয়েও নিকটতর।

আনিস্-আলজালিস

হাঁ, আমাদের প্রেম হবে চুম্বনের চেয়েও নিকটতম, আলিঙ্গন-রভসের চেয়েও মধুরতম, এতো ঘন, আর ঘনিষ্ঠ যে সুখে-দুঃখে সে হবে সমমর্মী, বহুদিনের বিরহে সে ভালোবাসা বদলে যাবে না, প্রত্যহের আনন্দ উচ্ছল অপব্যয়ে সে অমর প্রেম ম্লান হবে না।

নুরুদ্দীন

সেই ভালোবাসাই তুমি পেয়েছো।

(দুনিয়ার প্রত্যাবর্তন)

দুনিয়া

আমি নুলাৎকে বলেছি মাকে ডেকে নিয়ে আসতে—একটা মৃদু ঝড় উঠবে এখনি।

(দুয়ারের কাছে আমিনার প্রবেশ)

আমিনা

হারকুশ। ঘুনুচেচা।

হারকুশ

অাঁঃ অাঁঃ।

দুনিয়া

বিরাট দৈত্যটা চেঁচাচ্চে দেখো, গোঁ গোঁ করছে।

আমিনা

হারকুশ কবে নিত্য দিচ্ছিলে?

হারকুশ

ঘুম...আমি...না, না, বেগম সাহেবা, আমি চোখ বুজে ধর্মশাস্ত্রের একটা অনুশাসনের কথা ভাবছিলাম, পলেস্তের তো ধর্মকর্ম করবার সময় নেই—আপনারা দেনও না, সমস্ত জিনিষেরই ত কড়ায়গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে।

আমিনা

পিঠে যখন সপাৎ করে চাবুক পড়বে আর উঠবে তারি মাঝখানে ধ্যানধারণায় বসতে পারো? কারণ তোমার ভাগ্যে শীঘ্রই তা জুটছে।

হারকুশ

লাঠি পেটো আর চামড়াই চালাও, হারকুশের কাছে সবই সমান। আমাকে লাঠোষধি দিয়ে স্বর্গের সোজা রাস্তা থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না।

আমিনা

আমার মনটা কিন্তু 'কু' গাইছে।

(ঘরে ঢুকে)

এটা কি ভালো কাজ হলো, বাছা।

নুরুদ্দীন

মনে করে নাও না, খুব বকেছো কিন্তু সত্যি ও রকম করে কপালের ভুরু কোঁচকালে কষ্ট হয় না।

আমিনা

দুনিয়া, তুইও আছিস এর মধ্যে।

দুনিয়া

অভিনয়ে অংশ নয়, এ অনাসৃষ্টি ত আমারই কীর্তি আমার গৌরব, বিধিলিপিকে নতুন করে লিখেছি আমি।

আমিনা

নির্লজ্জ অবাধ্য মেয়ে, তোর ধৃষ্টতা ত কম নয়, দুনিয়া? আসছেন তোমার পিতা-ঠাকুর—তাঁর রাগ ফেটে পড়বে সকলেরই উপরে, তখন?

নুরুদ্দীন

হবে আর কী, একটু বকুনী, একটু হাসি, একটু কোলাকুলি, তারপর সব ত্রুটির মার্জনা দোষস্খালন। তোমরা যে আমার জন্য এমন একটি জ্যান্ত উপহার লুকিয়ে রেখেছো জানবো কি করে—হাঁ তোমাদের হাত থেকে পাবার আগেই আমি নিয়েছি—তাতে হয়েছে কি।

আমিনা

তোমার জন্য—হা কপাল? রাজার জন্য ওকে কেনা হয়েছে, রাজদ্রব্যে তুমি হাত দিয়েছো—এর চেয়ে বড়ো অপরাধ আর নেই।

নুরুদ্দীন

রাজার জন্য—রাজভোগ্য—আচ্ছা, দুনিয়া, তুমি ত বললে আমার জন্য ওকে আনা হয়েছে, হঠাৎ চমকে দেওয়া হবে আমাকে?

দুনিয়া

হাঁ, আমি বলেছি।

আবিনা

এতো বড় মিথ্যাভাষিণী তুই।

দুনিয়া

মিথ্যা, মিথ্যা দেখলে কোথায়—যে যাকে পায়, তার জন্যই সে কেনা, ওই ওকে পেয়েছে। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি? তুমি আশ্চর্যান্বিত হওনি? আর পিতৃব্যদেব, তিনি ত আরো হবেন, দুঃখ করবেন, রাগ করবেন। কিন্তু এই যোগ-বিয়োগের ফলটা দেখো—আমার ভাইটি আর আনিস্—কোথায় যে প্রেমের ফাঁদ পাতা ছিলো, ঘুনের ঘোরে পাকড়াও হলো—শুধু দুনিয়াই ভুল বোঝেনি। এর মধ্যে মিথ্যাটা কোথায় বরং সত্যিকার সত্যেরই একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে—না মণি, যেটা ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল তাকেই তোমার দুনিয়ারানী ঐ একটু এগিয়ে দিয়েছে।

নুরুদ্দীন

আমি এতোশতো জানতাম না—কিন্তু না, দুনিয়াকে তুমি দোষ দিয়োনা, কারণ জানলেও আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতুম আমার ভাগ্যলিপিকে পরীক্ষা করতে আর জোরে কেড়ে নিতে।

আবিনা

কিন্তু তোমার পূজনীয় পিতৃদেব কী করবেন, কী বলবেন সেইটেই তো হয়েছে আমার মুস্কিল—আমার ভয় করছে। তিনি এ কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে চেয়েছিলেন, তাঁর স্বভাবের চেয়ে অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে রয়েছেন—আচ্ছা, দেখি, তোমরা একটু গা আড়াল দাও, তাঁর রাগের প্রথম ধাক্কাটা আমার উপর দিয়েই যাক্।

নুরুদ্দীন

রাজা। তিনি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হয়ে বসলেও আমার শুদ্ধ ভালবাসা কিছুই পাবেন না—চলে আয় দুনিয়া, সহ অপরাধিনী।

(দুনিয়ার সহিত প্রস্থান)

আমিনা

হারকুশ—যাও, তোমার প্রভুকে ডেকে নিয়ে এসো আর তোমার পিঠের চামড়াটা একটু শক্ত করে রাখো—অবাধ্য অমনোযোগী চাকর।

হারকুশ

হারকুশের কাছে সবই সমান—লাঠ্যৌষধিই চলুক আর চামড়ার বেতই পড়ুক—বদমাইসী ভরা নোংরা সংসারে এই হচ্চে পরমাগতি।

(প্রস্থান)

আমিনা

আচ্ছা আনিস্ আমায় বল ত, মাথাটি একেবারে মুড়িয়ে খেয়েছো, না বাকী আছে কিছু—হায় হায়, তোমার আনত মুখ চোখই যে তোমার দোষের সাক্ষ্য দিচ্চে—যাই বলো বাপু, তোমার স্বভাব শিক্ষাদীক্ষা তোমার মুখের মত অতো সুন্দর নয়—তুমি কি বারণ করতে পারতে না ?

আনিস্-আলজালিস

মা, আমার দিকটাও ভেবে দেখুন, আমি দাসীবাঁদী, আমাদের কাজই হচ্চে শান্ত মনে বিনা বিচারে তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করা, মনোরঞ্জন করা—আমাদের শিক্ষাই তাই। স্বাধীন মানুষের কাছে যা গুণ, আমাদের কাছে তা দোষ। আপনারা আপনাদের মনোবৃত্তির প্রভু হতে পারেন, আমরা তা পারিনা, আমাদের কর্তব্য তা নয়।

আমিনা

না বাপু, তুমি মেয়ে বড়ো চালাকচতুর, যেমন সাফ্ মাথা, তেমনি কথার বাঁধুনী—এ তো দাসী চাকরাণীর কথা নয়, না, আমি তোমায় দোষ দিই না।

আনিস-আলজালিস

আমি অস্বীকার করছিনা যে আমার মনও এতে সায় দিয়েছিল।

আমিনা

বুঝতে পারছি সবই—কে যে তোমাকে অনুরোধ উপরোধের জালে জড়িয়েছিল, আর করবেই বা তুমি কি—ওর কাছে তোমার হৃদয় সাড়া না দিয়ে পারেনা—যাও।

(আনিসের প্রস্থান, হারকুশ ও ইবনসরীর প্রবেশ)

ইবনসয়ী

আশা করছি, আশা করছি, আমি যা ঘটাতে চাইনি তা ঘটেনি। এই বাচ্চাজোয়ানটাকে জিজ্ঞেস করলে কী যে মাথামুণ্ডু উত্তর দিচ্ছে, বুঝতেই পারছিনা।

আমিনা

খবর খুবই খারাপ।

ইবনসয়ী

কেন! কেন। না, আমারই বোকামী, তার ফলভোগ আমাকেই করতে হবে, আর পাহারাদার তুমি, ভালো করেই মাহিনা পাবে।

হারকুশ

হায়রে, পৃথিবীর রীতিনীতি, কার দোষ? না পেটো হারকুশকে, আমার নওজোয়ান প্রভুটি যদি ভুল জানালা বেয়ে, সিঁড়ির বদলে দড়ি বেয়েই ওঠে, তাতে কী, আমার পৃষ্ঠদেশ অক্ষত না থাকলেই হলো—বেশ, আমি কি জানলায় হাজিরা দিচ্ছিলাম, না আমার চোখের মধ্যে ভিনের দৃষ্টিশক্তি আছে যে কাঠের ভিতর দিয়েও সব দেখতে পাবো, হায়রে অবিচার আর কাকে বলে!

ইবনসয়ী

ভালো করে মিথ্যেটাও গুছিয়ে বলতে পারোনা, তার জন্যও যা কতক খাবে।

আমিনা

ঐ গরীব বেচারীকে দোষ দিয়ে আর কি হবে, এ হচ্চে অলঙ্ঘ্য নিয়তির খেলা।

ইবনসয়ী

হ্যাঁ, ঐ নাম স্মরণ করেই যা কিছু অঘটনের কাজ আমরা ভগবানের উপর সমর্পণ করি—না, সে হবেনা। ছেলেটা বিগড়েছে আমাদের জন্যই, আমরাই তাকে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছি এবং পাপের উপযুক্ত করেই মানুষ করেছি আর বরাবরই তার দোষত্রুটিস্খলন মৃদুভাবে বকে কার্যতঃ সমর্থন করেছি, এখন শাস্তি দিতে গেলে রূঢ় হতেই হবে। ঘরের বাইরে পরের দুয়ারে যা কিছু করেছে সে সবই ত আমরা হাল্কাভাবে নিয়েছি, এখন ব্যাপারটা নিজের ঘরের ভিতর ঘটেছে, বলো, কী করবে?

আমিনা

তুমি কি করতে চাও?

ইবনসরী

এই দোষের প্রকৃত দণ্ড হচ্চে মৃত্যু, কিন্তু দোষীর নয়। সবচেয়ে ভালো হয় যদি পাপটাকে লোপাট করে দেওয়া যায়, আর পাপী থাকে বেঁচে।

আমিনা

উজীর সাহেব, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, কী সব বলছো,—একটুখানি ভেঙেছে বলেই সবটা ভাঙতে হবে? নুরুদ্দীন আলিসকে নিক্—ভাগ্যের ইঙ্গিত তাই। তুমি আর একটা এর চেয়ে সুন্দরী কিনে আলজিয়ার্সীর শয়নকক্ষের সঙ্গিনী করে দাও, আর রাজার টাকাটা তোষাখানায় জমা দিয়ে দাও—একটু আধটু ত্রুটি ঢেকে ফেললেই চলবে।

ইবনসরী

মিথ্যাকথা বলে?

আমিনা

না, চুপ করে থেকে।

ইবনসরী

সর্বশক্তিমান চুপ থাকবেন? আমার শত্রুরা? খাকনপুত্র নীরব থাকবে? আমিনা, সন্তানরাই আমায় বধ করলে, অপমান, লজ্জা, মৃত্যু।

আমিনা

অতো ঘাবড়াচ্চো কেন? উজীর, স্ত্রীলোকের কাছ থেকে একটু বুদ্ধি ধার করো, দরবারে কাজে লাগবে। জানি, আলমুরেন কথাটা তুলতে পারে, তা তুমি কি নটনড়নচড়ন শিশ্চল নিঃশব্দ নৌকাবাবা হয়ে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করবে? রাজা কাকে বেশী বিশ্বাস করেন? বুদ্ধি খাটাও, নিজেকে রক্ষা করো, ছেলেকে বাঁচাও।

ইবনসরী

মতলবটা খাটিয়েছো ভালো, আমার দুর্বল মন এতে সায় দেয় কিন্তু আমার বিচারবুদ্ধি

নিশ্চয় এটা সমর্থন করেনা। তাছাড়া, শোনো আবিনা, আমরা যদি স্নেহবৎসল হয়ে এতো বড় প্রচণ্ড দোষটা এককথায় মাফ করে দিই, আমরা ছেলেটাকে আরো উচ্ছৃঙ্খল পথে এগিয়ে দেবো। ওর যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, দেহের নয়, আত্মার—পাপের পঙ্কে ডুবে ওর মন যে পাথর হয়ে যাবে, যেন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

আবিনা

যা বলি তাই শোনো। বাইরে দেখাও ভীষণ রাগ, চকচকে ছোরা সামনে রাখো, গলার কাছে ধরো, ওকে সত্যিই আতঙ্কিত করে তোলো. তখন সেই চরম মুহূর্তে আমি এসে কেঁদে পড়বো তোমার পায়ে, বলবো ওকে বাঁচাও আর কখনো আমার ছেলে এমন কাজ করবেনা, সত্যপথে চলবে।

ইবনসয়ী

তা, এ মতলবটা মন্দ নয়। দাও দিকিন একখানা ছোরা—দেখি চেষ্টা করে খুব রাগী রাগী ভাব দেখাচ্চে কিনা।

আবিনা

হারকুশ. একটা ছোরা, এখানে।

(হারকুশ তার ছোরাটা এগিয়ে দিল)

ইবনসয়ী

আর দেখো তুমি কিন্তু সব মাটি করে দিয়োনা, তাড়াতাড়ি চুকে।

আবিনা

আমায় বিশ্বাস করতে পারো।

ইবনসয়ী

হারকুশ ডেকে নিয়ে এসো আমার কুলতিলকটিকে, সে যেন না জানতে পারে আমি এখানে আছি।

(হারকুশের প্রস্থান)

আবিনা, তুমিও যাও।

(আবিনার প্রস্থান)

বিশ্বে খেলার ও মাঝে মাঝে সত্যফল আসতে পারে—এ ক্ষেত্রে তা একেবারে অসম্ভবও নয়। দেখা যাক—জিতি কিম্বা হারি—তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার, খানিকের কাজে ফুলে যাবার আগে। না, ঐ যে আসছে।

(নুরুদ্দীন ও হারকুশের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন

সত্যি বলছো ? এই ধরনের সহৃদয় বিদ্রোহের জন্য তোমায় সোনা দেওয়া উচিত।

হারকুশ

হারকুশকে বিশ্বাস করতে পারো, কিন্তু আমার উপর যদি নারধোর হয়—যাক্ গে, লাঠিই বা কি আর চামড়াই বা কি, সব সমান।

নুরুদ্দীন

বাবা !

ইবনসরী

বেটা বাসকেল, বদমাইস, ভণ্ড, বিটকেল্।

(নুরুদ্দীনকে একটা কোচের উপর ফেলিয়া দিয়া ছোরা হাতে)

বাবা বলা বের করছি, আল্লার জন্য তৈয়ারী হয়ে নাও, কালো অপরাধক্লিন্ন যে আত্মা চিরনরকে যাবে—আমি তোমার যম, বাপ নই।

নুরুদ্দীন

মা, মা, শীগ্‌গির, বাবা মেরে ফেললে।

(আমিনার দৌড়ে প্রবেশ)

বুড়োর মাথা খারাপ হয়েছে।

ইবনসরী

কেন, কেন তুমি এলে,—এতো তাড়াতাড়ি, মেয়েমানুষ কিনা।

নুরুদ্দীন

ওর চোখ কি রকম ঘুরছে দেখছোনা। শয়তান, ওকে ছাড়—ওকে নিয়ে যাও শিগগির।

ইবনসরী

আমাকে নিয়ে যাবে, বদমাইস্।

নুরুদ্দীন

না, ওকে কাইকুতু দাও, সেই ভালো।

ইবনসরী

বলে কী ছোঁড়াটা, কাইকুতু দাও—উদ্ধত পাষণ্ড তোর গলা কাটবো আজ।

আমিনা

(ভীত ত্রস্ত হয়ে)

ওগো, তুমি কী করছো, ওযে তোমার একমাত্র পুত্র।

ইবনসরী

খারাপ ছেলের চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভালো।

নুরুদ্দীন

কিছুই তুমি শুনবেনা ?

ইবনসরী

না, শুনবোনা, তৈয়ারী হয়ে নাও।

নুরুদ্দীন

বেশ, আমায় একটু ভালো ভাবে শুতে দাও।

ইবনসরী

বলে কী—ভালো করে শুতে দাও, বদমাইসের ধৃষ্টতা দেখো, শাস্ত্রই নরকাগ্নির ভাপসা তাপে সিদ্ধ হবে।

আমিনা

না, আর নয়।

আনিস-আলজালিস

(উঁকি মেরে)

ওরা কথাকাটাকাটি করছে, রাগারাগি করছে—তার চেয়ে আমার কেটে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়।

নুরুদ্দীন

ভয় পেয়োনা সুন্দরী,—আমরা একটা বহু পুরাতন কৌতুক-নাটক অভিনয় করছি, নামটা কি জানো—'অত্যাচারী পিতা আর গোবেচারী পুত্র'—বোকা বুড়ো।

ইবনসরী

কী, কী বললি ?

নুরুদ্দীন

দেখছো ত তোমার ঐ প্রচণ্ড রাগ আর দম্ভের পরিণাম—অনেকদিন পূর্বেই তোমায় সাবধান করিনি—তোমার ঐ আদরের যত্নে বর্ধমান স্বাস্থ্যবান ধর্মপ্রাণ পুত্রটির জন্য ? কী আজ মাথা ঘোরালে কি হবে—প্রশ্রয় দিয়েছে কে—মাথায় তুলেছে কে—এখন কলটি টিপে বললে চলবে কেন ?—আবার সতর্ক করছি, অন্ধক্রোধকে সামলাও, মানুষের পরমশত্রু ঐ রিপুটি—সত্যি রোমকষায়িত পিতৃদেবের একটি প্রোজ্জ্বল প্রতীক তুমি, বিশিষ্ট উদাহরণ।

ইবনসরী

নিশ্চয়ই তোমায় কেউ বলেছে। (হারকুশের প্রতি) হাসছিস্ কেন শয়তান।

হারকুশ

যা কিছু হোক্ সব আমারই দোষ—পান থেকে চুন খসুক্ ধরো হারকুশকে—তারপর যার শিল তারই নোড়া, হারকুশকে মারো।

ইবনসরী

বেটা দাঁড়াও, তোমার আস্থারাম খাঁচাছাড়া করছি।

নুরুদ্দীন

না, বাবা, ও যেখানে আছে থাক্, শোনো আমার কথা—আমি শপথ করে বলছি

যে তোমার মান সম্মান আভিজাত্য জীবন আমাদের কাছে সর্বোত্তম জিনিষ তার অপমান আমরা সহ্য করবো না, তোমার সামান্যতম ইচ্ছারও বিরুদ্ধাচরণ করবো না। সত্যি বলছি, বাবা, আমি জানতাম না যে তুমি আনিসকে বাজার জন্য এনেছো, আমি ভাবলাম এবং শুনেও ছিলাম যে আমারই জন্যে তোমরা ওকে কিনেছো। আমি এখনও স্পষ্ট বিশ্বাস করি যে নিয়তি আমারই জন্যে ওকে এখানে এনেছে।

ইবনসরী

ভুলই হয়েছে বাপু।

নুরুদ্দীন

না, এ ভ্রান্তির জন্য আমি অনুতপ্ত নই।

ইবনসরী

তুমি আমার পুত্র, সহৃদয়, সত্যবান্, সাহসী। দোষ ত্রুটি আছে জানি, কিন্তু শোনো একটা কথা। ঐ বাঁদীকে নেবে নাও, কিন্তু আর কোনো মেয়ের দিকে দৃষ্টি দেবে না,—স্ত্রী নয়, দাসী নয়, স্বৈরিণী নয়—যতদিন না ও নিজে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে ততদিন বিক্রীও করতে পারবেনা—বাজী, শপথ করো।

নুরুদ্দীন

শপথ করছি।

ইবনসরী

যাও, চলে যাও।

(নুরুদ্দীনের প্রস্থান)

আনিস্—তোমার জন্যই এই পুণ্য প্রতিশ্রুতি ওর কাছ থেকে নিলাম—আমার বিশ্বাস, এ শপথ ও ভঙ্গ করবে না—তুমিও যা এর প্রতিদান দিয়ো—ওর স্নেহময়ী পত্নীর চেয়ে কমতি যেন না দেখি।

আনিস্-আলজালিস্

কী উদার অন্তঃকরণ আপনার, মহৎ দোষীরাও আপনার কাছে তাদের প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ আশার আশ্বাস পায়।

ইবনুসরী

আনিস্—না আবার—যাও।

(আনিসের প্রস্থান)

অদ্য শেষ রজনী—তোমায় আগেই বলেছি কালই আমি বেরুবো কুলের পথে, মহাপ্রাণ খারুনের দৌত্যকার্যে—গ্রীকদের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা কইতে—বছরখানেকের অদর্শন।

আমিনা

বড়ই দুঃসময়—দিন আর কাটবেনা।

ইবনসরী

অনেক কিছু বিপদ আপদ ঘটতে পারে এর মধ্যে তাই আমার সন্তানদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে যাচ্ছি, যতটুকুন সম্ভব সেই পরম শক্তিমানের কৃপায়। দুনিয়ারও বিয়ে দিতে হবে, খাকনপুত্র ওকে চায় তার ঐ বেজী ছেলেটার জন্য—আমি কিন্তু রাজী নই। এমন একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই যে ওকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করতে পারবে, মন দিয়ে, দুহাত দিয়ে।

আমিনা

প্রভু, কার কথা বলছেন?

ইবনসরী

নগরপাল, মুবারক—আলজিয়ানী ওর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট, ওর উন্নতি হবে ধাপে ধাপে প্রতিদিন।

আমিনা

ও তো তুর্কীবংশীয়—আমাদের প্রাচীন আরব-সমাজের সঙ্গে কিন্তু ভাল মিশ্ খাবেনা।

ইবনসরী

ও সব এর বাহ্য। ইসলামের সব কিছুই সেই সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি থেকে উদ্ভূত। আর দেখো আমার সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা দুই ভাগে করে রেখে যাচ্চি—নুরুদ্দীনের জন্য অর্ধেক আর মুরাদের কাছে তোমার জন্য অর্ধেক, যখন তুমি তোমার আত্মীয় পরিজনের কাছে থাকবে।

আবিনা

এ সব কেন ?

ইবনসয়ী

দেখো, আমি থাকবো না, ছেলেটাই হবে কর্তা, হয়তো সব ফুঁকে উড়িয়ে দিলে, তারপর ? যদি সে ভালোভাবে থাকে ভালোই, কিন্তু যদি সব নষ্ট করে তখন বন্ধুরা ফিরেও তাকাবে না, সকলে করবে ঘৃণা। অবশ্য এও হতে পারে যে বিপদের বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়ে সে মাথা তুলে দাঁড়ালো, তার উদ্ধত রক্ত শান্ত হয়ে এলো, সে ফিরে পেলো তার বিদ্যাবুদ্ধি-বিনয়। তখন তাকে সাহায্য করবে তুমি, উদ্ধার করবে পঙ্ক থেকে এবং তখনই বুঝতে পারা যাবে এই ইরানী মেয়েটির প্রতি তার ভালবাসা কতটা গভীর কতটা স্থায়ী এবং এই মেয়েটাই বা কি রকম, ওর উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, কতটা অধিকার সে পেতে পারে, এবং ওকে সে ধরে রাখলেও সত্যি ভালবাসার অধিকার জন্মেছে কি না।

আবিনা

কিন্তু প্রিয়তম, এই এক বছর আমার ছেলেকে দেখতে পাবোনা ?

ইবনসয়ী

কান্না নয়, শোনো, ধরে নাও এ হচ্ছে আমাদের অতিরিক্ত ভালবাসার শাস্তি। এর চেয়ে খারাপও হতে পারতো—যার শেষ ভালো তার সব ভালো। এক বছর পরে বসো-রায় ফিরে যেন ছেলেকে আলিঙ্গন করে দেখতে পাই তার স্বভাব চরিত্র একেবারে বদলে গেছে, দেখি যেন হাস্যময়ী পুনিয়াম্মানী সুখে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করে সংসার করছে, কোলে এসেছে একটি গোলগাল ছেলে, যার তুমি সুখে দুঃখে, ওদের শত দোষ মার্জনা করেছো, সর্বংসহা ধরিত্রীর মত ধৈর্য দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে। আমি শুধু সেই প্রার্থনাই করি তাঁর কাছে—সবই তাঁর ইচ্ছা, মঙ্গলময় যে তিনি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(আজীবের গৃহের একটি কক্ষ)

আজীব

বালকিস্, প্রিয়ে, কাছে এসো।

(বালকিসের প্রবেশ)

বালকিস্

হুজুরের কি হুকুম?

আজীব

আমার ইচ্ছে। সে তো লোপ পেয়েছে যেদিন থেকে তুমি এসেছো—বড্ড কড়া থাকিব তুমি।

বালকিস্

গাল দেবার জন্য ডেকেছো নাকি।

আজীব

তোমার বীন্ নিয়ে এসো, একটা গান গাও না।

বালকিস্

না, এখন ভাল লাগছে না।

আজীব

গাও, লক্ষ্মীটি, তোমার মধুমাখা স্বর শোনবার জন্য আমি ক্ষুধিত হয়ে আছি।

বালকিস্

আমি কি কাবাব, না আমার কথাগুলো স্বাদু তরকারী যে না শুনলে কিধে পায়, ন্যাকামী।

(প্রস্থান)

আজীব

আরে, বালকিস্, শোনো শোনো।

(বীনুনার প্রবেশ)

বীনুনা

ওকে ডেকে আর কি হবে, মহারানী এখন মেজাজে আছেন। আর ওদিকে যে তোমার উজীর সাহেব আসছেন এদিকে, ঘোড়া থেকে নামলেন্।

আজীব

উঠি, তাঁকে উপরে নিয়ে আসি। বীনুনা, ওকে একটু তালিম দাও না, আমার হয়ে —দেবে লক্ষ্মীটি ?

(প্রস্থান)

বীনুনা

খুড়ো মশাইটি হঠাৎ উদয় হলেন কেন ? তিনি ত বড় একটা আসেন না, যেন একটি বেয়ো কুকুর।

(একটি পর্দার আড়ালে গিয়া লুকিয়ে রইল)

(আলনুয়েনের সঙ্গে আজীবের পুনঃ প্রবেশ)

আলনুয়েন

উনি কালই রওনা হচ্ছেন ? বেশ, বেশ, আর ঐ হতভাগা নুরুদ্দীনের হাতে থাকবে সম্পত্তির ভার ? আরো ভালো—আমি বলিনি মহামান্য লোকটির বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু কম ? (স্বগত) এখন এই বাঁদীর ব্যাপার নিয়েই আমি ওঁকে ফাঁসিয়ে দিতে পারি, থাক এখন, আরো গড়াক, উনি তফাতে চলে যান, ওঁর স্মৃতি একটু কমুক, ওঁর টাকাকড়ি ধনদৌলত ওঁর পুত্রবাবাজী দুহাতে অপব্যয় করুন তারপর, আমি সর্বনাশ করবো ওঁর ছেলের আর ঐ উদ্ধত তুর্কীটার, তাকে কিনা দুনিয়ার জন্য পছন্দ হলো আমার ফরীদকে ফেলে। হাঁ, ঐ ফরীদই ভোগ করবে শুধু ঐ দুনিয়াকে নয়, ঐ বাঁদীটাকেও। ওঁর স্ত্রী, না তাঁকে আর এর ভিতর টেনে আনা ঠিক হবে না, উনি পালান। তবে ওদের নামিয়ে আনবো ভাঙা বাড়ীতে, লোলচর্ম জীবনের শুকনো স্মৃতিতে, শীতকালের ঝরাপাতার আসরে। আর এই সুযোগে রাজার কানে এমন মন্ত্র দেবো যে তাঁর প্রশান্ত হৃদয়ের একটি অলিগলিতেও বড় উজীর সাহেবের কোন স্থানই থাকবেনা, একটু আশ্রয়ও না।

আজীব

খুড়ো, কি সব ভাবছো বলো দিকিন্।

আলনুয়েন

না, এমন কিছু নয়—সামান্য চিন্তা, ইবন্‌সমীর ছেলে ত তোমার সোজ।

আজীব

এক সঙ্গে পানাহার চলে বই কী—এক গেলাসের...

আলনুয়েন

বেশ, বেশ, মান সম্মান অর্থ ক্ষমতা চাও, না কী যা আছ তাতেই সন্তুষ্ট, ছোট মন, সামান্য আমোদআহ্লাদ সুখেই মগ্ন ?

আজীব

কেন খুড়ো ?

আলনুয়েন

মৃত্যুকে ভয় করো ? চরম অপমান ? না তার চেয়েও ভীষণ, দারিদ্র্য—কি বলো ?

আজীব

কে না চায় সুখসম্পত্তিসম্মান, সবাই ভয় করে দুঃখদারিদ্র্য দুর্দশাকে।

আলনুয়েন

তুমি সব পাবে যদি আমার কথামত চলো, আর যদি না পারো তবে জেনো অমঙ্গলের দিন ঘনিয়ে আসছে।

আজীব

কী কাজ করতে হবে আমায়।

আলনুয়েন

ঐ নুরুদ্দীনটাকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাও—ভোগবিলাসে, বৈছল্লোড়ে,

সুরা আর সুন্দরীতে ওকে ডুবিয়ে রাখো, বন্ধুর ছদ্মবেশে ওর সব সম্পত্তি হস্তগত করে নাও, পথের ভিখারী করে তোলো। মদ ওর মাথা বিকৃত করুক, রূপের মোহ ওকে বিকলাঙ্গ করুক, অর্ধোন্মাদ করুক। একটু আধটু এদিক ওদিক নয়, একেবারে পাঁকে টেনে নিয়ে যাও—অবশ্য নিজের গায়েও যে একটু লাগবেনা তা নয়—তবে যদি করতে পারো, তোমার ভবিষ্যৎ তৈরারী হয়ে গেলো। আর যদি না পারো তবে তোমারও ইতি এটা জেনে রেখো। আটমাস সময় দিচ্ছি—না, আসতে হবেনা।

(প্রস্থান)

আজীব

নীনুনা, কোথায় তুমি?

নীনুনা

এই যে এখানে তোমার পিছনে।

আজীব

সদ্য নরক থেকে উঠে আসা এক বেটা শয়তান এসেছিল আমার কাছে।

নীনুনা

শয়তান, সত্যিই—আর তোমাকেও সে তার যোগ্য সাগ্‌রেদ করে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে চায়?

আজীব

কি কয়ি বুঝতে পারছি না।

নীনুনা

অন্ততঃ সে যা চায় তা নয়।

আজীব

কিন্তু যদি না বলি, তবে আমার দফারফা। বসোরায় বাস করে ওর ক্রুর দৃষ্টি এড়ানো যাবেনা। আর অন্যদিকে—

মীমুনা

অন্যদিকের কথা ছেড়ে দাও, সত্যি, বদমাইস কুকুর কামড়াবেই, তার চরিত্রের খারাপ-দিকটা প্রকট হবেই, আমাদের স্বভাবের ভালো দিকটা কতো ক্ষণভঙ্গুর—না কিন্তু তুমি এ কাজ করতে পাবেনা, করবেনা, আমাদের বালকিস্ আনিসকে কতো ভালোবাসে।

আজীব

সুন্দরী বোঝোনা যে আমার জীবন, সম্পত্তি সবই লাটে চড়েছে।

মীমুনা

একটা কাজ করো।

আজীব

তুমি যা বলবে তাই করবো।

মীমুনা

ওর কতকগুলো বদ সঙ্গী আছে না।

আজীব

হাঁ, ঐ যে কাফুরদের দলটা হৈ হৈ স্ফূর্তি করে বেড়ায়, বেপরোয়া, যমের বালাই নেই, দিলও বেহুঁসিয়ার।

মীমুনা

ওদের হাতে ছেড়ে দাও ব্যাপারটা একটু আভাস দিয়ে কানে কানে, এই আর কী নিজে কিছু করতে যেয়োনা। বরং মাঝে মাঝে দাবড়ানী দিয়ো, ওকে একটু সংযত করবার চেষ্টা করো। যা কিছুই করো, ওর টাকাকড়ি উপহারের দিকে নজর দিয়োনা, ওটা হচ্চে মানুষের সদ্বিবেচনার বিনিময়ের মূল্য। ও যদি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়—যা হওয়া সম্ভব—শয়তানের মনস্কামনা পূর্ণ হলো। আর তা যদি না হয়, আমরা বসোরা ছেড়ে পালাবো, যদি আর কিছু উপায় না থাকে।

আজীব

বুদ্ধি আছে তোমার, খাসা মাথা। আমার যদি নীচ হতেই হয় তবে একেবারে নীরেট

নীচে না নেমে একটু সাহসীই হওয়া যাক না, যাতে মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও বজায় থাকে।

বীনুনা

আর বালকিস ?

আজীব

সত্যি।

বীনুনা

নিরাপত্তা সবাই চায়, তুমিও নিরাপদ হও—কিন্তু সব কিছুই সংশয় সন্দেহে ভরা হতে পারে, শুধু একটি সত্য বাঁচি—মৃত মানুষেরা ভালোবাসেনা।

আজীব

আমি ভেবে দেখবো নিশ্চয়ই—বীনুনা, যাও, তোমার বোনটিকে পাঠিয়ে দাও।

(বীনুনার প্রস্থান)

জিনিষটা বড়ই নোংরা, কিন্তু সম্মান, অর্থ আর বালকিসকে যদি বসাতে পারি একটা রাজ্যের ভাঙাগড়ার চূড়োয়—তার ঐ সুকুমার পেলব হাত দুটো দিয়ে সে মানুষ ভাঙবে, গড়বে—যে-হাতের তুলনায় বীণা যন্ত্রটা যেন বেমানান বড়ো। কিন্তু কাজটা গর্হিত।

(বালকিসের প্রবেশ)

বালকিস

আপনার কী আদেশ ?

আজীব

তোমার বীণা নিয়ে এসো, বসো একটা গীত শোনাও, মনটা বড়ই ক্লান্ত ভগ্ন হয়ে রয়েছে—না, বসো না সুন্দরী, মেজাজ পরীক্ষ নেই।

বালকিস্

ভয় দেখাচ্চেন ?

আজীব

ভুলে যাচ্চো, তুমি এখনও দাসী বাঁদী, যতোই আমি ভালবেসে মাথায় তুলি না তোমায় আমার কথামত কাজ না করলে তোমায় শাস্তি দেবার অধিকার আছে আমার।

বালকিস্

তাই করো, তাই করো, মারো কাটো, শুধু যা করেক মার নয়, একেবারে মেরে ফেলো, আমার মনটাকে খুন করেনি শক্ত নির্মম কথা বলে, জানি, জানি তোমাদের এই ধরনের ভালোবাসার কি পরিণাম—উঃ উঃ (কান্না)

আজীব

প্রিয়তমে ক্ষমা করো আমায়, সত্যি শপথ করে বলছি আমি, ওসব কিছু মনে করিনি।

বালকিস্

না, না, খেলার ছলে মাঝে মাঝে কথা বলি কম—না, আমাকে মেরে ফেলো, কেটে ফেলো!

আজীব

আরে, ঠাট্টা বোঝো না কেন! লক্ষ্মীটি আর কাঁদেনা, এতো কান্না নয়, আমার বুকের কলিজা উপড়ে নেওয়া—বালকিস্, শোনো, কি চাই তোমার—গলার হার, হাজার হাজার টাকা দাম? মুক্তোর রুমীর? কেঁদোনা।

বালকিস্

আমি দাসী বাঁদী, মার খেতে জন্মেছি, পান্নাহীরে মুক্তো আমাদের জন্য নয়, বীমুনা, বীমুনা—একটা চাবুক নিয়ে এসো ওঁর জন্য আর আমার জন্য এক বাটি বিষ!

(প্রস্থান)

আজীব

এতো বীণা বাজানো নয়, আমাকেই সরগমে তোলা—আমারই উপর যেন একটা সুরের রাগিনী ঝড়ের ঝঙ্কার দিয়ে গেলো...আমি না পারলুম নড়তে না পারলুম কিছু করতে, ওরই মন মতি মেজাজ আমাকে শাসন করে চালিয়ে নিয়ে চললো, ওর মৃদুহস্তের সঞ্চালনে স্নেহমুগ্ধ শিহরিত না হয়েই—না, না মানিনীর মান ভাঙাতেই হবে বীমুনা, ও, বীমুনা!

(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

ভেডান্থঙ্গল বিহঙ্গ-বিহার

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

কবি গেয়েছেন

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

(কল্পনা—'দুঃসময়')

আমি দেখেছিলাম দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে ওই ডানা মেলে নীল আকাশ বেয়ে হংস-বলাকারা কেমন আসছে। আমার মনের আকাশ দিয়ে এপার থেকে ওপারে উড়ে চলল বিহঙ্গ—ওই বিহঙ্গের সঙ্গে মন নিজেই যেন কখন অতিন্দ্র হয়ে গেছে, মুক্তির প্রসাদে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। কুট আর পাদা আইবিস বিহঙ্গবিদের শাস্ত্রে আলাদা শ্রেণীর পাখি, কিন্তু কবির কাছে এরা একই বাণীর প্রতিমূর্তি

Away ! Away ! for I will fly to thee....

(Keats — *Ode to Nightingale*)

একই অভিলাষের প্রতিধ্বনি—

If we were things born
Not to shed a tear....

(Shelley — *To a Skylark*)

বিস্তীর্ণ বিলের পারে উঁচু চিবিটার ওপর আমরা বসেছি। ডক্টর বীরেন গাঙ্গুলীর ভাই রাজেন, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, লালা আর আমি। লালা সকলের তুনিয়র, সকলের স্নেহভাজন এবং গাড়িখানার চালক। তার উৎসাহ অপরিসীম—বিলের পাশে হাল-দেওয়া জমিতে তিতর্ বা প্যাট্রিজ দেখে তার মনে যায় পড়ে বাল্যে রাঁচি অঞ্চলে পাখি-শিকারের কথা। পক্ষীমাংসের রসাল প্রসঙ্গটা অবশ্য অনুমেয়। আমি পা ছড়িয়ে দিলাম ঘাসের ওপর, ঘাট মাইল একদমে আসা হয়েছে মদুরান্তকম্, তারপরেই ছোট্ট গ্রাম ভেডান্থঙ্গল। মাদ্রাজ-পণ্ডিচেরী রাজপথ থেকে নেমে লাল সুরকির পথে ঢুকতে হয় নির্জন

এই জলাশয়ে। এত মাছ এই জলে আর সারা বছর এত জল এই বিলে। রাজ্যসরকার এই মৎস্যরক্ষার সুব্যবস্থা করেছেন ধীবরের জাল বঁড়শি ছোঁচ ত্রিসীমানায় আসতে না দিয়ে, বিশ মাইল পরিধির মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ আইন করে। বিলের জলে এখানে-ওখানে ছড়ানো এক এক টুকরো দ্বীপের মতো উঁচু জমিতে বেঁটে নেড়া গাছ—তার উপর গিজগিজ করছে এই মৎসভোজী পাখিরা।

এখন ফেব্রুয়ারী মাস। এখনো আশেপাশের জলাশয়ে জল শুকিয়ে যায় নি। মার্চ নাগাদ যাবে। তখন এটিই থাকবে পাখিদের একমাত্র নিরাপদ ধর্মশালা। দূরবীণ লাগালাম চোখে—কৌলীন্যগর্বে যে-দূরবীণ বিশেষ পদমর্যাদা দাবি করতে পারে। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এই অস্ত্রটি আমাকে ব্যবহারের জন্যে দিয়েছিলেন ক ল্যা ণ চৌধুরী। বিখ্যাত শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরী এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে দিয়ে হয়ত কত রাত্রি জেগে জ্যোৎস্নাপ্লুত গভীর অরণ্যে হিংস্র ও নিরীহ বনচারীদের জলপান ও ক্রীড়া লক্ষ্য করেছেন, মুগ্ধবিস্ময়ে রাজা ও প্রজার একই পথে আসা-যাওয়া নিরীক্ষণ করেছেন। আজকের বেলায় যারা জমায়েত হয়েছে তাদের নাম Little Egret (কিলচিয়া বগলা বা বক), Pond Heron (রাতচোরা বক), Little Stint (ছোট পানলোহা), Stilt (তিংধুর), Open Bill (খংবিলা), Cormorant (পান কৌয়া), Spoon Bill (চামচ বাজ), White Ibis (মুণ্ডা), Grey Heron (অঞ্জন), Night Heron (ওয়াক-কোয়াক), Snake Bird (গয়াল), Indian Moorhen (ডাহুক), Dabchick (পান-কৌড়ি), Painted Stork (দোখ), Coot (খুরকুল), Comb Duck (নক্তা)।

আশ্চর্য এই পাখিদের জগৎ। তারা শুধু জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর চক্রবন্ধনে আড়ষ্ট হয়ে কুলায় বসে নেই। তারা আবার বিশ্বপর্যটক। শীতের প্রকোপে সুমেরুরাজ্যে রাশি রাশি জল যখন জমে বরফের মাঠে পরিণত হতে থাকে, দিন যখন ছোট আরো-ছোট হয়ে ওঠে, আহার্য অল্প এবং খাদ্য-সংগ্রহের অবকাশ যখন স্বল্প-তর হতে থাকে, আর তার সঙ্গে যোগ দেয় প্রাণ-প্রবৃত্তির দুর্বার প্ররোচনা তখন পৃথিবীর ছাদ থেকে পাখা মেলে নেমে পড়তে হয়, বিষুবরেখার আশ্রয়ে পাড়ি দিতে হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে। কুমেরু থেকেও বিপরীত ধারায় চলে আসা-যাওয়া—শীতের তাড়নায় উঠে আসা ও পরে গরমের আবির্ভাবে নীচে নেমে পড়া। সুদূর ব্রাণ্ডেনবুর্গ, হঙ্গেরী, রুশ থেকে জলচর পাখিরা আসে ভারতবর্ষের রাজপুতানায়, পাতিয়ালায়, কানপুরে আসে ইন্দোরে, ধারে; আসে সেওয়ানীতে—দাঁড় হুদের ডাকে; আসে কেরলের কোচ্চিনায়ারে—ভেম্বনাদের মিঠাপানির কুহকে মজে। সেলিম আলি তাঁর Indian Birds বইতে পাখিদের বিস্ময়কর উড়ন-অভিযানের কথা লিখেছেন। আর্কটিক টার্ন (Tern) (তেহরি, কুরি জাতীয়) আর্কটিক থেকে আন-টার্কটিক রাজ্যে যাওয়া-আসায় বাইশ হাজার মাইল অতিক্রম করে। য়ুরোপের 'সোয়ালো' (নাককাটি) বারো হাজার মাইল আসা-যাওয়ার পথ পার হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে—প্রতিবার বছরের প্রায় একই সময়ে। হাঁস, রাজহাঁস, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এবং অনুকূল বাতাসে পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল বেগে উড়ে ঘণ্টার ব্যবধান পার হয়। দিনে বা রাতে দেশপারের যাত্রী পাখিরা ছয় থেকে এগার ঘণ্টা ওড়ে। প্লোভারের (চাহা) টানা পাড়ির দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ শ' মাইল (১১ ঘণ্টায়), উডককের আড়াই থেকে তিন শ', Stork-এর (সারস) একশ' পঁচিশ (ছয় ঘণ্টায়), 'কুট' বা ঘুঘুকুলের একশ' ষাট মাইল। ভারত-ভ্রমণকারী ইস্টার্ন গোল্ডেন প্লোভারকে একদমে দু'হাজার মাইল উড়ে আসতে দেখা

গিয়েছে। জাপানী কে-রাইপ ঘর ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ার শীত কাটায় তাকে সোজা তিন হাজার মাইল উড়তে হয়। বিদেশ-পর্যটক পাখিরা উঁচু পাহাড় পর্বতের বাধা না থাকলে তেরশ' ফুটের উপর দিয়ে বড় একটা চলে না, কদাচিৎ তারা তিন হাজার ফুটের ওপর দিয়ে চলে। তবে হাঁস রাজহাঁসের কুড়ি হাজার ফুট উঁচু দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যাবার দৃষ্টান্ত আছে। এক ধরনের শকুনও অত উচ্চতায় সচ্ছন্দে বিচরণ করে। ১৯৫৩ সালে এডমণ্ড হিলারী এবং তেনসিং এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার সময়ে ২৮,০০০ ফুট উঁচুতে এক ধরনের কাকের (Chough) সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন—২৬,০০০ ফুট উঁচুতে ক্যাম্পে এদের দল উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করতে আসত।

ভেডাঙ্গল তামিল উচ্চারণ (ভেডান্ = ব্যাধ বা কীরাত ; থঙ্গল = দঙ্গল, দল বা আড্ডা)। এটি একদা হয়ত ভাল ও তীর ব্যবহারক মানুষের আকর্ষণীয় স্থান ছিল। এখন ভেডাঙ্গল আনকোরা প্রোজেক্ট—টুরিস্ট সেন্টারের মহাবেলায় শিশুপাঠ হাতে নিয়ে শুধু প্রবেশাধিকার পেয়েছে। তত্ত্বাবধায়কের মুখে শুনলাম এখানে অতঃপর দর্শকদের জন্যে বিশ্রামাগার নির্মিত হবে, উঠবে মিনার যার সুউচ্চ শিখরে বসে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কৌতূহলী লক্ষ্য করবেন পাখিদের কার্যকলাপ। তারপর অভিজ্ঞ কর্মীর অধীনে হতে পারবে সত্যকারের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তথ্যসংগ্রহ ও গবেষণা। নিখুঁত জ্ঞানের জন্যে ভারতের সব বিহঙ্গ-বিহারগুলিকে সংযুক্ত করে বিদেশের পক্ষিবিজ্ঞানকেন্দ্রগুলির সঙ্গে পরিচিত করে দিতে হবে। তথ্যের আদান-প্রদানে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিশ্বের পটভূমিকায় শেষে ফুটে উঠবে স্থানীয় বাস্তবিক চিত্রটি। সে-চিত্র উপন্যাসের চেয়ে কম রমণীয় নয়।

পাখির সঙ্গে মিশে আছে একটা ভারহীনতার অনুভব, একটা গতির প্রবাহ, অনন্তের অবকাশে একটা অপার্থিব মুক্তির আহ্বান। তাই তো ইংরেজ কবি গেয়ে উঠেছেন

Hail to thee, blithe Spirit !
Bird thou never wert....

ভারতীয় কবিদের—নবীন কি প্রবীণ—তো কথাই নেই। তাঁরা মানুষের পরম সম্পদের—তার অন্তরাত্মার—চিত্র দিতে গিয়ে উপস্থিত করেছেন রাজহংসকে। উপনিষদের ঋষির চোখে পাখি মানুষেরই প্রতীক ও প্রতিনিধি, সে-দৃষ্টিতে শিল্পরসের প্রতি পক্ষপাতিত্বও কম নয়—এক পাখি গাছের ফল খায়, অন্য পাখি চেয়ে দেখে ; মানুষের এক নিম্নপ্রকৃতি—কর্মাশ্রয়ী, ফলাকৃষ্ট, পরিণাম-ভোগী, আর এক উর্ধ্ব- ও উত্তর-প্রকৃতি—নিস্পৃহ, নিরাসক্ত নির্বিকার ; এক দেহ, আর এক আত্মা ; এক আত্মা জীব-দেহে জড়াংশের মধ্যে সুকৃতি-কুকৃতির পরিণাম গ্রহণ করে, আর এক আত্মা জীবাধারে থেকে যেন উর্ধ্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শুধু নির্নিমেষে চেয়ে দেখে।

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

(১)

প্রশ্ন আশ্রম বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার উচ্চমান আর আগের মতো রইল না কেন?

উত্তর ব্যাপারটা কিছু জটিল। তোমাদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করি। অনেককাল পর্যন্ত আশ্রমটি ছিল কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিকে নিয়ে, যদিও তারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজের ভার গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে, এটি কোনো সঙ্ঘবদ্ধ সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের মতো ছিল না। মানুষগুলি যেন দাবার ছকের উপরে আলাদা আলাদা ঘুঁটির মতো ছড়ানো। আপাতদৃষ্টিতে যদিও তারা ঐক্যবদ্ধ ভাবেই থাকতো, বাইরের থেকে দেখা যেতো যে তারা একত্রে মিলে একই স্থানে বাস করছে, এবং তারা কিছু সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেও চলতো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সামান্য মাত্রই, বেশি কিছু নয়। সাধনার কাজে আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে কেউ হয়তো খানিক অগ্রসর হয়ে যেতো, আর কারো হয়তো কিছুই হতো না, পরস্পরের মধ্যে ভিতরের যে ঐক্যবন্ধন ছিল তা সামান্যই। সুতরাং এই অসমভাবের গোষ্ঠির মধ্যে কয়েকজনের ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক থেকে তার একটা সাধারণ মূল্য ও ছিল বটে, কিন্তু তা নিতান্ত উপরভাসা, তার কোনো একটা সামগ্রিক মূল্যসাফল্য ছিল না। এমনি ভাবটাই চলেছিল বহুকাল পর্যন্ত।

কেবল সম্প্রতিমাত্রই দেখা দিয়েছে সেই জরুরী প্রয়োজন যাতে এর সামগ্রিক সাফল্যই বিশেষ কাম্য, এবং তা কেবল এই আশ্রমের গণ্ডীটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না—কিন্তু যারা যারা স্থূলভাবে এখানকার অন্তর্ভুক্ত না হলেও আভ্যন্তরীণ চেতনার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হয়ে তাঁর প্রদর্শিত আদর্শকে নিজেদের জীবনে সার্থক করতে চেষ্টা করবে, তারাও এই সামগ্রিকতার আওতার মধ্যে এসে এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এখন অতিমানস চেতনা ও তার শক্তির অভিব্যক্তির পর থেকে এদের সকলেরই মধ্যে প্রকৃত একটা সবভাবের জীবনবিকাশের প্রয়োজন জেগেছে, যা কেবল পার্থিব ঘটনার উপর নির্ভর করবেনা কিন্তু যার মধ্যে নিহিত থাকবে একটা গভীরতর সত্য, কাজেই শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছিলেন অতিমানসগত বা বিজ্ঞানময় সম্প্রদায় তারই প্রথম সূচনা দেখা দিয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য বলে দিয়েছেন যে এখন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিজের নিজের মধ্যেও অতিমানস চেতনা অর্জিত হওয়া দরকার ; কিন্তু এই ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভের পূর্বে বিশেষভাবেই থাকা চাই "সামগ্রিক ও সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বের" প্রতিষ্ঠাকল্পে আভ্যন্তরীণ প্রয়াস। আমাদের এখানকার প্রচেষ্টা তারই উপলব্ধির দিকে নিয়োজিত হয়েছিল, কারণ প্রকৃত যোগসূত্রের দ্বারা একটা গভীরতর ঐক্য স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাতে একটা বিপত্তি ঘটল এই যে, সেই প্রচেষ্টা ব্যক্তির দিক থেকে হওয়াতে আগেকার অবস্থার ওলটপালট হয়ে গেল ; বাইরের দিক থেকে কিছু পরিবর্তন না দেখা দিলেও বিশেষ ক'রে তা ঘটল গভীরতর চেতনার দিকে—এতে যদিও একটা আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক যোগ স্থাপিত হলো, কিন্তু তাতে ব্যক্তিযোগ্যতার মান খানিকটা নিচে নেমে গেল ; কেবল যারা আভ্যন্তরীণ সিদ্ধির পথে অনেকটা উপরে উঠেছে তাদের কিছু হ্রাস পেল না, তাদের উন্নতি সমানেই বজায় রইল।

এতেই একটা ধারণা জন্মাচ্ছে যে উন্নতির মান সাধারণভাবে নিচে নেমে গেছে, কিন্তু তা ঠিক কথা নয়। সাধারণ উন্নতির মাত্রা আগের চেয়ে আরো উপরেই উঠেছে, বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতের দিকটাই নেমে গেছে। যাদের মধ্যে কিছু উপলব্ধির আলো এসেছিল কিংবা যারা অজানিতে ও অনভ্যস্তরূপে তার ভরভার বহন করছিল, সেটা ঘটেছিল এই গোষ্ঠিগত পারস্পরিক সংযোগসূত্রের ফলে। কিন্তু সেটা চলে গেলেও তা সাময়িক মাত্র, এর পরে বরং দেখা দেবে আরো বেশি সমৃদ্ধি, বেশি প্রসারতা ও বেশি উন্নতি। অবশ্য এরূপ যদি হতো যে প্রত্যেকেই এই সামগ্রিক আনুকূল্য ধারার সুযোগ নিয়ে সমস্ত বাধাকে কাটিয়ে রূপান্তর ও পুনর্গঠনের দিকে এগিয়ে যেতো, তাহলে সামগ্রিক ভাবেই সকলে অনেক অগ্রসর হয়ে উচ্চতর চেতনাতে পৌঁছতে পারতো।

যদিও আমি তখন এমন করে তোমাদের বুঝিয়ে বলিনি, কিন্তু এটাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য, যখন আমি বলতাম উত্তরোত্তর আরো বেশি প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার কথা। বস্তুত এমন কথাও একদিন বলতে চেয়েছি যে ব্যক্তিগত তোমাদের যা কিছু প্রচেষ্টা তা কেবল নিজেরই উন্নতি আনবে না, কিন্তু বিশেষ করে তার ফল সামগ্রিকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তখন স্পষ্ট করে কিছু বলিনি, কারণ কয়েক মাস ধরে আমি অপেক্ষা করছিলাম যাতে তোমাদের ব্যক্তিগত চেতনা নিজের থেকেই প্রস্তুত হয়ে উঠে সেখানে এই সামগ্রিক ব্যক্তিক-বোধের প্রয়োজনীয়তা আপনা হতেই জেগে ওঠে।...সে কথাটি এখন বুঝিয়ে বলা দরকার। ওরই জন্য আপাতত মনে হচ্ছে যে মান কিছু নেমে গেছে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। উন্নতির সর্পিল রকমের গতিধারাটাই এমনি, যাতে উপলব্ধির এক দিক ছেড়ে অন্য দিকে সরে যেতে হয়, যাতে আরো উচ্চ ও ব্যাপক উপলব্ধি আসতে পারে। আর সকলেই যদি সদিচ্ছার সঙ্গে চেতনভাবে এতে সহযোগিতা করে তাহলে তা আরো শীঘ্র ঘটতে পারবে।

আশ্রমের জীবনকে পুরোপুরি ভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এরূপ করার খুবই প্রয়োজন ছিল। যা ক্রমশ: এগিয়ে যেতে না পারবে তা নিশ্চয় পিছিয়ে যাবে কিংবা অবলুপ্ত হবে,

সুতরাং মানুষকে স্থায়ীভাবে টিঁকিয়ে রাখার জন্য চেতনার উন্নয়নের পথে একে নিত্য আগুয়ান করে প্রাণবন্ত করে রাখতেই হবে।

এখন যদিও আমরা সর্পিল পথ ধরে পূর্বেকার কয়েক বছরের সিদ্ধির ভূমি থেকে কিছু দূরে সরে এসেছি, কিন্তু অতঃপর আবার সেইদিকেই ঘুরে যাবো ওর চেয়ে উচ্চতর স্তরে। পূর্বোক্ত প্রশ্নের এই হলো আমার জবাব।

আমি যেরূপ বললাম তার উল্টো রকমের কার্যকলাপ আপাতত দেখা দিতে পারে, কিন্তু তাইই প্রায় হয়ে থাকে ; যখনই তুমি কোনো বিশেষ কাজকে সফল করে তুলতে চেষ্টা করো, তখনই তার বিরোধী যত প্রকার বাধা আছে তার তৎপরতা অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়, তখন তোমায় সেগুলোকে জয় করতে হয়। তখনকার পক্ষে প্রয়োজন কেবল অধ্যবসায় সহকারে লেগে থাকা। তার দ্বারাই পরে সে বাধা দূরীভূত হয়।

(২)

প্রশ্ন এখন যদি অতিমানস সব কিছুর অন্তরালে এসে গেছে, তবে তার সন্ধান নেওয়া এত কঠিন কেন ?

উত্তর অন্তরালে গুপ্ত রয়েছে বলেই কঠিন।

শ্রীঅরবিন্দ তো ভালো করে বুঝিয়েই দিয়েছেন যে অতিমানস সত্য যদি সকল ব্যাপারের পশ্চাতে না থাকত, তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোনোমতেই এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত হতে পারত না। এমন কোনো চেতনা কাজ করছে যার দীপ্ত ইচ্ছাতে সকল কিছুই এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে, তা ছাড়া অন্য কোনো অজ্ঞানতা বা নিশ্চেতনার ক্রিয়াতে এমন কখনই হতে পারে না।

কিন্তু তুমি যে সেই অতিমানস বা ঋতচেতনার সন্ধান পেতে অক্ষম হয়েছ, তার দ্বারা তোমার নিজেরই অজ্ঞানতা ও নিশ্চেতনা যে কতখানি সেই কথাই সপ্রমাণ হচ্ছে, যেহেতু যারাই তাদের অজ্ঞানতা ও নিশ্চেতনার গণ্ডিকে অতিক্রম করেছে তারাই তার উপস্থিতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তোমার পক্ষে তা যে কঠিন ঠেকছে সেজন্য দায়ী তোমার নিজের নিশ্চেতন অবস্থা। এ অবস্থা যে পার হয়ে যেতে পেরেছে তার কাছে এটা আদৌ কঠিন নয়, ওর উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট।

তুমি যদি একটু দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাগবত চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারো, তাহলে সহজেই লক্ষ্য করবে যে বিষয়গত সব-কিছুই কতখানি অবাস্তব। সাধারণ-চেতনাতে যাকে খুবই বাস্তব ও নির্দিষ্ট মাপের নিরেট নিঃসন্দেহ বস্তু বলে প্রতীয়মান হতো,

ঐরূপ চেতনাতে তাকে তখন মনে হবে ধোঁয়ার মতো অনিশ্চিত ও অবাস্তব বলে ; পূর্বোক্ত চেতনাতে তাকে বাস্তব বলে জানলেও এই চেতনাতে জানতে পারবে যে এই বাস্তব জগৎ খুবই অনিত্য ও নিতান্ত স্বয়ংবিরোধী। এ জগতের উৎপত্তি ও অস্তিত্বের মূল কারণ সম্বন্ধে কত বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেগুলিকে একত্রিত করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে রয়েছে বহু বিচিত্র রকমের পরস্পরবিরোধী চেতনার ক্রিয়া, যদিও সকলে একই জিনিস বোঝাতে চাইছে। এক দল বলছে যে এখানে যা কিছু ঘটেছে এবং ঘটছে সবকিছুই ভগবানের ইচ্ছাতে ; তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে তারা বলছে যে সমস্ত কিছুই ভগবৎ-ইচ্ছার পূর্ণ বিকাশ। আবার অন্য দলের লোকেরা বলছে যে সমস্তই হঠাৎ গড়ে উঠেছে খামখা, তার মধ্যে কোনো মতলবও নেই বা মানেও নেই, কেমন করে যে হয়ে পড়ল তাও কেউ জানে না, আর শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তাও কেউ জানে না, এর মধ্যে কোনো একটা যুক্তি বা যোগসূত্র নেই ; দৈবাৎ এমনি ঘটে গেছে, কেন তা কেউ বলতে পারে না।

এই সব বিভিন্ন মতামতকে যদি নিজের সামনে তুলে ধরো, আর এ সম্বন্ধে যত কিছু বলা হয়েছে ও লেখা হয়েছে তা যদি সমস্ত আগাগোড়া পড়ে দেখ, তাহলে বুঝবে যে এই একই জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা তাদের আপন আপন চেতনা অনুযায়ী, যে যেমন চেতনা নিয়ে সেটা দেখছে।

কিন্তু একটা কিছু সত্য রয়েছে নিশ্চয়, যা সকল মনেরই চিন্তার অতীত, যা সম্পূর্ণ অন্য। তাতেই একে তখন মনে হয় এমন অবাস্তব ও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

বস্তুতপক্ষে এই দুনিয়াটা হলো একটা ভাবগত বাস্তব, যার বাস্তবতা প্রত্যেকের আপন আপন চেতনার উপর নির্ভর করছে। এর নিজস্ব কোনো বিষয়গত বাস্তবতা নেই ; যেহেতু একজন বলবে যে এই সৃষ্টি কোনো পরমতম চেতনার দ্বারা উদ্ভূত ও পরিচালিত হচ্ছে, আবার অন্যজনে বলবে যে এমনিই দৈবাৎ যা হয়ে গেছে তাই চলছে, এর কোনো তাৎপর্য নেই—এমনি এই একই জিনিসের সম্বন্ধে দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত।

এদিক দিয়ে কি কথাটা তোমরা কখনো ভেবে দেখেছ ?

প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে আপন আপন একটা ধারণা রয়েছে যা তার কাছে সুস্পষ্ট ও যুক্তিগ্রাহ্য, আর সেই ধারণাটিকেই সে বলে জগৎ। সে সমগ্র জগৎকে দেখছে তারই কেন্দ্র হতে, আর তারই প্রতিক্রিয়া অনুসারে জগতের ব্যাপারটা বুঝছে এবং তদনুযায়ী কামনাও করছে। অথচ প্রত্যেকের চেতনার কাছেই তা স্বতন্ত্র জিনিস, অর্থাৎ যাকে আমরা জগৎ বলি তা সকলেরই উপলব্ধির বাইরে। এ তার চেয়ে এমনি এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস যাকে বুঝতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত চেতনাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ; একেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন নিম্নগোলার্ধ থেকে উচ্চগোলার্ধে উঠে যাওয়া। নিম্নগোলার্ধে যত বিভিন্ন মানুষ তত বিভিন্ন রকমের জগৎ, কিন্তু উচ্চগোলার্ধে আছে একটাই বস্তু যেখানে সর্ববিধ চেতনা একত্রে মিলিত হচ্ছে। তাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঋতচেতনা।

মানুষের চেতনা যত বেশি অগ্রসর হবে ততই তার মধ্যে একটা আপেক্ষিক বোধ আসবে, এবং তখন এই জ্ঞান আসতে থাকবে যে এমন কিছু সত্য বস্তু রয়েছে যা সাধারণ উপায়ে জানা যায় না, তাকে অন্য কোনো উপায়ে জানতে হবে।

(২)

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন "আমাদের এই পার্থিব অস্তিত্বের মূল তাৎপর্য ও ভিতরকার উদ্দেশ্য হলো আত্মিক ক্রমবিকাশ, জড়ের মধ্যে এমন নিত্য উন্মীলনমুখর ও স্বয়ংক্রিয় ক্রমস্ফুরণ যাতে ওর গঠনের ভিতর থেকে ওর অন্তর্বাসী আত্মাটি ক্রমশ অভিব্যক্ত হতে পারে।" (*The Life Divine*, Chapter XIII)

তাহলে কি তার গঠনের দিক থেকে মানুষ সকল প্রাণীর চেয়ে উন্নত, এই কথাই বলব ?

উত্তর সে কথা সহজেই বোঝা যায়।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, "গঠন আত্মার অভিব্যক্তির পক্ষে উপযোগী।" আর সেই অভিব্যক্তির বিশেষত্ব হলো চেতনা ও জ্ঞান আসা, এবং তার ফলে আধিপত্য অর্জন। সঙ্গতিযুক্ত সৌষ্ঠব ও বাহ্য আকৃতির দিক থেকে দেখলে বর্তমান কালের ক্ষয়িষ্ণু মানুষদের চেয়ে কোনো কোনো প্রাণীর চেহারা হয়তো আরো ভালো—যদিও আগেকার কোনো যুগে মানুষ হয়তো এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ও সুঠাম ছিল—কিন্তু আত্মিক বিকাশের পক্ষে এখনকার মানুষের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই এই মানুষ যে মাথা উঁচু করে সটান সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাতেই প্রমাণ হয় যে তার নজর উপরের দিকে, উপরের জিনিস সে দেখতে পায়। অন্যান্য প্রাণীদের মতো মাটির দিকে নাক গুঁজে না থেকে তোমরা সকল দিকেরই উপর আধিপত্য দাবি করতে পারো। যদি বলো যে পাখিরা উপরের আকাশে ওড়ে, কিন্তু সেই উড়বার ডানা দিয়ে তাদের বুদ্ধি বিকাশের কোনো উপায় নেই। আমাদের এই যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারার সামর্থ্য, এর মধ্যেই অনেক তাৎপর্য রয়েছে।

অবশ্য দেহবল এবং সাবলীল ক্ষিপ্রগতির দিক থেকে মানুষ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো প্রাণীই এর সমতুল্য নয়। তার দেহের সমগ্র গঠন তারই উপযোগী। মানুষের মধ্যে আরো অনেক রকমের সম্ভাবনা ছিল যেগুলিকে সে বর্জন করেছে, যেহেতু সে কেবল তার মানসিক জীবনেরই সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ ঘটাতে চেয়েছে, কিন্তু ইচ্ছা করলে সে আরো অন্যান্য অন্তর্নিহিত শক্তির উৎকর্ষ ঘটাতে পারে। শিক্ষার সাহায্যে সে নিজেকে অনেক বড়ো করতে পারে, নানারূপ দেহচর্চার দ্বারা সে তার দেহেরও

অনেক উন্নতিসাধন করতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো উৎকৃষ্ট জাতের প্রাণীদের বেলাতেও ওরূপ দৈহিক অনুশীলনের দ্বারা কোনো উন্নতিই ঘটানো যায় না—আমি স্কুলের বিদ্যাচর্চার কথাটা বাদ দিয়েই বলছি—তাদের স্থূল মাংসপেশীকেও কিছুমাত্র উন্নত করা যায় না। অন্যান্য সকল পশুরা তাদের জন্মগত নিয়ম অনুসারে যতটা পর্যন্ত বাড়বার তা আপনিই বেড়ে ওঠে; কিন্তু শিক্ষা বা অনুশীলনের দ্বারা তার চেয়ে বেশি কিছু হয় না, কিংবা যা হয় তা খুবই সামান্য, অল্প সীমার মধ্যে; মানুষ কিন্তু নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা নানা দিকে যথেষ্ট আত্মোন্নতি ঘটাতে পারে এবং আপন ত্রুটি ও দুর্বলতাকে সংশোধন করে নিতে পারে। উন্নত স্তরের সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই হলো প্রথম, যারা নিয়মিত চেষ্টার সাহায্যে এমন অনেক গুণকে আয়ত্ত করতে পারে যা আগে তাদের ছিল না। মানুষ ছাড়া আর কেউ তা পারেনা।

সত্যের জগতে আরো উচ্চমার্গের সত্তাদের সঙ্গে যদি এখনকার মানুষের তুলনা করি, যাদের সমান আমরা হতে চাইছি, তাহলে দেখব যে আমাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি ও অপূর্ণতা রয়ে গেছে। আবার যদি বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের ঠিক নিচেকার স্তরের প্রাণীদের মধ্যে চলে যাই, তাহলে দেখব যে আমাদের মধ্যে যতটা যোগ্যতা ও সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের মধ্যে তার কিছুই নেই।

তোমরা হয়তো ভাবছ যে মানুষের এতখানি প্রশংসা কখনই আমি করি না, কিন্তু তার কারণ এই যে মানুষ এমনিতেই নিজেরা নিজেদের খুব বেশি বড়ো বলে ভাবে।

প্রশ্ন : এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, উচ্চ চেতনাই কি নেমে এসে মানুষকে এমন গঠনে এনে দাঁড় করিয়েছে, অথবা তার এই গঠনের দ্বারাই সেই চেতনা নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে?

উত্তর : চেতনার অবতরণ ব্যতীত বিশ্বই সৃষ্ট হতে পারত না। তা ছাড়া কিসের দ্বারা কেমন করে এই বিশ্বসৃষ্টি শুরু হতে পারত?

প্রশ্ন আমি বলছি মানুষের কথা, মানুষপ্রাণীর নিজের দ্বারাই কি তার মন জিনিসটা গড়ে উঠেছে, অথবা মনই আপনা হতে তাদের মধ্যে এসে ঢুকেছে?

উত্তর অর্থাৎ তুমি জানতে চাও যে মানুষের বিবর্তনের মাঝামাঝি অবস্থাতেই তা ঘটে গেছে, অথবা উচ্চজাতীয় বানরের অবস্থাতে তাদের আত্মগুহার জোরেই মনের সেখানে আবির্ভাব ঘটেছে। তাই যদি হয় তো সেই আত্মগুহাই জন্মেছে তৎপূর্বে একটা চেতনার অবতরণের ফলে।

আসল কথা, ভিতরে জিনিসটা আগের থেকে না হাজির থাকলে কোনো কিছুরই অভিব্যক্তি ঘটতে পারে না। শূন্যের ভিতর থেকে তুমি কোনো জিনিসকেই টেনে আনতে

পারো না। ভিতরে একটু কিছু থাকলে তবেই তাকে তুমি টেনে বের করতে পারো, তার সম্যক বিকাশ ঘটিয়ে তাকে বাড়িয়ে তুলতে পারো. কিন্তু যেখানে কোনো কিছুই নেই সেখানে কোনো কিছুই দেখা দেবেনা। উন্নতি বা পরিণতি যা কিছুই বলো, সবকিছুই ঘটতে পারছে ভিতরে উপস্থিত কোনো আভ্যন্তরীণ প্রবেগের দ্বারা, যা চাইছে আপনাকে অভিব্যক্ত করতে। অর্থাৎ মোট কথা আগে থাকা চাই মূল বীজসূত্রটি, তবেই অতঃপর তার বিকাশ। সেই শাশ্বত সূত্র বা আদি সদ্‌বস্তু—যা কে-নামই তাকে দাও— সেটি না থাকলে বিশ্ব বলেও কিছু থাকত না, কারণ নেতিবাচকের ভিতর থেকে ইতিবাচক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে না।

মানুষের মনের উন্নতির পর্বের মধ্যে এমন একটা গোটা যুগ ছিল, যখন তারা প্রাণপণে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে স্বয়ং জড়ের কোনো ক্রিয়াতেই তার আত্মার সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু পরে সে যুক্তি খাটল না। (হাস্য) একটা যা কিছুই কেন তুমি করতে চাও, সে কাজ যত সামান্যই হোক, আগে তোমাকে তার সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতে হবে, তবেই অতঃপর সেটা বাস্তবে রূপায়িত হবে। যে জীবন কোনো চেতনাযুক্ত ইচ্ছা কর্তৃক সৃষ্ট নয়, তার মধ্যে কোনো অর্থ বা সুসঙ্গতি থাকে না। অর্থাৎ আমি এই কথা বলতে চাইছি যে এই প্রকৃতির মধ্যে যদি কোনো সচেতন শক্তি বা উদ্দেশ্যপূর্ণ কোনো চেতন ইচ্ছার কাজ না থাকতো, তাহলে এত বড়ো সৃষ্টির মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা বা সুনিয়ন্ত্রণ থাকতো না। একটুখানি মাত্র যদি লক্ষ্য করে দেখ, এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে যতটুকু পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র রয়েছে তার মধ্যেও যদি লক্ষ্য করো, তাহলে সেখানেই এর প্রমাণ মিলে যাবে।

যেমন দেখ, অগ্নির উপর মানুষের কেমন দখল, তার থেকেই এর নিদর্শন মেলে। যেখানেই মানুষ থাকে সেখানেই আগুন জ্বলে।

মানুষের মধ্যে এমন দুটি শক্তি আছে যা সকল প্রাণীর সকল শক্তির চেয়ে উঁচু দরের —তার লেখবার ও বলবার ক্ষমতা। যে সব জাতের প্রাণী উন্নত এবং যারা কথা বলার ভাষাকে কানে নিতে পারে, তারা মানুষের উচ্চারিত কথা শুনে মুগ্ধ হয়। কোনো বন্যজন্তুকে যদি তুমি ধৈর্যসহকারে সুস্থিরভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় কিছু বলো, সে তখনই আকৃষ্ট হয়ে শুনবে আর শুনে মুগ্ধ হবে—আমি মানুষের সঙ্গী গৃহপালিত পশুদের কথা বলছি না, তাদের কথাই বলছি যারা মানুষের সঙ্গ পায়নি। মানুষের কথা শোনবামাত্রই তারা বোঝে যে কোনো উচ্চতর শক্তি ঐভাবে নিজেকে ব্যক্ত করছে।

(৪)

"দিব্যজীবন" (*The Life Divine*) থেকে মানব ও বিবর্তন সম্পর্কে খানিকটা পড়া হবার পরে—

উত্তর শ্রীঅরবিন্দ এখানে একটা যুক্তির বিচার এনে দেখাচ্ছেন। সমস্যা নিয়ে আলোচনার এ একটা পন্থা বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওটাই তাঁর নিজের সুনির্দিষ্ট মত। গোটা বইটাই তিনি এই ধরনে লিখে গেছেন ; কত বিভিন্ন রকমের যুক্তি এনে ও বিভিন্ন মতামত ও ধারণার উল্লেখ করে শেষকালে তিনি সকল প্রশ্নের সমাধান নির্দেশ করেছেন। এই কারণে আমরা এখানে তাঁর লেখাগুলি পড়তে গিয়ে একটু অসুবিধায় পড়ি ; কারণ আমি যখন প্রতি সপ্তাহে তাঁর একটিমাত্র পরিচ্ছেদ পড়ে শেনে যাই, তখন তোমরা ভাবতে থাকো যে ওর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের নিজের অভিমতটাই পাওয়া গেল। আবার পরের সপ্তাহে যখন তাঁর পরের পরিচ্ছেদটি পড়ব তখন দেখবে যে তিনি অন্যরকম মতের কথা বলছেন, হয়তো তা পূর্বমতের সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন হয়তো সেটাকেই তোমরা তাঁর অভিমত বলে ধরে নেবে ; এমনি পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে তোমরা নানা বিরোধী উক্তির সাক্ষাৎ পাবে। এ কথা তোমাদের বলে রাখছি, কারণ অনেকের মুখেই এমন শুনতে পাই, যারা ভালো করে সবটুকু পড়ে না, অথচ নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে ভাবে, তারা বলে—"শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বইতে বারে বারে এক কথারই পুনরুক্তি করেছেন, তাঁর প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই দেখি সেই একই কথার পুনরুল্লেখ।" কিন্তু তার কারণ এই যে তিনি সকল প্রশ্ন নিয়ে সর্বদিক থেকেই বিচার করছেন, পরিশেষে তাঁর নিজের অভিমত জানাচ্ছেন। এই কারণেই তাঁকে এক কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে।

একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই এমন ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে হয় না। কোনো একটা প্রসঙ্গের সমাপ্তি পর্যন্ত না গিয়ে মাঝখানে থেমেই যেন ধরে নিও না, "শ্রীঅরবিন্দ তাহলে এই কথাই বলতে চাইছেন।" কিন্তু বাস্তবিক তিনি তা বলছেন না, তিনি বলছেন যে অনেকে তেমনি তেমনি মত পোষণ করে। তিনি দেখাতে চান যে একই সমস্যাকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে কত ভিন্ন রকমে দেখে, এবং সকলের মতামতের কথা বুঝিয়ে দিয়ে অবশেষে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেন, এবং তার বিশেষত্ব এই যে তার মধ্যে সকল মতেরই একটা সংশ্লেষণ ঘটে। সকল মতেরই যথাযোগ্য স্থান আছে তার মধ্যে। শ্রীঅরবিন্দ কোনো মতকেই বর্জন করেননি, সকল মতেরই একটা সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

সেই প্রশ্নটির কথা তোমাদের স্মরণ আছে কিনা জানি না ব্যক্তিগত বিবর্তন বলে কিছু আছে কি না ?

বিশ্বগত বিবর্তন তো চলেছেই, শ্রীঅরবিন্দ তা দেখিয়েছেন ; কিন্তু সেই বিশ্বগত বিবর্তনের অন্তর্বর্তী হয়ে ব্যক্তিগত বিবর্তনও ঘটছে কিনা এখানে এই পরিচ্ছেদে সেই তত্ত্ব নিয়েই যুক্তিপ্রয়োগ করে বলেছেন যে ওর মধ্যে ব্যক্তি-বিবর্তনের সিদ্ধান্ত আনবার কোনো প্রয়োজন নেই। ঐ প্রশ্নকে বাদ দিয়েও বিশ্বের একটা সামগ্রিক বিবর্তন যুক্তিসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আরো ধৈর্যের সঙ্গে যদি ওর পরবর্তী লেখাগুলি পড়ে যাই, তাহলে দেখব যে

সেখানে তিনি প্রমাণের দ্বারা দেখিয়েছেন যে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হলে ওর মধ্যে ব্যক্তি-বিবর্তনকে স্থান দেওয়া কেন দরকার। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই যে তোমরা এর সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছ কি না, এ কথা তোমাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করেছে কি না যে ব্যক্তি-বিবর্তনকে বাদ দিয়েও বিশ্ববিবর্তনের ক্রমস্ফুরণ সম্ভব কিংবা অসম্ভব।

প্রথমে তাই জানতে চাই যে বিশ্ববিবর্তন ও ব্যক্তি-বিবর্তনের পার্থক্যটা তোমরা বুঝেছ কি? আর দুই জিনিসই কেমন করে একত্রে অগ্রসর হতে পারে?

প্রকৃতি কোন উপায়ে তার বিশ্ববিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়?

প্রশ্ন একবার করে মৃত্যু, তার পরে আবার পুনর্জন্ম হয়।

উত্তর না, ওটা স্বতন্ত্র কথা। একবার মরে আবার জন্মানো, এ হলো ব্যক্তি-বিবর্তনের রীতি, যদি যবনিকা তার ব্যক্তিত্বের একটু কিছু অবশিষ্ট থাকে, নতুবা সম্পূর্ণটাই যদি লোপ পায় তাহলে পুনর্জন্ম নেবার জন্য কী রইল? পুনর্জন্ম মাত্রেরই মধ্যে আগেকার একটা কিছু ব্যক্তিত্বের জের থাকা চাই, নতুবা সে ব্যক্তি আর জন্মাতে পারে না। কিছুই আগের যদি অবশিষ্ট না থাকে তাহলে যা হয় তা ব্যক্তির ক্রমোন্নতি নয়, কেবল জড়বস্তুটা নিয়ে প্রকৃতির ক্রিয়া।

সহজ কথায় বলতে গেলে প্রকৃতি তার হাতে পেয়েছে গড়বার মতো খানিকটা জড় উপাদান তাই নিয়ে সে নানা মূর্তি গড়ছে, এক একটা আকৃতি দেখা দিয়ে আবার ভেঙে যাচ্ছে, তার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলাদা কিছুর মতো টিঁকে থাকছে না। কেন টিঁকছে না? কারণ আবার নতুন-কিছু গড়তে প্রকৃতির হাতে সেই উপাদানবস্তুটি চাই। তাই প্রকৃতি একবার একটা গড়ে আবার তাকে ভেঙে নতুন একটা গড়ে, আর তার এ কাজ চলতে থাকে অনির্দিষ্ট কাল ধরে, তাতে ব্যক্তি-ক্রমোন্নতি কিছুই হয় না কিন্তু তথাপি সামগ্রিক উন্নতি ঘটতে থাকে।

মনে করো, তুমি মডেল গড়তে কাদার বদলে খানিক প্লাস্টিক পেয়েছ। তাই দিয়ে প্রথমে একটা আকৃতি গড়লে, কিন্তু সেটা মনঃপূত না হওয়াতে তাকে ভেঙে আবার প্লাস্টিকের তাল পাকিয়ে নিয়ে অন্যরকম কিছু গড়তে লেগে গেলে। এর ফলে কিছু উন্নতির কাজ তো হলোই, তুমি বললে, "প্রথম জিনিসটা ঠিক হয়নি, এবার ওর চেয়ে ভালো জিনিস করব।" সেবারের জিনিসটা আগের চেয়ে একটু ভালো হলো বটে, কিন্তু তবু তেমন মনের মতো হলো না, তাই আবার তাকেও ভেঙে হয়তো প্লাস্টিকের তালের মধ্যে নতুন করে একটু জল মিশিয়ে তাকে আরো নরম করে নিয়ে ফের নতুন রকম কিছু গড়তে লাগলে, আর অনবরতই এমনি চলতে থাকল, উপাদান যদিও সেই একই কিন্তু তুমি বারে বারে

যা গড়ছ তা এক জিনিস নয়, প্রত্যেকটারই আলাদা আকৃতি নিয়ে আলাদা অস্তিত্ব, কিন্তু যখন তাকে ভেঙে ফেলছ তখন তার কিছুই থাকছে না।

তুমি একই রকমের মূর্তিকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর গঠন পরিণতি দিতে পারো, অথবা তার বদলে অন্যরকম জিনিসও গড়তে পারো ; যেমন, একটা কুকুর বা ঘোড়া গড়ে তা মনঃপূত না হওয়াতে তার চেয়ে ভালো সেই কুকুর বা ঘোড়াই গড়লে, অথবা সে জিনিস ছেড়ে অন্য কিছু গড়তে শুরু করলে। যদি একটা বাড়ি তৈরি করো যা তোমার পছন্দসই হলোনা, তাকে ভেঙে ফেলে তুমি আলাদা ছাঁদে আলাদা বাড়ি গড়লে, যার মধ্যে প্রথম বাড়ির স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছুই রইল না। এমনি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারাই বোঝানো যায় যে প্রকৃতি খানিকটা নিশ্চেতন নিরাকার উপাদানপিণ্ড নিয়ে কাজ শুরু করে একটার পর একটা জিনিস গড়তে থাকে ; কেবল তোমার মতো একটিমাত্র জিনিসের পরিবর্তে সে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ জিনিস গড়ে। কেবল মাত্রার তফাৎ, কারণ প্রকৃতির উপাদানের মাত্রা বিপুল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার উপাদানের মধ্যে এমন প্রাণময় ও চেতনাময় জিনিস আছে যা এক মূর্তি ভেঙে অন্য মূর্তি গড়লেও তার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করবে। প্রকৃতিও তোমারই মতো প্লাস্টিক বস্তু নিয়ে কেবল ভাঙছে আর গড়ছে, তার মধ্যে আগের তৈরি জিনিসের স্মৃতিটুকু ছাড়া কিছুই থাকছে না।

কিন্তু যেখানে তুমি ব্যক্তিবিবর্তনের কথাটা মানছ, সেখানে তাহলে একটা স্থায়ী রকমের কোনো কিছু এক গঠন থেকে অন্য গঠনে গিয়ে প্রবেশ করছে, আর প্রত্যেকবার নব নব গঠনের মধ্যে তারও কিছু নব নব উন্নতি ঘটছে, সে জিনিস ক্রমশ নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে গিয়ে উঠছে, আর শেষ পর্যন্ত একটা পূর্ণতাপ্রাপ্ত চেতন সত্তায় পরিণত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তাহলে বিশ্ব বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বিবর্তনও চলে করে চলতে থাকল। বিবর্তনের কাজ তাহলে একমুখী না হয়ে দুইমুখী ধারাতে চলতে থাকবে, এবং সেই ভাবেই প্রকৃতির বিবর্তনের কাজ ক্রমশ পরিণতিপ্রাপ্ত হতে থাকবে, কিংবা তার বিবর্তনের রীতিকে ব্যক্তিবিবর্তনের কাজেও নিয়োগ করবে। এবার বুঝতে পেরেছ ?

যেমন মনে করো, তুমি প্লাস্টিকের তাল নিয়ে যা কিছুই গড়ছ তার কেন্দ্রস্থলে যদি একটা মূল্যবান মণি লুকিয়ে রাখো, আর সেটা ভেঙে বারে বারে আরো যেসব আকৃতি গড়ো তার প্রত্যেকটির মধ্যেই সেই মণিটিকে স্থাপন করো, তাহলে যেমন হয়, কিন্তু তথাপি এ তুলনাটি পুরোপুরি ঠিক হচ্ছেনা, কারণ যতবারই তুমি একটা থেকে অন্য কিছুটা গড়ছ ততবারই ঐ মণির মূল্যটাও উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকা চাই, ক্রমে ক্রমে সেটা আরো বেশি নিখুঁত জিনিসে পরিণত হতে থাকা চাই।

তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি ব্যক্তিবিবর্তনের সত্যটিকে মেনে নিচ্ছ কিনা ? এ সম্বন্ধে তোমার মধ্যে কোনো অনুভূতি জাগল কি, যে কেমন ক'রে তা হয় ? প্রকৃতির সামগ্রিক

বিবর্তনের কথা ছাড়াও ব্যক্তিবিবর্তনের কথাটা কেমন করে বোঝা যাবে ? (একটি শ্রোতার প্রতি) এ প্রশ্নের জবাব তুমি দিতে পারো ?

প্রশ্ন : নিজের মধ্যে কোনো একটা শাশ্বত বস্তু রয়েছে, এ কথা যতক্ষণ না জানছি ততক্ষণ ঐ কথাই বা কেমন করে জানবো ?

উত্তর : ভালো জবাব দিয়েছ, ঠিক কথাই বলেছ। তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে, "তোমার সত্তার মধ্যে যে শাশ্বত বস্তুটি রয়েছে তার সন্ধান তুমি জানো কি ?"

প্রশ্ন : থাকলেও সে জিনিস এত গোপন হয়ে থাকে কেন ?

উত্তর : হয়তো তা নিয়ে কেউ গ্রাহ্যই করে না, এই হলো কারণ। তোমরা যদি তোমাদের ভিতরকার দরজাগুলো খুলে রাখো তাহলে হয়তো তার সন্ধান মিলতে পারে। যে ব্যক্তি সেখানে রয়েছে সে এমন কোনো ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যাই বলো, যে নিজেকে জাহির করতে চায় না, বাইরে বেরিয়ে নিজেকে দেখাতে চায় না। কিন্তু সে চায় যে আমরাই তাকে খুঁজে বের করি। অন্দরমহলে কোথায় কোন ঘরে সে নিঃশব্দে বসে আছে, সকল দরজাগুলি খুলে খুলে খোঁজ নিতে থাকলে তবে তার দেখা মিলবে।

কিন্তু আমি তো তাকে গোপন দেখছি না, আমি দেখছি যে সর্বক্ষণ সমস্তই সে জাহির রয়েছে, প্রত্যেকটি বস্তুতে, প্রতি মিনিটে।

তোমরা কি সেই ভাবে খুঁজেছ তাকে ? আচ্ছা, এখন একবার খুঁজে দেখা যাক।

(ধ্যান)

*

"দিব্যজীবন" (*The Life Divine*) থেকে মানব ও বিবর্তন সম্পর্কে পরিচ্ছেদটির অন্য অংশ পাঠের পর

উত্তর : এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে প্রাণীদের মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রজাতি তাদের আপন আপন গঠনানুযায়ী নির্দিষ্ট রকমের বিশেষত্বগুলিকে নিয়েই সন্তুষ্ট, তারা নিজেদের কোনো রূপান্তর ঘটাতে বা এক প্রজাতি হতে অন্য প্রজাতিতে বদলে যেতে চায়না। যে কুকুর সে কুকুর হয়েই খুশি, যে ঘোড়া সে ঘোড়া হয়েই খুশি, সে হাতি হতে কখনই চাইবে না। এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্ন তুলেছেন, "মানুষ কি শুধু মানুষ হয়েই খুশি থাকবে, কিংবা চেতনা জাগার ফলে সে ওর চেয়ে আরো কিছু হতে অর্থাৎ মানব থেকে অতিমানব হতে চাইবে ?" এ পরিচ্ছেদটির এই মোট বক্তব্য।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের লেখা পড়তে অভ্যস্ত থাকলে তখন তোমার অন্তরের একটা অংশ কেবল এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবে না। বাইরের খোলসটুকু নিয়েই তো কথা নয়, তুমি আপন অন্তরে এমন কিছুকে বোধ করতে থাকবে যা খোলসের প্রশ্ন পার হয়ে যেতে চায়। আর শ্রীঅরবিন্দ এই ধরনের কথা বলে সেই বোধটাই আমাদের মনে এনে দিতে চান।

আমি এমন অনেক গৃহপালিত পশু দেখেছি যারা বাস্তবিকই নিজেদের অবস্থা হতে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠার প্রয়োজন বোধ করে। আমি সেইরূপ অনেক কুকুর, বেড়াল ও ঘোড়া দেখেছি, এমনকি সেরূপ পাখিও দেখেছি। যাহা আকৃতিতে তারা যেমন আছে তাই আছে, কিন্তু তারই মধ্যে এমন কিছু জীবন্ত বস্তু রয়েছে যা স্পষ্টভাবেই অন্যরূপ হবার আকিঞ্চন করছে। আর যে মানুষ তার পশু-মানবের অবস্থা হতে নর-মানবের অবস্থাতে গিয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে প্রকৃতই এই অদম্য আস্পৃহা জেগেছে যাতে তারা চাইছে যে এই বিকৃত ও অপূর্ণ ও অসংশোধনী অর্ধ-পশুত্বের জীবনরীতিটা একেবারে বদলে যাক। তাই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই যে, সেই আস্পৃহা কি এতই প্রবল যার জোরে এই মানব প্রজাতি আপনা হতেই রূপান্তরিত হতে পারবে, অথবা সত্তার ভিতরকার এই অবিনশ্বর চেতনা দেহত্যাগের পরে মুক্ত হয়ে এমন কোনো উচ্চতর নব রূপান্তর গ্রহণ করবে যার অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি।

সমস্যার কথা এই সেই উচ্চতর রূপের সৃষ্টি হবে কেমন করে? সে কি এমন কোনো উপায়ে যার দ্বারা এই বর্তমান দেহই অল্পে অল্পে পরিবর্তন নিয়ে নবদেহ ধারণ করবে, অথবা আমাদের অজানা কোনো উপায়ে সেই নবদেহ জগতে আবির্ভূত হবে?

অর্থাৎ যেমন চলছে সেই ধারাতেই কাজ হতে থাকবে, অথবা হঠাৎ কোনো নতুন সৃষ্টি দেখা দেবে? আমরা যেমন রয়েছি তার থেকেই আভ্যন্তরীণ আস্পৃহার প্রভাবে ক্রমিক উন্নয়ন ঘটাতে থাকবে, কিংবা হঠাৎ একটা প্রলয় এসে এই বর্তমান মানব রূপ লোপ পেয়ে এমন নতুন রূপ জন্মাবে যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই? এটা কি আশা করতে পারি যে পার্থিব অভিব্যক্তির আধার এই দেহ ক্রমশ রূপান্তর পেয়ে এমন জিনিসে পরিণত হবে যার মধ্যে উচ্চতর জীবন অভিব্যক্ত হতে পারে, কিংবা এরূপ আধারকে ছেড়ে এমন আধারে আমরা প্রবেশ করব যার নমুনা পৃথিবীতে এখনও দেখা যায় নি?

এ প্রশ্ন নিয়ে তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখতে পারো, তাতে হয়তো কিছু নতুন আলোর সন্ধান মিলতে পারে।

(এই কথাগুলি ছাপতে যাবার সময় মা তার সঙ্গে আরো কিছু যোগ করলেন) :

আর দুই রকমই বা না হবে কেন?

দুই রকমই একত্রে হতে পারে, কোনটিকেই বাদ না দিয়ে।

প্রশ্ন হাঁ, কিন্তু তাহলে এক জিনিস অন্য জিনিসে সম্পূর্ণই রূপান্তরিত হয়ে যাবে?

উত্তর তা হবে প্রথমে কতকটা একঘেয়ে ভাবে, তারপরে তেমন অবস্থা ঘটলে তখন পুরোপুরি ভাবেই হবে। দুইরকম পরিবর্তনেরই একটা নিজস্ব সৌন্দর্য ও তাৎপর্য আছে, কাজেই দুই জিনিসই থাকবে।

মন যেমন চায় একটা নির্দিষ্ট সীমাংসাকে নির্দিষ্টরূপে বাছাই করে নিতে, এ কাজ তেমনভাবে হয় না। বাস্তবে যা ঘটবে তার তুলনায় এমন কি যতদূর পর্যন্তই আমরা মনের ধারণা করি না কেন, তাও খুবই সামান্য। কিন্তু তীব্র আস্পৃহা ও আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা যার অন্তরে আছে তার উপলব্ধির মধ্যে তা আসবে।

সর্বত্র ও সকল স্তরেও সর্বপ্রকার সম্ভাবনা নিরন্তর থাকবে শাশ্বতভাবে। আর তার প্রত্যেকটির জন্যই বিশেষ মুহূর্ত থাকবে নিকট অথবা দূর, কিন্তু সফল হবে প্রত্যেকটাই।

পশু ও মানুষের মাঝখানে যেমন অনেক রকমের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তা আর রইল না, তেমনি এখানেও মানব ও অতিমানবের মাঝে সবরকম সম্ভাবনাই থাকবে প্রত্যেকটারই জন্য চেষ্টা হবে তার নিজ নিজ ধরনে। সব কিছুতে মিলে শেষে তা একটা ভবিষ্যৎ সাফল্যের সহায়ক হবে।

একটা প্রশ্ন রয়েছে এই যে মানুষ আমার আগের যুগে যেমন অনেক প্রজাতি অবলুপ্ত হয়ে গেছে, মানুষও কি তেমনি অবলুপ্ত হয়ে অন্য প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে? অনেক রকমের প্রজাতি এই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে বটে, কিন্তু মানুষের মতো এমন কোনো দীর্ঘকালের টিঁকে থাকা প্রজাতি লোপ পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না, বিশেষত এমন কোনো প্রজাতি যার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল ক্রমবিকাশের বীজ ও উন্নয়নের সম্ভাবনা। এই কথাই বরং মনে হয় যে বিবর্তনের চক্রপথ ক্রমশ আরো উচ্চতর প্রজাতির দিকে অগ্রসর হবে, আর নিচেকার প্রজাতিগুলির কাছাকাছি যারা রয়েছে তারা লোপ পাবে, আগেই যেমন হয়েছিল।

কেবল এই কথাই আমরা ভুলে যাই যে সকল কিছুই সম্ভব, শুধু তাই নয়—এমন কি খুবই পরস্পরবিরোধী জিনিসগুলিও সম্ভব—কিন্তু প্রত্যেক সম্ভাবনারই একটা বিশেষ মুহূর্ত আছে। ৬-৩-১৯৬৩

(৬)

প্রশ্ন : মা, এখানে প্রথম মানুষটি কি ভাবে দেখা দিয়েছিল?

উত্তর : শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন ("দিব্যজীবনের"—*The Life Divine*—মানব ও বিবর্তন সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদে) যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিক থেকে যদি দেখ, তাহলে দেখবে যে তার বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে অনেকটা অস্থায়ীভাবে, তার থেকে মনে হয় যে

সেগুলি খুবই প্রমাণসহ নয়, বরং অনেকটা কল্পনার সাহায্যেই তা একে একে উদ্ভূত। বাস্তবের দৃষ্টিতেই তোমরা সেগুলিকে মেনে নাও, কারণ সেই দিক থেকেই তাকে প্রমাণিত বলে ধরা যেতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘটনার দিক থেকে যতখানি পাওয়া যায় তাতে তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন। যদি গুহ্যবিদ্যার দিক থেকে দেখ, তবে অনেক রকম কিংবদন্তি মিলবে যার ভিত্তি কেবল স্মৃতিপরম্পরার উপরে, কিন্তু তার কোনো বাস্তব প্রমাণ না থাকায় সেগুলি বৈজ্ঞানিক মত ও বীমাংসার চেয়ে আরো বেশি বিভ্রান্তিজনক। আভ্যন্তরীণ যুক্তিকে বোঝা এবং মেনে নেওয়া সহজ, কিন্তু বিজ্ঞান কিংবা গুহ্যবাদ কেউই প্রমাণ দিয়ে বলতে পারেনা যে প্রথমে কি একটিমাত্র মানুষ দেখা দিয়েছিল, কিংবা অনেকগুলি প্রথম মানব একসঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিল, কিংবা এমন কিছুর আবির্ভাব হয়েছিল যা মানুষের মতো হলেও ঠিক পুরোপুরি মানুষ নয়। এ সবগুই অনুমান মাত্র।

মুখে মুখে প্রচারিত যে কিংবদন্তি শোনা যায় এবং যা বিজ্ঞানের দিক থেকে সন্দেহ-জনক, তা এই যে প্রথম মানব বা প্রথম মানবদম্পতি বা প্রথম কয়েকটি মানব বাস্তবরূপে দেখা দিয়েছিল কোনো গুহ্য প্রক্রিয়ার ফলে, যেমন কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভবিষ্যৎ অতিমানস জগতের সম্পর্কে, অর্থাৎ উচ্চতর স্তরের সত্তারা তাদের উচ্চতর একাগ্রতার জোরে বাস্তবীকরণের দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনমত জড়দেহের একটা বিশেষ গঠন গড়ে করাবে। কিন্তু এমন হতে পারে না যে নিম্নস্তরের প্রজাতিরা নিজেরাই তাদের দেহের এরূপ ক্রমোন্নতি ঘটালে, যাতে অতঃপর প্রথম মানুষটি দেখা দিল।

অধ্যাত্মবাদ ও গুহ্যবাদের মতে রূপায়ণের আগে আসে চেতনা, সেই চেতনাই একাগ্র ও কেন্দ্রীভূত হয়ে রূপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু বাস্তববাদ বলবে যে আগে চাই রূপের আধার, পরে তারই ভিতর থেকে চেতনা প্রকাশ পাবে। অদৃশ্য জগৎ ও শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে যাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তারা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলে যে চেতনাই আপনাকে প্রকাশের জন্য রূপগ্রহণ করে। পৃথিবীতে যে বর্তমান অবস্থা রয়েছে তাকেই কোনো উচ্চতর চেতনা আপন ক্রিয়ার দ্বারা এমন ক্রমিকভাবে রূপান্তরিত করে আনছে যাতে তার বিকাশ এখনই অথবা কয়েক পুরুষ পরে দেখা দিতে পারে। যাদের কিছু অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্বোধ আছে তারা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত, এ ছাড়া অন্যরকম কিছু হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যারা নিচের দিক থেকে দেখছে তারা একথা মানবে না। অজ্ঞানতা কখনো তার জ্ঞানবুদ্ধিকে প্রজ্ঞার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা, অথচ সেই চেষ্টাই সে এখন করতে চাইছে। জানার চেয়ে সন্দেহ করা সহজ, তাই মানুষের মন এখন সব কিছুকে সন্দেহ করতে অভ্যস্ত হয়েছে, সে প্রথমে সন্দেহটাই করে বসে আর সেইজন্য কিছুই তার জানা হয় না।

আগে পরিকল্পনা, তবে তার অভিব্যক্তি, এতে কোনো ভুল নেই। অতীতকালের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ হয়েছিল এবং কেমন ধরনের মহামানব এখানে দেখা দিয়েছিলেন সে কথা যাদের স্মরণ আছে, যারা দেখেছে যে তাঁরা ছিলেন বর্তমান মানুষের

চেয়ে কতখানি উচ্চস্তরের, তারা নিশ্চয় বুঝবে যে চরম উন্নতির দিন যখন আসবে তখন কেমন মানুষ জন্মাবে।

জীবনের ক্ষেত্রে অনুকরণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। পশুদের মধ্যে এটা স্পষ্টভাবেই আছে, এমন কি উদ্ভিদের মধ্যেও এর সূচনা আছে। এর থেকেও অনুমান করে নিতে পারো যে আগেকার পশুদের জীবনে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা ছিল এমন বিরল আদর্শকে ধরতে যা পরে গুহ্য উপায়ে পৃথিবীতে দেখা দেবে, আর উত্তরোত্তর তেমন চেষ্টা হতে থাকায় পরে মানবজাতির আবির্ভাবের পক্ষে তা সহায়ক হলো।

(৭)

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দের "দিব্য জীবন" (*The Life Divine*) গ্রন্থের মানব ও বিবর্তন সম্পর্কিত অধ্যায়ে বাস্তববাদের তরফের যুক্তি প্রসঙ্গে—

উত্তর এ যুক্তিগুলি যদি অকাট্য হতো, উচ্চতর উপলব্ধি বলে যদি কোনো কিছুই না থাকত, তাহলে অবশ্য কিছুই করবার ছিল না। কিন্তু সুখের বিষয় যে তা নয়।

শ্রীঅরবিন্দ বরবারই এ কথা জানিয়েছেন যে তিনি যা কিছু বলেছেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তার সকলগুলিরই প্রমাণ তোমরা পাবে, যখন উপরের কাজ সম্পূর্ণ হবে; যারা অবিশ্বাস করছে তাদের ভুলটা তখন স্বীকার করতেই হবে, তবে তখন হয়তো তারা থাকবে না।

অতএব তোমাদের একমাত্র কাজ হলো নিজদের বিশ্বাসকে ও নিশ্চয়তাকে আঁকড়ে থেকে নিজেদের পথটি ধরে চলা, সকল বাধা বিপত্তি ও প্রতিবাদকে গ্রাহ্যমাত্র না করে।

এমন অনেকে আছে যাদের অন্তরের অস্বস্তিকে দূর করতে অন্যের কাছ থেকে আশ্বাস ও নির্ভয়তা ও নিশ্চয়তা পাবার দরকার হয়। এরাই প্রায় অসুখী হয়ে থাকে, কারণ এরা যার অবলম্বন চায় তার নিজেরই বিশ্বাসের অভাব, সুতরাং এরা বিচলিত অবস্থায় কষ্টই ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয়তাকে নিজেরই মধ্যে খুঁজে নিতে হবে, আর যা কিছুই ঘটুক না কেন তাকে মেনে নিয়ে আপন পথে চলতে হবে তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। যে সব চেয়ে বেশি সহ্য করবে তারই হবে জিত।

এই সহনশীলতাকে বজায় রাখা, সহস্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, এটাই দরকার। আর তোমার অবলম্বন থাকবে একটি মাত্র, যা অটল ও অনড়, সে ঐ পরাৎপর পরম সত্যের অবলম্বন।

অন্য কোনো অবলম্বন খোঁজা বৃথা। ঐ একমাত্র অবলম্বনই সর্বদা সর্বাপেক্ষা সার্থক।*

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—সত্যপতি ভট্টাচার্য

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে)

৮৪

অতিপ্রাকৃত বলে যাকি তাকেই যার প্রকৃতি আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নেই, যার সম্বন্ধে আমরা এখনও কিছু জানি না, কিংবা যার প্রণালী এখনও আমাদের অধিকারভুক্ত হয়নি। অলৌকিক কিছুর দিকে যে একটা সাধারণ আগ্রহ রয়েছে, তার থেকেই প্রমাণ হয় যে মানুষের আরোহণ-পর্ব এখনও সমাপ্ত হয়নি।

৮৫

অতিপ্রাকৃতকে অবিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত ও তা বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করাও এক ধরনের প্রজ্ঞা।

৮৬

বড়ো বড়ো সাধুসন্তেরা অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়েছেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা বড়ো তাঁরা তার নিন্দা করেছেন কিন্তু সবচেয়ে যাঁরা বড়ো তাঁরা অলৌকিক কাজও করেছেন আবার তার নিন্দাও করেছেন।

৮৭

আপন চোখ দুটো খুলে দেখ জগৎ কী আর ভগবান কী ; তুচ্ছ যত স্বপ্নের কল্পনাকে মন থেকে দূর করে দাও।

আচ্ছা মা, আপনি কিংবা শ্রীঅরবিন্দ, আপনারা কেন মানব-চেতনার এই সব বাহ্য বিরোধিতাকে জয় করতে কোনো অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করলেন না ? বাহ্য ব্যাপারকে আপনারা এড়িয়ে যান কেন, তার সম্বন্ধে এত নিশ্চেষ্ট কেন ?

উত্তর শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে এইটুকু জানি, তিনি নিজে আমাকে যে কথা অনেক বারই বলেছেন। লোকে তাকেই বলে অলৌকিক শক্তি বা মিরাকল্ যার দ্বারা বস্তুময় ও প্রাণময় জগতে হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তেমন হস্তক্ষেপ মিশ্রিত প্রকৃতির ব্যাপারই হয়ে থাকে, আর তা অনেকটা অজ্ঞানতা ও স্বেচ্ছাচারিতার ক্রিয়া।

কিন্তু মনের দিক দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ কত যে অলৌকিক কাজ করেছেন তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। সহজ সরল বিশুদ্ধ প্রকৃতির দৃষ্টি থাকলেই তা দেখতে পাওয়া যায়, আর অনেকেই তা দেখেছে। কিন্তু আমি জানি, বস্তুর বা প্রাণের জগতে তিনি সে কাজ করতে চাইতেন না, ঐরূপ মিশ্রণ এসে পড়বে বলে।

আর নিজের অভিজ্ঞতা হতে জানি, পৃথিবীর এখনকার অবস্থাতে সরাসরি কোনো বস্তু বা প্রাণ সম্বন্ধে অলৌকিক মিরাকল্ ঘটাতে গেলেই অসত্যের তরফ থেকে অনেকখানি সাহায্য নিতে হবে, অথচ তা নেওয়া ঠিক নয়—কারণ তার ফল দাঁড়াবে নিখাঁ মিরাকল্। তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমি এক সময়ে বহু প্রকারের মিরাকল্ ঘটানোর কাজ দেখেছি, তাতে এমন সব জিনিসকে অস্তিত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছে যাকে আমি সমর্থন দিতে পারি না।

লোকে যাকে অলৌকিক ব্যাপার বলে তা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে প্রাণময় জগতের সত্তাদের দ্বারা, কিংবা যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের দ্বারা, এবং তা সবই মিশ্রিত জিনিস—অর্থাৎ তাতে এমন সব জিনিসকে সত্য ও বাস্তব করে তোলা হয় যা প্রকৃত সত্য নয়। ঐরূপ ভিত্তি নিয়েই তার ক্রিয়া। তাকে সমর্থন করা যায় না।

প্রশ্ন: আপনি যে বললেন শ্রীঅরবিন্দ মনের তরফে অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন, এ-কথার অর্থ কি তা বুঝলাম না।

উত্তর অর্থাৎ যখন তিনি মনশ্চেতনার উপর প্রয়োগ করেছেন অতিমানস শক্তি। যে মনশ্চেতনা সকল কিছু বাস্তব তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার উপর অতিমানস শক্তি বা সংগঠন বা তেজের প্রভাব গিয়ে পড়লে তখন তার সকল ধারাই পালটে যায়। তার যা ফল হয় তা আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক, কারণ মনের যুক্তির পথে তার কাজ হয় না।

তিনি নিজেই বলেছেন যে অতিমানস শক্তিকে আয়ত্ত করে যখন তিনি স্বইচ্ছায় তাকে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতেন, তখন তার অনিবার্য সাফল্য পুরোপুরি ভাবেই মিলত। একে মিরাকল্ বলা যেতে পারে।

যেমন ধরো কেউ হয়তো খুব অসুস্থ হয়েছে, যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে; অতিমানস শক্তি শ্রীঅরবিন্দের আয়ত্তাধীন থাকলে (কখনো কখনো এই শক্তিকে দখলে এনে তিনি আপন ইচ্ছামত তা প্রয়োগ করতে পারতেন) তখন তিনি তা কাজে লাগাতেন, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছাকে কোনো দৈহিক বা মানসিক বা প্রাণগত ব্যাধির উপরে প্রয়োগ করতেন, উচ্চতর

স্তরের ও উচ্চতর সঙ্গতির অতিমানস শক্তিকে সেখানে নিযুক্ত করতেন, আর তখনই তার কাজ হতো। প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার উপরে একটা উচ্চতর নিয়ম ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হতো। অর্থাৎ রোগটি আরোগ্য হয়ে যেতো, আর সে আরোগ্য সাধারণ ঐহিক বা মানসিক উপায়ের আরোগ্যের চেয়ে আরো সম্পূর্ণ হতো।

এমন দৃষ্টান্ত অনেক ঘটেছে। কিন্তু লোকে তাদের সাধারণ চেতনাতে এমন অন্ধ ও অবিশ্বাসী যে তারও একটা ব্যাখ্যা টেনে আনতো, কারণ সব-কিছুরই যাহোক-একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কেমন যাদের মধ্যে আস্থা ও আশ্বাস আছে, এবং কিছু বিশুদ্ধতা ও জ্ঞানলাভের আন্তরিক চেষ্টা থাকে, তারাই এগুলোকে লক্ষ্য করতে পারে।

তিনি এমন কথাও বলতেন যে ঐ শক্তি উপস্থিত থাকলে তাঁকে কোনো প্রয়াসই করতে হতো না, শুধু সেই উচ্চ অতিমানস শক্তিকে পাঠিয়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ কার্যসিদ্ধি হতো।

প্রশ্ন অলৌকিক ক্রিয়া বা মিরাকুল্ জিনিসটা কী? শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন যে অলৌকিক বলে কিছু নেই, অথচ "সাবিত্রী"তে রয়েছে—

"এখানে সব কিছুই মিরাকুল্ ও তার দ্বারা সব কিছুই ঘটনাতে পারে।" (Savitri I. V. 97)

উত্তর সেটা নির্ভর করছে তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, এদিক থেকেই দেখ বা ওদিক থেকেই দেখ।

তাকেই তোমরা বলো মিরাকুল্ যার অর্থটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিংবা যার কোনো মনোগত অর্থ মিলছে না। সে হিসাবে বলা যায় যে তেমন ব্যাপার তো কত অসংখ্য রকমই ঘটছে, যার কোনো হেতু বা পদ্ধতি তোমরা খুঁজে পাও না।

প্রশ্ন তাহলে আসল মিরাকুল্ ঠিক কেমনতরো হবে?

উত্তর কেমন করে তা বলি, কারণ মিরাকুল্ জিনিসটাই বা কী? আসল মিরাকুল্ ও কেবল মনেরই ধারণার কথা; অমুক অবস্থাতে অমুক জিনিসটা হতে পারে কিংবা পারে না, তা কেবল মনই বোঝে তার আপন যুক্তি অনুসারে। কিন্তু সে তো শুধু তারই সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতরকার কথা। ভগবানের দিক থেকে যদি দেখ, তাহলে মিরাকুল্ কেমন করে হয়? সব কিছুই যখন তিনি, সব কিছু স্বভাবত তিনিই ঘটাচ্ছেন।

এর থেকে এসে পড়ছে সেই বৃহৎ সমস্যার কথা, সেই শাশ্বতের ক্রিয়াপদ্ধতি, যার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়ে বলেছেন তাঁর "সাবিত্রী"তে। এটা অবশ্য সহজেই বোঝা যায় যে যা-কিছু বস্তুরূপ গ্রহণ করবে তার মধ্যে আগে সে বিষয়ে একটা ইচ্ছা জাগা চাই। আর

যুক্তিতে এ কথা প্রথমেই মানতে হবে যে বিবর্তনের মূলসূত্র হলো এই, বস্তুরূপ নেওয়া চলবে ক্রমিক বিকাশের ধারাতে, সমগ্রতা নিয়ে তা একভাবে চিরন্তন হয়ে থাকবে না। (নীরব থেকে) বলা বড় কঠিন, কারণ আমাদের চিরাভ্যস্ত ধারণাই এই যে একটা নির্দিষ্ট রকমের ধারা আবহমান কাল চলে আসছে, আর একটা নির্দিষ্ট ধারা নিয়েই কাজটা আরম্ভ হয়ে থাকবে। আমাদের যেমন বলার রীতি সেইভাবেই বলি যে কোনো এক বিশেষ "মুহূর্তে" ভগবান তাঁর এই বস্তুরূপণের কাজ শুরু করেছিলেন (হাস্য)। এইভাবে বললে ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। তিনি একটু একটু করে ক্রমশ নিজেকে বস্তুরূপে বিকাশ করছেন, এবং তারই অর্থ ক্রমিক বিবর্তন। কিন্তু এ হলো একটা কথার কথা। প্রকৃতপক্ষে এর আরম্ভও নেই আর শেষও নেই, অথচ কেবলই ক্রমিকভাবে অগ্রগামী। এই যে ধারাবাহিক নিত্য অগ্রগামী বিবর্তন, এর অর্থ করে নিতে হবে কেবল অভিব্যক্তির দিক থেকে। কেবল যদি পৃথিবীটির সম্বন্ধে বলো তাহলে তোমাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা ঠিকই হবে, কারণ পৃথিবীর একটা আরম্ভ ছিল, আয়ার দিক দিয়ে নয় কিন্তু বাস্তবের দিক দিয়ে। তেমনি হয়তো বস্তুবিশ্বেরও একটা আরম্ভ ছিল।

(নীরব থেকে)

এদিক দিয়ে যদি চিন্তা করো তাহলে বুঝবে যে এক বিশ্বের মাঝে কোনো অভাবনীয় নিয়াকৃত ঘটতে হলে তাকে অন্য কোনো বিশ্ব থেকে হঠাৎ এসে হাজির হতে হয়। আর পৃথিবীর কথা যদি বলো (তাতে সমস্যাটা আরো সহজ হয়ে আসে), তাহলে এখানকার নিয়াকৃত হবে এমন-কিছু যা ইতিপূর্বে এখানে হতে দেখা যায় নি, হঠাৎ হলো আবির্ভূত, যা এই জড় জগতের নিয়ম বহির্ভূত, এসেই এখানকার নিয়ম উলটে-পালটে দিলে।

আবার অন্যদিকে এ-কথাও কথিত আছে যে প্রত্যেক বস্তুর কেন্দ্রে সব-কিছুই রয়েছে অন্তর্নিহিত হয়ে, সুতরাং তদ্বহির্ভূত কোনো নিয়াকৃত বা অঘটন ঘটা সম্ভব নয়।

এই নিয়াকৃত কথাটা হলো পরিমিত জগতের, পরিমিত চেতনার ও পরিমিত কল্পনার জিনিস। বস্তুজগতে যা আগে ছিল না তাই যেন কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে হঠাৎ তেড়ে-ফুঁড়ে এসে ঢুকে পড়া জিনিস। তাহলে এখানকার চেয়ে উপরিস্থ শাশ্বত ও সীমাহীন জগতের কোনো ইচ্ছা বা চেতনার যা-কিছু অভিব্যক্তি এখানে ঘটবে তাই হবে নিয়াকৃত। কিন্তু যদি এই সীমিত জগতের ও তার ধারণাসীমার বাইরে গিয়ে পড়ো তাহলে দেখবে যে নিয়াকৃত বলার মতো কিছুই নেই। ভগবান ইচ্ছা করলে অনেক নিয়াকৃতের খেলা দেখাতে পারেন, তিনি সকল রকম সম্ভাবনার খেলাই খেলে থাকেন, কিন্তু তা ছাড়া বাস্তবিক নিয়াকৃত বলে কিছু নেই।

ভগবানকে তখনই বুঝতে শুরু করবে যখন যথার্থই অনুভব করবে যে তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার খেলাই খেলছেন, কিন্তু সেই "সম্ভাব্য" মানে তা মানুষের ধারণা অনুসারে নয়, তাঁর নিজের ধারণা অনুসারে।

এখানে প্রকৃত নিরাকুলের কোনো স্থান নেই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাই দেখায়।

(নীরব থেকে)

এই বিলম্বিত বিবর্তনের পরিবর্তে যদি এখানে হঠাৎ এসে পড়ে অতিমানস জগতের কোনো অভিব্যক্তি, তখন এখানকার মনোধর্মী মানুষ তাকে বলবে এটা নিরাকুল, কারণ তা এমন জিনিস যা তার চেতনার অতীত, দেখা দিয়েছে তার চেতন জীবনের সামনে। নিরাকুল দেখার সম্বন্ধে এমনি একটা আগ্রহ, এটা শিশুদের মধ্যে ও শিশুর মতো সরল-হৃদয় মানুষদের মধ্যে যতখানি প্রবল, পাকা বুদ্ধির মানুষদের মধ্যে ততখানি নয়,—আর এটা আসে পরমাশ্চর্যকে উপলব্ধি করবার আশ্পৃহা থেকে, এবং স্বাভাবিক এবং জীবনের সাধারণ প্রত্যাশার চেয়ে আরো বড়ো কিছু আছে যার নাগাল হঠাৎ মিলে যেতে পারে এই বিশ্বাস থেকে।

প্রশিক্ষণের দিক থেকে আমাদের এই দুটি মনধর্মী প্রবণতাকে উৎসাহিত করাই ভালো। পরমাশ্চর্যের সম্বন্ধে এই আগ্রহ, যার নাগাল সহজে মিলবার নয় তার দিকে এমন ঝোঁক থাকা, এতে তোমার মধ্যে একটা দিব্যত্বের বোধ এনে দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখা চাই যে বাস্তব জগৎকে যেন সঠিক ও নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যাতে অলীক কল্পনা ঘুচে গিয়ে সঙ্গত ও বিশদভাবে বাস্তবকে চেনা যায়, সেদিক দিয়েও উৎসাহদান করতে হবে। দুইই চলবে সমান্তরাল ভাবে। সাধারণত দেখা যায় যে ওর মধ্যে একটিকে মেরে অন্যটিকে বাড়ানো হয়, কিন্তু তা করা খুবই ভুল। দুই জিনিসই একত্রে চলতে পারে, এবং এমন দিন আসতে পারে যখন অনেকটা জ্ঞানলাভ করে তুমি বুঝবে যে দুইই হলো একই জিনিসের দুই পিঠ, তখন আসবে তোমার আলোকদৃষ্টি ও উচ্চতর বোধশক্তি। সংকীর্ণতা চলে গিয়ে বোধশক্তি আসবে সত্যের, যা উদার ও বিশাল, তার মধ্যে অনুভূতি মিলবে এমন মানসিক জগতের যার অনেক কিছুই এখনও বাস্তবে প্রকাশিত নয়।

প্রশিক্ষণের কাজে এর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি।

জগৎ যেমন স্থূল বাস্তব তাকে ঠিক সেই ভাবেই দেখা এবং তার সঙ্গে একটা মুক্ত রকমের আশা ও আশ্পৃহাযুক্ত অপূর্ব নিশ্চয়তার অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে দেখতে পাওয়া যে এই জগৎই অতঃপর কেমন হতে পারে, এই হলো পরিণত বোধশক্তির দুটি প্রান্ত। অত্যাশ্চর্য চমৎকারিত্বকে, চরম শক্তিশালীকে ও সর্বসম্পূর্ণকে আমরা যতটাই কেন ধারণা করি, তথাপি যা প্রকৃত সম্ভাব্য তার সঙ্গে ওর তুলনা হয় না, আর আমরা যতই কেন নিখুঁতভাবে বিচার করতে যাই তথাপি তা যথেষ্ট নিখুঁত হয় না। সুতরাং দুই রকমই একত্রে থাকা দরকার। যখন তুমি এদিককে জানবে (নিচের দিকে দেখিয়ে) এবং ওদিককেও জানবে (উপর দিকে দেখিয়ে), তখন দুটোকেই একত্রে মিলিয়ে নিতে পারবে।

বিরাকুল্ সম্বন্ধে এই রাস্তা নেওয়াই সব চেয়ে ভালো। বিরাকুল্ দেখার কামনা করা অজ্ঞানেরই লক্ষণ। "আহা, এমনটি যদি হতো।" এ হলো অজ্ঞানের ও অক্ষমতার কথা। আর যারা বলে, "বিরাকুলের মধ্যেই বেঁচে আছি", তারা কেবল নিচের দিকটা দেখছে—তাও অপূর্ণভাবে—উপরের সঙ্গে কোনো যোগ নেই।

এই বিরাকুলের প্রত্যাশাকে ঘুরিয়ে আনতে হবে আশ্পৃহাতে, সেই আশ্পৃহা চাইবে যে অনভিব্যক্ত হোক অভিব্যক্ত,—এ আশ্পৃহার খুবই প্রয়োজন, কারণ তা শাশ্বতের বিকাশের সহকারী।

চুলচেরা যুক্তিবাদী বলবে, "প্রার্থনা কেন করব, আশ্পৃহারই বা কি দরকার? আমি কিছু চাইব কেন? ভগবান যা করতে চান তা নিজেই করছেন আর নিজেই করবেন।" সে কথা ঠিকই, কিন্তু এই যে আকুতি, "ভগবান তুমি প্রকাশ হও," এতে তাঁর বিকাশ-স্পন্দনের বেগ আরো তীব্র হয়।

নতুবা জগৎকে তিনি এমনভাবে গড়তেন না, এই যে সারা জগতের ব্যাকুলতা তার উৎসমুখে ফিরে যেতে, এর মধ্যেই রয়েছে একটা শক্তির লীলা, একটা আনন্দের ঢেউ তোলা, একটা স্পন্দনতরঙ্গিত অনুপ্রেরণার স্রোতধারা।

আর সেই কারণেই আংশিকভাবে তারই প্রয়োজনে চলেছে এই বিবর্তনের ক্রিয়া।

বিশ্ব যদি চিরন্তনরূপে পূর্ণতার অবস্থায় থাকত, যদি চিরন্তনরূপে পূর্ণতাকেই অভিব্যক্ত করত, তাহলে এগিয়ে যাবার আনন্দ বলতে কোনো জিনিসই থাকত না। *

---

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পঙ্কজিনী ভট্টাচার্য

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[চতুর্থ পাদ—পূর্বযোগ]

৫

অন্তঃকরণ

সিদ্ধির পথে মনোময় পুরুষের অভিযানের মোটামুটি একটা ছক পেলাম। এখন তার পর্বগুলি খুঁটিয়ে দেখা যাক।

সিদ্ধির জন্য প্রথমেই দরকার অন্তঃকরণের শুদ্ধি। প্রশ্ন হবে, শুদ্ধির স্বরূপ কি? অন্তঃকরণই-বা কাকে বলব?

শুদ্ধতার একটি প্রতীক হল অবর্ণ নিস্তরঙ্গ আকাশ। শুদ্ধ চৈতন্য আকাশবৎ। তা-ই পুরুষের স্বরূপ। এই পুরুষকে কল্পনা করা হয় প্রকৃতি হতে বিবিক্ত, অসঙ্গ, নির্লেপ।

কিন্তু পুরুষ যদি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হন, তাহলে কি তিনি শুদ্ধ থাকতে পারেন না? পৃথিবী অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোককে ছাপিয়ে যে-আকাশ, তা নিশ্চয় শুদ্ধ। কিন্তু এদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট যে-আকাশ, তা-ও কি শুদ্ধ নয়? আরও গভীরের কথা, এরাও কি শুদ্ধ হতে পারে না? পুরুষ গুণাতীত বলে শুদ্ধ, আর প্রকৃতি গুণময়ী বলে অশুদ্ধ—এই ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ভুলে যাই, গুণাতীততা আর গুণময়তার মাঝে আরেকটা অবস্থা আছে—শুদ্ধসত্ত্বতা। তা-ই পরা বা পরমা প্রকৃতির স্বরূপ। অপরা এবং পরা দুইই পুরুষেরই প্রকৃতি—একটি অশুদ্ধা, আরেকটি শুদ্ধা। পুরুষের ঈক্ষণে এবং প্রচোদনায় অশুদ্ধা প্রকৃতি রূপান্তরিত হচ্ছে শুদ্ধা প্রকৃতিতে—এই দৃষ্টিই সম্যক্ দৃষ্টি, কেননা এতে পুরুষ আর প্রকৃতির যুগনদ্ধতা ব্যাহত হয় না, সমগ্রভাবে সাধনার একটা তাৎপর্য এবং জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। আকাশের অবর্ণতায় শুদ্ধির এক রূপ, আবার দ্যুলোকের আলোয় তার ভাস্বরতাও শুদ্ধির আরেক রূপ। অবর্ণতা আর শুভ্রতায় প্রতিষ্ঠিত হলে দেখি শবলতা বা বর্ণবৈচিত্র্যও তারই বিচ্ছুরণ, সুতরাং সেও শুদ্ধ।

দেহ প্রাণ হৃদয় আর মন—এই নিয়ে আমাদের অপরা প্রকৃতি। এর মধ্যে ভেজাল আছে, যার জন্য আমরা দুঃখ পাই, স্বচ্ছন্দ হতে পারি না। অপরা-প্রকৃতির শুদ্ধির একটি

আদর্শ হল চারিত্রিক বিশুদ্ধি অর্জন করা বা পুণ্যাত্মা হওয়া। তার বাঁধা-ধরা কতকগুলি নিয়ম আছে, সমাজস্থিতির জন্য তা আবশ্যকও। কিন্তু পূর্ণযোগের শুদ্ধির আদর্শ তাকেও ছাপিয়ে গেছে। তার শুদ্ধতা দ্বন্দ্বাতীততায়, 'ন পুণ্যং ন পাপম্' বেদান্তের এই মন্ত্রে।

'ন পুণ্যং ন পাপম্।' তার অর্থ এ নয় যে পূর্ণযোগী পাপ আর পুণ্যের মাঝে কোনও তফাত করবেন না ; অথবা এও নয় যে, সংসারে পাপ-পুণ্য যখন সুখ-দুঃখেরই মত ওতপ্রোত, তখন যোগী অন্তরে বিবিক্ত থেকে বাইরে প্রকৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেন। চারিত্রিক বিশুদ্ধি বা সদাচার যোগের প্রাথমিক অঙ্গ হিসাবে অপরিহার্য। তাকে ধরে কিছুদূর পর্যন্ত এগনো যায় এবং এগতেও হয় ; কিন্তু চরম লক্ষ্যে সে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। সদাচারের ছক কাটা হয় দেশ কাল বা সংস্কার অনুসারে ; গোড়াতে চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হলেও শেষ পর্যন্ত সে যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। মন শুদ্ধির যে-আদর্শ কল্পনা করে, তা সাত্ত্বিক হতে পারে কিন্তু গুণাতীত ভূমি হতে হয়তো দেখা যাবে, সে-সাত্ত্বিকতার মধ্যে মোহের ভেজাল রয়েছে—যেমন কুরুক্ষেত্রে প্রত্যুদ্যত অর্জুনের ছিল। বস্তুত সাত্ত্বিকতা আর শুদ্ধসত্ত্বতা এক কথা নয়। সাত্ত্বিকতা মনের সম্পদ, আর শুদ্ধসত্ত্বতা হল অতিমানসের সুগুণ। পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বটা মনের ; অতিমানসে আছে সত্যে জ্ঞানে আনন্দে প্রেমে ও শক্তিতে আনন্ত্যের সহজ প্রকাশ। তাই মনঃকল্পিত পাপ-পুণ্যের মাপে তাকে মাপা যায় না, তার পাপ-পুণ্যের ধারণা প্রচলিত সংস্কারের অতীত।

অশুদ্ধতার মূলে কি আছে বুঝতে পারলে শুদ্ধির স্বরূপ বোঝা যাবে। অশুদ্ধতার প্রথম হেতু হল অবিদ্যা এবং তদুদ্ভূত দৃষ্টির বিপর্যয়। অবিদ্যা বলতে বুঝি চেতনার সঙ্কোচ। আমরা সবটুকু জানি না বা বুঝি না। যেটুকু জানি বা বুঝি তাকেই একান্ত করে আঁকড়ে ধরে পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খাই। চিত্ত তাতে আবিল হয়ে ওঠে। অশুদ্ধতার আরেকটি হেতু হল আধারশক্তিগুলির মধ্যে ক্রিয়ার ব্যাবিশ্রুতা। আমাদের মধ্যে চিৎশক্তির একটা ঊর্ধ্বপরিণাম ঘটছে—যেমন দেহের মধ্যে ফুটছে প্রাণ, প্রাণের মধ্যে মন ইত্যাদি। কিন্তু কেউ তারা স্ব-তন্ত্র হয়ে ফুটছে না, ঊর্ধ্বতরকে নির্ভর করতে হচ্ছে তার নীচের স্তরের উপর এবং তাইতে তার ক্রিয়ার মধ্যে দেখা দিচ্ছে একটা কুণ্ঠা এবং ব্যাবিশ্রুতা। চিত্তের আবিলতার এই আরেকটি কারণ।

একটা উদাহরণ দিলে এই অবিশুদ্ধির ধরনটা বোঝা যাবে। প্রাণের ধর্ম হচ্ছে আত্তীকরণ (assimilation) এবং সম্ভোগ। তার শুদ্ধ রূপ হল আবেশ এবং আনন্দ—যেমন এক বস্তুতে আবিষ্ট হয়ে তাদের সম্ভোগ করে নন্দিত হচ্ছেন। এটি একটি পরিব্যাপ্ত এবং নির্লিপ্ত চেতনার আত্মারামতারই বৈভব। কিন্তু সঙ্কীর্ণ জীবচেতনায় ঐ আবেশ আর আনন্দই ধরল বাসনা আর বুভুক্ষার রূপ। প্রাণ মন-বুদ্ধিকে নিয়োজিত করল এদের দাবি মেটাতে। দৃষ্টির বিপর্যয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দিল ক্রিয়ার ব্যাবিশ্রুতা। চিত্ত আবিল হয়ে উঠল।

এই আবিলতা হতে মুক্তি হল যোগের প্রথম সাধ্য।

*

এইবার যে-আধারকে অনাবিল করতে হবে, তার পরিচয় নেওয়া যাক।

একদিকে আমাদের রয়েছে দেহ যাকে বলতে পারি চিদাবিষ্ট জড়, আরেকদিকে মন যা হল জড়াশ্রিত চিৎ। দুয়ের মাঝে চলছে প্রাণের খেলা যা চিৎশক্তির উল্লাস। দেহ প্রাণ মন সবই চিৎশক্তির ক্রমসূক্ষ্ম বিভূতি। প্রাচীনেরা আধারকে শরীর নাম দিয়ে আত্মার তিনটি শরীরের কথা বলেছেন—স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর আর কারণশরীর। প্রাকৃতচেতনায় স্থূলশরীরের অনুভব প্রধান হয় জাগ্রতে, সূক্ষ্মশরীরের স্বপ্নে, আর কারণশরীরের সুষুপ্তিতে। যোগচেতনায় এই অনুভব বিস্ফারিত হলে আত্মা যথাক্রমে হন বৈশ্বানর বা বিরাট, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ, এবং প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বর। স্থূলশরীর স্থূলপ্রাণ দ্বারা বিধৃত, স্থূল করণ (instruments) বা ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে তার প্রকাশ। তেমনি সূক্ষ্মশরীর বিধৃত সূক্ষ্মপ্রাণ (psychic prana) দ্বারা, আর কারণশরীর চিন্ময় মহাপ্রাণ দ্বারা। সূক্ষ্মপ্রাণের বৃত্তি হল অন্তঃকরণ। প্রাচীন মতে তার চারটি বিভাগ—চিত্ত মন বুদ্ধি এবং অহংকার। সূক্ষ্মের সঙ্গে স্থূল নিষ্প্রিত হয়ে আছে। এই ব্যামিশ্রতার বাহন হল আমাদের নাড়ীতন্ত্র (nervous system)। নাড়ীসঞ্চারী প্রাণ অশুদ্ধির হেতু বলে প্রাচীন যোগে নানা উপায়ে নাড়ীশোধনের ব্যবস্থা আছে। অশুদ্ধি বিশেষ করে প্রকট হয় বাসনাতে (desire)।

তাহলে দেহ আর তার মধ্যে নাড়ীতন্ত্র, প্রাণ আর তার বৃত্তিরূপী বাসনা এবং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবার বিশেষ করে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ যার বিভাগ হল চিত্ত মন বুদ্ধি এবং অহংকার—এইগুলি নিয়ে আমাদের আধার। তার ঊর্ধ্বে অথচ তাতে নিগূঢ় হয়ে আছে ঈশ্বরশক্তি বা অতিমানস। সিদ্ধির সে-ই প্রয়োজক।

এখন অন্তঃকরণের একেকটি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

*

প্রথম ধরা যাক চিত্তের কথা। আধারের মধ্যে যে-আলয়(basic)-চৈতন্য, তার নাম চিত্ত। আধারের সমস্ত অনুভব আর ক্রিয়ার উৎস হল সে-ই : এগুলিকে বলা যায় চিত্ত-বৃত্তি। জড় আর প্রাণের মত চিত্তও বিশ্বব্যাপী একটা তত্ত্ব, জড়ে তার ক্রিয়া অবচেতন এবং যান্ত্রিক। আমাদের আধারে চিত্তের দুরকম ক্রিয়া—গ্রাহক আর কারক। গ্রাহক-চিত্ত বাইরে থেকে অনুভবের উপাদান গ্রহণ করে, আর কারকচিত্ত তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বৃত্তিকে বাইরে প্রতিক্ষিপ্ত করে। চিত্তের অধিকার মনের চাইতে অনেক বিস্তৃত। মনের অজানতে চিত্ত অনেক-কিছু গ্রহণ ক'রে নিজের ভাণ্ডারে জমা রাখে এবং মাঝে-মাঝে মনের তলা থেকে উপরে তাদের ফুটিয়ে তোলে—নানা অপ্রাকৃত বা অধিচেতন (subliminal) অনুভবের আকারে। চিত্তের পুরাপুরি খবর মন রাখে না বলে তার অনেক-কিছুই তার কাছে ঠেকে অবচেতন।

প্রাচীনেরা স্মৃতিকে চিত্তের একটা বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন। স্মৃতির উৎপত্তি অনুভবের সংস্কার (impression) থেকে। সব অনুভব মনের গোচর নয়, কিন্তু অবচেতন বা অধিচেতনরূপে চিত্তের গোচর। তাই মনের স্মৃতির বাইরেও স্মৃতি আছে—যেমন দেহের বা প্রাণের স্মৃতি। প্রকৃত-পরিণামের ভিতর দিয়ে এগুলি নানা সংস্কার বা অভ্যাসের আকারে আমাদের আধারে সঞ্চিত হতে থাকে—অনেকক্ষেত্রেই মনের অগোচরে। তাইতে তাদের ক্রিয়া অনেকসময়ই হয় দুর্বোধ এবং দুর্বশ। কিন্তু উদ্দীপ্ত চেতনাকে চিত্তের গভীরে তলিয়ে দিয়ে তাদের বশে আনা বা ইচ্ছামত পরিচালিত করা যোগীর অসাধ্য নয়।

চিত্তের আরেকটি বিসৃষ্টি হল ভাবমানস (emotional mind), মনের নানা প্রকোষ্ঠে বা আবেগে বা প্রকাশ পায়। ভাব হল জ্ঞান আর সঙ্কল্পের মাঝামাঝি। জ্ঞান হল গ্রাহক, আর সঙ্কল্প কারক। গ্রাহকচিত্তে বাইরের বা ভিতরের ছাপ পড়ল, কারক-চিত্তে দেখা দিল তার প্রতিক্রিয়া। গ্রাহকচিত্তের যে-জ্ঞান, তাকে রঞ্জিত এবং স্বদনীয় করে তুলল ভাব—কারকচিত্তের সঙ্কল্পকে জোরালো করবার জন্য। জ্ঞান তটস্থ, সে হল চেতনার পুরুষের অংশ আর ভাব এবং সঙ্কল্পে আছে একটা ঝোঁক ও প্রবেগ, তারা হল প্রকৃতির অংশ। চেতনা যখন প্রাকৃত, তখন প্রকৃতির দিকটাই তার মধ্যে জোর ধরবে। তাই অধিকাংশক্ষেত্রে ভাব আমাদের কাছে অসংবর হয়ে পড়ে। কিন্তু তাকেও বশে আনা যায়। ভাবের মধ্যে যে-স্বদনীয়তা, তার শুদ্ধরূপ হল রসচেতনায়। ওটি চৈত্যসত্তার (psyche) ধর্ম। তার মধ্যে বাসনার বিকার এবং উচ্ছলতা নাই, আছে প্রসন্নতা বা আনন্দের প্রশান্তি। সে-ই ভাবের প্রশান্তা।

এই প্রসঙ্গে নাড়ীতন্ত্রের কথা তোলা যেতে পারে। প্রাণ যেমন দেহ আর মনের মাঝে সেতু, তার বাহন হিসাবে নাড়ীতন্ত্রও তা-ই। নাড়ীতন্ত্রের মধ্যে দেহের উপাদান প্রসাদযুক্ত হয়ে চেতনার অনেকখানি কাছে পৌঁছেছে। তাই নাড়ীতন্ত্রকে ধরে চেতনাকে উদ্দীপ্ত করা কোনও-কোনও যোগের বিশিষ্ট সাধনাঙ্গ। প্রাকৃতচেতনায় নাড়ীতন্ত্রের সঙ্গে ইন্দ্রিয়নির্ভর মনের খুব নিকট সম্পর্ক। মনের নিচুতলার অনেক-কিছু এই সম্পর্কের আওতায় এসে পড়ে। কাম ক্রোধ ভয় ইত্যাদি ভাবময় চিত্তবৃত্তির অনেকখানি নাড়ী-তন্ত্রিত, তাদের মধ্যে ভাবের চাইতে ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর প্রাধান্য, তাই তাদের প্রবেগও বাইরের দিকে। কাম আর প্রেমের তফাতও এইখানে। কাম বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, নাড়ীবিক্ষোভজনিত প্রাণের বিকার, তাকে ভাবের পর্যায়ে ফেলতে বাধে। কিন্তু প্রেম একটি শুদ্ধভাব, অন্তর্মুখ আসঙ্গের প্রশান্ত নিবিড়তায় রমণীয়। নাড়ীতন্ত্র সেখানে ঊর্ধ্বস্রোতা বিশুদ্ধ প্রাণের বাহন।

*

তারপর মন। মন চিত্তেরই বিসৃষ্টি। আগেই বলেছি, চিত্তের চাইতে তার অধিকার সঙ্কীর্ণ। আমাদের প্রাকৃত মন ইন্দ্রিয়নির্ভর। জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে সে বাইরের জগৎকে

জানে, আবার কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তার উপর ক্রিয়া করে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বাহ্যিক এবং নাড়ী-তন্ত্রিত। কিন্তু এ হল তাদের ক্রিয়ার দিক; স্বভাবের দিক দিয়ে তারা কিন্তু চেতনা বা চিত্তেরই সাধন। মন ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বিশ্বের স্পন্দনকে গ্রহণ ক'রে তাদের রূপান্তরিত করে সংবিৎএ এবং তা-ই দিয়ে গড়ে তোলে একটা অন্তর্জগৎ বা অনুভবের জগৎ।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেমন স্থূল হতে পারে, তেমনি সূক্ষ্মও হতে পারে। সূক্ষ্ম বিষয়ের জন্য দরকার হয় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের। অবশ্য সে-ইন্দ্রিয় চেতন মনের নয়, অধিচেতন মনের। দূরদর্শন দূরশ্রবণ চিন্তাসংক্রামণ সম্মোহন ইত্যাদি সম্ভব হয় এই মনের ইন্দ্রিয় দিয়ে। আমরা সাধারণত এসব অনুভবকে অতীন্দ্রিয় বলে রহস্যের কোঠায় ফেলি। অথবা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের যে বিশিষ্ট শক্তি 'অনুমান' তারই সাহায্যে এদের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি। কিন্তু অনুমানের জ্ঞান পরোক্ষ, আর ইন্দ্রিয়সংবিৎ অপরোক্ষ। অধিচেতন মনের ঐ অনুভবগুলিও অপরোক্ষ। তাই তাদের অতীন্দ্রিয় না বলে সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের গোচর বলাই ভাল।

*

তারপর বুদ্ধি। এও চিত্তেরই বিসৃষ্টি, কিন্তু মনের ওপারে। মন ইন্দ্রিয়নির্ভর বলে সবসময় বিশেষপ্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বুদ্ধির কারবার সামান্যপ্রত্যয় নিয়ে। তাইতে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনা তার দ্বারা সম্ভব হয়। তাছাড়া ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্যে আছে সঙ্কল্পবৃত্তি, যা দিয়ে সে হয় আমাদের জীবন-মনের নিয়ন্ত্রী।

বুদ্ধির তিনটি স্তর। প্রথমটি মনের কাছাকাছি। একে আমরা খাটাই প্রাকৃত-জীবনের প্রয়োজনে। মনের এনে-দেওয়া উপাদানগুলি নিয়ে সে ইন্দ্রিয়নির্ভর এবং প্রায়শই গতানুগতিক একটা জীবনাদর্শ গড়ে তুলে তার সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। এই আটপৌরে বুদ্ধি হল সাধারণ মানুষের।

এর চাইতে উঁচু স্তরের বুদ্ধি প্রকাশ পায় চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে, যারা নতুন করে ভাবে, জীবনকে বাইরে-ভিতরে গুছিয়ে নিয়ে একটা মহত্তর আদর্শের দিকে এগিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে।

তারও উপরের স্তরের বুদ্ধি হল জ্ঞানতপস্বী এবং সত্যান্বিজ্ঞাসুদের। কোনও ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে নয়, সত্যকে তার স্বরূপে জানবার প্রেরণাতেই বুদ্ধিকে তাঁরা নিয়োজিত করেন লোকোত্তরের গবেষণায়। বলা বাহুল্য, খুব কম লোকই এই আকাশচারী বুদ্ধির অধিকারী।

বুদ্ধির উল্টা পিঠ হল বিজ্ঞান, যা অতিমানসের বৃত্তি। তাইতে সে লোক আর লোকোত্তরের মাঝে সেতুর কাজ করে। বুদ্ধির একটা দিক ফেরানো আছে মনের দিকে, আরেকদিক অতিমানসের দিকে। উপনিষদে এই বুদ্ধিকেই বলা হয়েছে সূক্ষ্মা অগ্র্যা বুদ্ধি, যা পরমার্থদর্শনের সাধন।

*

আত্মবোধের যে-চিদ্‌বিন্দুকে কেন্দ্র করে বুদ্ধি কাজ করছে, তার নাম হল অহংকার। পোড়াতে অহন্তা নিজের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, কিন্তু তবুও তার মধ্যে একটা বিস্ফারণের প্রেরণা আছে। কুণ্ডলিত অহং ইন্দ্রিয়নির্ভর, দেহ-প্রাণ-মনের প্রাকৃত ছাঁচের বাইরে সে যেতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধির উদ্দীপনায় তার মধ্যে ভাবের ছোঁয়া লাগে যখন, তখন সে নিজেকে প্রসারিত করতে পারে অপরের মধ্যেও। এই আত্ম-প্রসারণের চরম পরিণাম হল সর্বাত্মভাবনায়—অহন্তা তখন পূর্ণাহন্তা বা পরাহন্তা। অহং বস্তুত আত্মারই প্রতিবিম্ব। অহং—আত্মা—ব্রহ্ম : চৈতন্যের বিস্ফারণের এই পর্যায়।

৬

প্রাকৃত মনের শুদ্ধি

অন্তঃকরণের পরিচয় পেলাম। তার শুদ্ধি ছাড়া সিদ্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু অন্তঃকরণের অনেক বৃত্তি, আর তারা ওতপ্রোত এবং অন্যোন্যনির্ভর। তাইতে প্রশ্ন হয়, শুদ্ধির কাজ কাকে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে? কোন্ বৃত্তি শুদ্ধ হলে পর অন্যান্য বৃত্তির শুদ্ধি সহজ হবে?

উপনিষদে আছে 'মনো বৈ যজ্ঞমানঃ'—সাধনযজ্ঞের যজমান হল মন। মানুষ বিশেষ করে মনোময় জীব। সুতরাং সাধনা শুরু করতে হবে মন দিয়ে। তাই সবার আগে চাই মনের শুদ্ধি।

মনের নীচে প্রাণ, উপরে বুদ্ধি। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, মনের অশুদ্ধির একটা মূল কারণ হবে প্রাণের বিকার; আর তার শোধনের জন্য দরকার হবে বুদ্ধির সজাগ সহায়তা। প্রাণ এগে মনকে কাবু করে ফেললে তার কবল হতে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে উপরওয়ালার শরণ নিয়েই। চৈতন্য জড়ে নিগূঢ়, প্রাণে আচ্ছন্ন, মনে অনতিস্পষ্ট, আর বুদ্ধিতে স্পষ্ট। সুতরাং মনের মধ্যে প্রাণের বাধাকে কাটিয়ে উঠতে হলে বুদ্ধিরই সাহায্য-নিতে হবে।

*

প্রাণচেতনাই (psychic prana) যদি মনের অশুদ্ধির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিকারের জন্য প্রথমত তার স্বরূপটি চিনে নেওয়া দরকার। প্রত্যেকটি করণের (instrument) একটি শুদ্ধধর্ম আছে, আবার তার বিকারও আছে। প্রাণচেতনার শুদ্ধধর্ম হচ্ছে সম্ভোগ। স্বরূপত সম্ভোগ দোষের নয়। জীবনটা রয়েছে সব-কিছু ভাল লাগবার জন্যই, শুকিয়ে মরবার জন্য নয়। সাংখ্যবাদীরা বলেন, যখনই তোমার কিছু

ভাল লাগল, বুঝতে হবে প্রকৃতির সত্ত্বগুণ তোমার মধ্যে উদ্রিক্ত হল। সত্ত্বগুণের লক্ষণ হচ্ছে লঘুত্ব আর প্রকাশ ভাল লাগায় তোমার চেতনা হালকা হল, স্বচ্ছ হল, উদ্দীপ্ত হল। সব সম্ভোগেই প্রথমটা তা-ই হয়। আরও গভীরের দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যায়, সব সম্ভোগেই প্রথমে প্রকাশ পায় ব্রহ্মের আনন্দরূপ, বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ। সম্ভোগের ভিতর দিয়ে রসরাজ নিমেষের ঝলকে একবার উঁকি দিয়ে যান, কিন্তু থাকেন না। প্রাণ-চেতনা স্বচ্ছ সুন্দর ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেই আবার মলিন ও শ্রীহীন হয়ে যায়। তাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত আধারকে তখন সম্ভোগের মাতন দিতে হয়। কেন?

রসগ্রহণ যেমন প্রাণচেতনার শুদ্ধধর্ম, তেমনি তার বিকার হল বিশুদ্ধ সম্ভোগকে আবিল-করা বাসনার তাড়না। সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি, বাসনার মধ্যে আছে দুটি অবগুণ —রাজসিক চাঞ্চল্য আর তামসিক মূঢ়তা। এর মধ্যে মূঢ়তাই হল আসল দোষ। আগেও বলেছি, অশুদ্ধির একটি কারণ হল দৃষ্টির বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের আরেক নাম হল মূঢ়তা। আসল সুখ মনে; কিন্তু আমরা ভাবলাম, সুখ বিষয়ে। তাইতে বিষয়ের পিছনে ছুটতে শুরু করলাম। তা-ই থেকে চাঞ্চল্য—বিষম ভয় রেষারেষি হানাহানি, জীবনের সহস্র ঝামেলা। প্রত্যাহার দ্বারা অন্তরের সুখকে অন্তরে ধরে রেখে প্রত্যয়ের একতানতায় চেতনাকে যদি উজান বইতে দিতে পারতাম, তাহলে সুখের যে-কোনও উপলক্ষ্যকে ধরে আমরা পৌঁছতে পারতাম চরম লক্ষ্য আনন্দে।

মূঢ় প্রাণবাসনার এই দোষ সংক্রামিত হয় মনে —তার ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প সব-কিছুকে আবিল করে তোলে। বুদ্ধির উপর ছায়া ফেলে তাকেও সে বিভ্রান্ত করে। মন-বুদ্ধি হয় তার তাঁবেদার অন্ধ প্রাণের চাওয়াকে মনে হয় বেশ দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে চাওয়া বলে। এই হল ব্যাপিপ্রতা—অশুদ্ধির দ্বিতীয় কারণ। চেতনার বহুদূর পর্যন্ত এর অধিকার বিস্তৃত।

প্রাণবাসনার এই উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল অশান্তি আর অবসাদ। মন তাথেকে মুক্তি চায়, কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। অধিকাংশ মানুষেরই জীবনের এই করুণ ছবি।

*

প্রাণচেতনার বিকারের মূল রয়েছে দেহের মধ্যে। দেহ চেতনার প্রকাশের বাহন বটে, কিন্তু তার জড়ত্বই আবার চিৎপ্রকাশের একটা বাধা। প্রকাশ আনন্দ এবং শক্তির যে অসীম সম্ভাবনা চৈতন্যে নিহিত রয়েছে, তা সীমিত ও পঙ্গু হয়ে আছে দেহের মধ্যে। প্রাণ তাকে মুক্তি দিতে চায়, কিন্তু পারে না; বাসনা হল সেই ব্যর্থতার রূপ। সর্বত্র যা হয়ে থাকে, এখানেও হয়েছে তা-ই দেহ একটা অবরতত্ত্ব হয়ে পরতত্ত্বের উপর ছায়া ফেলেছে, দেহের জড়ত্ব এবং পঙ্গুতা প্রাণ ও মনের স্বাচ্ছন্দ্যকেও করেছে কুণ্ঠিত। জড়দেহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই প্রাণের ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি খোঁজে জড়ের মধ্যে, দেহাত্মবাদ হয়ে

ওঠে মানুষের জীবন-দর্শন। কিন্তু তার সার্থকতা আপাতত মাত্র : এ যেন পথের সন্ধানে কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়া। দেহ জরামৃত্যুর অধীন, অথচ প্রাণ আর মনের মধ্যে রয়েছে অজর অমৃতের পিপাসা—এও একটা ঝামেলা। তাছাড়া যত ভেদভাবের মূলও এই দেহের মধ্যে। এক অখণ্ড চৈতন্য দৃশ্যত এই দেহকে অবলম্বন করেই বহু হয়েছেন, অতএব খণ্ডিত এবং সঙ্কুচিতও হয়েছেন। বহুভাবনার মধ্যে বৈচিত্র্যের যে-উল্লাস আছে, তাকে ছাপিয়ে অনেকক্ষনয় ভেদ বিরোধ আর সংঘর্ষই প্রবল হয়ে ওঠে দেহকে আশ্রয় ক'রে।

তবুও মনে রাখতে হবে, দেহ চিৎপ্রকাশের বাহন। দেহকে ছেড়ে প্রকাশের সাধনা চলতে পারে না, ইন্ধন ছাড়া শূন্যে-শূন্যে আগুন জ্বলে না। সমস্যার সমাধান হচ্ছে দেহকে উপেক্ষা বা পীড়ন করায় নয়, বুদ্ধির সহায়ে মনকে দেহ ও প্রাণের বশ্যতা হতে মুক্ত করায়। চেতনার প্রত্যাহার এবং অন্তর্মুখীনতার দ্বারা মনকে দেহ-প্রাণ হতে ঊর্ধ্বতন পৃথক শক্তি বলে ধারণা করা যায়। তখন দেহের ভাবনা রূপান্তরিত হয় দেহবোধের ভাবনায় ; অর্থাৎ দেহ আর তখন বস্তুপিণ্ড নয়, কিন্তু বোধেরই একটা প্রকার মাত্র। কয়লায় তখন আগুন ধরে যায় ; আমরা কয়লাকে আর বড় করে দেখি না, দেখি আগুনকে। শরীর যখন যোগাগ্নিময় হয়, তখন সে চিৎপ্রকাশের বাধক না হয়ে হয় সাধক।

*

সাধারণত আমরা মনে করি, কামনাবাসনা আছে বলেই জীবনে রস আছে, কামনা না থাকলে তো জীবন শুকিয়ে গেল। তাই বেশীর ভাগ মানুষ কামনার স্রোতে জীবন ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু কামনার নিরঙ্কুশ তৃপ্তি সুসাধ্যও নয়, সুমঙ্গলও নয়। এখানেও এক সমস্যা। কামনাবাসনাকে নির্মূল করে দিয়ে বৈরাগ্যের মধ্যে কেউ তার সমাধান খোঁজে। কিন্তু এ যেন নাথা কেটে ফেলে মাথাব্যথার চিকিৎসা করা। বৈরাগ্যে বীর্য আছে, আবার একদেশদর্শিতাও আছে। আরেকটা সমাধান হচ্ছে ভোগ ও বাসনার সংযমে। অধিকাংশ লোকের পক্ষে সংযম আন্তরিক নয়, ভোগ আর ত্যাগের মাঝে একটা রফা। তাও লোকাপেক্ষার বা সমাজের শাসনে। সংযম যাদের কাছে আন্তরিক, তারাও সুস্থ জীবনাদর্শের নামে রফার পথই ধরে। তাতে স্বোত্তরণ (self-exceeding) বা চেতনার উত্তরায়ণের সাধনার কোনও ইশারা থাকে না।

সমস্যার সমাধান করতে হলে কামনা (desire) আর সঙ্কল্পে (will) তফাত করতে শিখতে হবে। কামনা আসে অভাববোধ থেকে ; আর সঙ্কল্প হল স্বভাবের স্ফূর্তি। আমার যা নাই, তা-ই আমি কামনা করি, এবং তাকে খুঁজি বাইরে। আর আমার যা আছে, তাকে ফুটিয়ে তুলি সঙ্কল্পে। কামনা অশক্তের, আর সঙ্কল্প শক্তিমানের। কামনায় চিত্তের বহির্বৃত্তি, আর সঙ্কল্পে তার নিশ্চলতা। সমস্ত তর্পণই অন্তশ্চেতনার প্রশান্ত প্রসন্ন উদার তর্পণ—ইন্দ্রিয় প্রাণ মন তার বাইরের নিমিত্ত মাত্র। উপনিষদে কথাটা এই সূত্রে প্রকাশ করা হয়েছে : যে আত্মারাম, সে-ই আপ্তকাম। আত্মস্থিতিতে জাগে স্বরূপের

আনন্দ এবং তাহতে হয় শক্তির স্বচ্ছন্দ বিকিরণ। এই বিকিরণের মূলে রয়েছে যে-প্রবেগ, তা সত্যসঙ্কল্প যা কামনার দিব্যরূপ। সত্যসঙ্কল্পবান্ পুরুষের কাছে ভোগে বৈরাগ্যে কোনও বিরোধ নাই, দুয়ের মাঝে রফারও কোনও প্রয়োজন নাই ; সংযম তাঁর কাছে কৃচ্ছ্রতা নয়, নিজেকে বঞ্চিত করা নয়, স্বভাবের তা সুশ্রী ও কেনজর প্রকাশ।

*

প্রাণকে বাসনার বিকার এবং উত্তালতা হতে মুক্ত করে আকাশবৎ অনাসক্ত প্রশান্ত ও প্রসন্ন চেতনার স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই ভূমিতে থেকেই মনঃশুদ্ধির সাধনা সহজ হবে।

একই মনের তিন রূপ—ভাবমানস (emotional mind), ইন্দ্রিয়মানস (sensational mind), আর সংবেগমানস (mind of impulse)। প্রাকৃতভূমিতে ভাব ইন্দ্রিয় আর সংবেগ সবারই ক্রিয়া যান্ত্রিক। মন যন্ত্রের যন্ত্রী বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি ক্ষীণ এবং অপরিশুদ্ধ। দৃষ্টির সঙ্কোচে ক্রিয়ার পরিণাম হয় বিকৃত, সে-বিকারের জ্বালা আবার মনকেই ভুগতে হয়। মন যন্ত্রী হয়েও যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে তার এই দুর্ভোগ। মন হতে বিবিক্ত বুদ্ধির আছে স্বচ্ছন্দ এবং উদার দৃষ্টি, পরম লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মনের বৃত্তিকে শুদ্ধ করতে পারে সে-ই।

প্রাকৃতভূমিতে আমাদের মধ্যে চেতনার ক্রিয়া চলছে এইভাবে। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগে চেতনায় যে-সাড়া জাগল, তাতে চেতনা নড়ে উঠল—ক্রিয়ার বদলে দেখা দিল প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া হল চিত্তের সংবেগপ্রসূত। ইন্দ্রিয়সংবিৎ বা সাড়ার কোনও রং নাই, কিন্তু সংবেগের রং আছে কোনও সংবিৎকে সে মনে করে অনুকূল, কোনটাকে প্রতিকূল। অনুকূলটা তার ভাল লাগে, তাকে সে আঁকড়ে থাকতে চায়, প্রতিকূলকে চায় বর্জন করতে। এমনি করে সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে দেখা দেয় ইচ্ছা-দ্বেষ। সুখ-দুঃখ পড়ে ভাবের এলাকায়, ইচ্ছা-দ্বেষ সংবেগের এলাকায়। সাংখ্যের ভাষায় বলা যেতে পারে, সংবিৎ পুরুষের ধর্ম, তাই তটস্থ আর ভাব এবং সংবেগ প্রকৃতির ধর্ম, তাই দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। কি ভাল লাগবে আর কি লাগবে না, কি চাই আর কি চাই না, তার অনেকটাই নির্ভর করে সংস্কারের উপর। এই বাছাইএর একটা হেতু নিশ্চয় আছে, এবং মোটামুটি বলা চলে হেতুটা হচ্ছে চিৎপ্রকর্ষ ; কিন্তু তার স্বরূপ প্রাকৃত চেতনার কাছে স্পষ্ট নয়। মানুষ বাস্তবিক 'যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়'। এই ভুলের দার্শনিক নাম হল 'অবিদ্যা'। ভুল করি বলেই দুঃখ পাই, কেউ যেন কাঁটার চাবুক মেরে বলে 'এ-পথে নয়'। কিন্তু তবুও আবার ভুল করি। ফলে জীবন সুখ-দুঃখ রাগ-দ্বেষ শুভাশুভের দ্বন্দ্বে সঙ্কুল হয়ে ওঠে। সঙ্কুল মনকে বলি অবিশুদ্ধ। আর এই অবিশুদ্ধি মুখ্যত ভাবমানসের।

ভাবমানসকে শুদ্ধ করতে হলে সুখ-দুঃখ আর ইচ্ছা-দ্বেষের উর্ধ্বে যেতে হবে। দুঃখের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক বিরাগ আছে, সুতরাং তার উর্ধ্বে যাওয়ার প্রেরণা সহজেই

পাই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সুখকে নিয়ে। সুখের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক বলে তাকে আঁকড়ে থাকতে চাই এবং ঠিক সেইজন্যেই আবার দুঃখ পাই! দুঃখকে চিনতে আমাদের ভুল হয় না, কিন্তু সুখকে চিনতে ভুল হয়। সুখকে মনে করি বস্তু-নির্ভর—ভুল এইখানে। ভুল শোধরাতে দুঃখের সঙ্গে-সঙ্গে সুখকেও জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে চাই সর্বনাশা বৈরাগ্যের তাগিদে, এও কিন্তু আরেকটা ভুল। সুখ বস্তুনির্ভর নয়—ভাবনির্ভর, আত্ম-চৈতন্যের প্রশান্তিই তার উৎস, এইটুকু যদি বুঝতে পারি, তাহলে আর কোথাও ভুলের মাশুল গুনতে হয় না। আত্মচৈতন্যের প্রশান্তিতে যে-সুখ, সেই সুখ দিয়ে তখন দেহের প্রাণের ইন্দ্রিয়ের মনের সুখকে ভাবিত করি। আমি তখন আত্মারাম, আমার সব-কিছুতেই সুখ—তথাকথিত সুখ-দুঃখেও সুখ। তাকে আর সুখ না বলে বলতে পারি আনন্দ।

আনন্দ আমার স্বরূপ। আনন্দে আমি আত্মারাম বলেই বিশ্ব আমার কাছে রমণীয়। আমি তাকে ভালবাসি, তার আলো-ছায়া ভালো-মন্দ সব নিয়ে তাকে ভালবাসি। দেখি, সে বিষ্ণুর রমা, তাঁর শ্রী, তাঁর কমলা—তাঁর হিরণ্যগর্ভ আকৃতির প্রচ্ছটা।

এই আনন্দ-প্রতিষ্ঠাতেই ভাবনাবস শুদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয় আর সংবেগের গভীরে নিষিক্ত হয়ে তাদের অভ্যস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপান্তর ঘটিয়ে ইন্দ্রিয়মানস আর সংবেগমানসকেও সে শুদ্ধ করে।

৭

বুদ্ধির শুদ্ধি

প্রথমে বুঝতে হবে বুদ্ধি কি এবং তার জন্য মন আর বুদ্ধির তফাতটা বুঝে নিতে হবে। একেবারে গোড়া ধরে আলোচনা শুরু করা যাক।

প্রথমটায় দেখছি, প্রকৃতি জড়। তার মধ্যে ক্রমে-ক্রমে চেতনাকে উন্মেষিত করছে প্রাণ। চেতনার উন্মেষের যে-আয়তন বা আধার তা-ই হল দেহ। বৈদিক ঋষির ভাষায়, দেহ গড়তে গিয়ে প্রাণ হল অন্নাদ আর জড় তার অন্ন। অন্ন আহরণের চেষ্টা থেকে প্রাণের বৃত্তি দেহের মধ্যে ধরল ইন্দ্রিয়ের রূপ। দু'প্রস্থ ইন্দ্রিয়—বাইরকে জানবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর তার উপর ক্রিয়া করবার জন্য কর্মেন্দ্রিয়। গোড়ায় তারা প্রাণধারণের জন্য অন্ন আহরণ আত্মরক্ষা প্রজনন ইত্যাদি জীবনযোনি প্রযত্নেরই সাধন। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সুচল করবার জন্য দেহের সূক্ষ্মভাগ দিয়ে দু'প্রস্থ নাড়ীরও সৃষ্টি হল—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জন্য সংজ্ঞাবহা আর কর্মেন্দ্রিয়ের জন্য আজ্ঞাবহা নাড়ী।

ইন্দ্রিয় আর নাড়ীতন্ত্র নিয়ে প্রাণের কাজ প্রথমটায় চলতে লাগল যন্ত্রের মত। চৈতন্য

জড়িয়ে আছে সবার সঙ্গে, কিন্তু খুব স্পষ্ট হয়ে নয়। কাজ চলছে অবচেতন সংস্কারের বশে, অথচ অনেকসময় এমন আশ্চর্য নিখুঁতভাবে যে মানুষের বুদ্ধিও তার কাছে হার মানে। কিন্তু বস্তুত তখন পর্যন্ত চেতনা আচ্ছন্ন, তার মধ্যে মনেরই উন্মেষ হয়নি।

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে-বোধ জন্মে, সে যদি বিষয়নিরপেক্ষ একটা স্বতন্ত্র সত্তা পায়, তাহলে তাকে চেতনার স্পষ্টতা বলে ধরতে পারি। এইখানে মনের সৃষ্টি হয়। একটা ফুলের সঙ্গে চোখের যোগ হল, ফুলের বোধ জন্মাল। ফুলটা না থাকলেও যে-চেতনায় ফুলের রূপটা থেকে যাবে, তাকে বলতে পারি মন। চোখ যেমন বহিরিন্দ্রিয়, মন তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়। বোধের ছবিগুলি মনের মধ্যে প্রথমটায় স্পষ্ট হয় না, কিন্তু মন যতই জোর ধরতে থাকে ততই তারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বোধের স্পষ্টতার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দেয় তার বৈচিত্র্য। তখন তাদের মধ্যে প্রয়োজন-মত ছাঁটাই-বাছাই করবার দরকার হয়। আবার একজাতীয় অনেক বোধের সমাহার থেকে সাধারণ একটা বোধের উন্মেষ হয়, যার সংজ্ঞা সামান্যপ্রত্যয় (knowledge of the universal, concept)। নির্বাচন আর সামান্যপ্রত্যয়ের সাহায্যে ভিতরে-ভিতরে একটা আলাদা বোধের জগৎ যেন গড়ে ওঠে। সাংখ্যের ভাষায় তখন পুরুষ যেন প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে তাকে চালিয়ে নেবার যোগ্যতা অর্জন করে। এমনি করে বুদ্ধির উন্মেষ হয়।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, ইন্দ্রিয় যতটা অবশ, মন ততটা অবশ এবং যান্ত্রিক নয়, যদিও তার ক্রিয়ার মালমশলা সব সংগ্রহ করতে হয় ইন্দ্রিয়বোধ থেকেই। বুদ্ধিতে এসে চেতনা ইন্দ্রিয়বশ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বুদ্ধি বিবিক্ত, সামান্যগ্রাহী, নির্বাচক এবং মনের শাস্তা। কিন্তু প্রথমটায় যেমন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের, তেমনি মনের সঙ্গে বুদ্ধির বাধাবাধি থেকেই যায়। শুদ্ধির একটা ধারা হল এই ব্যামিশ্রতা দূর করা, একথা আগেই বলেছি।

*

পশুর মন আছে কিন্তু বুদ্ধি নাই। বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে মানুষের মধ্যে। এই উন্মেষের মূলে আছে বিবেক। মানুষের চেতনা ইন্দ্রিয়বোধ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে পারে, স্মৃতি কল্পনা আর সামান্যপ্রত্যয়ের সহায়ে অন্তরে একটা আলাদা বোধের জগৎ গড়ে তুলতে পারে—এই তার বৈশিষ্ট্য। আর এইজন্যই মানুষ বুদ্ধিমান জীব। আবছা একটা বুদ্ধি পশুর মধ্যেও আছে, কেননা চেতনার বৃত্তিগুলিকে কোনও অবস্থাতেই পায়রাখুপী করে রাখা যায় না। কিন্তু তবুও পশুতে বুদ্ধি সংস্কারযুক্ত (instinctive) অতএব অবশ, আর মানুষের মধ্যে ভাবনাযুক্ত (reflective) অতএব স্ববশ।

বুদ্ধির আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, তার মধ্যে চেতনার পরাবর্তন (turning upon itself) সম্ভব। মানুষ যেমন বাইরকে জানে, তেমনি আবার নিজেকেও জানে; পশু নিজেকে জানে না। এই আত্মসচেতনতা আসে অবশ্য বিবেক থেকে, আর এটি মানুষেরই

বিশিষ্ট ধর্ম। মানুষ যখন আত্মসচেতন হয়, তখন তার মধ্যে দেখা দেয় আত্মনিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য —ইচ্ছা করলে প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তিকে সে সংযত করতে পারে। মানুষ একাদশীর উপবাস করে স্বেচ্ছায়; কিন্তু একটা গরুকে বেঁধে রেখে খেতে না দিলেই তবে তার একাদশী। নিরোধ (repression) আর সংযমের (control) তফাত এইখানে। সংযমও মানুষের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। বিবেক হতে জাত আত্মসচেতনতা এবং আত্মসংযম মানুষের জীবনে বুদ্ধির বিশিষ্ট পরিণাম।

এই বিবেক হতে বুদ্ধির পিছনে আমরা আবিষ্কার করি স্ব-তন্ত্র পুরুষকে। প্রকৃতিকে গুছিয়ে নেবার বশে আমরা চালনা করবার জন্য পুরুষের প্রধান সাধন তাহলে এই বুদ্ধি। কিন্তু প্রাকৃত চেতনায় বুদ্ধি জড়িয়ে আছে মনের সঙ্গে, মন চলছে অপরা-প্রকৃতির শাসনে। বুদ্ধির কাজ সেখানে মনের চকুম তামিল করা, তার গোছানো বাগানো চালানোর সামর্থ্যকে নিযুক্ত করা প্রকৃতির প্ররোচনাকে সাধক করবার কাজে।

*

মন দিয়ে আমরা যেমন বহিঃপ্রকৃতিকে জানি এবং বুদ্ধির সহায়ে তাকে শাসন করি বশে আনি, তেমনি বুদ্ধি দিয়ে আমরা জানি নিজেকে অর্থাৎ আমাদের অন্তর্যামী পুরুষকে। পুরুষকে জানার একটি তাৎপর্য হল অন্তঃপ্রকৃতিকে শাসনে আনা। প্রকৃতির বশীকারের আবার দুটি লক্ষ্য হতে পারে, এক তার অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির নিরোধ, আর তার শুদ্ধ প্রবৃত্তির স্ফুরণ। প্রকৃতির যেসমস্ত প্রবৃত্তি আমাদের অবাঞ্ছিত—যেমন আমাদের সাধারণ জীবনের নানা খাদেরা —সেগুলিকে আমরা ফেলতে পারি অপরা-প্রকৃতির এলাকায়। এগুলিকে দূর করতে পারলে আমাদের মধ্যে স্বভাবতই শুদ্ধ বা পরা প্রকৃতির উন্মেষ হবে, যার বৃত্তি হল প্রশান্তি প্রকাশ প্রসন্নতা বীর্য ইত্যাদি। এই যে অপরা প্রকৃতি হতে পরা প্রকৃতিকে বিবিক্ত করা এবং তার স্ফুরণের বাধাকে অপসারিত করা—এই হল অধ্যাত্মসাধনায় বুদ্ধির বিশেষ কাজ।

প্রকৃতিবশীকারের দুটি ধারার কথা আমরা জানি। একটি হল, পুরুষকে প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত ক'রে কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত করা। অগ্র্যা বুদ্ধিকে তখন আমরা বিবেক-সাধনের কাজে লাগাই, একে-একে প্রকৃতির সমস্ত পর্ব পার হয়ে অবশেষে তাকে দাঁড় করিয়ে দিই অসঙ্গ পুরুষের মুখামুখি। বুদ্ধির ভাস্বরতায় তখন পুরুষের যে-উপলব্ধি হয়, যোগের ভাষায় তাকে বলে সম্প্রজ্ঞান। আরেক ধাপ এগিয়ে গেলে যার বুদ্ধিও থাকে না, কি থাকে তা বলা যায় না; তাকে বলে অসম্প্রজ্ঞান। এই হল নিরোধযোগের পথে বুদ্ধির প্রয়োগ।

কিন্তু প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হওয়া যেমন তার বশীকার, তেমনি তার ঈশ্বর হওয়াও বশীকার। পুরুষ 'কেবল' এই যেমন তাঁর স্বরূপের একদিক, তেমনি তিনি 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ' এও তাঁর স্বরূপের আরেকদিক। বস্তুত নিরোধযোগে প্রকৃতির রাশ টানতে গিয়ে পুরুষের মধ্যে যে-শক্তি জাগে, তার এক অংশে আপনাহতেই বিভূতিতে উছলে পড়তে পারে।

বৈরাগ্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, কৈবল্যের সঙ্গে বিভূতির, শিবের সঙ্গে শক্তির তাই যুগনদ্ধতার সম্পর্ক। অসঙ্গ কৈবল্যে প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করে দিব্যবিভূতিতে তাকে উল্লসিত করাতেই পুরুষের স্বরূপশক্তির পূর্ণ পরিচয়। আমরা শুদ্ধবুদ্ধিকে এইদিকেও প্রয়োগ করতে পারি।

বুদ্ধিও দুরকমের—প্রাকৃতবুদ্ধি আর শুদ্ধবুদ্ধি। প্রাকৃত বুদ্ধিকে গীতায় বলা হয়েছে গুণময়ী বুদ্ধি : তামসী রাজসী আর সাত্ত্বিকী—তার এই তিন ভেদ। এ-বুদ্ধিও জীবনের দিশারী, কিন্তু তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, সে মনের তাঁবেদার। আমাদের প্রাকৃত জীবন চলছে তার নির্দেশে। তার গতি বহিরাবৃত্ত। আর শুদ্ধবুদ্ধির গতি অন্তরাবৃত্ত। এ-বুদ্ধি আবিষ্কার করতে চায় পুরুষের স্বারাজ্যের মহিমাকে। প্রাকৃত বুদ্ধিকে সে নিরস্ত করে না, কিন্তু তার বৃত্তিকে পরিশোধিত করে তাকে সেই মহিমার অনুগত করতে চায়। অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে-কামপুরুষ (desire-soul), তার চেতনা সঙ্কীর্ণ, তার ভাবনা-বেদনা-সঙ্কল্প ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। জগতের অধিকাংশ মানুষ এই স্তরের। কিন্তু যাঁরা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কবি শিল্পী ধর্মবুদ্ধি এবং পরার্থপর, তাঁরা এর চাইতে উপরের স্তরের। তাঁদের চেতনা উদার, ইন্দ্রিয়পরতা হতে মুক্ত বস্তুর চাইতে ভাবকে তাঁরা বড় বলে জেনেছেন, একটা মহত্তর আদর্শের প্রেরণা তাঁদের মধ্যে আছে, একটা ঊর্ধ্বশক্তির আলো তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে। তাঁদের এই মহিমা শুভ বুদ্ধিরই প্রসাদ।

কিন্তু এও শুদ্ধবুদ্ধির সূচনা মাত্র। সিদ্ধির পথে একে বলতে পারি প্রথম পদক্ষেপ, লক্ষ্য এখনও বহু দূরে। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য দুটি সাধনা অপরিহার্য এক, অপরা-প্রকৃতির সংস্কারাচ্ছন্ন যান্ত্রিক মূঢ়তা হতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা আর, অন্তরাবৃত্ত আত্মচৈতন্যের গভীরে এক লোকোত্তর স্বয়ম্ভু পুরুষকে আবিষ্কার করা যিনি আমাদের সমস্ত শুভপ্রবৃত্তির উৎস। এরই ফলে আমাদের ভাবনায় জ্বলে উঠবে সমস্ত সংস্কার হতে মুক্ত বোধির ঋতম্ভরা দীপ্তি, ভাবনালস আপ্লুত হবে হর্ষ-শোকের দ্বন্দ্ব হতে নির্মুক্ত মহত্তর রস-চেতনার প্রসন্ন আস্বাদে, মর্মবুদ্ধিতে জাগবে লোকাপেক্ষাহীন ঋতানুবর্তনের সুকল্যাণ অকুণ্ঠতা, কর্মের মূলে থাকবে গতানুগতিকতার মূঢ়তা হতে মুক্ত হয়ে সৃষ্টির উল্লাসে ফুল ফুটিয়ে চলার প্রেরণা। বুদ্ধিতে আত্মমহিমার অবারিত দীপ্তিতেই তার শুদ্ধি এবং সিদ্ধি।

*

শুদ্ধবুদ্ধির এই স্বরূপ। এখন বলি তার অশুদ্ধির কথা। বুদ্ধিকে কলুষিত করে বাসনা ভাবপ্রবণতা আর ইন্দ্রিয়পরতা। তিনটিই অপরা-প্রকৃতির বৃত্তি, গড়পড়তা মানুষের স্বভাবধর্ম। তাদের মূলে রয়েছে চেতনার সঙ্কোচ আর বস্তুনির্ভরতা। উপ-নিষদের সেই কথা ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খোলা বাইরের দিকে, মানুষ তাই কেবল বাইরটাই দেখে, ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখে না। তাইতে পশু যেমন সহজ সংস্কারের বশে চলে, মানুষও তেমনি চলে গতানুগতিকতার আবর্তনে আবর্তিত হতে-হতে। অথচ এমন করে চলতে সে বাধ্য নয়। তারও মধ্যে আছে স্বোত্তরণের (self-exceeding) প্রবেগ, অন্তরা-

বৃত্তির অভীপ্সা। তাই প্রকৃতির এই আবর্তন থেকে একসময় সরে দাঁড়াবার ইচ্ছা তার প্রবল হয়ে উঠে। সবার হয় না, কিন্তু কারও-কারও হয়। যার হয়, উপনিষদে তার সংজ্ঞা 'ধী-র' কি না বুদ্ধিযুক্ত। অপরা-প্রকৃতির আবর্তন হতে সে বিবিক্ত। চাকা ঘুরছেই, কিন্তু চাকার সঙ্গে আর সে বাঁধা নয়—সে চক্রবর্তী। বাইরে আবর্তন, কিন্তু অন্তরে গভীর শান্তি—অন্তরাবৃত্তি হতে, প্রাকৃতক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হওয়ার ফলে। এই হল ধীরের পরিচয়।

বুদ্ধির অবিশুদ্ধির তিনটি স্তর আছে। একটির কথা এই মাত্র বললাম—অপরা-প্রকৃতির যান্ত্রিকতার অনুবর্তন, সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে চলা, নিজের কথা নিজে না ভেবে অন্যের চালনায় অন্ধের মত চলা। সংসারের বেশীর ভাগ মানুষের এই দস্তর। তাদের বুদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে ইন্দ্রিয়পরতার উপর।

এর চাইতে উঁচু স্তরের বুদ্ধি হল অভ্যুদয়বাদী বা প্রগতিসাধকদের। প্রাকৃতজনের মত তাঁরা এক জায়গায় থেকে কেবল কলুর বলদের মত পাক খেয়ে মরেন না, তাঁরা চান এগিয়ে যেতে। বুদ্ধিকে তাঁরা প্রয়োগ করেন জীবনের অভ্যুদয়সাধনার কাজে। কিন্তু তাঁরাও ঐ চাকাতেই বাঁধা। শুধু তফাত এই, তাঁদের বেলায় চাকাটা এক জায়গায় থেকে ঘোরে না, ঘুরতে-ঘুরতে এগিয়ে চলে, কিন্তু চলে একই সমতলের উপরে। তাঁদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়শাসিত না হলেও মনঃশাসিত। তাঁদের পুরুষার্থের আদর্শ মনের রচিত, এবং শেষ পর্যন্ত তার ভিত্তি ঐ ইন্দ্রিয়সংবিৎ। এ-বুদ্ধি প্রজ্ঞাবাদী, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ নয়। সত্যের ব্যাবহারিক দিকটাই সে দেখে, পারমার্থিক দিকটা নয়। জীবনসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গেই তার উল্লাস, তার অতলের প্রশান্তি তার অগোচর। আধুনিক সভ্যতায় এই বুদ্ধিরই জয়-জয়কার। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ-বুদ্ধিও অবিশুদ্ধ। উপনিষদের ভাষায় এ নয়বিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নয়, তাই লোকোত্তীর্ণও নয়। অভ্যুদয় ইন্দ্রিয়যান মানুষকে অনেক-কিছুই দিয়েছে, কেবল দিতে পারেনি প্রশান্তির প্রসন্নতা।

এরও চাইতে উঁচুস্তরের বুদ্ধি হল সত্যানুসন্ধিৎসু দার্শনিকের। সমগ্র সত্যকে জেনে মানুষের জীবনে তাকে প্রতিফলিত করবার আদর্শদ্বারা এই বুদ্ধি অনুপ্রাণিত। আদর্শ মহান, কিন্তু আদর্শে আর বাস্তবে তবুও দুস্তর ফাঁক থেকে যায়। বুদ্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে গোড়াতেই বলেছি, তার মধ্যে জ্ঞান আর সঙ্কল্পের সমন্বয় হওয়া চাই, পুরুষের প্রজ্ঞার মধ্যে প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করবার সামর্থ্য থাকা চাই। দার্শনিক বুদ্ধির প্রথম ত্রুটি সঙ্কল্পের ন্যূনতায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, দার্শনিক দর্শনের একটা বিরাট ইমারত গড়েছেন—কিন্তু তার ভিত্তি বালির উপরে। জগতের সব তিনি জেনেছেন, কেবল জানেননি নিজেকে। লোকোত্তর সত্যের পরিচয় তাঁর হাতের মুঠায়, কিন্তু জীবনসত্য যে কখন আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়েছে টেরও পাননি। দার্শনিক বুদ্ধির দ্বিতীয় ত্রুটি, অনেক দর্শনেই দৃষ্টির ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু গভীরতা নাই। এ-যুগের অনেক ঐহিক দর্শনের এই ত্রুটি। তার

মধ্যে বুদ্ধির চমৎকার আছে, অনুসন্ধিৎসার আন্তরিকতা আছে; কিন্তু গোড়াতেই জীবনকে সে হয়তো দেখেছে কেবল প্রবৃত্তির দিক থেকে, তার যে নিবৃত্তিমুখী একটা গতি আছে তা সে জানলেই আনেনি। তেমনি আবার নিবৃত্তিপর দর্শন প্রবৃত্তির দিকটাকে চেয়েছে চেপে যেতে বা ছেঁটে ফেলতে। এই থেকে দেখা দিয়েছে দার্শনিক বুদ্ধির আরেক ত্রুটি—তার একদেশদর্শিতা। অর্থাৎ অধিকাংশ দর্শনই সম্যক্ (integral) দর্শন নয়, কিংবা ফলিত দর্শন নয়—যদিও দর্শনেই মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে। এক-কথায় অধিকাংশ দার্শনিকই যোগী নন, কিংবা যোগী হলেও যোগের পূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত নন। এই হল তৃতীয়স্তরের বুদ্ধির অবিশুদ্ধি।

বুদ্ধির সব অবিশুদ্ধির হেতু হল তার ব্যামিশ্রতা। আসলে আমাদের বুদ্ধি যত উঁচুতেই উঠুক না কেন, সে একান্তভাবে জড়িয়ে আছে মনের সঙ্গে। তাই তার সব প্রত্যয়ের উপর পড়ে মনের ছায়া। মন স্বভাবত বিভজ্যদর্শী, অখণ্ড সত্যকে সে দেখে খণ্ড-খণ্ড করে। অখণ্ডদর্শনের অধিকার আছে বুদ্ধিরই, কেননা সামান্যপ্রত্যয় তার স্বধর্ম। কিন্তু মনের আওতায় পড়ে বুদ্ধিও অখণ্ডের একেক দিককে একেক সময় একান্ত করে তোলে। সব দিককে ধরতে পারলেও তার মধ্যে একটা পর্যায়বোধ থেকে যায়, অখণ্ডের সামরস্যে সবাইকে জারিত করে নিতে সে পারে না। বুদ্ধি হয়তো বোঝে, শূন্যও সত্য, পূর্ণও সত্য। কিন্তু বোঝে পর্যায়ক্রমে। দুটী একসঙ্গে কি করে সত্য হয় তা সে বোঝে না, কেননা মনও তা বুঝতে পারে না। তাইতে অখণ্ড সত্যকে জীবনে রূপ দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার নিজের শূন্যতার আপূরণ করতে বুদ্ধি পরমসত্যের সন্ধানে কখনও নিজেকেও ছাপিয়ে যায়। তখন আর তার বোঝবার কিছু থাকে না, এক সর্বনাশা নাস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্বের সকল উল্লাস তলিয়ে যায়। এও বুদ্ধির পরাভব, অতএব একটা ন্যূনতা।

*

তাহলে বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে হলে তাকে মনের ছায়াপাত হতে মুক্ত করতে হবে। অথচ তার জন্য নিজেকে ছাপিয়ে যাবার চেষ্টায় তাকে শূন্যে লীন হলেও চলবে না। সমস্যার সমাধান হবে বুদ্ধির বিজ্ঞানে রূপান্তরে। মন বুদ্ধি আর বিজ্ঞান—চৈতন্যের এই তিনটি শক্তিকে পর-পর স্থাপনা করা যেতে পারে। জানার রীতি দিয়ে তাদের স্বরূপ বোঝানো যায়। মন জানে সব-কিছুকে তার বাইরে রেখে, জানে টুকরা-টুকরা করে; কেননা তার জানার সাধন হল ইন্দ্রিয়, যারা স্বভাবতই বিশেষদর্শী। মনের বিশেষদর্শনকে সামান্য-প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করে বুদ্ধি। কিন্তু তার সামান্যপ্রত্যয় আবছা। একটা মানুষকে আমি স্পষ্ট করে দেখতে পারি, স্পষ্ট করে ভাবতেও পারি; কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রত্যয় আমার কাছে নিশ্চিত এবং ব্যবহার্য (pragmatic) হলেও আবছা। তাছাড়া বুদ্ধির এ-জানাও জ্ঞেয়কে বাইরে রেখে জানা। কিন্তু জানার আরেকটা ধরন আছে—হয়ে জানা। তার সূচনা নিজেকে জানাতে। নিজের দেহ-প্রাণ-মনকে আমরা অপরোক্ষভাবে জানি। এ-জানা

হয়ে জানা এবং বিশেষকে জানা, তার স্পষ্টতা এবং তীক্ষ্ণতা আছে। কিন্তু এ-জানার মধ্যে ব্যাপ্তি নাই বলে তার পীড়াও আছে। আমরা জানি আমাদের সুখ-দুঃখে ইচ্ছা-দ্বেষে আন্দোলিত বিকৃত আমিটাকেই। বিকারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি চেতনার ব্যাপ্তিতে, নিজের সম্পর্কে সামান্যপ্রত্যয়ে। আগেই দেখেছি, এই সামান্যপ্রত্যয় বুদ্ধির আছে—বিষয়-সম্পর্কে ; কিন্তু বিষয় সেখানে বোদ্ধার বাইরে। এখন, এমন-এক জ্ঞান আমরা যদি পাই যা আগ-পর এবং সামান্য-বিশেষের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছে, তাহলে তা-ই হবে বিজ্ঞান (gnosis)। উপনিষদে বিজ্ঞানের একটি সূত্র 'যস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ'—তিনিই বিজ্ঞানী যাঁর আত্মাই হয়েছে এই সব-কিছু। এই হল যথার্থ ঘরে জানা। আর এই জানার মধ্যে আছে হওয়ার সংবেগ, তাই প্রজ্ঞা আর সঙ্কল্প এখানে এক হয়ে আছে। ঋষিরা উপমা দিয়েছেন সবিতার—যিনি জগৎ প্রসব করছেন, প্রচোদিত করছেন, হয়ে আছেন। তিনি প্রজ্ঞা, তিনি আনন্দ, তিনি বীর্য।

বুদ্ধির স্বনিষ্ঠ সামান্যপ্রত্যয়কে অন্তরাবৃত্ত এবং আত্মনিষ্ঠ করে অন্তরাকাশে চিৎসূর্যকে আবিষ্কার করতে হবে এবং প্লাবিত হতে হবে ওঁরই সাবিত্রী শক্তিতে। এই হল বুদ্ধির শুদ্ধি এবং সিদ্ধির স্বরূপ।

[ক্রমশঃ]

Only a change of consciousness and the conquest over falsehood can change the conditions of the world.

— The Mother

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যগুরু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যারত্ন বি, ই, এম, আর, এস-এর কয়েকখানি অনবদ্য গ্রন্থ :

The Swami Vivekananda—A study Rs. 3.00

বিবেকানন্দ—জীবন ও জিজ্ঞাসা ১.৫০

স্বামীজীর জীবন ও দর্শনের এমন বলিষ্ঠ নির্ভীক সমালোচনা বিরল।

উড়িষ্যার দেবদেউল ৫.৫০

উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর আলোচনা,
পাশ্চাত্য ও ভারতীয় স্থাপত্যরীতির তুলনামূলক বিচার।

বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর

ভারতীয় জীবনধারায় ইংরেজী ভাষার অনুপ্রবেশের প্রামাণ্য ইতিহাস।

কন্‌টেম্‌পোরারি পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

প্রধান কার্যালয় :—১২ নেতাজী সুভাষ রোড.

ক লি কা তা—১

With complements from

STANDARD VULCANISING CORPORATION

1B, Ballygunje Circular Road

CALCUTTA-19

PHONE—443701

ESSO DEALER

A Super Station Dedicated to Happy Motoring !

নূতন বই

Meditations on Savitri	(Illustrated)	40.00
Way of Light	T. V. Kapali Sastri	8.00
বাংলার প্রাণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩.৫০

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী–২

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের

★ কবির্মনীষী

★ রবীন্দ্রনাথ

(রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক)

★

শ্রীমৎ অনির্বাণের

দিব্যজীবন প্রসঙ্গ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির—১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম—পণ্ডিচেরী

The merely sceptical mind loses itself in the void.

— Sri Aurobindo

With compliments from:-

Tata Scob Dealers (Controlled Stock) Cal. Ltd.,

20, Strand Road,

CALCUTTA-1.

Telephone : **22-1101-1107** *Telegram :* **TASCOB**

The thoughts of the Divine are like white doves of peace and sweetness.

— The Mother

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

The purposeless exaggeration of anything is always an evil.

— Sri Aurobindo

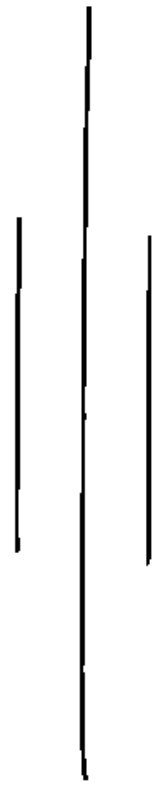

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

PNE : 47-2H0963

FAMOUS GROCER AND SPICES DEALER
OF
SOUTH CALCUTTA

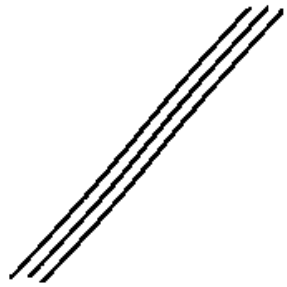

ASWINI KUMAR NANDI & SONS

JADU BABU'S BAZAR
BHOWANIPORE
CALCUTTA - 25

PHONE : 31-2665 GRAM : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

DESIGNED

The Kuljian Corporation of India service organisation specialising in consulting engineering. ■ In its fully—equipped office in Calcutta, the Corporation has assembled a well-knit team of about a hundred trained Indian and American construction engineers and draughtsmen all qualified by experience in project construction. ■ Backed by the experience of a decade in power engineering in India and proud of the tradition of its American collaborators whose famous name it bears, the Corporation welcomes exacting assignments of all types, in any part of India, any time. ■ From feasibility report to initial operation is the scope of Kuljian service; from power plants to all-type public works is the range of Kuljian operation.

SURVEY
REPORT
DESIGN
ENGINEERING
PROCUREMENT
CONSTRUCTION
INSPECTION
INITIAL OPERATION

The **Kuljian** *Corporation*
(INDIA) PVT. LTD.
ENGINEERS • CONSTRUCTORS
24-B, Park Street, Calcutta 16

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

FOR SERVICE

"Having realised infinite unity in ourselves, then to give ourselves to the world is utter freedom and absolute empire."

— *Sri Aurobindo*

The best means of routing the enemy is to laugh in his face.

— The Mother

NATIONAL GENERAL TRADING

19, STRAND ROAD

CALCUTTA-1.

GRAM: DONWEL

PHONE: 22-3577
35-3314

Troubled by insects ? ?

If so, please do not hesitate to make use of our
up-to-date scientific and efficient servicing arrangements
by specially trained staff for completely
disinfecting your premises with :

I.C.I.'s "GAMMEXANE" FORMULATIONS

Eastern Insecticide & General Merchandise Pr. Ltd.

(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)

4, Lyons Range
CALCUTTA-1

For your Electrical Services

CONSULT

FARADAY ELECTRICALS

79, DHARAMTALA STREET

Show Room: 9, Lower Circular Road
CALCUTTA—16.
PHONE—24-2012.

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

It is the unfaithful who get angry when they see faithfulness in others.

— Sri Aurobindo

Independence Transport & Shipping Agency,
P. 40, Princep Street,
CALCUTTA-13.

Phone : **23-6503**

Cable : **ITSACINCH**

To dwell in the psychic is to be lifted above all greed.

— The Mother

For all sorts of glasses for Buildings, Furniture and Cars, please send your enquiry to :—

B. K. SHAW & CO.,

P - 20, Radha Bazar Street,
CALCUTTA - 1

Cable : BIKEGLAS Phone : 22-5613

Telegrams: **'Vessel' Cal**
Codes { Scotts 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : 23-1393 Dock Office : Residence : { 55-6461 55-3724 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

The cure from all difficulties can come when the egoistic concentration upon one's desire and convenience ceases.

— The Mother

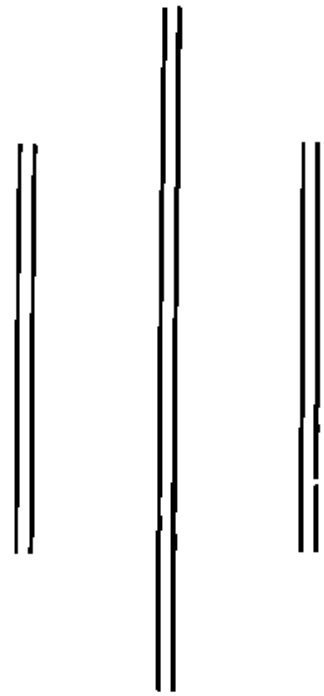

BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

সর্বোৎকৃষ্ট
ঝাঁঝযুক্ত
প্রতি গৃহে ব্যবহৃত
সরিষার তৈল
১/২, ১, ২, ৪ ও ১৬।০ কে. জি. টিন এবং ৪০ কে. জি. ও ২০ কে. জি. শীল করা ড্রামে পাওয়া যায়।
গণেশ
সরিষার তৈল
প্রাগ অয়েল মিলস · আলীগড়।

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বার্ত্তিকা

[শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও দর্শন বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা]

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির প্রকাশনা

23 AUG 1963

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

কবির্মনীষী	৩.৫০
রবীন্দ্রনাথ (৩য় সং)	৩.৫০
স্মৃতির পাতা	·৷

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

সাধনার জীবন	১.০০

Loving Homage	Rs. 10.00
The Golden Book of the Mother	Rs. 100.00 (*De Luxe Edn.*)
	Rs. 60.00 (*Ordinary Edn.*)

Phone : 34-2376 Gram : "SRIMANDIR"-Cal.

SRI AUROBINDO PATHAMANDIR

15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

Study Circle Meeting Programme

For July 1963

Date	Lecturer	Subject	Time
Sat. July 6	Sri Makhanlal Dhar	The Life Divine	5-30 P.M.
Sat. July 13	Sri Sudhansu Mohan Banerjee	The Dreams of Sri Aurobindo II	5-30 P.M.
Sat. July 20	Srimati Anirvan	Isha Upanishad V (Tape Recorded)	5-30 P.M.
Sat. July 27	Sri Subodh Ranjan Maitra	The Synthesis of Yoga	5-30 P.M.

Daily Evening Meditation 7-5 P.M.—8 P.M.
Saturday Evening Meditation 7 P.M.—7-15 P.M.
Sunday Evening Meditation 7 P.M.—7-30 P.M.

Working hours of the Pathamandir :—
On Weekdays—From 2 P.M.—8 P.M.
On Saturdays—From 2 P.M.—7 P.M.
On Sundays —From 1 P.M.—6 P.M.

বর্তিকা

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৩

বর্ষ—২৩ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৩)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

১। মায়ের বাণী		১
২। ঋগ্বেদ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭
৩। শ্রীঅরবিন্দ নমস্তে	স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী	১১
৪। স্মৃতির পাতা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৩
৫। মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	২০
৬। প্রশ্নোত্তর	শ্রীমা	৩০
৭। যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	৩৪
৮। বঙ্গোপসাগর উপকূলে	শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯
৯। ডাঃ কে, ডি, ঘোষের পরলোকগমনে		৭০
১০। কঠিন ডানার ওড়া	বীরবাহু	৭৬

বর্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৯শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১॥০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Edited by: NOLINI KANTA GUPTA

Printed by: AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

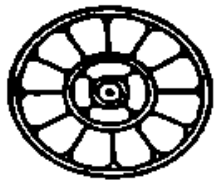

1 - 4 - 63

When men will understand that the Divine knows better than they do what is the best for them, many of their difficulties will disappear

J.

মায়ের বাণী

("বুলেটিন" থেকে গৃহীত)

১৯৬২

যখন আমাদের সমবেতভাবে কাজ করতে হয়, তখন আমাদের চিন্তায়, আমাদের অনুভবে, আমাদের কর্মে সর্ব্বদাই জোর দেওয়া উচিত অনৈক্যের নয়, ঐক্যের বিষয়গুলির উপর।

যা আমাদের মিলিয়ে ধরে যতটা সম্ভব তাকেই প্রাধান্য দেবে, যা আমাদের আলাদা করে ধরে তা গণনায় আনবে না।

আমাদের কার্য্যের ধারা স্থূলতঃ যদিও বা বিভিন্ন ধরণের হয় সেখানেও আমাদের মিল থাকতে পারে অটুট অবিচ্ছিন্ন, যদি আমরা সর্ব্বদা আমাদের স্মরণে রাখতে পারি সেই সব তত্ত্ব ও তথ্য যা মিলিয়ে ধরে, আর সেই দিব্য লক্ষ্যটি এবং সেই সংসিদ্ধি যা আমাদের সকল আশ্পৃহা, সকল কর্ম্মের চিরন্তন লক্ষ্য।

*

আরো ঠিক হয় যদি বলা যায় যে জীব (অন্তঃপুরুষ) একটা ক্রমোন্নত রূপ ধারণ করে চলে, তাই শেষে হয়ে ওঠে চৈত্যসত্তা। কারণ জীব হল ভগবানের একটা অংশ, অপরিবর্ত্তনীয় অবিনশ্বর। চৈত্যসত্তা নিত্য প্রগতিশীল এবং অমর।

আত্মসংজ্ঞানের, আত্মসংগঠনের, আত্মকর্তৃত্বের জন্য সব উপায়ই স্থূল। শুধু বেছে নিতে হবে কোনটিতে তোমার স্বতঃপ্রবৃত্তি, তোমার প্রকৃতির সঙ্গে মিল আছে। উপায় যখন ঠিক করা হয়েছে তখন নিজস্ব বুদ্ধি-শক্তির আশ্রয় নিতে হবে, তাকে প্রয়োগ করতে হবে অপরাজেয় ধৈর্য্যের সঙ্গে, কোন বাধা কোন বিঘ্ন যাকে হটাতে পারে না। কাজটি দীর্ঘ পুঙ্খানুপুঙ্খ, তাকে গ্রহণ করতে হবে আন্তরিকভাবে, অধিকতর, ক্রমে আরো অধিকতর এবং আরো নিষ্ঠাপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীণ আন্তরিকভাবে।

সহজ পথ সাধারণতঃ কোথাও নিয়ে যায় না—

*

কাজে তোমার আদর্শ হবে সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতা—তবেই তুমি সুনিশ্চয়ভাবে ভগবানের সত্যকার যন্ত্র হতে পারবে।

*

মতবাদ নানাবিধ, মার্গ হিসাবে, সম্প্রদায় হিসাবে, প্রত্যেকে নিজের নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থক চমৎকার যুক্তি সব এনে দেয়।

তারা যে সব কথা বলে তার মধ্যে সত্য আছে নিশ্চয়, আর সে সব প্রতিপাদ্য যে কেবল সম্ভব তা নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তাদের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল।

আমি কেবল বলতে পারি আমার নিজের অভিজ্ঞতা—জীব হ'ল ভগবৎস্বরূপ, পুরুষোত্তম ভগবানের চিরন্তন অংশ। সুতরাং সে কখনও কোন বিধির মধ্যে—তা যাই হোক না—আবদ্ধ হয়ে সীমিত হয়ে থাকতে পারে না—তার বিধি হল তার নিজস্ব।

এই সব জীব-সত্তাকে ভগবান নিজের ভিতর থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কাজ করবার জন্যে—প্রত্যেকে পৃথিবীতে আসে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা বিশেষ কাজের জন্যে, একটা বিশেষ নিয়তি নিয়ে—আসে নিজের অন্তরে বিশেষ বিধি নিয়ে, যে বিধি অলঙ্ঘনীয় তার নিজের পক্ষে, তা কখন সাধারণ বিধি হতে পারে না।

সুতরাং অনন্ত কালের বিবর্তনে সকল প্রতিপাদ্যই—তা করণীয় হোক আর অকরণীয় হোক—বাস্তবরূপ নিয়ে থাকবেই।

*

নিম্নতর প্রকৃতির কর্মযাত্রা সব বাস্তবে রয়েছে, এই অনুভূতিতে এদের স্বীকার করা বস্তুতন্ত্রতা হতে পারে, কিন্তু তা সাধনার অঙ্গ হতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য হল এ সব জিনিষ স্বীকার করে তার উপভোগ করা নয়, তা হল এ সবের থেকে মুক্তিলাভ করা এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের এবং সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার জীবন সৃষ্টি করা।

এরা রয়েছে, মেনে নেওয়া, এই রূপে যে এদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে, আমাদের স্পর্শ করতে তাদের দেওয়া হবে না—এ হল এক কথা; আর তাদের বরণ করে নেওয়া, তাদের অনুগত হওয়া হল সম্পূর্ণ আর এক কথা।

*

ভগবৎপ্রসাদে অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও নির্ভরই হল শেষ পর্যন্ত পরম জ্ঞান।

অহংকার রয়েছে যতক্ষণ ততক্ষণ প্রেমের স্থান নাই। এক প্রেমই প্রেমদান করতে জানে, একমাত্র প্রেমই অহংকে জয় করতে পারে।

*

আমরা চাই পূর্ণতা পূর্ণসিদ্ধি—এই মানুষী পূর্ণতা নয়, যা হল অহংকারের পূর্ণসিদ্ধি এবং যা ভাগবত পূর্ণসিদ্ধির পথে অন্তরায়।

আমরা চাই সেই পূর্ণসিদ্ধি যা পৃথিবীর উপর চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম।

*

তোমার জন্যে একটা দুর্যোগই যদি ভগবান চেয়ে থাকেন, তবে প্রতিবাদ করবে না, তাকে গ্রহণ কর আশীর্ব্বাদরূপে, আর বাস্তবিক তা আশীর্ব্বাদই হয়ে উঠবে।

১৯৬১

আর সকলে যা করে, ঠিক তাই—একটু ভাল করে—করবার জন্যে আমরা এখানে নই।

আমরা এখানে রয়েছি আর সকলে যা পারে না তাই করবার জন্যে, পারে না কারণ তাদের ধারণাতেই আসে না এমন কিছু করা যায়।

আমরা চাই ভবিষ্যতের সন্তান যারা তাদের কাছে ভবিষ্যতের পথ খুলে ধরতে।

আর যা-কিছু তা কষ্ট করে করবার মত কিছু নয়, শ্রীঅরবিন্দ যে সাহায্য এনেছেন তার যোগ্য নয়।

*

সত্য হল পরম সুষমা, পরম আনন্দ।

বিশৃঙ্খলা, দুঃখ মাত্রই মিথ্যা।

সুতরাং বলা যেতে পারে, ব্যাধি হল মূল শারীরিক মিথ্যা এবং তাই চিকিৎসকেরা হল সেই বৃহৎ বহৎ সেনাদল যাদের কাজ জগতে সত্যের জন্য যুদ্ধ করে চলা।

*

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিকার হল নিজের ক্ষেত্রে, নিজের ত্রুটি ও বাধা সম্বন্ধে চিন্তা করবে না।

চিন্তার বিষয় হোক শুধু যে মহৎ কাজ আমাদের করতে হবে, যে আদর্শ শ্রীঅরবিন্দ আমাদের দিয়েছেন পূর্ণ করতে—কাজটাই, আমরা যে কি ভাবে করি তা নয়।

*

এক আকার দিয়ে একত্ব আসে না।

একই রকমের কর্ম্মসূচী এবং পন্থা ধরে শিক্ষায় একত্ব আনা যাবে না।

একত্ব লাভ হবে সদা-সর্ব্বদা—ক্ষেত্রভেদে উক্ত হোক আর অনুক্ত হোক—মূল আদর্শটিকে মূল শক্তিকে কি জ্যোতিকে, আমাদের শিক্ষার আদি হেতু ও লক্ষ্যকে সম্মুখে ধরে রাখলে।

সত্যকার পরম একত্ব প্রকাশ পায় বৈচিত্র্যের মধ্যে। মানস যন্ত্রই চায় এক-আকার।

কার্যতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আবিষ্কার করতে হবে তার নিজস্ব পন্থা—যেটি তার বুদ্ধিগ্রাহ্য বা অনুভবগ্রাহ্য। এ ভাবেই শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে।

*

স্নেহের জন্য, প্রেমের জন্য স্পৃহা মানবীয় প্রয়োজন। কিন্তু তা পরিতৃপ্ত হতে পারে তখনই যখন ভগবানের দিকে সে মুখ ফেরায়। যতদিন তা তৃপ্তি চাইবে মানুষী আধারের মধ্যে ততদিন নিরাশ হয়ে ও আঘাত পেয়ে চলতে হবে।

*

জগতের ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ যা এনেছেন তা একটা সিদ্ধান্ত নয়, তা হল একটা আবির্ভাব, একটা সৃষ্টিশক্তি যা এসেছে সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে।

*

আনন্দের এই যে অপরূপ জগৎ আমাদের দুয়ারে—
পৃথিবীতে মানবের জন্যে যে রয়েছে
আমাদের আহ্বানের অপেক্ষায়।*

---

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ঋগ্বেদ

দশম মণ্ডল—দশম সূক্ত

ওচিৎ সখায়ং সখা বৃত্যাং তিরঃ পুরু চিদর্ণবং জগন্বান্।
পিতুর্নপাতমা দধীত বেধা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ ॥ ১ ॥

ন তে সখা সখ্যং বষ্ট্যেতৎ সলক্ষ্মা যদ্বিষুরূপা ভবাতি।
মহস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরা দিবো ধর্ত্তার উর্ব্বিয়া পরি খ্যন্ ॥ ২ ॥

উশন্তি ঘা তে অমৃতাস এতদেকস্য চিত্ ত্যজসং মর্ত্যস্য।
নি তে মনো মনসি ধায্যস্মে জন্যুঃ পতিস্তন্বমা বিবিশ্যাঃ ॥ ৩ ॥

ন যৎ পুরা চকৃমা কদ্ধ নূনমৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম।
গন্ধর্ব্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ ॥ ৪ ॥

গর্ভে নু নৌ জনিতা দম্পতী কর্দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ।
নকিরস্য প্র মিনন্তি ব্রতানি বেদ নাবস্য পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥

কো অস্য বেদ প্রথমস্যাহ্নঃ ক ঈং দদর্শ ক ইহ প্রবোচৎ।
বৃহন্মিত্রস্য বরুণস্য ধাম কদু ব্রব আহনো বীচ্যা নৃন্ ॥ ৬ ॥

যমস্য মা যম্যং কাম আগন্ সমানে যোনৌ সহশেয্যায়।
জায়েব পত্যে তন্বং রিরিচ্যাং বি চিদ্বৃহেব রথ্যেব চক্রা ॥ ৭ ॥

ন তিষ্ঠন্তি ন নিমিষন্ত্যেতে দেবানাং স্পশ ইহ যে চরন্তি।
অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ং তেন বি বৃহ রথ্যেব চক্রা ॥ ৮ ॥

রাত্রীভিরস্মা অহভির্দশস্যেৎ সূর্য্যস্য চক্ষুর্মুহুরুন্মিমীয়াৎ।
দিবা পৃথিব্যা মিথুনা সবন্বূ যমীর্যমস্য বিতৃয়াদৃজাসি ॥ ৯ ॥

যা যা তা গচ্ছাদুত্তরা যুগানি যত্র যামযঃ কৃণবন্নজামি।
উপ বর্বৃহি বৃষভায় বাহু মন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ১০ ॥

কিং ভ্রাতাসদ্যদনাথং ভবাতি কিমু স্বসা যন্নির্ঋতির্নগচ্ছাৎ।
কামমূতা ব্রহ্মেহ ব্রবীমি তন্বা মে তন্বং সং পিপৃগ্ধি ॥ ১১ ॥

ন বা উ তে তন্বা তন্বং সম্পৃচ্যাং পাপমাহুর্যঃ স্বসারং নিগচ্ছাৎ।
অন্যেন মৎ প্রমুদঃ কল্পয়স্ব ন তে ভ্রাতা সুভগে বষ্ট্যেতৎ ॥ ১২ ॥

রতৌ বভূসি যম নৈব তে মনো হৃদয়ং চাবিদাম।
অন্যা কিল ত্বাং কক্ষ্যেব যুক্তং পরিষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্ ॥ ১৩ ॥

অন্যমূ ষু ত্বং যম্যস্ত উ ত্বাং পরিষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।
তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কৃণুষ্ব সংবিদং সুভদ্রাম্ ॥ ১৪ ॥

ঋগ্বেদ

দশম মণ্ডল—একপঞ্চাশৎ সূক্ত

শ্রীমহিমীকান্ত গুপ্ত

১০

যমী

আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি সখার দিকে সখ্যের জন্য। পারাবতের এক বিশাল অর্ণবে তাই এসে গিয়েছি।

বিধাতা সঙ্কল্প করেছেন পৃথিবীর উপর হবে আমাদের পিতার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পুত্র। (১)

যম

সখা তোমার সখ্য কামনা করব না—আকৃতি বিভিন্ন হলেও, প্রকৃতি তাদের এক।

শক্তিময় মহতের বীরপুত্রেরা স্বর্গ ধারণ করে আছে, তারাই বৃহৎকে চারিদিকে ছড়িয়ে প্রকাশ করেছে। (২)

যমী

দেবতারা যা চায়, কেবল মর্ত্যেরই পক্ষে ত্যাজ্য তা?

তোমার মনকে তবে আমার মনের মধ্যে স্থাপন কর; জনকরূপে, পতিরূপে আমার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ কর। (৩)

---

(১) যম ও যমী বিবস্বান অর্থাৎ সূর্য্যের সন্তান, সূর্য্যের তপঃশক্তি, পৃথিবীর উপরে তাঁরা প্রাণশক্তি। তাঁরা এসে নিলেছেন এই প্রাণশক্তির পারে; পৃথিবীতে জীবের, বাষ্টি-রূপ ব্যক্তিরূপ সত্তার সৃষ্টির জন্য। মানুষের অন্তরে যে চিন্ময় স্বরূপ তার জন্ম ও বিকাশই দেবতাদের যজ্ঞীয় কর্ম্ম ও সৃষ্টির সার্থকতা।

(২) তবে যম ও যমী সহোদর-সহোদরা হলেও তাঁদের স্বভাব ভিন্ন। তাঁরা পুরুষ-প্রকৃতির অনুরূপ বলা যেতে পারে। যম প্রাণপুরুষ, যমী প্রাণপ্রকৃতি। পুরুষ জ্ঞান-প্রধান, তার গতি উর্দ্ধে, পরম একত্বের দিকে, প্রকৃতি শক্তিপ্রধান, তার গতি নিম্নের প্রকাশের দিকে স্থূলের বহুত্বের দিকে। এই বহুলত্ব প্রকট দেবতাদের সত্তায়, দেবতাদের কর্ম্মে। প্রাণপ্রকৃতি জীবভূত হতে চায়; দেবতাদেরই মত বহুলত্বের ধারায় চলে। কিন্তু প্রাণপুরুষ বলছে যে তা সঙ্গত হবে না তাতে সৃষ্টি হতে পারে অজ্ঞানময় জীব।

কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন যম-যমী হল দিন-রাত্রি। দিন-রাত্রির মিলন হয় না; রাত্রি যদি দিনের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তবে দিন হয়ে যায় গ্রস্ত।

যম

পূর্বে আমরা যা করি নি, এখন তবে সত্যবাক্ হয়ে অসত্য ভাষণ করি কি করবে?

জ্যোতিঃপতি, যিনি রয়েছেন জলধারার অন্তরে, তাঁর সহাঙ্গিনী যিনিও জলধারার অন্তরে, তাঁরাই হলেন আমাদের উৎস, তাঁরাই আমাদের পরম প্রিয়। (৪)

যমী

আমাদের জনয়িতা যে দেব হলেন নির্মাতা, স্রষ্টা, বিশ্বরূপী; তিনি আমাদের উভয়কে গর্ভে থেকেই আত্মপতি করে রেখেছেন।

তাঁর কর্মধারায় কোন কিছু বাধা দিতে পারে না। আমাদের এ কথা পৃথিবী জানে, দ্যুলোকও জানে। (৫)

যম

কে জানে সেই প্রথম দিনের কথা? কে তা দেখেছে, কে বলবে এখানে সে কথা? বরুণের মিত্রের হল বৃহৎ ধাম। তোমার কথা কি? মানুষকে তুমি আঘাত হেনেছ, বিপথে নিয়েছ। (৬)

যমী

যমী আমি, যমের কামনা আমার মধ্যে এসে যেন প্রবেশ করে; একই উৎসে, একই শয্যায় শয়ন করি যেন।

পতির নিকটে পত্নীর মত আমি আমার দেহ উন্মুক্ত করেছি—রথের দুটি চক্রের মত, সহকর্মী আমরা হই যেন। (৭)

---

(৪) সূর্য ও সূর্যাশক্তি, পুরুষোত্তম ও পরাশক্তি, পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরী, হলেন আদি স্রষ্টা-জননী যম ও যমীর। জলধারা হল চেতনার প্রসার বা লোক সব। সঙ্গত, মিলিত হতে হলে এঁদেরই সঙ্গে আগে মিলিত সঙ্গত হতে হবে।

(৫) "ঠিকই ত, তাঁরাই ত আমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন; আমরা মিলিত শুধু সেই দ্যুলোকে নয়, এই ভূলোকেও।"

(৬) "তুমি বুদ্ধিমতীর মত কথা বলছ বটে কিন্তু অতি বুদ্ধিমতী; সেই আদি উৎসের রহস্য কে জানে? বরুণ ও মিত্র ছাড়া—" বরুণ হল পরমের বৃহৎ অসীম চেতনা, আর মিত্র তার মৈত্রী, ঐক্য, সমন্বয়। কিন্তু প্রাণের প্রাকৃত চেতনা জীবকে অজ্ঞানের বিপথে নিয়ে যায়।

(৭) প্রাণপ্রকৃতির যজ্ঞ সৃষ্টিবেগ প্রকাশ পায় যমীর বাক্যে।

যম

এই যে সব দেব-চর এখানে বিচরণ করে, তাদের গতি বন্ধ হয় না, চক্ষু নিমীলিত হয় না।

হন্তা তুমি, আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের সঙ্গে যাও তুমি, তোমরা যুগলে রথচক্রের মত এক কর্মে সংযুক্ত হও। (৮)

কি দিনে কি রাত্রে আমার যজ্ঞীয় ভাগ যেন আমাকে দেওয়া হয়; সূর্যের চক্ষু যেন প্রতিমুহূর্তে উন্মীলিত থাকে।

স্বর্গ ও পৃথিবী যুগলে যমের বন্ধু; যমী যেন যমের সহজাত নয় এমন কাউকে গ্রহণ করে। (৯)

উত্তরকালে এমন যুগ আসছে যখন যারা সহজাত তারা অসহজাতের কাজ করবে।

তুমি তোমার দুই বাহু দিয়ে বৃষরাজকে আলিঙ্গন করে ধর। হে ভোগময়ী, আমি ভিন্ন অন্যকে তুমি পতিত্বে বরণ কর। (১০)

---

(৮) "আমাদের চলতে হবে দেবধর্ম অনুসারে; চিরজাগ্রত দেবতাদের কর্ম অমোঘ। সে দেব ধর্মকর্ম তোমাতে-আমাতে পূর্ণ হবে আমাদের ঊর্ধ্বে উত্তরণে. এই এখানে পৃথিবীতে মিলিত হয়ে নয়; আমাদের উভয়ের যে উত্তর স্বরূপ, সেই স্বরূপ-স্থিতির যে মিলন তাই সার্থক।

(৯) এই সূক্তটির কিছু পরেই ১৪নং সূক্তে যমের ধর্ম ও কর্ম সম্বন্ধে, তার যজ্ঞীয় ভাগ, সৃষ্টিধারায় তার ব্রত, পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যম নিয়ে চলে সূর্যের পথ ধরে ঊর্ধ্বলোকে, অন্ধকারের শক্তি সব ভেদ করে, দূর করে; তার সঙ্গে রয়েছে তার সঙ্গী দুটি কুকুর, তারা পথ দেখিয়ে চলে, তাদের শাণিত দৃষ্টি দিয়ে। যুগল অর্থ হতে পারে দৃষ্টি ও শ্রুতি, সাক্ষাৎদৃষ্টি ও সাক্ষাৎ শ্রবণ অথবা জ্ঞান ও শক্তি, চিৎ ও তপঃ. যুগল অশ্বীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যমী হল নিম্নগা প্রবৃত্তির ধারা।

(১০) নিম্নতন চেতনায় (অপরার্ধে) পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ ক্ষরপুরুষে আর অজ্ঞান প্রকৃতিতে, তার ফলে জন্মে বদ্ধ জীব, মৃত্যুকবলিত ব্যক্তি। ক্ষরপুরুষের অন্তরে যে অন্তর্যামী, চিন্ময় সত্তা সে এ সম্মীলন চায় না। কিন্তু জড়প্রকৃতির মায়াময়ী শক্তি সৃষ্টির জন্য চায় এ সংযোগ। তা না করে ক্ষরপ্রকৃতি যদি উন্নীত হয়ে, পরাপ্রকৃতিরূপে সম্মিলিত হয় পরমপুরুষ (বৃষরাজ, স্বয়ং সূর্যদেব) বা পুরুষোত্তমের সঙ্গে, তখনি হবে সত্যকার ভ্রাতাভগ্নীর সম্মেলন, মানুষ তখন অর্জন করবে দেবধর্ম।

সে কি ভ্রাতা, তার হেতু কেউ যদি অনাথ হয়? সে কি ভগ্নী কেউ যদি নিষ্কৃতিগামী হয় তার হেতু?

বাসনাকুল হয়ে তোমাকে বলছি বহু কথা, ধর তবে আমার দেহ আলিঙ্গন করে। ১১

যম

তোমার শরীর দিয়ে আমার শরীরে সংশ্লিষ্ট হবে না; নিজের ভগ্নীতে সংগত হওয়া পাপ বলা হয়।

অপরের সঙ্গে প্রমোদের জন্য মনকে কিন্তু, তোমার ভ্রাতা, হে সুভোগবতী এ বস্তু কামনা করে না। ১২

যমী

ভাল কথা, ভাল কথা, যমদেব। তোমার মন, তোমার হৃদয় আমি জানি না।

আর এক মন তোমাকে বাহুতে দিয়ে যেন আলিঙ্গনে বেঁধেছে, লতা যেমন করে বৃক্ষকে। ১৩

যম

যমী, তুমি অন্য জনকে, অন্য জন তোমাকে আলিঙ্গন করে যেন, লতা যেমন করে বৃক্ষকে।

তার মন তুমি চাও, সে চায় যেন তোমার মন, এভাবে হোক তোমাদের মনচিন্তিতা তাই হবে মঙ্গলের। ১৪

দেবতাদেরও মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও স্ত্রী, তাদের বলা হয়, "নৃ" ও "জা"। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ এবং ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্বন্ধ দুটিতে মিলে পূর্ণতর দিব্য সংবন্ধ হল দেব ও দেবীর। বাইবেলেও আছে (খৃষ্ট বলছেন তাঁর চর্চকে অথবা ভগবান বলছেন জীবকে)

"A garden inclosed is my sister, my spouse..."

(১৪) নিম্নপ্রকৃতি চাইবে 'পর' অর্থাৎ পরমপুরুষকে, অপর বা অবর পুরুষ নয়—তেমনি অবর অর্থাৎ প্রকৃতি-অন্তর্গত পুরুষ চাইবে পরাপ্রকৃতিকে।

শ্রীঅরবিন্দ—নমস্তে

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

"অগ্নিমীলে"—এই আদিম ঋকমন্ত্রে বৈদিক ঋষি যে অগ্নিকে "পুরোহিত", "হোতা", "রত্নধাতম"রূপে উদ্‌বোধন এবং আবাহন করিতেছেন ; কেবল অধিভূত ও অধিদেব ভূমিতে নয়, পরন্তু অধ্যাত্মভূমিতেও যে অগ্নি আপন জ্যোতির্ময় অমৃত পাদে "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত ; "এতাবানস্য মহিমা," "পাদো দিবা পর এনা পৃথিবৈতাবতী মহিমা মন্ত্রভূৎ"—এই সকল বেদমন্ত্রে যে পরমের অনুত্তর মহিমা সনুনীরিত ; সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাচক ওঁকারের যে অগ্নি চিদ্রূপা দেবতা, এবং, যে জাতবেদাঃ অগ্নি ছান্দোগ্য উপকোশলকে সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা আত্মবিদ্যার উপদেষ্টা ; সেই ভূরাদি সত্য অবধি বিশ্ব চেতনার সপ্তভূমিকায় সপ্তশিখা-বিস্তারকৃৎ অগ্নিই এই মর্ত্যধামে মূর্ত্তবিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শ্রীঅরবিন্দে। হে শ্রীঅরবিন্দ : সে মূর্ত্তবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া তুমি তোমার অকুণ্ঠ, অপরাজেয় দিব্যসত্তায়, অকৃপণ, অসীমিত, অনির্ব্বাণ আত্মজ্যোতিতে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছ ভূয়োভূয়ো নমো নমস্তে। তোমায় বারম্বার নমস্কার !

সেই বিশ্বতোমুখ, বিশ্বোত্তীর্ণ অগ্নির মূর্ত্তরূপ তুমি, তুমিই মর্ত্যজীবনে সেই অগ্নির সূত্রকৃৎ, ভাষ্যকৃৎ—তোমার "দিব্যজীবন", তোমার "গীতা", তোমার "পূর্ণযোগ", তোমার "সাবিত্রী"—এ সবই তোমার অমৃতজ্যোতিঃ আত্মসংবিত্তি অসামান্য অভিব্যক্তি। এ অভিব্যক্তি দেশে বা কালে তুলিত অথবা সীমিত হবার নয়। তোমায় নমস্কার !

বর্ত্তমান শতকের আদিমভাগে আমরা পাইয়াছিলাম তোমাকে এক মহাযুগসন্ধিক্ষণে অগ্নিযুগের ঋষি—চয়নকৃৎ, বিধিকৃৎ, পথিকৃৎ, পুরোহিত, হোতা রূপে। তোমার দিব্য উজ্জিত অথচ সমাহিত অগ্নি সে যুগে জাতীয়শিক্ষা, জাতীয়জাগৃতি এবং জাতীয় মুক্তি—এই শিখাত্রয় বিস্তারে আপনাকে মহিমোজ্জ্বল করিয়াছিল। প্রথমটির লক্ষ্য জাতির আত্মসংবিৎ ও আত্মপ্রত্যয় ; দ্বিতীয়ের আত্মশক্তিতে অভয় উদ্‌বোধন, তৃতীয়ের সেই বেদপ্রোক্ত সার্ব্বভৌমিক স্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সে যুগের মহামন্ত্র—"বন্দে মাতরম্"। এ মন্ত্র সাধনে শুধু বাহ্য, সীমিত, অন্যাপেক্ষ কিছুতে লক্ষ্য দাও নাই তুমি।

সে যুগের কর্ম্মযোগী শ্রীঅরবিন্দকে পরের যুগে পাই—পণ্ডিচেরী আশ্রমে মূর্ত্তির ধ্যানবেদীতে। মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতী-মহেশ্বরী—এই চতুর্ব্যূহা মহাশক্তির ধ্যাননিরত এবং সাক্ষাৎকারে পূর্ণাভিষিক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পূর্ণযোগীরূপে। পূর্ণশক্তি-পূর্ণশ্রীছন্দ:-পূর্ণবিদ্যা-পূর্ণযোগৈশ্বর্য্য—এই চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ অববোধে চরিতার্থ। ব্যষ্টিসাধনার সীমানা এ পরিপূর্ণতায় বিলাইয়া যায়—সকল অপূর্ণের মাঝে পরিপূর্ণের অবতরণ ইহা। "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্"।

আজ বিশ্বের সামনে মহতী বিনষ্টির করাল ছায়া। তথাপি পূর্ণ দিব্যচেতনার ভূমিষ্ঠ অবতরণের ইহা পূর্ব্বভূমিকা। তোমার "সাবিত্রী" তো তাই অনোঘবাণী—মানবের মৃত্যুতে শেষের ছেদ তো কদাপি নয়। আজ মহামানব জাগরোন্মুখ। তার প্রসবব্যথায় ধরিত্রী ব্যাকুল। তোমার সেই অমর বীর্যবাণী সার্থক হউক আজ সর্ব্বতোভাবে—এই আকুতি চলার পথে দিবাবসানে শুভচরণ এই তোমার সহপাথেয়ও।

স্মৃতির পাতা

দু'টি মহাযুদ্ধ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমাদের পণ্ডিচেরী-জীবনে আমরা দু'টি মহাযুদ্ধ—বিশ্বসমর—পার হয়ে এসেছি। এ একটা অভিজ্ঞতা বটে! দু'টি যুদ্ধের সংস্থান ও প্রকৃতি একই—আমাদের দিক থেকে এ হল দেবাসুরের সংগ্রাম। একদল দেবতাদের যম আর একদল অসুরদের যম। ব্যাপারটা কৌতূহলের, বিস্ময়ের যদি না হয়, জার্মানী ও রুশ ছিল অসুরদের পক্ষে, আর ইংলণ্ড, ফরাসী, আমেরিকা ছিল দেবতাদের পক্ষে।

মানুষের ইতিহাসে ধরাবরই এ-রকম হয়ে থাকে। একটা নূতন সৃষ্টি যখন হবে, মানুষ যখন এক ধাপ এগিয়ে যাবে তার ক্রমোন্নতির পথে, তখনই তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াবে অপশক্তিরা—যারা চায় না মানুষ উঠে চলুক ঊর্দ্ধতর চেতনার—দেবত্বের—দিকে, মানুষকে তারা চায় নিজেদের করতলগত করে রাখতে।

শ্রীকৃষ্ণের সময়ে মানুষের এ-রকম এসেছিল একটা সঙ্কট মুহূর্ত—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে বলা হয় ধর্ম্মযুদ্ধ, দেবাসুরের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন নবযুগের বাণী ও দীক্ষা। ঠিক অনুরূপ ভাবেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাণী ঘোষণা করতে সুরু করলেন প্রথম মহাযুদ্ধের নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গেই। যুদ্ধ আরম্ভ হল ১৯১৪ সালের আগষ্টে, শ্রীঅরবিন্দের "আর্য্য" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দেখা দিল ১৫ই আগষ্ট। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, যুদ্ধ যতদিন চলেছিল, আর্য্য পত্রিকাও চলেছিল প্রায় ঠিক ততদিনই; যুদ্ধ শেষ হল ১৯১৮এর শেষে, আর্য্য পত্রিকা চলেছিল আর একটি বছর বেশি, ১৯২১এর আরম্ভেই তার শেষ। শ্রীমা তখন শেষবার এসে গেলেন।

ভারতবর্ষের উপর দিয়ে এই মহাযুদ্ধটি একরকম ধীরে সুস্থে চলে গিয়েছে, প্রলয়ঙ্কর বিপর্য্যয় কিছু ঘটায়নি, একটা দমকা হাওয়ার মত এসে চলে গিয়েছে এরডেন জাহাজের অভিযানের মত। সে যুদ্ধের স্মৃতি আমাদের জাগরূক এখনো ঐ বিচিত্র ঘটনাটিতে—পণ্ডিচেরীর পাশ দিয়ে ঐ জার্মান জাহাজটি চলে যায়; এখানে কিছু ক্ষতি করেনি, কেবল মাদ্রাজের পারে ছুঁড়েছিল দু'চারটি গোলা। কিন্তু মনে আছে, জাহাজটি বন্দরের বাতিঘরে দেখে, এখানকার বহু বাসিন্দারা যাদের ঘরবাড়ী সমুদ্রের ধারে তারা সব রুদ্ধশ্বাসে পালিয়েছিল পশ্চিম দিকে—আমাদেরই এখনকার Lake Estate-এর দিকে দলে দলে পুঘপুঘ্ বোঝাই করে, তখন rickshaw ছিল না, ছিল পুঘপুঘ্, ওখানকার পাহাড়ের মধ্যে, গর্ত্তে গর্ত্তে লুকিয়ে পড়তে কিম্বা হ্রদটির জলের মধ্যে ডুব দিতে, মৈনাকের মত।

ইংরাজের আওতায় ছিল ভারতবর্ষ, তাই সে মহাযুদ্ধের ঝড়ঝাপটা ইউরোপের উপর দিয়েই গিয়েছে, আমাদের এখানে সামান্য ছোঁয়াচ লেগেছে। তবে দুচারটা তরঙ্গ দেখা দিয়েছিল লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথম বাঙ্গালী সেনার উদ্ভব; সরকারী চাকুরে পেশাদার সৈন্য নয়, স্বদেশী সেনা। এক পাঞ্জাবী এবং গুরখা ছাড়া ভারতীয়দের সৈনিকগুণে ইউরোপীয়ের সমকক্ষ কখন বিবেচনা করা হয় না, বাঙ্গালীরা ত' এ বিষয়ে ঘৃণার পাত্র। ইদানিং তারা দেখিয়েছিল গুপ্তঘাতকের কৌশল বা সাহস কিন্তু অনেকের মতে ওটা ছিল **dastardly crime**, ভীরুর অপকর্ম্ম। কিন্তু সুশিক্ষিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনী আর এক জিনিষ। তাই সেই মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে এক দল স্বেচ্ছাসৈনিক নিজেদের তৈরী করলে চন্দননগরে থেকে, জন পনের হবে, ফরাসী নাগরিক—তারা ফরাসী—ইংরেজের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যোগ দেবে; এল তারা পণ্ডিচেরী ফরাসী দেশের পথে, এক দল উচ্চাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিদীপ্ত শৌর্যবন্ত যুবক, তার মধ্যে ছিল আমাদের হারাধন। তরুণ হারাধনের ছবি আমার সম্মুখে ভাসছে, দীর্ঘ ঋজুদেহ প্রশান্ত, দুঃসাহসী। হারাধন তার যুদ্ধ-জীবন-কাহিনী আমাদের অনেক বলেছে ফিরে এসে। তাদের একবার জাহাজডুবি পর্য্যন্ত হয় টরপেডোর ঘায়ে, সাঁতরে নৌকার আশ্রয়ে তারা রক্ষা পায় টিউনিসিয়ার ডাঙ্গায় উঠে। হারাধন তার যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছে তার 'লড়াইয়ের নূতন কায়দা' পুস্তকে। আমাদের যুগে বারী-দা'র 'বর্ত্তমান রণনীতি'র অনুসরণে। পণ্ডিচেরীর দৃশ্যও মনে আছে —পণ্ডিচেরীতে স্বেচ্ছাসৈন্য নয়, ফরাসীদের হল বাধ্যতামূলক বা অবশ্যকরণীয় সৈন্য-বৃত্তি। ১৮ বৎসর বয়স হলেই প্রত্যেক ফরাসীকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে পুরা এক বছর কি দুবছর। পণ্ডিচেরীতে ভারতবাসীরা যারা ফরাসী-স্বত্ব গ্রহণ করেছে (**Renonçants**) তাদের পক্ষে সৈন্যবৃত্তি অবশ্যকরণীয়। সুতরাং আমাদের বন্ধুদের মধ্যে আলোড়ন উঠে গেল, এক রকম দলে দলেই যেতে হল ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য। তার মধ্যে ছিল আমাদের বিশেষ অন্তরঙ্গ "দাভিদ" —আমাদের বিখ্যাত ফুটবল টিমের বিখ্যাত গোলী (**goalie**)। সে তখন নববিবাহিত, আমার মনে আছে যতদিন সে বাহিরে ছিল (প্রায় তিন বছর) তার স্ত্রী নিয়মিত পূজা দিত মারীআম্মাকে, যিশুমাতা মেরীকে (তারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল), স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে। তার কণ্ঠে করুণ গান আমার কানে এখনও যেন লেগে আছে। দাভিদ ফিরে এল যুদ্ধশেষে—শেষ হয়ত "ব্রিগাদিয়ে" পদলাভ করে; তার প্রত্যাবর্ত্তনের অভ্যর্থনা আমার মনে আছে, পরে সে পণ্ডিচেরী সহরে মেয়র হয়। আরো মনে আছে আমাদের **Benjamin**-এর কথা—তাঁকে পণ্ডিচেরী তীর ছাড়তে হবে, তাঁর মা কেঁদে আকুল—কত কত মা-বোনেরা জাহাজ ছাড়বার সময়ে গিয়ে অশ্রুপাত করেছে। **Benjamin**কে তবে দেশত্যাগ করতে হয়নি, তিনি হয়ে গেলেন **reformé** অর্থাৎ ডাক্তারী পরীক্ষায় তিনি অযোগ্য বিবেচিত হলেন। অন্যদিকে ভারতের মধ্যে বিপ্লবী দেশভক্তেরা সুযোগ গ্রহণ করার

চেষ্টা করলেন তাদের পথে, ইংরেজকে ঘায়েল করার জন্য। গদর দল আমেরিকা থেকে জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নামতে চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ল, বুড়ীবালামে বাঘা যতীন তার দল নিয়ে প্রায় সম্মুখ যুদ্ধ করেই প্রাণ দিল, আর পণ্ডিচেরীতে আমাদের বন্ধুদের দল থেকেই ষড়যন্ত্র করে অত্যাচারী Magistrate Asheকে খুন করা হল। এ রকম ক্রিয়াকর্মের বাহ্যসার্থকতা কিছু ছিল কি না সন্দেহ করা যেতে পারে, কিন্তু একটা বৃহৎ নহৎ আন্দোলন ঔচিত্যের সীমানা মেনে চলে না। সে চলে তার আপন আন্তর বিধান অনুসারে। এই সব বিপ্লবীরা দেশভক্তির দেখিয়েছিল সে যুগে সে অবস্থার মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ বন্দীর বা দাসের গোষ্ঠি একটা, দাস-জাতি একটা কতদূর কি করতে পারে, দেখিয়েছে তাদের সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা। এই বিশ্বযুদ্ধ একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল ইংরেজের আসন টলিয়ে দিতে পারবে—ইংরেজের দুর্যোগ আমাদের সুযোগ স্বতঃসিদ্ধ বলে তারা গ্রহণ করেছিল।

বৃহত্তর দৃষ্টির দিক দিয়ে, প্রথম মহাসমর ফরাসী বিপ্লবের উপসংহার সুরু করলে। ফরাসী বিপ্লব একটি মাত্র রাজা ও রাণীর মস্তকচ্ছেদ করেছিল, কিন্তু এই মহাসমরের শেষে দেখা গেল ইউরোপের সব রাজাদের উচ্ছেদ হয়েছে অর্থাৎ প্রধান প্রধান, যাঁরা বাকী রইলেন তাঁরা ইংরেজ রাজার মত ঠুঁটো জগন্নাথ। এ হল বাহ্য-লক্ষণ, আসল অর্থ জনগণের জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ ধন-দৌলত শুধু নয়, শিক্ষা-দীক্ষাও কতিপয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে না, তাকে বিস্তৃত করে ধরতে হবে সর্বত্র। পন এবং অর্থ এবং পদার্থ (প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়) সকলের পক্ষে সুলভ হবে। আমাদের ভাগ্যে, ঊর্দ্ধের আলো ও চেতনা যে নেমে আসছে, মানুষকে নিয়ে চলছে ক্রমোন্নতির দিকে, তার সার্থকতা হতে থাকবে—অধিকাংশ মানুষের মধ্যে তা যত জীবন্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে। মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বার্তা তাই স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা সকলের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে এবং গোষ্ঠীগত বা জাতি-গতভাবে, 'উপনিবেশ' বলে কিছু থাকবে না, ছোট ছোট জাতি পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। এই প্রগতির সূত্রপাত প্রথম মহাযুদ্ধ দিয়ে, আর তৃতীয় অবদান হল "মহাজাতি প্রতিষ্ঠানে"র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ জাতি নেশন স্বাধীন স্বতন্ত্র হবে বটে কিন্তু ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠিদের রক্ষণের জন্য, জাতিগত অন্যায় ব্যবহারের প্রতিষেধ স্বরূপ চাই একটি জাতি-সমবায়—সকল জাতির প্রতিনিধির সম্মেলন। এরই নাম League of Nations মানবজাতির একত্ব—সমগ্র মানবজাতি বিবিধ গোষ্ঠির একটা বিচিত্র পূর্ণ সমন্বয়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হবে।

আদর্শ এল তবে শিক্ষা দীক্ষায় গরিষ্ঠ এক মানবজাতি, ঋষি এবং যোগীদের দৃষ্টিতে তার নাম দেবজাতি, মানুষের পশু থেকে দেবত্বে পরিণতি। কিন্তু তাই বিরোধী শক্তিদের মাথায় টনক নড়ল। মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে হবে, সুপথে নয়, কুপথে নিয়ে যেতে হবে। দেবতায় নয়, অসুরে রাক্ষসে পিশাচে পরিণত করতে হবে। (গোটে একদিন দেখিয়েছিলেন এই চিত্র)। তাই মানুষের মনে এল গরিষ্ঠ জাতির (Super-race) আদর্শ

এবং সে আদর্শ রূপ গ্রহণ করলে বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে—হিটলার ও জর্মন-নাৎসি জাতির উদ্ভব। হিটলারের দোসর হয়ে দেখা দিলেন ষ্টালিন ও তার বোলশি জাতি। মুসোলীনি তাদের অনুগতজন—ভাষায়, কেউ। পুরাণে শাস্ত্রে শুনেছি প্রাচীন কালের শুম্ভ-নিশুম্ভের কথা, হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুর কথা; শিশুপাল-বক্রদন্তের কথা। অপদেবতারা যুগ্মমূর্তি ধরে দিব্যশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এও যেন তাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হেতু ঠিক এইখানে—পৃথিবীতে ভাগবতীশক্তির অবতরণের বিরুদ্ধে অপশক্তির মূর্ত্ত অবতরণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ ১৯৩৯ সালে। শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে এ বিষয়ে পক্ষগ্রহণে ইতস্তত: করেছিলেন। প্রথম যুদ্ধের ফলে জর্মনীর উপর প্রতিশোধ হয়ত মাত্রাধিক হয়েছিল, তাই জর্মনদের পক্ষে প্রতিশোধের প্রতিশোধ গ্রহণ স্বাভাবিক ছিল। আমাদের দিক থেকে ভারতের পক্ষে কি সুবিধা-অসুবিধা তাও বিবেচ্য ছিল। কিন্তু অচিরেই তিনি দেখলেন এই বিরাট খাওবদাহনের পিছনে কি নিদারুণ সত্য লুকিয়ে রয়েছে। যে অপশক্তি কালো ছায়ার মত অনুসরণ করে এসেছে চিরকাল এবার সে বুঝি তার শেষ রুদ্রমূর্ত্তি গ্রহণ করতে চলেছে পৃথিবীতে—যে অপদেবতা তার কৃষ্ণ কবলের প্রসারিত করে দিব্য ভবিতব্যের পথ আগলে চলেছে—**across the path of the divine Event.**

তাই তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন তাঁর পক্ষগ্রহণ—সম্পূর্ণরূপে, অণুমাত্র দ্বিধা না রেখে তিনি 'মিত্রশক্তি'দের পক্ষে দাঁড়ালেন। অর্থদান করে তাঁর স্থূল শারীর সাহায্য পর্য্যন্ত নিয়োগ করলেন।

মানবজাতির এ মহাসঙ্কট মুহূর্ত্তে—পৃথিবীর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে যখন যুদ্ধের ফলাফলের উপর তখন তিনি এই অশনিসম্পাত, পৃথিবীর উপর অপশক্তির সম্পূর্ণ আক্রমণ আপনার দেহের মধ্যে গ্রহণ করলেন পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যে। নতুবা পার্থিব শক্তির সামর্থ্য ছিল না এই দুর্ব্বার শক্তিকে হঠিয়ে রাখে। এই বিশ্বগ্রাসী বিষ তিনি গলাধ:করণ করলেন, নীলকণ্ঠ হয়ে। এ যেন নিজের দেহ থেকে অস্থিদান দধীচির মত—তা দিয়ে অসুরঘাতী বজ্রনির্ম্মাণের জন্য। ১৯৩৮ সালে তাঁর শরীরের উপর যে আঘাত হল, তার এই নিহিত অর্থ।

শ্রীমা তখন জানালেন এই যুদ্ধ তাঁরই যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে যারা যোগদান করবে তারা তাঁরই সৈনিক। ভারতবাসীরা যাতে এই যুদ্ধে যোগদান করে, সাহায্য করে যথাসাধ্য এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন (পণ্ডিচেরী সহর থেকে ফরাসী নাগরিক বহুজনকে সৈন্য হয়ে যেতে হয়েছে এবারেও পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি)*—আশ্রমের কয়েকজন সন্তান নৌ-বিভাগে

---

* পণ্ডিচেরী অধিবাসী যাঁরা এই মহাযুদ্ধে জীবনদান করেছেন তাঁদের স্মরণার্থে স্মৃতিস্তম্ভ আমরা সকলেই দেখেছি সমুদ্রের ধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রতিবৎসর স্মারক-অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে।

সেনা-বিভাগে, বিমান-বিভাগে যোগ দিয়েছে ; কয়েকজন, অতি আপনার আমাদের, প্রাণ দিয়েছে পর্য্যন্ত, তোমরা জান তা।* এই যুদ্ধেই আমরা দেখেছি আশ্রম থেকে মাথার উপর দিয়ে উড়োজাহাজ কত উড়ে চলেছে দিনে বা রাতে। অবশ্য শত্রুদের কোন হাঙ্গিয়ার এ অবধি আসেনি। দলে দলে গাড়ী করে সেনাবাহিনী কত এখান দিয়ে গিয়েছে। দলে দলে আবার অনেকে মায়ের দর্শন করে আশীর্ব্বাদ নিয়ে গিয়েছে। সৈন্যদের মায়ের কাছে ছিল যেন অবারিত দ্বার, প্রায় যখন তখন এলেই দর্শন হত। একজন সেনাধ্যক্ষের কথা মনে আছে, নাম বোধহয় অর্জুন সিং (রাজপুত)—অতি চমৎকার লোক ছিলেন, তিনি বলেছিলেন তিনি এবং তাঁর উপরস্থ বন্ধু একজন সেনাপতি, তাঁরা যুদ্ধের ব্যবসা গ্রহণ করলেও যোগসাধনায় তাঁদের বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ আছে। পরে অবশ্য তাঁদের খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

এই যুদ্ধের ঝাপটা ভারতবর্ষ বেশ কিছু অনুভব করেছিল, অবশ্য তাতে ভারতবাসীরা নিজেরাই ইচ্ছন জুগিয়েছিল। ভারতের স্বদেশপ্রেমিকেরা, স্বাধীনতাকামীরা, বোধহয় অধীর হয়ে উঠেছিল, এই শেষ বা শ্রেষ্ঠ সুযোগ বলে তাদের মনে হয়েছিল। ইংরেজের বিপদে এবং সেই উদ্দেশ্যে অনেক কিছু বাধা সৃষ্টি করেছিল দেশে। শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের পরামর্শ ছিল অন্য—তাঁরা বলেছিলেন ইংরেজের যথাসাধ্য সাহায্য কর, তার শাসন-যন্ত্রের যুদ্ধবিভাগের সর্ব্বত্র প্রবেশ কর, তাদের সঙ্গে নিলে যাও জলে স্থলে আকাশে, অধিকার কর, আয়ত্ত কর সকল পদ্ধ ও বিদ্যা। এই রকমে যে আসন করে নেবে—সিংহাসন প্রায় —তা থেকে তোমাদের বিচ্যুতি ঘটবে না, তাই হবে স্বাধীনতার অনিবার্য্য প্রতিষ্ঠা। শ্রীঅরবিন্দের ঈপ্সিত পথ গ্রহণ করলে ভারতের স্বাধীনতা সহজতর এবং পূর্ণতর হত তা আজকাল অনেকেই স্বীকার করতে সুরু করেছে। কার্য্যতঃ অবশ্য এই দুইএর সন্ধি-সংযোগ বা রফা বা মিতালী হয়েছিল।

যা হোক, এক সময়ে কিন্তু অনিত্রদের সাফল্য জাগ্রত বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল। আমরা শুনতে সুরু করলাম আসন্ন বিপদ-সঙ্কেত ধ্বনি, সমুদ্রের ধারে রাস্তায় আলো নির্ব্বাপন আদেশ ইত্যাদি সাজ-গাজ ব্যাপার, যদিও বেশির ভাগ ছিল মহড়া practice হিসাবে। আশ্রমের মধ্যে পর্য্যন্ত ট্রেঞ্চখানা কাটা হয়েছিল, বোমা আক্রমণের সময় লুকিয়ে পড়বার জন্য, স্থানে স্থানে বালু আর বালতি রাখা হয়েছিল বোমার ফলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপণের জন্যে। এ কাজটির নাম ছিল Air Raid Protection (A.R.P.) এবং এর ভার গ্রহণ

---

* এখানে আমার মনে পড়ে কবীর অমিতুল শ্রীঅরবিন্দের অগ্নিবাণী—

Our sacrifice at the altar of the Mother must be as relentless as that of the Carthaginian parents who pressed their children through fire to Moloch.

মায়ের পদতলে আমাদের আত্মদান হবে নির্দ্দয়—প্রাচীন কার্থেজবাসী পিতামাতাদের মত তারা তাদের সন্তানদের আগুনের ভিতর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় মোলখ-দেবতার কাছে।

করেছিলেন স্থানীয় এক ভদ্রলোক—আমাদের শান্তা ও বাবুর বাবা (বাবু আশ্রমের long jump-এর record-holder). তিনি বহুদিন গত হয়েছেন। তবে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শান্তা ও বাবুর মা শ্রীমায়ের কাছে এখনো Tara A.R.P. নামে পরিচিত। অবস্থা ক্রমে আরো ঘনীভূত হয়ে উঠল—ডাক এল পবিত্রকে পর্য্যন্ত এখান থেকে যেতে হবে সৈন্যদলে যোগ দিতে (সে Captain-এর পদে ছিল)। মনে হয় এখানেও Barrackএ গিয়ে তাকে হাজিরা দিতে হয়েছিল ; তার অবর্ত্তমানে তার এখানকার কাজকর্ম্ম কি রকমে চলবে, সে বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত না করে ফেললেন। যদিও শেষ পর্য্যন্ত তাকে যেতে হল না। শ্রীমাকে যেমন প্রথম বারে ফিরে যেতে হয়, প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পরেই এবং আবার এখানে আসতে পারেন একেবারে যুদ্ধের শেষে ছ' বৎসর পরে। এদিকে জাপানীরা এসে পড়ল, আন্দামান দখল করেছে.—আন্দামান থেকে মাদ্রাজ কতটুকু ব্যবধান—উত্তরপূর্ব্বে বর্ম্মা অতিক্রম করে পূর্ব্ববাংলা সীমানায় উপস্থিত জাপানীরা সুভাষ বসুর সৈন্য সমেত। আমাদের জ্যোতিষ ডাক্তার (তখন সৈন্যবিভাগের ডাক্তার) Imphal ইম্ফাল সহরে শত্রুর আবেষ্টনে অবরুদ্ধ প্রায় S.O.S. হাঁকছেন। ফরাসী ইন্দোচীন থেকে ফরাসীরা দৌড়ে পালাচ্ছে পণ্ডিচেরী হয়ে যাবে ফিরে দেশে (কোন দেশে ?), বলছে তারা জাপানীরা এল বলে, জাপানী ভাষা শিখতে আরম্ভ কর। কেউ কেউ বলছে না, জর্ম্মন শেখ, জর্ম্মনীর দখলে যাবে ভারত। হিটলার ইংলণ্ড গ্রাস করতে উদ্যত, তখন এক Churchill সেই বিকট কবলের সামনে নির্ভীক দাঁড়িয়ে।

এই সময়েই ত'. মা যেমন বলেছিলেন, দলে দলে শিশুরা অর্থাৎ শিশুদের নিয়ে পিতা-মাতারা এখানে আশ্রয় চাইলেন। ফলতঃ আমরা শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের পদতলে থেকে খুব বেশী ভীত হইনি। আমাদের এখানকার দৈনন্দিন জীবনে অতিরিক্ত তপশ্চর্য্যা, অশনে বসনে কঠোর বিরতি অভ্যাস করতে হয়নি। একটি মজার কাহিনী বলি তবে এখানে। আমাদের আশ্রমবাসী ভক্ত একজন তখন বাহিরে কার্য্যোপলক্ষে ছিলেন এবং দেশের একজন বিখ্যাত নেতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়—আলাপ স্বভাবতই হল ভারতের ভাগ্য সম্বন্ধে, জাপানী-দের দুর্দ্ধর্ষ অগ্রগতি সম্বন্ধে। নেতা মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন শ্রীঅরবিন্দের অভিমত কি ? তাতে আমাদের বন্ধু উত্তর করেন "মাভৈঃ, জাপানীরা আসতে পারবে না, ফিরে যাবে, আমাদের গুরু বলেছেন। নেতা মহাশয় অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলেন তখন। জানিনা আমাদের বন্ধুর পরে সুযোগ হয়েছিল কিনা নেতৃ-মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা। নেতৃবর্গের অনেকেই তখন হৃদয়ঙ্গম করেননি জাপানীদের কি জর্ম্মনদের এমন কি রুশদের সাহায্যে—অর্থাৎ অনুগত হয়ে—ভারতের স্বাধীনতা-লাভ মরীচিকা ; দাসত্বের পরিবর্ত্তন হত শুধু, নূতন দাসত্ব হত নিদারুণ। যে নবসাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তৃপক্ষ ছিল ওদের, তা হল আধুনিক স্বাধিকারপ্রমত্ত, সেখান থেকে উদ্ধারলাভের আশা বহুশত বৎসরের প্রয়াসসাপেক্ষ হত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সুন্দর প্রীতিকর কাহিনী, কাহিনী নয়, ঘটনা বলি তবে—তোমাদের কেউ কেউ হয় ত সাক্ষী ছিলে। তখন একটা আশঙ্কা বা সঙ্কটের কথা উঠেছে ভারতের পক্ষে। চীনা আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে হবে। ভারত কি আবার আক্রান্ত অধিকৃত পরপদানুগত হয়ে পড়বে? ভারত বৃহৎ দেশ বটে, তার জনবল আছে, কিন্তু সে জনবল জনতামাত্র অর্থাৎ তার সংগঠিত ব্যূহবদ্ধ ক্ষাত্রশক্তি নয়—শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় খেলার মাঠে। শ্রীমা ভারতের মানচিত্রটি দেখিয়ে একটু হেসে বললেন—দেখছ না, ভারতের প্রহরী কে? কাশ্মীরের পূর্ব্বোত্তর অংশটি ব্যাদিত-আনন সিংহ নয়? বাস্তবিকই লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঐ অংশটি সিংহেরই মাথা—নাক এগিয়ে, মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে, সম্মুখে যে আসবে তাকে গিলে খাবে যেন। মা দুর্গার সিংহ? আরো এক দৃশ্য এই সঙ্গে যোগ করে দিতে পারা যায়। ভারতের দিকে সিংহ; সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখ দক্ষিণ-পূর্ব্বে—ঐ ভারতের মানচিত্রে—স্পষ্টই একটা হাতী তার শুঁড় বাড়িয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে, বলছে, না, সাবধান, সদাজাগ্রত প্রহরী আমি এই। শ্রীগজলক্ষ্মী এইখানে।

আমাদের এখানকার একজন সাধক হিটলার যখন "ধ্বংকেতুনিব কিমপি করালম্" হয়ে পৃথিবী আকাশ বাতাস ছেয়ে উঠেছেন তখন শ্রীঅরবিন্দকে অনুযোগ করে বললেন, "গুরু, কোথায় তোমার আশ্বাস, পৃথিবী যে গেল। ভগবান কোথায় তুমি?" শ্রীঅরবিন্দ তখন ধীরকণ্ঠে বলেছিলেন, যাও কেন? **"Hitler is not immortal!"** কিছু পরে—যতটা পরেই হোক না—দেখা গেল তাসের ঘরের মত কোথায় উড়ে গেল হিটলার-রাজ্য, ফুৎকারে যেন মিলিয়ে গেল একটা দিগন্তব্যাপী কুজ্ঝটিকা—দারুণ দুঃস্বপ্ন একটা তিরোহিত হল ভোরের আলোয় ছটায়।

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

(১)

প্রশ্ন : এক জন্ম থেকে পরে জন্মান্তর ঘটলে কি পূর্বজন্মের মন-প্রাণের উন্নতি যতটা হয়েছিল তা আরো ওর পর থেকে সেই নূতন জীবনে অগ্রসর হতে থাকবে? সে ক্ষেত্রে পূর্বজন্মের অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলি কি ভাবে কাজ করবে? আবার কি তাকে সেই সকল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নতুন করে ঘুরে যেতে হবে?

উত্তর : সে কথা নির্ভর করে ব্যক্তিসত্তাদের নিজেদের উপর।

জন্ম হতে জন্মান্তরে যে উন্নতির ধারা চলতে থাকে তা প্রাণ-মনের নয়। উন্নতি যা হয় তা চৈত্যসত্তার, কেবল কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, যেখানে বিবর্তনের পরিণতি খুব উচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছেচে। ব্যাপারটা হয় এইরূপ চৈত্যসত্তার পক্ষে পর্যায়ক্রমিক-ভাবে চলতে থাকে একবার বিশ্রাম ও একবার সক্রিয়তার পালা ; কাজের পালা এলে তাকে কাজে নামতে হয় কোনো স্থূলদেহের মধ্যে, তখন সেই দেহ প্রাণ মনের দ্বারা যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তারই ভিতর দিয়ে ওর উন্নতি চলতে থাকে ; এর পরে যখন আসে বিশ্রামের পালা তখন সেই সব অভিজ্ঞতার যা নোটফল তা উত্তমরূপে জীর্ণ হতে থাকে ; সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়ে গেলে তখন তার সুফলটুকু নিয়ে সে আবার নেমে আসে অন্য নতুন দেহে। এইরূপ হতে হতে যখন তার উন্নতির মাত্রা পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে, তখন সে তার নিজের পরবর্তী পরি-স্থিতি বেছে নিতে পারে, অর্থাৎ তার অভিজ্ঞতাকে আরো সম্পূর্ণতর করে তোলবার জন্য অতঃপর কেমন দেহ ও কেমন জীবন তার চাই সেটাও সে নিজে বেছে নেয়। উন্নতির মাত্রা যখন খুবই বেশি হয়, তখন কোনো কোনো স্থলে চৈত্যটি তার নশ্বর দেহ ছেড়ে যাবার আগের থেকেই ঠিক করে নেয় যে তার পরের জন্মে কোনরূপ জীবন সে গ্রহণ করবে।

যে সত্তাটি পুরোপুরিভাবে পরিণত ও চেতনাপ্রাপ্ত হয়েছে সে নিজেই তার নতুন দেহের গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে, নিজের আভ্যন্তরীণ প্রভাবে তদনুরূপ উপাদান সেখানে এনে ফেলে, যাতে সেই দেহ তার অস্তিত্বের পরবর্তী কর্মধারার উপযোগী হতে পারে। কিন্তু এ কেবল পরিণত সত্তার পক্ষেই সম্ভব। আবার সম্পূর্ণ পরিণতি পাবার পরে সে যখন কেবল ভগবৎ-কর্ম করতেই পৃথিবীতে আসে, যাতে সমগ্রভাবে সে তাতে সহায়তা করতে পারে,

তখন সে তার পূর্বজন্মের মন-প্রাণকেও সেই নতুন গঠনের মধ্যে কতকাংশে টেনে আনতে পারে, যেহেতু তা চৈত্যশক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে আগের থেকেই সেই ভাবে প্রস্তুত ছিল, এবার তাকে সাধারণ উন্নতির বিষয়ে সার্থকভাবে কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু এ শুধু খুবই উচ্চ অবস্থার কথা।

চৈত্য সত্তা যখন পূর্ণ পরিণতি ও পূর্ণ চেতনা পেয়ে ভগবৎ ইচ্ছার যন্ত্ররূপে কাজ করবার মতো হয়, তখন সে তার মন-প্রাণকে এমনভাবে গড়ে তোলে যাতে তা সুরক্ষিত থেকে পরে সাধারণ ক্রিয়াসঙ্গতির মধ্যে সমুচিত অংশগ্রহণ করতে পারে।

উচ্চ স্তরে পৌঁছে উন্নত অবস্থার পক্ষেই এটা সম্ভব, কারণ তখন দেহলোপ হবার পরেও তার মন ও প্রাণের উৎকৃষ্ট অংশকে অন্তত কিছুটা বজায় রাখা যায়। যেমন, প্রাণের বা মনের কোনো বিশেষ রকমের অসাধারণ গুণপনা যেখানে বিকাশ পেয়েছে, সেখানকার সেইটুকু এক বিশেষ সংগঠনরূপে মৃত্যুর পরেও টিকে থাকে : যাদের মস্তিষ্কের বুদ্ধিবৃত্তি অসাধারণ রকমের উৎকর্ষ পেয়েছে সেটা বিশেষ রকমে সংরক্ষিত থেকে ভবিষ্যতে তার পরবর্তী জীবনেও সে গুণটি কাজ করে। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বাদকের হাতগুলি যখন অসাধারণ নৈপুণ্যলাভ করে তখন তাদের সেই সুনিপুণ হাতগুলি মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্মভাবে টিকে থাকে ; আর এমন কি অনুকূল ধরনের কোনো জীবিত ব্যক্তির আধার পেলে সেই হাত তার মাধ্যমেও নিজেকে চরিতার্থ করে। এমনি হয় সকল ক্ষেত্রেই।

নতুবা সাধারণ পক্ষে যেখানে চৈত্যের পূর্ণ পরিণতি আসেনি, সেখানে সেই চৈত্যের দেহত্যাগ যদি শান্তিময় ও কেন্দ্রগত অবস্থায় ঘটে থাকে, তাহলে মৃত্যুর পরে তার সূক্ষ্ম মনো-দেহ ও প্রাণদেহ কিছুকাল পর্যন্ত টিঁকে থাকে ; আর তার মৃত্যু যদি হয় আকস্মিক এবং আবেগযুক্ত ও অতৃপ্ত আসক্তির অবস্থাতে, তাহলে সত্তাটির বিভিন্ন অংশগুলির ব্যবধান এলোমেলো হয়ে যাওয়াতে তেমনি অবস্থাতেই তারা অনেককাল টিঁকে থাকে, পরে বিলীন হয়ে যায়।

যা-কিছু গঠন ও রূপান্তর ঘটাবার আছে তার একমাত্র কেন্দ্রস্থল হলো দেহাশ্রিত চৈত্য। সুতরাং এ কথা মনে করা খুবই ভুল যে দুটি দেহজন্মের মধ্যবর্তী কালেও উন্নতির কাজ চলতে থাকবে, কিংবা তখন আরো তাড়াতাড়ি পরিণতির কাজ হতে পারবে। কারণ তখন সাধারণত কোনোই উন্নতির কাজ হয় না, চৈত্য তখন থাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থাতে, আর তার আনুষঙ্গিক অংশগুলি কিছুকাল টিঁকে থেকে পরে বিলীন হয়ে যায়।

পার্থিব জীবনই হলো যা কিছু অগ্রগতির ক্ষেত্র। যা কিছু উন্নতির কাজ তা এই নশ্বর দেহের মধ্যে থেকেই ঘটা সম্ভব। আর এই চৈত্যসত্তাই জীবন থেকে জীবনান্তরে যেতে যেতে ক্রমিক বিবর্তন ও বিকাশের দ্বারা আপন উন্নতির ধারাকে অগ্রসর করে দিয়ে যায়।

১২।৮।১৯৫৮

(২)

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দের "দিব্য জীবনে" (The Life Divine) মানবের আধ্যাত্মিক বিবর্তন সম্পর্কে লেখা রয়েছে, "প্রকৃতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে তার প্রাথমিক অবস্থায় আমরা দেখি সে রয়েছে নীরব নিশ্চেতনার মধ্যে মূক ও প্রচ্ছন্নভাবে।" এই ছত্রটির অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।

উত্তর : শ্রীঅরবিন্দ এ কথা প্রথম থেকেই বলে আসছেন যে সকল জড়ের অন্তস্তলে অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে সুপ্তপ্ত ভগবৎ-উপস্থিতি, আর সমগ্র পার্থিব বিবর্তনের ক্রিয়া এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে যাতে এই সৃষ্টি আবার তার আদি উৎসে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে, যাতে সকল কিছুর ভিতরকার সেই গুপ্ত উপস্থিতি মুক্তভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতির উদ্দেশ্যই তাই।

বিশ্বব্রহ্মাও হলো পরম ব্রহ্মের নিজেকে বাস্তবীকরণ, যেন নিজেকে বাইরের দিকে দেখবার জন্য তিনি নিজেরই ভিতর থেকে বস্তু হয়ে একটা রূপান্তর নিলেন যাতে ঐভাবে অবস্থান করে তিনি নিজেকে ওরই ভিতর দিয়ে পুনরায় জানতে পারেন, যাতে এখানকার অস্তিত্ব চেতনা বস্তুরূপে মূর্ত হয়ে তাঁকে পুনরায় চেনে তার আদি উৎপত্তিস্থল বলে, এবং পুনরায় তাঁর সঙ্গে এক হয়ে এই সম্ভূতির মধ্যে তাঁরই অভিব্যক্তিকে বিকাশ করে। এ ছাড়া বিশ্বসৃষ্টির অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর আমাদের এই পৃথিবী হলো গোটা বিশ্বসৃষ্টির একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, একটা চুম্বকস্বরূপ প্রতীক, যাতে এর মাধ্যমে যে বিবর্তনের কাজ হবে তা সমগ্রভাবে বোধগম্যরূপে সহজ হয়ে আসে। কেবল এই পৃথিবীর ইতিহাসটা অনুসরণ করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে গোটা বিশ্বসৃষ্টির হেতু কি। পরমব্রহ্ম তাঁর শাশ্বত সম্ভূতির দ্বারা নিজেকে জানছেন ; এবং তার চরম লক্ষ্য হলো সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার পুনর্মিলন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অভিব্যক্তির সচেতনে ও সজ্ঞানে পুনরায় স্বেচ্ছাকৃত ঐক্যবিধান।

এই হলো প্রকৃতির ভিতরকার মর্মকথা। প্রকৃতি হলো নির্বাহিকা শক্তি, তারই দ্বারা সব কিছু নির্বাহিত হচ্ছে। সৃষ্টির ভার প্রকৃতিই গ্রহণ করেছে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে সে একেবারে নিশ্চেতন তথাপি তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সেই পরমা চেতনা ও শাশ্বত সদ্‌বস্তু, এবং তার চেষ্টা সেইভাবেই চলেছে যাতে যাবতীয় সকল কিছুই নিজেকে সম্যক জেনে সম্যক উপলব্ধি করে।

কিন্তু প্রকৃতি গোড়ার দিকে সে কথা আদৌ প্রকাশ করে না। অল্পে অল্পে তার ভিতরকার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় ; প্রথম দিকে থাকবে সব-কিছু প্রচ্ছন্ন, শেষের দিকে হবে উদ্‌ঘাটিত। আর মানুষ এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যখন সেই গুহ্য কথাটি তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে ; সুতরাং আগেকার যুগে বিবর্তনের যে

কাজ অচেতনে সম্পাদিত হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছিল, তা এখন হবে সচেতন ও ইচ্ছাকৃত-ভাবে, এবং তাতে উপলব্ধির আনন্দ থাকায় তা হবে যথেষ্ট দ্রুতগতিতে।

আগেকার যুগে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে এই ক্রিয়ার লক্ষণ নিরূপণ করতে হলে তীক্ষ্ণ অলোকদৃষ্টির প্রয়োজন হতো, কিন্তু এখন মানুষের মধ্যে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে অধ্যাত্ম বস্তুর বিকাশ, এবং তা এর পরে আরো পূর্ণ ও মুক্তভাবেই আত্মপ্রকাশ করবে। মানুষ এখন নিজেই তার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, অন্ততপক্ষে তার জীবনের উচ্চতর অংশে সে নিজেকে জেনেছে; সে এখন জানতে শুরু করেছে যে তার জীবনের মূল সত্তা তার কাছে কি প্রত্যাশা করছে, এবং সেই প্রত্যাশাকে সার্থক করতে সে সাধ্যমত সহযোগিতাও করছে।

প্রকৃতি চায় যে সৃষ্টি জানুক স্রষ্টাই নিজেকে সৃষ্টির বাস্তবরূপ দিয়েছে, স্রষ্টাতে ও সৃষ্টিতে তাই প্রভেদ নেই, আর এই অভেদত্বের উপলব্ধি আনাই তার লক্ষ্য। এই হলো প্রকৃতির গুহ্য কথা।

প্রশ্ন: কিন্তু না, শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলছেন "প্রকৃতির নিশ্চেতন এবং লুক্ক ও প্রচ্ছন্ন ভাব।" প্রকৃতির "নিশ্চেতনা" কেন?

উত্তর না, সে কথা নয়। প্রকৃতি আসলে নিশ্চেতন নয়; কেবল তাকে দেখাচ্ছে নিশ্চেতন। এই নিশ্চেতনাকে নিয়েই তার প্রথম কাজ শুরু হলো, কিন্তু তার গভীরে লুকিয়ে রইল চেতনা যা অল্পে অল্পে প্রকাশ পেতে থাকল। (মা এখানেই পরে সংশোধন করে বলেছেন, "চেতনার প্রকাশ নয়, প্রকাশ হলো তার অভিব্যক্তি, অর্থাৎ সে উত্তরোত্তর নিজেকে অভিব্যক্ত করছে।") যেমন মনে করো ধাতুপ্রকৃতি, পাথর, মাটি, নানা ধাতু, জল, বাতাস, সবকিছুকেই সম্পূর্ণ নিশ্চেতন দেখাচ্ছে, কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে যদি দেখ...আর বিজ্ঞানও তো এখন বলছে যে বাহির থেকে অসাড় দেখালেও ওর মধ্যে কিছু শক্তি রয়েছে কেন্দ্রীভূত ও সংহত হয়ে, সুতরাং বলতে হবে যে কোনো সচেতন শক্তির দ্বারাই তারূপ ঘটেছে। অবশ্য বাহ্যদৃষ্টিতে যখন আমরা কোনো পাহাড় দেখি তখন আদৌ ভাবতেই পারি না যে ওটি চেতন, কারণ চেতনার কোনো লক্ষণই সেখানে নেই, তাকে পুরোপরি নিশ্চেতনই দেখায়।

কিন্তু বাইরের থেকে নিশ্চেতন দেখালেও তার মধ্যেও উত্তরোত্তর এক চেতনা জাগছে। আর ধাতুর রাজ্যে তো গুহ্য চেতনার লক্ষণই রয়েছে, যেমন দেখতে পাচ্ছি তার কেনাস বা দানা বাঁধতে পারার ব্যাপারে। এই রকমারি ক্রিস্ট্যাল বা দানা বাঁধার কাজটি এমন অপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে নিপুণভাবে সাজানো হয়, যে খোলা মন নিয়ে নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝবে যে তার পিছনে কোনো এক চেতনা কাজ করছে, অমন জিনিস কখনো অচেতনে দৈবক্রমে ঘটে যেতে পারে না।

স্ফটিক ও খনিজ নবণের কেনাস কখনো লক্ষ্য করে দেখেছ কি ? কতই সুন্দর সেগুলি দেখতে, তাই না।

আর সমুদ্রের, বায়ুর, ঝড়ের তরঙ্গসমূহের নির্দিষ্ট প্রকার চালনা দেখলে মনেই হতে থাকে যে কোনো এক চেতনা বা অনেক চেতনাই তার পিছনে কাজ করছে। প্রকৃতই তাই। কেবল বাহ্যদৃষ্টিতে দেখায় যে ওর মধ্যে কোনো চেতনা নেই।

বস্তুত প্রত্যেক সত্তাই সমগ্র বিবর্তনচক্রের মধ্যে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হয়ে চলেছে, এবং নূতন করে প্রত্যেক ধাপটি এগিয়ে যাবার আগে ঝটিতি একবার করে তার পুরানো ধাপগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটে যাচ্ছে, পুরানো পাঠগুলি চট্ করে পুনঃপুনঃ ঝালিয়ে নেবার মতো।

অতএব প্রথমে হলো যাত্রা শুরু ; ঢুকে চলে গেলে গহন অন্ধকার অচেতনা ও অন্ধ নিশ্চেতনার পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে ; সেখানে থেকে আবার নতুন করে জাগতে শুরু করলে, তখন ফিরে চললে আলোর রাজ্যে।

৭-৫-১৯৫৮

(৩)

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ এইখানে লিখছেন ("The Life Divine" গ্রন্থের "The Evolution of Man" অধ্যায়ে, ১০৪৫ পৃঃ),—"সর্বোচ্চ জ্ঞানকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে চাওয়া ও মনের আয়ত্তের মধ্যে আনা এক অপরিহার্য সহায়।" এর অর্থ কি ?

উত্তর : অধ্যাত্মরাজ্যের যা কিছু ব্যাপার আমাদের মধ্যে ঘটে থাকে, নিজেদের বোঝবার কারণে আমরা তার একটা বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা করতে চাই, সেই অনুভূতির মধ্যে কার্য-কারণের একটা যুক্তি টেনে আনতে পারলে মনের তাতে কিছু লাভ হয়, তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। শ্রীঅরবিন্দ তাকেই বলেছেন, "অনুভূতিকে মনের আয়ত্তের মধ্যে আনা।"

এ ক্রিয়াটি প্রায় আপনা হতেই করা হয়ে থাকে, যদিও তাতে মূল অনুভূতির আসল রসটুকুই বাদ হয়ে যায়। তাকে পুরোপুরি ভাবে বজায় রাখতে হলে মনের আয়ত্ত সীমার মধ্যে না এনে তাকে তেমনিভাবেই রাখা উচিত, কিন্তু বাস্তবের জগতে বাস করতে থাকায় তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেইজন্যই আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে যারা মনের দখলে না এনে সেইভাবেই বজায় রাখতে চাইত তারা কর্মজগতের স্তরে না নেমে সমাধির মধ্যে আশ্রয় নিতো। কিন্তু তুমি যদি চাও তোমার পার্থিব জীবনেও রূপান্তর আনবার জন্য প্রাণ মন

দেহের উপর এবং তোমার দৈনন্দিন জীবনের উপর সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রভাবকে কার্যকরী করতে, তাহলে তাকে তোমার মনের ভাষাতে তর্জমা করে নিতেই হবে, এবং তাতে তার যতটা জিনিস গলে বেরিয়ে যায় সে ক্ষতিটুকু সহ্য করতেই হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত গোটা মনটাই রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে সেই অনুভূতিকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে নিজেও তার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে না পারছে।

কিন্তু আমরা যা চাইছি তা আরো কঠিন ; আমরা চাই প্রাণসত্তারও রূপান্তর, যাতে সেও আধ্যাত্মিক অনভূতিতে তার অবিকৃত অবস্থাতেই অংশগ্রহণ করতে পারে, আর শেষ পর্যন্ত আমরা চাই দেহেরও রূপান্তর আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রিয়াতে, যাতে তা আর সেই অনুভূতির বাধাস্বরূপ না হয়।

সাধারণ মনের তরফ থেকে এই রূপান্তরের সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া খুব কঠিন, কারণ ওর অর্থ হবে সমগ্র বৃত্তিগুলি পাল্টে যাওয়া, অর্থাৎ যাতে সকল বৃত্তির সকল ক্রিয়াই বদলে যাবে। কিন্তু আমরা বৃত্তিকে ও তার ক্রিয়াকে এক করে দেখতে এতই অভ্যস্ত যে ঐ প্রকারে ভাবা ছাড়া যে অন্য কোনো প্রকারে ভাবা যায় তা বিশ্বাসই করতে পারি না।

কিন্তু সেটা কেবল তখনই সম্ভব যখন তোমার মনের ভূমিতে আসবে সম্পূর্ণ নীরবতা, এবং উপরের দীপ্তি নিয়ে অধ্যাত্মশক্তি সরাসরি সেখানে নেমে এসে তারই প্রভাবে মনকে দিয়ে সব-কিছু কাজ করাবে—তার সাধারণ বিচার-বিশ্লেষণমূলী আপন অভ্যস্ত ক্রিয়াগুলির পরিবর্তে। মনের তথাকথিত স্বাভাবিক বৃত্তিক্রিয়াকে দিতে হবে থামিয়ে, আর তখন আধ্যাত্মিক আলো শক্তি ও চেতনা সেই মনের প্রচলিত রাস্তায় না গিয়ে সরাসরিভাবেই নিজেকে ব্যক্ত করতে পারবে।

মন তার বাহ্য স্বরূপে হলো একটি ক্রিয়াযন্ত্র, যার কাজ হলো সংগঠন এবং ক্রিয়া-সম্পাদন। চিন্তাগুলিকে সে তার পারম্পর্য অনুযায়ী গুছিয়ে সাজিয়ে নেয় এবং তাই থেকে বাস্তব কর্মের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত স্থির করে নিয়ে কর্মের বিষয়ে তদনুযায়ী প্রেরণা দান করে। কিন্তু অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা সেটা সরাসরিভাবেই সম্পন্ন হয়ে থাকে, মনের চেতনাকেও তার দখলের মধ্যে এনে, সুতরাং মনের বিচার বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করবার নিজস্ব রীতিটা সেখানে আদৌ কাজে লাগবে না। এইরকম সরাসরিভাবের কাজ সহজাত বোধির দ্বারাও কতকটা হয়ে থাকে ; সেই হিসাবে এই আধ্যাত্মিক শক্তির কাজকে বলা যেতে পারে অতিবোধির ক্রিয়া, যেখানে সাক্ষাৎ দৃষ্টি অনুভূতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি হবে, যেখানে সকল জানাই হবে নিজেও তাই হয়ে জানা।

এই রূপান্তরের অনেকগুলি ধাপ আছে। তার প্রথম ধাপ হলো মনের মধ্যে ঐরূপ ক্রিয়ার নকল হতে থাকা। মনের পটে আপনা হতেই বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তে আসার মামুলী কাজগুলি হয়ে যেতে থাকে, কিন্তু তা এতই তড়িঘড়ি সম্পাদিত হয়ে যায় যে তাকে মনের তরফের কাজ বলে জানতেই পারি না, কেবল দেখি তার আরম্ভটুকু আর শেষ

সীমাংসাটুকু, তার মাঝখানে যে মনের ক্রিয়ার পরপর ধাপগুলি মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে গেল তা ধরতেই পারি না, কাজে তাকে বোধির ক্রিয়া বলে মনে করি। যাদের মন খুব ত্বরিত-ক্রিয় এবং চট্‌পটে তাদের কাছে সেটা বোধির কাজ বলেই বোধ হতে পারে, কিন্তু তা বাহ্যত সেইরূপ দেখায় এবং তা প্রায়ই হয় বোধির ক্রিয়ার নকল। আসল বোধির হলো প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, যেখানে বুদ্ধিবিচারের কোনো কাজই নেই। সেখানে কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সরাসরি অভিব্যক্তি।

কিন্তু যতদিন সে অবস্থা না আসছে, ততদিন ঐ অনুভূতিকে যাহা চেতনার মধ্যে আনতে তাকে মনের বিচার-বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আসতেই হবে, এবং তাতে তার আসল রসটুকু গলে বেরিয়ে যাবে, বাকী থাকবে তার শুষ্ক ছালটুকু, যার কোনো উপলব্ধি আনার শক্তি নেই—সেটা তখন প্রায় উবে গেছে।

অথচ যারা হয় বুদ্ধিপ্রধান মানুষ তাদের পক্ষে এটা নিতান্তই দরকার ; তারা সব-কিছু জিনিষের মতো আভ্যন্তর অনুভূতিকেও মনের কাছে ধরে দেখবে এবং মনের মধ্যে একটা গঠন দেবে। ভাষা দেবার ক্ষমতা থাকলে তাকে ভাষায় ব্যক্ত করতেও চেষ্টা করবে! কিন্তু যখন তুমি অনুভূতির রাজ্যে বাস করতে অভ্যস্ত হবে তখন নিজেই লক্ষ্য করতে পারবে যে অনুভূতি ও তার বিবৃতির মধ্যে কতখানি ফাঁক থেকে যাচ্ছে, কতখানি নীচে তাকে নামিয়ে ফেলা হচ্ছে, এবং তার মাধুর্যে সমগ্র সত্তা প্রভাবিত হবার পরিবর্তে তা কতখানি পিছনে হটে ধীরে ধীরে অন্তরালে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপরে যতটুকু রইল তা আসল জিনিসের শুষ্ক এবং বাসি নকল মাত্র,—যতই জোরালো ভাষায় তাকে ব্যক্ত করো তবু তার সত্যের যনত্ব শুকিয়ে ও গুটিয়ে গেছে। তার মধ্যে যে আনন্দ, যে সৌন্দর্য ও সৌরভ, যে দীপ্তি ও উত্তাপ ছিল, সবস্তই মুড়িয়ে গেছে। অনুভূতিকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরতে চাইলেই তা গলে বেরিয়ে যায়, গঠন দেবার শক্তি থাকলেও তা ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আমাদের এখানকার জীবনধারায় "মনের উন্নতি" বলতে কি বুঝব? আর তার সার্থকতাই বা কী?

উত্তর : এ-কথা একবার তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি। বোধ করি শিক্ষাবিষয়ক আমার প্রবন্ধগুলিতে তা বিশদভাবে বলা হয়েছে। সমুচিত শিক্ষা পেলে দেহের বেলাতেও যেমন উন্নতি হয়, মনের বেলাতেও তাই।

দেহের মধ্যে রয়েছে নানা অঙ্গ, মাংসপেশী এবং স্নায়ু ; শিক্ষা এবং অনুশীলনের দ্বারা যদি তার উন্নতির কোনো চেষ্টা না করি, তাহলে গোড়াতে শক্তি যা থাকে সেইটুকুই থাকবে, তার দ্বারা যেটুকু কাজ হবে তা হবে অপূর্ণ ও নগণ্য। সম্পূর্ণ ও সমুচিত অনুশীলনের ফলে স্থূলদেহের দ্বারা যতখানি কাজ হতে পারে, বিনা অনুশীলনে তা কখনই হয় না। এ কথার

কেউ দ্বিরুক্তি করবে না। তেমনি মনের বেলাতেও সেই একই কথা। মনের যে যন্ত্রটি তোমাকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে খুব বেশি রকমের সম্ভাবনা রয়েছে ও গুণ-বিকাশের অবকাশ রয়েছে; কিন্তু সে সম্ভাবনা রয়েছে মুদিত হয়ে, বিশিষ্ট রকম প্রশিক্ষণের দ্বারা তাকে উন্মীলিত করে নিতে হবে, তার জ্যোতিকে ফোটাতে হলে রীতিমত অনুশীলন চাই।

অবশ্য মস্তিষ্কই হলো মনশ্চেতনার বাহ্য অভিব্যক্তির কেন্দ্র। সেই মস্তিষ্ক যদি উৎকর্ষের দ্বারা পরিণতিপ্রাপ্ত না হয়ে অপরিণত অবস্থাতেই থেকে যায় তাহলে সে অসংখ্য রকমের জিনিস প্রকাশ করতে অপারগ হয়, কারণ তেমন সুনিপুণ প্রকাশ-যন্ত্রগুলি তার মধ্যে তৈরি হয়ে ওঠেনি। কোনো বাদ্যযন্ত্রে যদি অধিকাংশ সুর বাজাবার মতো তন্ত্রীর অভাব থাকে, তাহলে তার মতোই হয় মস্তিষ্কের অবস্থা, সম্পূর্ণ রকমে না হলেও অনেকটা তাই।

মনের প্রশিক্ষণ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে শানানোর দ্বারা মস্তিষ্কের গঠন বদলায় ও তার অনেক উন্নতি হয়, তাইতে তার প্রকাশক্ষমতাও সম্পূর্ণতর ও মার্জিত হয়।

তুমি যদি জীবনের ক্ষেত্র থেকে সরে অব্যক্তরাজ্যের চূড়ায় গিয়ে থাকতে চাও তাহলে এর কোনো প্রয়োজন নেই, নতুবা অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চাইলে এটা অনিবার্য।

প্রশ্ন: কিন্তু আপনি তো বলেন যে মনের এই সব বিচার-বিশ্লেষণের বৃত্তিগুলিকে যদি অতিরিক্ত প্রখর করে তোলা হয়, তাতে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসার পক্ষে বাধা হতে পারে, তাই নয় কি?

উত্তর: হাঁ, তাই বটে, যদি তাকে সংযত করে নিজের দখলের মধ্যে রাখা না হয়। কিন্তু তা নাও ঘটতে পারে। তাকে বশে রাখা কিছু কঠিনই হয়, কারণ যার মধ্যে ব্যক্তিবোধ জিনিসটা তেমন গজায়নি তার চেয়ে যার মধ্যে সেটা গজিয়েছে তার পক্ষে নিজেকে সংযমের মধ্যে রাখা কঠিন তো হবেই; তার অহংভাবটা তখন দানা বেঁধে গেছে, সেখানে অনেকখানি আত্মশ্লাঘা এসে গেছে, তাই না? কিন্তু তবুও এ সব বাধাকে কাটিয়ে ওঠা যায়, আর তা যারা পারে তাদের সেই ব্যক্তিত্বপূর্ণ পরিণত সত্তা যে উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হয় তা কোনো কাঁচা রকমের অশিক্ষিত প্রকৃতির পরিণতির অপেক্ষা অনেক দামী। তাদের পক্ষে যে রূপান্তর আসা বা আত্মসমর্পণ করতে পারা আরো কঠিন হবেনা এমন কথা আমি বলছি না, কিন্তু তাতে সক্ষম হলে তার সুফল অনেক বেশি হবে।

বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এখানে তুলনা চলে,—যে যন্ত্রে মাত্র কয়েকটি সুরের তন্ত্রী আছে তার ওর সঙ্গে দশগুণ বেশি তন্ত্রীওয়ালা যন্ত্রের যতখানি তফাৎ ততখানি। যে যন্ত্রে মাত্র চার পাঁচটি সুরের চাবি আছে তাকে বাজাতে পারা হয়তো খুবই সহজ, কিন্তু যে যন্ত্রে পুরোপুরি সংখ্যার চাবি আছে তা বাজাতে পারলে সঙ্গীতটা হবে উঁচুদরের।

আরো তুলনা হতে পারে একটি একক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে একটা পুরো অর্কেস্ট্রার।

যে ব্যক্তি তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বসমেত সম্পূর্ণরূপে সমৃদ্ধ, তার সঙ্গে তুলনা হতে পারে শত শত বাদকের এক সম্মিলিত অর্কেষ্ট্রার। অতগুলিকে সঙ্গতির মধ্যে রেখে সেই অর্কেষ্ট্রার পরিচালনা করা খুব কঠিন কাজ বটে, কিন্তু তা করতে পারলে যে ফল হয় তা অত্যাশ্চর্য।

১৭-৯-৩৮

(৪)

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দের "দিব্যজীবন" ("The Life Divine") থেকে "মানব ও বিবর্তন" ("Man and the Evolution") অধ্যায়টি পাঠ করে।

উত্তর : যারা মনোময় সত্তা তারাই কেবল সৃষ্টিকার্য ও রূপান্তরের ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে ; পশুদের যে মনশ্চেতনা আছে তা বিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আগেকার পশুরাজ্যের যুগে জগতে কোথায় কি ঘটে যাচ্ছে তা জানার ও স্মরণ রাখার কোনো উপায় ছিল না। তাই পৃথিবীর ইতিহাসের সে অংশ একেবারে অবলুপ্ত। পর্যায়-ক্রমে যে রূপান্তর তখন ঘটে গেছে তাকে অনুসরণ করে স্মৃতিগত করে রাখার মতো মানসিক যোগ্যতা তখন কারো ছিলনা। এখন তার সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার মধ্যে প্রত্যক্ষ স্মৃতির কোনো নজির নেই, অধিকাংশই কল্পিত। চৈত্যসত্তাকে সেই সব পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নিশ্চয়ই আসতে হয়েছে কিন্তু সে সম্বন্ধে তার কোনো স্মৃতি নেই। চৈত্যের যা স্মৃতি থাকে তাও চৈত্য, কিন্তু সে হলো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস ; মনের স্মৃতির মতো তার মধ্যে কোনো অতীত ঘটনাবলীর সঠিক বিবরণপূর্ণ ঐতিহাসিক বাস্তবতা নেই।

এখন কিন্তু আমরা এক নতুন রকম রূপান্তরের প্রবেশমুখে এসে পড়েছি, যাকে এখানে বলা হয় চেতনার আসন্ন নবোন্মেষ আমরা সম্মুখীন হয়েছি। এখন আমরা প্রত্যক্ষ করব যে মনোময় সত্তা কেমনভাবে অতিমানস সত্তাতে রূপান্তরিত হচ্ছে, আর আমাদের মনের ঐতিহাসিক স্মৃতিশক্তির সুযোগ নিয়ে যা দেখব তা লিপিবদ্ধ করতে পারব। সুতরাং সেদিক থেকে দেখলেও এখন যা ঘটতে চলেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। আর যখন ঐ রূপান্তর প্রক্রিয়ার শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবো, তখন খুব সম্ভবত তার থেকে আমরা অতীতের রূপান্তরগুলিরও হদিস পেয়ে যাবো ; অর্থাৎ এখন আমরা যে কথা আন্দাজে বুঝতে চেষ্টা করছি তা এখনকার রূপান্তরধারার পুনরাবৃত্তিকে অনুসরণ করে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবো, যখন দেখব এবার মনোময় সত্তা কেমনভাবে অতিমানস সত্তায় রূপান্তর নিচ্ছে।

সেইজন্য তোমাদের বলা হচ্ছে নিজেদের পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে প্রখর করে তুলতে,

যাতে তোমাদের আধারের অবস্থার ভিতর দিয়ে অজান্তে কিছুই না ঘটে যেতে পারে, কেবল করে কি ঘটে গেল তা না জেনে হঠাৎ একেবারে একটা নতুন জীবনের মধ্যে জেগে উঠতে না হয়।

তোমাদের পক্ষে এখন উচিত নিজেদের যত ছোটোখাট মানুলী মনস্তত্ত্বের ব্যাপার নিয়ে তাতেই ব্যাপৃত হয়ে না থাকা (আর মানবের ইতিহাসে তা এখন যথেষ্ট সেকেলে জিনিস হয়ে গেছে),—এখন একটা নৈর্ব্যক্তিক ও সূক্ষ্মতর সাধারণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তোমাদের সম্পূর্ণ সজাগ ও অবহিত হতে হবে, যাতে সবিশেষ ঐকান্তিকতা সহকারে নব নব আবিষ্কারের সম্মুখীন হতে পারো।

পক্ষপাতিত্ব ও পছন্দ-অপছন্দের মনোভাব এখন ছেড়ে দিতে হবে, এখন চাই ওর চেয়ে সূক্ষ্মতর বুদ্ধির দৃষ্টিকে উন্মীলন করা, যাতে সকল প্রকার স্বার্থপরতা ও আসক্তিকে অতিক্রম করে নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারো যা কিছু ঘটে চলেছে। *

১২-৩-১৯৫৮

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পন্তপতি ভট্টাচার্য

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে)

(৮৮)

বাঁচবার জন্যই এ জগৎ মৃত্যু দিয়ে গড়া। মৃত্যুকে তুমি বাদ দিতে চাও? তাতে জীবনও বাদ হয়ে যাবে। মৃত্যুকে বাদ দিতে পারো না, কিন্তু তাকে রূপান্তরিত করতে পারো বৃহত্তর বাঁচাতে।

(৮৯)

ভালোবাসার জন্যই এ-জগৎ হিংসাতে ভরা। হিংসাকে তুমি বাদ দিতে চাও? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসাও লোপ পাবে। হিংসাকে বাদ দিতে পারো না, কিন্তু তাকে তার উল্টো জিনিসে অর্থাৎ তীব্র প্রেমে ও আনন্দে রূপান্তরিত করে নিতে পারো।

(৯০)

জ্ঞানের জন্যই এ-জগৎ অজ্ঞানে ও ভ্রান্তিতে পূর্ণ। অজ্ঞানকে ও ভ্রান্তিকে বাদ দিতে চাও? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও লোপ পাবে। অজ্ঞান ও ভ্রান্তিকে বাদ দিতে পারো না, কিন্তু তাকে পরমতর বুদ্ধিতে রূপান্তরিত করে নিতে পারো।

(৯১)

কেবল জীবনই যদি থাকত আর মৃত্যু নয়, তাহলে অমরত্ব বলে কোনো কিছু থাকত না; কেবল প্রেমই যদি থাকত আর হিংসা নয়, তাহলে আনন্দ হতো ক্ষণিকের নিরুত্তাপ স্ফুরণ; কেবল জ্ঞানই যদি থাকতো আর অজ্ঞান নয়, তাহলে আমাদের চূড়ান্ত বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিও তার সংকীর্ণ সীমাটুকু নিয়েই থেকে যেতো।

(৯২)

মৃত্যুই রূপান্তরিত হতে পারে জীবনের অমরত্বে; হিংসা রূপান্তরিত হতে পারে প্রেমের রভসে; অজ্ঞান পরিবর্তিত হতে পারে বুদ্ধি-বিজ্ঞতা হতেও উচ্চতর জ্ঞানদীপ্তিতে।

উত্তর : এগুলি সবগুই হলো একই মর্মার্থজ্ঞাপক যে, বিপরীত ও বিরুদ্ধ জিনিস থাকলে তবেই তা উন্নতির অভিমুখে তীব্র প্রবেগ জন্মাতে পারে। কারণ, যদি বলো যে হিংসা না থাকলে প্রেম হতো নিরুত্তাপ...কিন্তু অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্তকে ছাড়িয়ে গিয়ে প্রেমের যেখানে মূল তত্ত্ব সেখানে হিংসা বা নিরুত্তাপের কোনো প্রশ্নই নেই। শ্রীঅরবিন্দের এ কথার অর্থ কেবল এই হবে যে এখানকার জড়ের মধ্যে বিরুদ্ধতার উসকানি থাকলে তবেই তার ভিতরকার আসল জিনিস সর্বাপেক্ষা শীঘ্র ও সতেজে অভিব্যক্ত ও প্রতিভাত হতে পারবে।

অনুভূতির সম্পর্কে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ প্রথমত, যখন তুমি শাশ্বত দিব্য প্রেমের কিছুমাত্র স্পর্শ পাবে, তখনই তোমার মধ্যে জাগবে একটা অনুভব, চেতনার একটা স্পন্দন—যা শুধু বুঝতে পারার মতো নয়, তার চেয়েও বাস্তব—কিন্তু এদিকে তোমার স্থূল চেতনা যতই কেন ঘষে মেজে তৈরি হয়ে থাক তথাপি সেই জিনিসকে নিজের কাছে সে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না—সুতরাং তোমার মধ্যে প্রথম যে ধারণাটি জন্মাবে তা তোমার এই অপারগতা। তারপর আসবে একটা বিপরীত অনুভূতির তরঙ্গ, যা ঠিক হিংসা ঘৃণার মতো নয়, কিন্তু নোটের উপর এমন এক বিরুদ্ধ স্পন্দন যার মধ্যে রয়েছে সেই প্রেমকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার তীব্র আবেগ। অর্থাৎ এই স্থূল জগতের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সেই প্রেমের অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করতে চাইছে না—আমি সাধারণ জগতের কথা বলছি না, বলছি তার চেতনার দিকের কথা, সে চেতনার আধুনিক শীর্ষ উন্নতিরই অবস্থাতে। আর আমি বলছি এমন অনুভূতির কথা যা বাস্তবিকই এসেছে। এ চেতনার অংশবিশেষের সেই যে বিমুখ বিরুদ্ধতা, তা সরাসরি গিয়ে নাড়া দিয়েছে প্রেমের যেখানে মূল উৎস সেখানে পর্যন্ত, যা এমন তীব্র আঘাত না পেলে কখনই এমনভাবে উদ্দীপ্ত হতো না। তার ফলে এখন বাঁধ ভেঙে নেমে এসেছে প্রেমের বন্যা, যা আগে কখনো হয়নি, সুতরাং তার এমন বিকাশও আগে কখনো হয়নি।

এমনি ধরনের আরো এক অনুরূপ অনুভূতি আসতে পারে তথাকথিত জীবন-মরণ সম্পর্কে। নিরন্তরের এই যে মরণ-সম্ভাবনা তোমাদের জীবনের উপর "ছায়াপাত" করছে, এর কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তাঁর "সাবিত্রী"তে : জন্মগ্রহণ থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত এ তোমার সঙ্গের সাথী, মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যুভয় সর্বক্ষণই লেগে আছে। আর তার সাথে সাথে অমনি জেগে উঠছে দেহের প্রতি কোষে কোষে শাশ্বতের শক্তির প্রতি আকুল আহ্বান,—সর্বক্ষণের ঐ মৃত্যুভয়টি না থাকলে যা কখনো জাগতো না। অতএব বুঝতেই পারছ যে ভগবৎ-অভিব্যক্তিকে টেনে আনার জন্য এগুলি হলো উপায় মাত্র, যাতে তাড়াতাড়ি কাজটা এগিয়ে যায়, উত্তরোত্তর যাতে সে অভিব্যক্তি পূর্ণতর হয়ে উঠতে পারে। তা এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে বলে এই উপায়গুলিও এমনি অবাঞ্ছিত। সেই অভিব্যক্তি যতই সম্পূর্ণতর হয়ে আসবে ততই এই উপায়গুলিও হয়ে আসবে সূক্ষ্মতর, তখন আর জগতের

উন্নয়নের জন্য এমন নির্মল রকমের বিশুদ্ধ জিনিসগুলির প্রয়োজন হবে না। জগৎ এখনও রয়েছে শৈশবের অবস্থাতে, তাই মানবের চেতনাও শৈশবাবস্থা ছাড়াতে পারেনি।

এটি হলো নিতান্ত বাস্তব অনুভূতির কথা।

সমুচিত উন্নয়নের কাজের পক্ষে যখন জগতে মৃত্যু থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখন মৃত্যুও আর থাকবে না, দুঃখকষ্টের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে দুঃখকষ্টও আর থাকবে না, প্রেমের বিকাশের জন্য যখন হিংসাঘৃণার প্রয়োজন ফুরোবে তখন হিংসাঘৃণাও আর থাকবে না।

(নীরব থেকে)

মোট কথা সৃষ্টিকে তার জড়তা হতে মুক্ত করে ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর করে দেবার জন্য এইগুলিই হলো সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্র ও সুনিশ্চিত উপায়।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

সৃষ্টির মধ্যে একটা দিক দেখা যাচ্ছে যা হয়তো খুবই সাম্প্রতিক তা হলো বিশৃঙ্খলা ও অসঙ্গতির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার তাগিদ। যেখানে সঙ্গতি নেই সেখানেই আসে বিশৃঙ্খলা। তখন তা অনেক রকমের আকার নেয়—যেমন হানাহানি, ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অবথা অপচয়। সে অবস্থা নির্ভর করে তুমি কেমন স্তরে অবস্থান করছ তারই উপর। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তার মধ্যে এসে পড়ে অর্থহীন জটিলতা, শক্তিক্ষয়, বস্তুক্ষয়, কালক্ষয়, অবুদ্ধি, বিকৃত বুদ্ধি, নানারূপ আবিলতা। বেদে একেই বলা হয়েছে কুটিল অবিদ্যা (Croockedness)। যার মানে পেঁচালো জিনিস, যা সোজাভাবে না থেকে বেঁকে পাকিয়ে মুচড়ে থাকে। ভগবৎ-ক্রিয়ার যে শুদ্ধ ও সরল সুসঙ্গতি তার থেকে একেবারেই উল্টো। ...সে জিনিস হলো শিশুর মতো সহজ, সরল, একেবারে সোজাসুজি, যা অসংলগ্নভাবে বৃথা ঘুরপাক খায় না। তবুও সে একই জিনিস: এই বিপরীত রকমের বিশৃঙ্খলাই সেই বিশুদ্ধ ও সরল জিনিসের জন্য আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলার এক উপায়।

দেহ সেটা অনুভব করে, মর্মে মর্মেই তা অনুভব করে যে সব-কিছুই কত সোজাসুজি ও সহজ হয়ে উঠতে পারে।

আর দেহের পক্ষে তাই দরকার—রূপান্তর পেতে হলে এমনি ব্যক্তিগত জিনিসে জড়ীভূত হয়ে না থেকে তার পক্ষে চাই নিজেকে সরল ও সহজ করে নেওয়া। প্রকৃতির মধ্যে কত কিছু জটিলতা রয়েছে যা আমরা এখন কতক বুঝতে ও পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেছি,—আমাদের সামান্য কিছু দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতেও এত বেশি জটিলতার আমদানি করতে হয় যে তার কথা ভাবা যায় না। মানুষের চিন্তাতে তার সবগুলির কিনারা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে,—বিজ্ঞান এখন তা আবিষ্কার করছে। আর এটাও এখন আমরা স্পষ্টই অনুভব করছি যে ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক করতে ও সকল বিশৃঙ্খলা ও জটিলতাকে ঘোচাতে হলে চাই সহজ ও সরল হওয়া।

(দীর্ঘকাল নীরব থেকে)

প্রকৃতিকে বাধ্য হতে হয়েছিল ঐ সব উৎকট ও অনন্ত প্রকার জটিলতার সাহায্য নিতে, যাতে সে আপন আত্মাভিব্যক্তি ঘটিয়ে তার মৌলিক সারল্যে ফিরে যেতে পারে।

তাহলে আমরা সেই একই কথাতে ফিরে আসছি। সমূহ জটিলতার ভিতর থেকেই দেখা দেবে সারল্য ফিরে আসার সম্ভাবনা, যা তখন একটা ফাঁকা জিনিস হবে না, তা হবে পরিপূর্ণ রকমের পরিণত জিনিস। আর সব কিছুই হবে তার অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এই সব জটিলতার সৃষ্টি না হলে তা হতো শূন্যগর্ভ।

সেইরকম সব আবিষ্কারই এখন হচ্ছে। যেমন দেশ শরীরসংস্থানের দিক দিয়ে আজ চিকিৎসার সুবিধা করতে কতই অবিশ্বাস্য রকমের জটিলতার আবিষ্কার হচ্ছে। জড় পদার্থের মৌল উপাদানগুলির বিশ্লেষণের মতো তার মধ্যে কতই বিচিত্র রকমের জটিলতা। অথচ সব-কিছুই হলো সেই এককে খুঁজে পাবার প্রয়াস—সেই অনন্য সহজ সরল ভগবত্তাকে।

(নীরব থেকে)

কাজটা হয়তো শীঘ্রই হয়ে যাবে—তবু শেষ পর্যন্ত তার জন্য চাই আশ্পৃহা, এমন তীব্র ও অনন্ত আশ্পৃহা যা নামিয়ে আনবে সেই রূপান্তরকারী শক্তিকে, এবং তার দ্বারাই জটিলতা বদলে যাবে সরলতায়, হিংসা বদলে যাবে প্রেমে ইত্যাদি।

আমাদের অবস্থাটা খুবই ক্ষোভের, এমন কথা বলায় কোনো লাভ নেই। কেন এমন হয়েছে?...যখন এমন থাকবে না তখন তা বোঝা যাবে। কিংবা অন্যভাবেও বলা যায় যে এর কারণ জানা গেলে তখন এমন আর থাকবে না।

আর এই যে সব মন্তব্য করা, "এমন না হয়ে অমন হলে বেশ হতো", ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো একেবারেই বৃথা ও নিরর্থক। তোমার যা করবার তাই করে যাও, যত গভীর পারো; যাতে এমন আর না থাকে, এই হলো একমাত্র কাজের কথা।

দেহের দিকের কথাটা খুবই বিবেচ্য। কিন্তু কাজটা পর্বতপ্রমাণ, যদিও আপাত-দৃষ্টিতে খুবই ছোটোখাটো ব্যাপার, কিন্তু বহুত্বের দিক দিয়েই তার মূল্য।

(না পরে এখানে এইটুকু যোগ করে দেন,—"পণ্ডিতেরা বলবে এ সব বাজে কথা, কিন্তু তার কারণ আমি তাদের ভাষা ব্যবহার করছি না, কেবল ভাষারই তফাৎ।)

১৫ই মে, ১৯৬৩

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[চতুর্থ পাদ—পূর্বযোগ]

৮

পুরুষের মুক্তি

শুদ্ধির পরিণাম মুক্তি। অশুদ্ধির হেতু হল দৃষ্টির বিপর্যয়, চেতনার সঙ্কোচ আর বৃত্তির বিকার। পুরুষের দৃষ্টি যদি নির্মোহ হয়, চেতনা হয় আকাশের মত উদার, আর চিদ্‌-বৃত্তি স্বচ্ছন্দ ও সুষম, তাহলে তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ এবং মুক্ত।

কিন্তু মুক্তির দুটি আদর্শ আছে। একটি প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হয়ে মুক্তি—নির্গুণ-ব্রহ্মোপলব্ধি নির্বাণ বিদেহমুক্তি অনাবৃত্তি ইত্যাদি সংজ্ঞায় তার পরিচয়; আরেকটি প্রকৃতি-সহ মুক্তি—ঈশ্বরোপলব্ধি সাযুজ্য জীবন্মুক্তি অবতার ইত্যাদি সংজ্ঞায় তার পরিচয়। দুটিতে সাধারণত একটা বিরোধ কল্পনা করে উৎকর্ষ-অপকর্ষের কথা তোলা হয়। বলা বাহুল্য, পূর্বযোগ দুয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখে না, দ্বিতীয়টিতে বলে করে প্রথমটির পূর্ণতা। মুক্তির সার্থকতা স্বাতন্ত্র্যে। আধারশুদ্ধিতে এই স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ বৃত্তির সুষম স্বাচ্ছন্দ্য আসে প্রাণে মনে বুদ্ধিতে এবং দেহেও (তার কথা পরে)। সে-স্বাচ্ছন্দ্য বিজ্ঞানের। শুদ্ধির কথা আলোচিত হয়েছে, এইবার মুক্তির প্রসঙ্গ।

উপনিষদে মুক্তির একটি পরিচিতি হচ্ছে 'গ্রন্থিগুলির বিকিরণ'। এটি মুক্তির নেতির দিক। গ্রন্থিগুলি এলিয়ে পড়লে শক্তি ছাড়া পাবে; তখন স্বভাবতই দেখা দেবে তার উল্লাস। এইটি মুক্তির ইতির দিক। ইতিকে লক্ষ্য করেই নেতির বিচার করা যাক; দেখা যাক, গ্রন্থিগুলি কি।

গীতায় চারটি গ্রন্থির কথা বলা হয়েছে—বাসনা বা কাম, অহঙ্কার, ত্রৈগুণ্য এবং দ্বন্দ্বভাব। আগের দুটি গ্রন্থি আছে পুরুষে, আর পরের দুটি প্রকৃতিতে। পুরুষ আর প্রকৃতি দুয়েরই মুক্তি চাই। এ-অধ্যায়ে পুরুষের কথা বলে পরের অধ্যায়ে প্রকৃতির কথা তুলব।

*

আদিম গ্রন্থি হল বাসনা। মনঃশুদ্ধির প্রসঙ্গে প্রাণবাসনার কথা আলোচনা করেছি। গীতার ভাষায় এ-বাসনা বা কামের অধিষ্ঠান হচ্ছে ইন্দ্রিয় এবং মন; কিন্তু তার চাইতে

গভীরে রয়েছে বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত কাম। এ-কাম অহংবুদ্ধি বা আদিম ভেদভাবের সঙ্গে জড়িত। ঋগ্‌বেদের ঋষি বলেন, 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ'রূপে এ-কাম ছিল সৃষ্টির আদিতে। পরমপুরুষ কামনা করলেন, 'আমি বহু হব, প্রজাত হব'। তাঁর সেই বহু হওয়ার কামনার যে-প্রবেগ, তা-ই আমাদের ব্যক্তিভাবনার জননী এবং ধাত্রী।

এইদিক দিয়ে দেখতে গেলে কামনার দুটি রূপ। আমাদের মধ্যে কামনা একটা অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না। সে কি চাইছে, তা ভাল করে বোঝে না। তাই তার ভুল হয়, ফলে সে দুঃখ পায়। অথচ কিছু না চাইলেও যে তার জীবন অচল হয়ে যায়। কিন্তু উপর থেকে যখন দেখি, তখন আবার এই কামনারই দেখি দিব্য রূপ। সে তখন আর জীবের আতুর প্রমত্ত পরাহত সঙ্কীর্ণ কামনা নয়; সে ব্রহ্মের দিব্যকাম, তাঁর সত্যসঙ্কল্প, তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ', তাঁর সিসৃক্ষার সহস্রদলকমলে আসীনা কমলা। এ তাঁর উল্লাসের চিন্ময় ছন্দ: যেমন উল্লাস তাঁর চিৎ হতে জড়ে গুটিয়ে আসাতে, তেমনি উল্লাস জড় হতে প্রাণ মন বুদ্ধির ভিতর দিয়ে পুরাণী প্রজ্ঞায় বিকসিত হওয়াতে। আমাদের জীবনের মূলে তারই আবেগ, তারই আকূতি।

উজান-ভাটার ছন্দে এই-যে স্ফুরত্তার উল্লাস, এ এসে কুণ্ঠিত হল আমাদের অহন্তার মধ্যে। অহন্তার অর্থই হল চেতনার সঙ্কোচ। বৃহতের মধ্যে যা ছিল সহজ ও সুঘন, অল্পের মধ্যে এসে সে হল কৃচ্ছ্র এবং সঙ্কুল; শক্তি-মত্ততার পরিণাম হল অপঘাত আর অবসাদ। এই হল কামনার অভিশাপ। আর এর সংস্কার আধারের গভীরে এমনই মজ্জাগত হয়ে আছে যে অন্তঃকরণের বিশিষ্ট বৃত্তির শুদ্ধিতেও তার জড় মরতে চায় না, পাতাল থেকে অসুরদের মত আশয়ের অতল থেকে বারবার সে এসে হানা দিতে থাকে।

আশয় হল অন্ধপ্রকৃতির গুহাশয়ন. আমাদের মূঢ় সংস্কারের সমস্ত বীজ সেখানে সঞ্চিত রয়েছে। আশয়ে নিহিত বাসনাকে নির্বীজ করতে হলে নিরোধ ছাড়া উপায় নাই, সাধককে যেতে হবে নিঃস্পন্দ শূন্যতার অসম্প্রজ্ঞানে। সেখান থেকে যে ফিরে আসা যায় না, তা নয়। শিব-শক্তির সামরস্যই যদি পূর্ণতার সত্য হয়, তাহলে ফিরে আসাটাই স্বাভাবিক। নিরোধ-সংস্কার যদি প্রবল হয়, তাহলে ফিরে এসে সাধক হন নিশ্চেষ্ট অনীহ নিরপেক্ষ নিবৃত্ত অকর্তা: 'ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মত' তিনি উড়ে চলেন। কিন্তু ঐশ্বরযোগের আবেশে তাঁর ফিরে আসাটা দিব্যশক্তির স্ফুরণে সার্থকও হতে পারে। তখন হয় তিনি 'সর্বারম্ভপরিত্যাগী' নিমিত্ত-কর্তা, চিন্ময় মনস্বান্; অথবা সেই পরমেরই প্রপঞ্চোল্লাসের শক্তিক দিব্য-কর্তা, বিজ্ঞানময় বিবস্বান্। এই শেষের অবস্থাতেই পুরুষ-প্রকৃতির মাঝে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে; প্রকৃতি তখন পুরুষের আত্মশক্তি, তপঃশুদ্ধা পার্বতী পরমেশ্বরে নিত্যসঙ্গতা। বাসনা তখন রূপান্তরিত হয় স্বরূপানন্দের উল্লাসে।

*

পুরুষের দ্বিতীয় গ্রন্থি হল অহং। জীবের কামনা যেমন শিবেরই সিসৃক্ষার আনন্দের

কুণ্ঠিত এবং বিকৃত রূপ, তার অহংও তেমনি তাঁরই স্বরাট আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্কীর্ণ প্রতিচ্ছায়া। বস্তুত সর্বব্যাপী এক অহংই আছেন, সেই এক অহংই হয়েছেন বহু অহং। যেখানে বহুত্ব সেইখানেই ভেদ এবং অন্যোন্যব্যাবর্তকতা (mutual exclusiveness)। তার চরম রূপ দেখি জড় পরমাণুতে। কিন্তু একের বহুতে পরিকীর্ণ হওয়া যেমন শক্তির একটি ছন্দ, তেমনি বহুর একে সংহত হওয়াও আরেকটি ছন্দ। ভেদের মধ্যে তাইতে দেখা দেয় অভেদের আভাস, বিরোধ দূর হয়ে বৈচিত্র্য। আবার যা অভেদ তা মহৎ, যা ভিন্ন তা অণু। অণু 'মহতো মহীয়ান্' হতে চাইছে এই তার শক্তিরূপ। অহং অল্প, কিন্তু হতে চাইছে ভূমা ; এই তার জীবনসত্য।

বিরাট জড়ের বুকে অহং যেন চৈতন্যের একটি স্ফুলিঙ্গ। তার সত্তার একটা অপরিহার্যতা আছে, সে নইলে জড়ের মধ্যে চিৎ-এর উন্মেষ হত না। প্রত্যেক উন্মেষের গোড়ায় থাকে একটা সঙ্কোচ একটা কুণ্ঠা। অথচ তাকে কাটিয়ে ওঠবারও একটা গূঢ় প্রবেগ তার মধ্যে থাকে। জীবন জটিল হয়ে ওঠে এইজন্য।

অহন্তার মধ্যে জটিলতার দুটি রূপ—একটি বিরোধ, আরেকটি সঙ্কোচ। অহংএর সঙ্গে অহং-এর বিরোধ দিয়ে জীবনের শুরু। চারদিককার শক্তির হানাহানির মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, পুষ্ট করতে হবে ; তাই নিজের চারদিকে একটা শক্ত বেড়া দিতে হয়। নিজের স্বার্থ না দেখলে নিজেকে বাঁচানো যায় না। তাইতে অপরের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়। আবার বিরোধ শুধু জগৎকে নিয়ে নয়, নিজের মধ্যেও এক বৃত্তির সঙ্গে আরেক-বৃত্তির বিরোধ—কেননা প্রত্যেক বৃত্তিরই একটি নিজস্ব অহং আছে।

এই এক পাপ। আরেক পাপ সঙ্কোচ। অহং সঙ্কুচিত, ছোট হয়েই তার জীবনের শুরু। তার জ্ঞান সীমিত, সে দেখে শুধু ইন্দ্রিয়-মনের ঠুলির ভিতর দিয়ে। সবটা দেখে না বলেই তার ভুল হয়। আবার তার শক্তি সীমিত। শক্তির কুণ্ঠার সঙ্গে দৃষ্টির ভুল মিলে তাই তার কর্মকে করে তোলে বিকর্ম। তার পরিণাম কাজেই যাবেলা ব্যর্থতা দুর্ভোগ—এক কথায় আনন্দের সঙ্কোচ। জীব অজ্ঞান অশক্ত দুঃখী—অহন্তার সঙ্কোচ তাকে ঘিরে আছে বলে।

অথচ সে অসীম হতে চায়, এই তার বাঁচোয়া। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা আছে। অসীমতা দু'রকমের—শক্তির অসীমতা ,আর চৈতন্যের অসীমতা। শক্তির অসীমতা ভোগে আর ঐশ্বর্যে। এই ভোগ আর ঐশ্বর্যের সাধন কি ?—দেহ প্রাণ মন আর বুদ্ধি। কিন্তু স্বভাবতই তারা সীমিত। সীমিত সাধন দিয়ে অসীমকে তো ভোগ করা যায় না বা তার উপর অবাধ কর্তৃত্ব খাটানো যায় না। অতএব অহং-এর কাছে শক্তিসাম্যের পথ রুদ্ধ। সান্ত হয়ে অনন্ত প্রকৃতিকে স্থূলে ভোগ করা যায় না বা বশে আনা যায় না।

কিন্তু অহং-এর পক্ষে অসীমতার আরেকটা পথ খোলা আছে—চিৎসাম্যের পথ। অহং চেতনায় অসীম হতে পারে। অহং-চেতনার বিস্ফারণেরও দুটি পথ। এক, প্রকৃতির

স্পর্শ হতে নিজেকে বিবিক্ত করে শান্ত হওয়া। শান্ত চৈতন্য বিক্ষোভ ও দুরাগ্রহের ঘাত-প্রতিঘাত হতে মুক্ত বলে আপনি ছড়িয়ে পড়ে, এনে দেয় আনন্ত্যের বোধ। আর, ইন্দ্রিয়-পথেই আকাশ হতে বাতাস হতে আলো হতে সমুদ্রবেখলা পৃথিবীর বিস্তার হতে অসীমকে নিজের মধ্যে আবাহন করে তার দ্বারা আবিষ্ট হওয়া, অল্প অহংকে অনুভব করা ভূমার বিভূতিরূপে। তখন আর 'আমার' শক্তি 'আমার' আনন্দ নয়—অসীমেরই শক্তি আর আনন্দ। আর তার নিরহংশতার অনুভবে আমার স্বারাজ্য আর সাম্রাজ্যের মহিমার অনুভব। সে-আমি আর ক্ষুদ্র অহন্তা নয়, বিশ্বব্যাপ্ত পূর্ণাহন্তা, বিশ্বাতীত অথচ সর্বাবগাহী পরাহন্তা—আকাশের মত, আকাশজোড়া প্রাণস্পন্দ আর আলোর হিল্লোলের মত।

এই ব্যাপ্তিচৈতন্যেই অহংএর মধ্যে যে ভেদ বা বিরোধের ভাব ছিল, তার অবসান ঘটে। তখন সব আমিতেই সেই আমি, অথবা এই আমি। সে-আমি বিশ্বাতীত, সেই আমিই বিশ্বরূপ, সেই আমিই জীবভূত। বাসনা তখন সেই পরম আমির প্রপঞ্চোল্লাস।

এই হল পুরুষের মুক্তি অথবা অতিমুক্তি, কেননা নির্বাণ সাযুজ্য সার্ষ্টি সামীপ্য সালোক্য তার অন্তর্ভুক্ত। এ-মুক্তি সাধর্ম্যমুক্তি, সর্বতোভাবে পুরুষ হওয়ার মুক্তি, শিব-শক্তির সামরস্যের মুক্তি।

৯

প্রকৃতির মুক্তি

আর দুটি গ্রন্থির কথা বলতে বাকী—একটি ত্রৈগুণ্য, আরেকটি দ্বন্দ্ব। গ্রন্থিগুলি চেতনার আবর্ত, আর চেতনা স্বরূপত একরস। সুতরাং সমাকবিজ্ঞান দিয়ে একটি গ্রন্থি-মোচন করলে আরগুলিও শিথিল হয়ে যায়। পরাহন্তৃত্ব আপ্তকামতা নৈস্ত্রৈগুণ্য নির্দ্বন্দ্বতা সবই এক পরমচৈতন্যের বিভিন্ন পরিচয়। বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনাটা তাই পরিবর্তসাধকের বোঝবার সুবিধার জন্য।

আমাদের সত্তার দুটি দল—একটি পুরুষ আরেকটি প্রকৃতি, একটি চৈতন্য আরেকটি শক্তি। শক্তির ক্রিয়া চলছে, চৈতন্য তাকে অনুভব করছে আস্বাদন করছে নিয়ন্ত্রণও করছে। চৈতন্যের দিক থেকে সমস্তটা ব্যাপারের কেন্দ্র হল অহং বা আত্মবোধ, তার কামনা বা সঙ্কল্প বা তপঃ শক্তিকে সক্রিয় করছে। আর শক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে সে গুণ-পরিণামে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে, বিচিত্র দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হচ্ছে—পুরুষেরই জন্য; অর্থাৎ প্রকৃতির এই গুণপরিণাম আর দ্বন্দ্বের সার্থকতা চৈতন্যের কাছেই। অহন্তা আর কামনার যে বন্ধ আর মুক্ত দুটি ছন্দ আছে, তা দেখেছি। তেমনি আছে ত্রিগুণের আর দ্বন্দ্বেরও। বন্ধন হতে মুক্তিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই সাধনা। দেখেছি মুক্তির দুটি রূপ—বন্ধনকে

ছাপিয়ে মুক্তি, আবার বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি। দুটিই সত্য। একই শিব নৃত্যপরা কালীর পদতলে শববৎ—তখন পুরুষ আর প্রকৃতিতে বিবেক; আবার তিনিই নটরাজ—একাধারে পুরুষ আর প্রকৃতি দুইই। এই যুগনদ্ধতাই অখণ্ড এবং পরম সত্য।

*

প্রকৃতিতে যে ত্রিগুণের গ্রন্থি আছে, তার কথাই আগে বলি। সংক্ষেপেই বলব, কেননা বিষয়টি এর আগেও আলোচিত হয়েছে।

গুণবাদ সাংখ্যদর্শনের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি গুণময়ী, তার মধ্যে অনন্তগুণের খেলা। পুরুষের দিক থেকে এটি হল বোধের বৈচিত্র্য। বোধ না থাকলে গুণ থাকা না থাকা সমান। বোধের মধ্যে প্রকর্ষের তারতম্য আছে। আদিতে চেতনার আচ্ছন্নতা, তারপর ওই মূঢ়ভাবকে কাটিয়ে উঠতে গিয়ে একটা ধস্তাধস্তি বিক্ষেপ বিকার বৈচিত্র্য ইত্যাদির খেলা এবং অবশেষে সুস্পষ্ট বোধ। ব্যাপারটা যেন রাত্রির অন্ধকারকে তরল করে সূর্য ওঠার মত: প্রথমটায় অন্ধকার (তমঃ), তারপর আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে আকাশের লাল হয়ে ওঠা (রজঃ), এবং অবশেষে উদ্ভাসন সূর্যোদয় (সত্ত্ব)। আরেকটা উপমা হচ্ছে, কাঠে আগুন ধরার: প্রথমে কাঠে আগুন থাকলেও তার প্রকাশ নাই, তারপর তার ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে জ্বলা এবং অবশেষে সমস্তটা কাঠেরই আগুন হয়ে ওঠা। পুরুষের অনুভবের সমস্ত বৈচিত্র্যকে সাংখ্যকার এই চিৎপ্রকর্ষের তারতম্যের থাকে-থাকে সাজিয়েছেন একদিকে নিশ্চেতনতা বা মূঢ়তা, আরেকদিকে চেতনার পূর্ণতা, মাঝখানে চেতনার বিক্ষেপ। ব্যাপারটা অনবরত চলছে—রাতের পর দিন, দিনের দুপুর, তারপর আবার সন্ধ্যা, আবার রাত, আবার ভোর; প্রকৃতির পরিণাম চলছেই।

জড়প্রকৃতিতে ব্যাপারটা তবুও সোজা, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিতে এসে সেটা খুব জটিল হয়ে গেছে। জটিলতার আসল কারণ হচ্ছে গুণের মিশ্রণ। কোনও গুণই একলা কাজ করে না, করে একসঙ্গে। একসময় একেকটি গুণ প্রধান হয়, আর দুটি আড়ালে থেকে তাকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করে। যেমন তমোগুণের ধর্ম চেতনার আচ্ছন্নতা, মূঢ়তা; কিন্তু তারই আড়ালে রয়েছে চেতনার স্বরূপে ফুটে ওঠবার একটা আকূতি অর্থাৎ সত্ত্বের চাপ, আর তাইতে যে-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে তা-ই দেখা দিচ্ছে চেতনার নানা বিক্ষেপে এবং বিকারে —যার নাম হল রজের চাঞ্চল্য। সত্ত্বে চেতনার পূর্ণ প্রকাশ; কিন্তু আড়াল থেকে রজঃ তার মধ্যে বিক্ষেপের সৃষ্টি করছে যাতে মুনিদেরও মতিভ্রম হচ্ছে; আর তমঃ চেষ্টা করছে চেতনাকে স্তিমিত করতে এবং ক্রমে তা স্তিমিত হয়ে পড়ছেও—চেতনার উদ্দীপনাকে বরাবর জাগিয়ে রাখতে ক'জন মানুষ পারে? রাজসিক উত্তেজনার মধ্যে থাকে প্রশান্ত উদ্ভাসনতার আকূতি—যা সত্ত্বের ধর্ম, থাকে অপরিহার্য অবসাদের পিছুটান—যা তমের ধর্ম। আমাদের দেহের বনিয়াদ হল তমঃ, প্রাণের রজঃ, আর সত্ত্বের মন। তিনটিকে আলাদা করা যায় না, একের উপর অন্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

এমনি করে তিনগুণের তিননিশানিতে দেখা দিচ্ছে অগুনতি বৈচিত্র্যের মানুষ। শুধু মানুষই-বা কেন—বিচিত্র জীব, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। সাংখ্যকার বলছেন, তমোগুণের ধর্ম হল স্থিতি (inertia), রজোগুণের প্রবৃত্তি (dynamis) আর সত্ত্বগুণের প্রকাশ (illumination)। সহজেই মনে পড়ে জড় প্রাণ আর চৈতন্যের কথা। দেখতে পাই, জড়ের অব্যক্ত হতে চৈতন্যের সুব্যক্তির দিকে প্রকৃতির অভিব্যক্তি—এই তার সৃষ্টির ছন্দ; আবার বিপরীতক্রমে চৈতন্যের সঙ্কোচে জড়ত্বের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া এই তার প্রলয়ের ছন্দ। সৃষ্টি-প্রলয়ের অবিরাম আবর্তন চলছে গুণলীলাকে আশ্রয় করে।

অগুনতি বৈচিত্র্যসত্ত্বেও মানুষের মধ্যে তিনটি মূল চরিত্র (type): তামসিক মানুষ—মূঢ় দেহসর্বস্ব অসাড় দুরাগ্রহী পরিবর্তনবিমুখ; রাজসিক মানুষ—চঞ্চল প্রাণের উত্তেজনায় অধীর ভোগলোলুপ নিত্যনতুনের সন্ধানী; আবার সাত্ত্বিক মানুষ—প্রশান্ত মনস্বী বিবেচক সংযত দূরদর্শী প্রতিভাবান রসিক। প্রথম চরিত্রের মানুষ সবচাইতে বেশী, আর তৃতীয় চরিত্রের সবচাইতে কম—যদিও এরাই সমাজের আদর্শ এবং নেতা। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কবি শিল্পী সাধু-সন্ত প্রভৃতি এই চরিত্রের। তবে এও একটা গড়পড়তা হিসাব; আসলে মানুষের মধ্যে চরিত্রের মিশান অফুরন্ত।

*

প্রকৃতির গুণলীলা হতেই চেতনায় দেখা দেয় দ্বন্দ্বের খেলা। দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় চেতনার সঙ্কোচ হতে; আর ওইটি হল তমোগুণের ক্রিয়া। তার পিছনে রয়েছে রজোগুণের প্রবেগ। তমসাচ্ছন্ন চেতনা সর্বপ্রকাশক বা সর্বগ্রাহী নয়। সে কিছুদূর পর্যন্ত দেখে, একটা-কিছুকে উপাদেয় বলে বেছে নেয়। ফলে অনেক-কিছুই তার নজরের বা আগ্রহের বাইরে পড়ে থাকে, ওগুলি তার কাছে হেয়। কিন্তু জীবনে উপাদেয়ের সঙ্গে হেয়েরও মোকাবিলা করতে হয় মানুষকে। তাইতে তার চেতনায় ওঠে সুখ-দুঃখের এবং তাহতে রাগ-দ্বেষের আর ভাল-মন্দের তরঙ্গ। তরঙ্গের অর্থই হল চাঞ্চল্য, ওটা রজোগুণের ধর্ম। ওর উত্তেজনা আছে, আবার অবসাদও আছে। শেষপর্যন্ত আর এমন করে জীবনদোলায় দুলতে মানুষের ভাল লাগে না।

মানুষ আপাতত যে-গুণেরই বশ হক না কেন, চেতনার গভীরে সে কিন্তু চায় সত্ত্বগুণকে—চায় প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল প্রসন্নতাকে, চিৎপ্রকর্ষ তার জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সত্ত্বগুণেরও দুটি রূপ—মিশ্রসত্ত্ব বা মলিনসত্ত্ব আর শুদ্ধসত্ত্ব। মলিনসত্ত্বে রাজসিক চাঞ্চল্য আর তামসিক মূঢ়তার খাদ আছে। ফলে তার দৃষ্টি যত স্বচ্ছই হক না কেন, খানিকটা রঙের ঘোর তার মধ্যে থাকেই। যেমন, দেশের হিত করতে চাই, পরার্থপর হতে চাই—খুব ভাল কথা; প্রেরণাটা সত্যি সাত্ত্বিক। কিন্তু হিতৈষণার মধ্যে অদূরদর্শিতা গোঁড়ামি যশোলিপ্সা অহঙ্কার কত-কিছুরই ভেজাল থাকতে পারে। তখন অতি বড় বিশ্বহিতৈষণাও হয় শুম্ভ-নিশুম্ভের দেবব্রতপালনের মত: শুম্ভ তো আর শম্ভু নয়।

আসলে মলিনসত্ত্ব হল মনের ধর্ম, আবরণ আর বিক্ষেপের ক্রিয়া তার মধ্যে থাকবেই থাকবে এবং পরিণামে সাধকের সমস্ত প্রয়াসকে রজস্তমের ভূমিতে নামিয়ে আনবেই, বিকার আর অবসাদ থেকে কিছুতেই তাকে বাঁচানো যাবে না। বাঁচতে হলে যেতে হবে মনের ওপারে, ত্রিগুণশালী গুণলীলার ওপারে।

*

এইখানেই আমরা পাই সাংখ্যের নৈস্ত্রিগুণ্যের বা কৈবল্যের আদর্শ। প্রকৃতির মধ্যে গুণপরিণাম আছেই, তার ঝামেলাও আছে; অতএব পুরুষকে তার ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। তমোগুণের ধর্ম মূঢ়তা; তা কে চায়? রজোগুণের ধর্ম চাঞ্চল্য; তারও দুঃখ আছে। সত্ত্বগুণ ভাল বটে; কিন্তু তারও মধ্যে দেখি ভেজাল আছে—সে বিকৃত হয়ে যায়, নেতিয়ে পড়ে, অনেকদূর দেখলেও সবটা দেখে না। গীতায় আছে, সত্ত্বগুণও বাঁধে—সুখের আসক্তি দিয়ে, জ্ঞানের আসক্তি দিয়ে। ওই আসক্তি কথাটাই ভয়ানক। তার মূলে আছে মোহ, অভিনিবেশ—অতএব না পেলেই দুঃখ। সুখ আর জ্ঞানের মত অত ভাল জিনিসেও সেই রজস্তমের ভেজাল। অতএব সত্ত্বগুণেরও ওপারে চলে যাও, কোনও গুণকেই আমল দিও না। রাগ দ্বেষ মোহ—ওই তো চেতনায় গুণের ছায়া, যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ তমের ছায়া। তোমার অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই, মোহও নাই—চেতনায় কোনও রং নাই, কোনও তরঙ্গ নাই। অতএব সুখ-দুঃখ ইচ্ছা-দ্বেষ শুভাশুভ পুণ্য-পাপ কোনও-কিছুরই দ্বন্দ্ব নাই। এমন কি তোমার কোনও কর্মও নাই—কেননা কর্ম করতে গেলেই চেতনায় তরঙ্গ উঠবে আর অমনি প্রকৃতির খপ্পরে পড়তে হবে। তুমি অকর্তা, তুমি অভোক্তা—প্রকৃতির গুণলীলার বৈরাগী উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। এমন-কি লীলা দেখবারও দরকার কি? তোমার চেতনার দর্পণে কোনও-কিছুরই ছায়া পড়ে না—দিনেরও না রাতেরও না, সৎএর না অসতেরও না। তুমি ত্রিগুণাতীত, 'শিব এব কেবলঃ'।

*

কিন্তু গুণাতীত হওয়াই সাধনার শেষ কথা নয়, তারও পরে আছে গুণাধীশতা। আগেও বলেছি, ত্রিগুণ আর গুণাতীতের মাঝে আরেকটা ভূমি আছে শুদ্ধসত্ত্বের। বাস্তবিক, প্রথমে সাধনা শুরু হয়েছিল কিন্তু সত্ত্বগুণকেই লক্ষ্য করে। কিন্তু যখন দেখা গেল, মনের ভূমিতে থাকতে সত্ত্বগুণকে বিশুদ্ধ রাখা যায় না, তখন তাকেও ছাড়িয়ে যাবার কথা উঠল। মনের ওপারে আছে বিজ্ঞান, সত্ত্ব আর সেখানে মলিনসত্ত্ব নয়, শুদ্ধসত্ত্ব বা গীতার ভাষায় নিত্যসত্ত্ব। বেদে পুরাণে তন্ত্রে এর কথা নানাভাবে বলা হয়েছে—উদয়াস্তহীন নিত্যসূর্যের বা চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধিহীন নিত্যষোড়শী কলার উপমা দিয়ে। এখানে প্রকৃতি অপরা নন, পরা বা পরমা—পরমপুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি বা তাঁর স্বরূপশক্তি। গুণের ক্রিয়া এখানে ব্যামিশ্র বা অন্যোন্যবিরুদ্ধ নয়—শুদ্ধ এবং সুষম। অপরা প্রকৃতিতে যে-তমঃ অন্ধ অসাড়তা, এখানে তা রূপান্তরিত চিদ্‌ঘন প্রশান্তিতে; রাজসিক চাঞ্চল্য এখানে সিদ্ধবীর্যের স্ফুরত্তা, সত্ত্ব সর্বজ্ঞো-

তাপর আত্মজ্যোতির প্রকাশ। আমাদের প্রাকৃত জীবনের বনিয়াদ গুণবৈষম্যের উপর, গুণসাম্য হলেই প্রকৃতি হয়ে যায় অব্যক্ত—যেমন নিদ্রায় বা প্রলয়ে ; ও হল অব্যক্তের অন্ধতমঃ। আর পুরুষের স্বরূপপ্রকৃতিতেও গুণসাম্য আছে, আমাদের প্রাকৃতচেতনায় তাও অব্যক্ত ; কিন্তু সে হল জ্যোতির্ময় অব্যক্ত। তাকে বলতে পারি গুণাতীতের মধ্যে শুদ্ধগুণের স্ফূর্তি—যেন অবর্ণ আকাশে চিৎসূর্যের দীপ্তি, বিষ্ণুর বক্ষে কৌস্তভদ্যুতি, প্রলয়সমুদ্রে বিশ্বের নীলাকমল, বৈরাগী মহেশ্বরের কোল জুড়ে সর্বৈশ্বর্যভূষিতা উমার হিরণ্যপ্রতিমা। ত্রিগুণে আর গুণাতীতে বিরোধ আমাদের ব্যষ্টিচেতনায়—আমাদের মোক্ষসাধনের গরজে ; কিন্তু নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের মধ্যে তো এ-বিরোধ নাই।

আর তাঁর সাধর্ম্য লাভ করাই আমাদের সিদ্ধির চরম। শুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের অবিনাভূতা শুদ্ধা ও মুক্তা প্রকৃতি : দুয়ের সানরসেই সত্তার সার্থকতা।

●

১০

সিদ্ধির ষড়ঙ্গ

পরমপুরুষের সাধর্ম্যলাভ করাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। তার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন আধারের শুদ্ধি। শুদ্ধি হতে আসে মুক্তি—পুরুষ এবং প্রকৃতি দুয়েরই মুক্তি। মুক্তি বলতে বুঝি স্বভাবের পূর্ণতা এবং শক্তির স্বাতন্ত্র্য। এই মুক্তি হতেই সিদ্ধি।

সাধর্ম্যলাভের নানা আদর্শ আছে। মায়াবাদীর কাছে পুরুষ শুদ্ধসত্তামাত্র, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, বিশ্বাতীত ; তাঁর কাছে সাধর্ম্যলাভের অর্থ এই বিশ্বাতীতের মধ্যে অবগাহন ও নিমজ্জন। বৌদ্ধের কাছে পরমার্থ কোনও পুরুষ নয়, সমস্ত ভাবের প্রতিষেধরূপী শূন্যতা মাত্র ; তার মধ্যে অহং-এর পরিনির্বাণই তাঁর কাছে সিদ্ধির চরম। এঁরা কেউই নাম-রূপের ধার ধারেন না। যাঁরা নাম-রূপকেও সত্য বলে স্বীকার করেন, তাঁদের দর্শন এমন সর্বনাশা না হলেও তাঁরাও সিদ্ধির সন্ধান করেন লোকোত্তরে। কিন্তু পূর্ণযোগীর সিদ্ধি শুধু লোকোত্তরে নয়, ইহলোকে এবং ইহজীবনেও। তাঁর মুক্তির সাধনা শুধু নিবৃত্তি এবং নিষ্ক্রান্তির জন্য নয়, রূপান্তরের জন্য। সব-কিছুকে নিয়েই তাঁর সাধনা, কাটছাঁট করে নয়। তাই তাঁকে নজর রাখতে হয় সবদিকে। তাইতে একটা ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে তাঁর সাধনাকে ফেলা যায় না বলে বিচিত্র পথে তার গতি, বহুমুখী তার ব্যঞ্জনা।

তবুও বলা যেতে পারে, তার দুটি অঙ্গ বা ধারাবাহিকতার দুটি ধারা আছে। এখানে সংক্ষেপে তাদের কথা বলে পরের অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

●

সিদ্ধির প্রথম অঙ্গ হল সমত্ব। গীতাতে সমত্বের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'; এমনও বলা হয়েছে সমত্বই যোগের লক্ষণ—'সমত্বং যোগ উচ্যতে'। সমতার বোধ আসে পরম প্রশান্তি থেকে; আর বৈষম্যের হেতু হল অধঃ-চেতনার সঙ্কীর্ণতা, গুণের বিক্ষোভ, দ্বন্দ্বমুগ্ধতা। আকাশের আনন্ত্যে যে-চেতনা ছড়িয়ে পড়েছে, সে শুধু সম নয়, সুষম: সে অবিচল সর্বাধার, সর্বাবগাহী, সর্বপ্রচোদক। তার প্রশান্তিই শক্তির স্ফুরত্তার (dynamism) উৎস। সে শুধু নিষ্পাক গ্রহীতাই নয়, স্বচ্ছন্দ কর্তাও। পুরুষের সাম্য হসিত হয় প্রকৃতির সৌষম্যে—বুদ্ধি মন হৃদয় প্রাণ এমন-কি দেহ পর্যন্ত সর্বত্র সর্বকালে একের সুরে বেজে ওঠে। সমত্ব শান্তি, সমত্ব হর্ষ।

সিদ্ধির দ্বিতীয় অঙ্গ হল শক্তি। সমত্ব যেমন দিব্যপুরুষের স্বভাব, তেমনি দিব্য-প্রকৃতির স্বভাব হল শক্তি। সমত্ব আর শক্তি অবিনাভূত, চেতনা শান্ত হলেই আমাদের মাঝেকার সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে। শক্তির চারটি উপাঙ্গ। প্রথম, করণের (instruments) সামর্থ্য। চারটি করণকে মুখ্য বলে ধরে নিতে পারি—বুদ্ধি হৃদয় প্রাণ আর দেহ। কৃচ্ছ্রতার দ্বারা এদের নিগ্রহ (repression) যোগের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য সংযম (control) এবং ঊর্ধ্বশক্তির প্রসাদের দ্বারা এদের আপ্যায়ন যাতে এদের সামর্থ্যের পূর্ণপ্রকাশ ঘটতে পারে। দ্বিতীয় উপাঙ্গ বীর্য। বীর্য পুরুষের স্বভাব। সে হল বৃহৎ চেতনার আবেশ হতে জাত ইচ্ছার অনমনীয়তা এবং শক্তিপ্রয়োগের অকুণ্ঠ সামর্থ্য। তৃতীয় উপাঙ্গ সমর্পণ। করণের আপ্যায়ন এবং আধারে বীর্যের স্ফুরণ সম্ভব হয় ভাগবতী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর চেতনা (guidance) এবং স্ফুরত্তার কাছে নিজেকে গঁপে দিতে পারলে। সাধনা আমি করছি না, করছেন তিনিই—এই ভাবটি চেতনায় প্রবল হওয়া চাই। তার জন্য প্রয়োজন হল শ্রদ্ধা, যা শক্তির চতুর্থ উপাঙ্গ। শ্রদ্ধা হল আস্তিক্যবুদ্ধি, যা পুরুষ হৃদয়ে তার আভাস পেয়ে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রত্যয় এবং বিশ্বাস। অরুণোদয়ের সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে—যখন মনে হয় আলো ফুটতে আর দেরি নাই।

■

সব সাধনারই শুরু হয় মন দিয়ে। সমত্ব ও শক্তির সাধনাও যতদূর চলতে পারে মনের সহায়ে। কিন্তু যোগের সম্যক্‌সিদ্ধি তাতে আয়ত্ত হয় না। সাধনার উচ্চস্তরে ঊর্ধ্বশক্তির আবেশ মনের মধ্যেও হয়, মনের সমত্ব এবং শক্তি হল তারই ফল। কিন্তু মন গুণের অধীন বলে মানবী সিদ্ধির মধ্যে তখনও জোয়ার-ভাটা খেলতেই থাকে। প্রকৃতির রূপান্তর না ঘটিয়ে চেতনাকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বস্রোতা এবং প্রকৃতির মহেশ্বর করে তোলা যায় না। তীব্র সংবেগের ফলে অননীভাবের পূর্ণতায় মনের প্রলয় হলেও সমস্যার সমাধান হয় না। মনের প্রলয় নয়, চাই তার রূপান্তর। মনের ওপারেই রয়েছে বিজ্ঞান, রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে তারই আবেশে। বিজ্ঞান আবিষ্ট করবে বুদ্ধি মন হৃদয় প্রাণ ইন্দ্রিয়সংবিৎ সব-কিছু, সমস্ত আধারকে সে হিরণ্ময়জ্যোতিতে ভাস্বর করে তুলবে, অতিচিতি (Super-conscience)

হতে অচিতি পর্যন্ত তার সব মহলে বইয়ে দেবে পুরুষোত্তমের দিব্য জ্যোতি আনন্দ ও শক্তির মুক্তধারা। এমনি করে মনকে বিজ্ঞানের ভূমিতে তুলে নেওয়া এবং তার দ্বারা তাকে আরিত করা হল সিদ্ধির তৃতীয় অঙ্গ।

চতুর্থ অঙ্গ হল কায়সিদ্ধি। মানুষের অন্নময় স্থূলশরীরের পিছনে আছে প্রাণমনোময় সূক্ষ্মশরীর, তারও পিছনে আছে বিজ্ঞান-আনন্দময় কারণশরীর। তাদের বীর্যকে উন্মীলিত করে এই দেহকেও চিন্ময় করে তোলা হল কায়িক সিদ্ধি। হঠযোগের চক্রভেদে, রাজযোগের ভূতজয়ে, তন্ত্রের ভূতশুদ্ধিতে তার ইঙ্গিত আছে। পূর্ণযোগী ইচ্ছা করলে তাদের কাজে লাগাতে পারেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে তারা অপরিহার্য নয়। নীচের শক্তিকে উজানের দিকে ঠেলে দেওয়া নয়, উপরের শক্তিকে নীচে নামিয়ে আনা হল তাঁর যোগের বিশিষ্ট কৌশল। সুতরাং তাঁর কায়সিদ্ধি হবে বিজ্ঞানসিদ্ধিরই পরিণাম।

তারপর পঞ্চম অঙ্গ হল বিজ্ঞানঘন পুরুষের চিন্ময় ভোগৈশ্বর্যের সিদ্ধি। পরমপুরুষ প্রকৃতির শুধু দ্রষ্টা নন, তিনি তার ভোক্তা এবং মহেশ্বর। বিশ্বরূপা প্রকৃতি তাঁর আত্মমায়া—তাঁর আনন্দের বিভা এবং শক্তির উল্লাস। তাঁর ঐশ্বর্য আত্মরূপায়ণের অনন্ত বৈচিত্র্যে, তাঁর ভোগ সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেরই আনন্দস্বরূপের আস্বাদনে। বিজ্ঞানঘন পুরুষও এইখানে তাঁর সমধর্মা।—এই তাঁর সিদ্ধি। তিনি অকামহত, অথচ আত্মপ্রকৃতির পরম চরিতার্থতায় আপ্তকাম, সান্তের মধ্যেও আনন্ত্যের ক্রমোর্ধ্ব উল্লাসে উচ্ছলিত।

শেষ অঙ্গ হল আনন্দসিদ্ধি। বিজ্ঞানের পর্যবসান ব্রহ্মের আনন্দে। ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ—যেমন বিশ্বাতীতে, তেমনি বিশ্বে। তিনিই বিশ্ব : 'পুরুষ এব ইদং সর্বম্', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' এই অনুভব বিজ্ঞানঘন পুরুষের : শুধু আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণেই নয়, তার বিস্ফোরণেও। তাইতে দেহ প্রাণ মনের অনন্ত উল্লাস—ভূতগ্রামের বিচিত্র পরম্পরায়। সবই তিনি রূপে-রূপে প্রতিরূপ, আবার লোকোত্তরে নির্বাণ নীরূপ। এই দ্বিকোটিক অনুভবেই অভয় আনন্দের পরম প্রতিষ্ঠা, অধ্যাত্মসিদ্ধির চরম।

১১

সমন্বয়সিদ্ধি

'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি'। ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্ম হতে হবে—এই হল জ্ঞানের সিদ্ধি। 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি'। তিনি রস, তিনি আনন্দ ; তাঁকে লাভ করে ও আস্বাদন করে আনন্দ হতে হবে—এই হল প্রেমের সিদ্ধি। শুধু সাযুজ্য নয়, সাধর্ম্যও ; অদিব্যের দিব্যে রূপান্তর—পুরুষের মহিমায় এবং প্রকৃতির উল্লাসে। এ-ই সিদ্ধি।

সমরসিদ্ধি তার প্রথম সোপান। 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'—সমত্ব ব্রহ্মের স্বভাব। আকাশের সমত্ব : তার প্রসন্ন দ্যুলোক, ক্ষুব্ধ অন্তরিক্ষ, রূঢ় পৃথিবী ; কারও প্রতি সে উদাসীন নয়, সবাইকে সে জড়িয়ে আছে। অথচ সবাইকে ছাপিয়ে তার আত্মরতির আনন্দে প্রশান্ত হয়ে আছে। এ-ই সমত্ব। এ-ই ব্রহ্ম, এ-ই আত্মা। চৈতন্যের এ-ই নিরূঢ় স্বভাব।

অথচ 'আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা'। এ-আকাশ যেমন উদাসীন নয়, তেমনি আসক্তও নয়—নাম আর রূপের নির্বাহ হচ্ছে এই আকাশ হতেই। সে-নির্বাহ আকাশে প্রাণের স্পন্দন : আকাশ আর প্রাণ অবিনাভূত। আকাশ পুরুষ, প্রাণ প্রকৃতি। কর্ম প্রকৃতির, পুরুষ তার অধ্যক্ষ—দুয়ের মাঝে আনন্দের গ্রন্থি। ব্রহ্ম কর্মাধ্যক্ষ।

যিনি অধ্যক্ষ, তিনি ঈশান (Master)। তাঁর ঈশনা কর্মের সমস্ত পরিস্পন্দে সমস্ত বিকারে অনুস্যূত হয়েও অবিকল্পিত। এইখানে তাঁর সমত্ব। কর্মের আদিতে নিশ্চেষ্টতা, অন্তে চরিতার্থতার প্রশান্তি—মাঝখানটাতেই যত বিক্ষোভ। আদি মধ্য অন্ত সবার যিনি উপদ্রষ্টা অনুমন্তা এবং ভর্তা, তিনি মধ্যপর্বের বিক্ষোভে ক্ষুব্ধ হন না, কেননা এ-বিক্ষোভ বিধৃত রয়েছে তাঁরই প্রশাসনে। আমরা প্রশান্তা নই, আদি-অন্ত দেখতে পাই না, তাই ক্ষোভ আমাদের কাছে পীড়া। কিন্তু দৃষ্টি যদি উদার হয়, গভীরে যায়, যে-সত্তার বৃন্তে সব-কিছু বিধৃত তার মর্মে নিঘাত হয়, তাহলে ক্ষোভকে দেখি ব্রহ্মক্ষোভের আকারে—যেন আদিত্যের বুকে আলো নৈমন করছে পারার মত। যেন বাদী-বিবাদী সব সুরের পরম সঙ্গতি এক বৃহৎ গানে। যেন নটরাজের নৃত্য।

এক পরমসাম্য ছাড়া ক্ষোভকে ধারণা করা যায় না, ছন্দের সুষমা আনা যায় না তার মধ্যে। প্রাকৃত জীবনেও তা-ই দেখি। চাকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সেও এগোয়—কিন্তু কী তার জ্বালা। আর, যে চক্রবর্তী, সে নিশ্চল থেকে নিজে চলে পরকে চালায়। সমত্ব ওই নিশ্চলতায়, আর ওই থেকেই আসে অধিষ্ঠানের আর প্রশাসনের সামর্থ্য।

অধ্যক্ষ হতে হলেই সবার উর্ধ্বে উঠতে হবে। তার নাম বিবেক, তার ফল কৈবল্য। কিন্তু নিরীহ কৈবল্য নয়, প্রবর্তক কৈবল্য। আর চেতনাকে প্রসারিত করতে হবে—আকাশের মত। সাংখ্যের আত্মা বিবিক্ত, বেদান্তের ব্রহ্ম বৃহৎ। দুটি ভাবনাকে মিলিয়ে নিতে হবে : 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম। প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে মহান্ হয়ে শান্ত হয়ে আবার প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরতে হবে, অক্ষুব্ধ প্রশান্তির মহিমা থেকেই তার ক্ষোভে আনতে হবে ছন্দ, তার বৈষম্যে সৌষম্য। তার মর্মের গভীরে নিহিত পুরুষের সত্য-সঙ্কল্পকে উদ্ভাসিত করতে হবে তার আচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে।

*

সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সব-কিছুকে অক্ষুব্ধ হয়ে গ্রহণ করতে হবে—এই হল সমত্বের একটি লক্ষণ। ক্ষোভ আসে নিজের মতলব থাকে বলে। ক্ষুদ্র বাসনার ক্ষুদ্র তৃপ্তি ব্যাহত হলেই দুঃখ। অথচ চাওয়া প্রাণের ধর্ম, তার টুঁটি চেপে ধরাটাই মুশকিলের আসান নয়।

কিন্তু প্রাণকে যদি বৃহৎ করি, তাহলে চাওয়ারও রূপ বদলে যায়। প্রাণ বৃহৎ হয় চেতনা বৃহৎ হলে। তার চাওয়া যেন আকাশের চাওয়া—যার পাওয়া বাইরে নয়, অন্তরে। বাইরটা তখন উপলক্ষ্য মাত্র; সাড়া যেন অনন্তের ইশারা। সব স্পর্শই তখন ব্রহ্মের সংস্পর্শ—সুখ তো বটেই, দুঃখও তা-ই। অন্তরে কোথায় যেন একটা ফোয়ারা খুলে যায়, তাইতে সব-কিছুতেই আনন্দ ছলকে ওঠে। কোনও-কিছুর বিরুদ্ধেই আর তখন নালিশ নাই। দেখছি, আঁকা-বাঁকা বিচিত্র গতিতে সব নদীই চলছে সমুদ্রসঙ্গমে। আর সে-সমুদ্র এই অনুভবে, আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ এই চেতনায়। আকাশের সমুদ্র: অক্ষুব্ধ বলেই সব ক্ষোভের আশ্রয়, ভূমা বলেই সব অল্পের নিধান, আনন্দ বলেই সব দুঃখের নির্বেদন।

মানুষী সিদ্ধিও যদি চাই, তাহলেও তার পথ হচ্ছে এই সমত্ব। মানুষ চায় শক্তিকে বশে আনতে। শক্তি আছে তার অন্তরে—আত্মশক্তি; আছে বাইরে—ভূতশক্তি আর সমাজশক্তি। কিন্তু বাইরে শক্তিকে সে বশে আনতে পারে আত্মশক্তির দ্বারাই। বহিঃ-প্রকৃতিকে বশে আনছে বিজ্ঞান, সেও আত্মচৈতন্যেরই বিভূতি, বুদ্ধির দান; তারও সাধনা একধরনের যোগসাধনা বই কি। বিজ্ঞানের সাধনায় উপকরণ সঞ্চিত হল প্রচুর, কিন্তু গোল বাধল তার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে। ভূতশক্তিকে কিছুটা বশে আনতে পারলেও মানুষ সমাজশক্তিকে এখনও বশে আনতে পারে নি, তাই সারা দুনিয়া জুড়ে আজ কেবল হানাহানি। সুখ আর শান্তি চায় সবাই কিন্তু এত দুঃখ এত অশান্তি বুঝি আর কোনদিন জগতে দেখা দেয়নি। আসল কথা, মানুষ সম্রাট্ হয়েছে, কিন্তু স্বরাট্ হয়নি। আত্মশক্তিকে বশে আনতে পারেনি বলেই সমাজশক্তিকে সে বশে আনতে পারছে না। স্বারাজ্যের অভাবে তার সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা বারবার বানচাল হয়ে যাচ্ছে। আর স্বারাজ্যের ভিত্তিই হল সমত্ব—দৃষ্টির সমত্ব, ভাবের সমত্ব, কর্মের সমত্ব। এক কথায় যোগের সমত্ব। মনস্বীর সমাজ গড়াই আদর্শ নয়, আদর্শ হল যোগীর সমাজ গড়া। তার সূত্র হল আত্মাতে সর্বভূতকে দেখা, সর্বভূতে আত্মাকে দেখা। অক্ষুব্ধ আত্মচৈতন্যের ভূমিতে থেকে সবাইকে দেখা, সবার মধ্যে আত্মমহিমার সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ এবং উদ্দীপ্ত করা। কিন্তু তার গোড়ার কথাই হচ্ছে, যিনি নায়ক তাঁর চেতনার আকাশবৎ ব্যাপ্তি, অর্থাৎ সমত্ব।

*

সমত্বসিদ্ধি শুধু পুরুষের মধ্যেই নয়, চাই প্রকৃতির মধ্যেও। বিবিক্ত পুরুষের সমত্ব তো থাকবেই, সে-সমত্ব আবার সঞ্চারিত হওয়া চাই ব্যবহারেও। চাই প্রাণে হৃদয়ে সঙ্কল্পে ভাবনায় সর্বত্র সমত্ব।

প্রাণে সমত্বের কথাই আগে বলি। বাসনা হল প্রাণের ধর্ম, শুদ্ধির দ্বারা তার মুক্তির কথা আগেই বলেছি। মুক্তির পরিণামে আসে সমত্ব। সমত্ব আকাশবৎ চেতনা—একথা আবার স্মরণ করিয়ে দিই। প্রাণবাসনা বাইরে ছোটে, আর ছোটে অল্পকে পেতে। এই প্রবেগ আর মোহ হতে তাকে মুক্ত করতে হবে। চাওয়ার কিছুই নাই, তবুও কত-কিছুরই

স্পর্শ আমরা পাচ্ছি। আকাশ মেঘও চায় না রৌদ্রও চায় না, তবুও তার বুকে মেঘ-রৌদ্রের খেলা চলছে। চলুক, আকাশ তাতে নির্বিকার, তাদের প্রতি তার অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই নাই। দ্বন্দ্বাতীত চেতনা আমার আয়ত্ত, এক পরিব্যাপ্ত নিত্যবর্তমানের সাধনে বা পিছনে কোনদিকেই তার দৃষ্টি যায় না। সংসারের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ অনুরাগ-বিরাগ শুভ-অশুভ সব-কিছু তলিয়ে যায় সেই আকাশের অতলে।

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া নয়, 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম' সব-কিছুকে শুষে নেওয়া নিজের অতলে—এই হল আরেকটি সঙ্কেত। তার মূলে রয়েছে চেতনার প্রত্যাহার (withdrawal) বা অন্তরাবৃত্তি (inwardisation)। গীতায় আছে, কাছিম যেমন হাত-পা-মুখ সব নিজের মাঝে গুটিয়ে নেয় বাইরের সাড়া থেকে, তেমনি।

এমনি করে বারবার তলিয়ে যেতে-যেতে অন্তশ্চেতনার গভীরে খুঁজে পাই আত্মসত্তার অক্ষীয়মাণ জ্যোতির্লিঙ্গকে। সে-পাওয়াকে জড়িয়ে আছে সত্তার আনন্দ (delight of existence)—শুধু 'আছি' এই বোধের প্রশান্ত গভীর আনন্দ। দেখি, প্রাণের বাসনার সেই আনন্দেরই ঝিলিমিলি। যা চেয়েছিলাম, তা পেয়েই রয়েছি। এখানকার প্রতিচ্ছায়া ওইখানে। এখানে আনন্দের বৃন্ত, আর ওইখানে তার সহস্রদল।

একাকে পেয়ে তখন বহুর সম্ভোগ, প্রাণবাসনার দিব্য পরিতর্পণ। পরিগ্রহের (egoistic possession) উপভোগ নয়, ত্যাগের সম্ভোগ, বৈরাগীর অনুরাগ। যেমন মহেশ্বরের অনুরাগ উমার প্রতি, স্বরূপানন্দের লাবণ্যপ্রতিমার প্রতি। এই হল আকাশ আর প্রাণের সামরস্য।

*

তারপর হৃদয়ের সমন্বয়। প্রাণ আর হৃদয় কাছাকাছি। একটি ক্রিয়া, আরেকটি ভাব। একটি প্রবেগ সৃষ্টি করে, আরেকটি করে আস্বাদন। উপনিষদে হৃৎপুরুষকে বলা হয়েছে 'মধ্বদ' বা মধুভোজী; কিন্তু প্রাকৃত হৃদয়ের আস্বাদন তিক্ত-মধুর, মধুরের চাইতে বরং তিক্তের ভাগটাই বেশী। রস বিরস হয়ে ওঠে অহন্তায়, চেতনার সঙ্কোচে। একেকটি অহংএর একেকটি জগৎ, কারও সঙ্গে কারও মিল নাই, সবার দাবিই সমান উগ্র—তাই জগৎ জুড়ে কেবল রেষারেষি আর হানাহানি। কোথায় সুষমা, কোথায় আনন্দ?

সমস্যার একই সমাধান: ডুবতে হবে সেই গভীরে, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—সব-কিছু এসে মিলিত হয়েছে একটি নীড়ে। সব অহং-এর আধার এক পরম অহং—তাঁর অহং। আমার অহন্তা তলিয়ে যাক সেই পরাহন্তায়, বাসনার উত্তালতা শিথিল হক শান্ত হক। কোনও-কিছুর প্রত্যাশা আর নয়, শুধু অকামহত বিস্ফারিত হৃদয় নিয়ে চেয়ে থাকা। সে-হৃদয় তাঁরই আনন্দের সুধাপাত্র—গভীরের রসে আপনা হতে যেমন উপচে উঠছে, তেমনি বিশ্বের সমস্ত সংবেদনকে রসান্বিত করে তুলছে অনির্বচনীয় সৌম্য মধুর রসায়নে।

জীবন তখন আনন্দের প্রস্রবণ। বিরসতার ভয়ে জীবনকে নীরস করা নয় কৃচ্ছ্রতার দ্বারা, কিন্তু রসচেতনার রূপান্তর ঘটানো অস্তিত্বের আদিম মাধুর্যের দোহায়—জীবনে সেই রসকে ফিরিয়ে আনা যা আছে শিশুর রসনায়।

অক্লিষ্ট মুক্ত হৃদয়ের সরলতায় তখন সব ভাবের রূপান্তর ঘটবে। বুভুক্ষু বিক্ষুব্ধ আর্ত অর্জন কাম রূপান্তরিত হবে প্রশান্ত প্রসন্ন স্নিগ্ধ আরাম অতএব আপ্তকাম প্রেমে। অক্ষম শোকের বিধুরতা রূপান্তরিত হবে স্বপ্রতিষ্ঠ অতএব সক্ষম সমবেদনার বীর্যে, রোষ ক্ষেমঙ্কর রুদ্রের অশিবনাশন দাক্ষিণ্যে।

*

তারপর সঙ্কল্পের সমন্বয়। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে প্রকাশ পায় পুরুষের দুটি বৃত্তি—ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বের প্রেরণা আসে কামনা অথবা সঙ্কল্প হতে। কামনার শুদ্ধ রূপ হল সঙ্কল্প, একথা আগে বলেছি। কিন্তু অবিদ্যার ভূমিতে সঙ্কল্প শুদ্ধ থাকে না, 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা' কর্তার কামনার সঙ্গে জড়িয়ে যায়—গীতায় তার নাম 'কাম-সঙ্কল্প'। তার প্ররোচনায় আমাদের যে-কর্ম, তা ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য শুভাশুভের দ্বন্দ্বে জড়িত। একটা আদর্শবাদের প্রেরণা তার মূলে নিশ্চয় আছে, নইলে সমাজস্থিতি অসম্ভব হত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-আদর্শ মনঃকল্পিত সুতরাং একদেশদর্শী। সব না দেখে না বুঝে সাধারণ ব্যাপারেও ভাল-মন্দের সম্পর্কে রায় দেওয়া কঠিন—আর বিশ্বব্যাপারে তো আরও কঠিন। যেমন ভোক্তৃত্বের বেলায় সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে গেলে আমরা বিশ্বমূল আনন্দের সন্ধান পাই, তেমনি কর্তৃত্বের বেলাতেও ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশ্বমূল সত্যসঙ্কল্পের অনুভব পেতে হবে। সে-অনুভবের পথম শর্তই হবে চিরাচরিত ভাল-মন্দ বা ধর্মাধর্মের মনগড়া আদর্শের প্রতি সাধকের সমদৃষ্টি। কারও ভাল-মন্দের বিচার না করা সমদর্শনের প্রথম অঙ্গ; দেখছি মানুষ নিজের ইচ্ছায় চলছে না, চলছে তাঁর ইচ্ছায় —'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়' সুতরাং আমি তার বিচার করবার কে। সে-ইচ্ছাকে যখন নিজেরও ইচ্ছার মূলে প্রত্যক্ষ করি, তখন রামপ্রসাদের মতই বলি, 'ধর্মাধর্ম দুটো অজা তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে খুনি, যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি।' সমর্পণের এইটি দ্বিতীয় অঙ্গ। বাসনার কথা নয়, অহঙ্কারের কথা নয়, মতলববাজির কথা নয়, তদ্গত চিত্তের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা; 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।' গীতায়ও তনি তাঁর বাণী: 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' তদ্গতচিত্তের দ্বারা অধর্মাচরণ হয় না, হতে পারে না—একথা ধ্রুব সত্য; কিন্তু একথাও সত্য, মানুষের মনগড়া মাপকাঠিতে তাঁর আচরণকে মাপাও যায় না। 'তাঁর ক্রিয়া মুদ্রা যত বিজ্ঞে না বুঝায়।'

*

প্রাণ হৃদয় আর বাসনার সম্বন্ধ হল প্রকৃতির দিক ঘেঁষা। আর পুরুষের দিক ঘেঁষা সম্বন্ধ হল মন এবং বুদ্ধির।

মন ভাবে। তার ভাবনার মধ্যে আছে স্মৃতি কল্পনা সংস্কার অভ্যাস আর পৌনঃপুনিকতার জটলায় গড়া তার নানা মত—যাদের প্রতি তার মোহ অপরিসীম। প্রথমেই এই মোহ হতে মনকে মুক্ত করতে হবে। মন জানে না, জানতে চায়—এই তার সত্য ধর্ম। অবিদ্যা হতে সে চলছে বিদ্যার দিকে, ধীরে-ধীরে তার পথ আলোকিত হয়ে উঠছে। কিন্তু আলোকের পরমতীর্থে সে পৌঁছবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। বাধা রয়েছে তার স্বভাবের মধ্যে—সে একদেশদর্শী। যেটুকু সে জানে সেইটুকুকেই একান্ত করে তুলে অখণ্ড অনির্বচনীয় সত্যের মধ্যে সে বিদ্যা আর অবিদ্যার সত্য আর মিথ্যার বিরোধ সৃষ্টি করে। আর তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী : অনুভূতির তুরগশিখরেও মনের এই দ্বৈধবুদ্ধির সংস্কার সত্যের মুখকে আবৃত করে হিরণ্ময়পাত্রের আড়ালে; আর অবরভূমিতে মনের সত্যসম্পর্কে নানা মতুয়ামির (dogmatism) তো কথাই নাই। সন্ধানী মনকে সবরকম পক্ষপাত বাঁচিয়ে চলতে হবে—এই তার সম্বন্ধ। সে যেন হবে ভোরের শুকতারা, সবিতার দিগ্‌ব্যাপ্ত জ্যোতির্বিভাবের অগ্রদূতী; তাঁর আলোর মধ্যে তার প্রদ্যোতিত পরিনির্বাণেই তার সার্থকতা।

তারপর বুদ্ধির সম্বন্ধ। মনের সঙ্গে জড়ানো বুদ্ধির কথা বলছি না, সে হল ব্যাবহারিক বুদ্ধি। আর এ-বুদ্ধি বোধিচালিত, তত্ত্বদর্শী। তাঁর পরিব্যাপ্তি তার সহজ ধর্ম—যেমন আকাশজোড়া আলোর মত, যার মধ্যে অবাধে সবই ভাসছে। সম্বন্ধ এ-বুদ্ধির পক্ষে স্বাভাবিক।

ব্রহ্মে রয়েছে প্রকৃতি-পুরুষের মিলন। দুটি মিলনেরই সম্বন্ধের কথা বললাম। এই সম্বন্ধই সাধককে পৌঁছে দেয় 'সম্বং ব্রহ্মতে'—অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের সম্বন্ধে। তার মধ্যে একরূপ হয়ে আছে স্বয়ম্ভূ অনন্ত সত্তার সম্বন্ধ, যার প্রশান্ত নিবিড়তা দেহ প্রাণ হৃদয় সঙ্কল্প আর মনকে করবে চিদ্‌ঘন। আছে অনন্ত চৈতন্যের সম্বন্ধ যার মধ্যে বইছে আনন্দ-চিন্ময় 'পুরাণী প্রজ্ঞার' মুক্তধারা; আছে অকামহত তপঃশক্তির সম্বন্ধ যাহতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রভাস্বর সত্যসঙ্কল্পের সাবিত্রদ্যুতি; আছে পরমানন্দের সম্বন্ধ যা অনির্বচনীয় রস রতি আর কান্তির ত্রিবেণীসঙ্গম। এই সেই 'নিরঞ্জন পরমসাম্য' যা আকাশের নিথরতায় আর আদিত্যের আভাস্বরতায় নিত্য যুগনদ্ধ হয়ে আছে বিশ্বের আদিতে মধ্যে এবং অন্তে, জীবচেতনার গহনে তুঙ্গতায় এবং ব্যাপ্তিতে।

[ক্রমশ]

বসোরার উজীররা

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ইবনসরীর প্রাসাদ, ভোজের জন্য সুসজ্জিত বাহিরমহলের একটি প্রকোষ্ঠ
দুনিয়া, আনিস-আলজালিস, বালকিস]

দুনিয়া

হায় রে বিধাতা—স্ফূর্তির কি বহর—যে যা পেয়েছে, তাই নিয়েই সরেছে। দলে দলে পিষে রেখে গেছে ধরটা—দেখছি এ সবও দৈত্যদানাদের কিছুই নজর এড়ায় না—এমন ভারী ভারী আসবাবপত্রগুলো, তাও কিনা টেনে নিয়ে চম্পট। ঐ যে রাক্কস খানিনটা দাঁতে করে অমন সুন্দর দামী চেনটা নিয়ে সরলো, কেউ কিছু বললে না—পালালো কিনা একেবারে তার সুরক্ষিত দুর্গাভ্যন্তরে। আর ঐ যে আসুর—সেও কী কম—বোসেইকের টেবিলটা পকেটে পুরলে। অমন সুন্দর 'কার্পেট' আর 'রাগ'গুলো ঘূর্ণীঝড়ের মত জেলের ঘরে গিয়ে উঠলো। এমন করলে, এই দুর্ব্যবহারে—লক্ষ টাকার থলিই হোক আর যাই হোক কদিন টেঁকে?

বালকিস

না, এ বাধা দিতেই হবে—

দুনিয়া

খুড়োমশায়ের কাছে নুরুদ্দীন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা অনেকটা রেখেছে—আসলে ছেলেটা মোটামুটি মন্দ নয়, ভালই—শুধু ঐ বদসঙ্গী ছোঁড়াগুলোই সর্বনাশ করছে, আর আনিস—তুমিও কম গণ্ডগোলের মূল নও—মুখে যতই ওর নামে নালিশ করনা কেন, তুমি নিজেই কি কম বেহিসেবী।

আনিস-আলজালিস্

আমি?

দুনিয়া

হাঁ, তুমি, সখী তুমি—বলো দিকিন্, যখনই একটা জড়োয়া গয়না নজরে পড়েছে তখনই তুমি কেনোনি? একটা চমৎকার পোষাক তোমার চোখে লাগলো অমনি সেটা হয়ে গেলো তোমার—যতদিন তুমি ওর সঙ্গে ঘরকন্না করছো, বলোতো কোনদিন হাসিঠাট্টা, গান, সুরা সুর বাদ গেছে কিছু, তবে?

আলিস-আলজালিস্

হাঁ্যা, কয়েকটা আংটি, দুএকটা চেন, কিছু রেশমপশমতুলোর জামা পোষাক—এই তো সামান্যই আমি কিনেছি, আবার কী?

দুনিয়া

এই সামান্যই যে অসামান্য হলো, কতো দাম পড়েছে জানো?

আলিস-আলজালিস্

না, জানিনা।

দুনিয়া

জাননা, সে ঠিকই—তা জানবে কেন—আর নয় এবারে একটু সংযত হও, হাতটান করো, রাশ টেনে ধরো।

বালকিস

এরপরে ঐ সব বন্য বর্বর বানগুলেদের মাঝে তোমায় গান গাইতে বলবে, সোজা বলে দেবে—না—ও দিকে আর নয়, যেয়োনা।

আলিস-আলজালিস

ঠাট্টা থাক, তাই বলে এই মজাদার হৈহল্লোড় ভেঙে গোমড়ামুখী হয়ে বসে থাকতে হবে নাকি? আনন্দ-সংহারিণী ভ্রূকুটিকারিণী মূর্তিতে? না বাপু, আমার দ্বারা তা হবে না—সবচেয়ে বড়ো পাপ হচ্ছে, ঐ ভুরু কোঁচকানো, তার তুলনা নেই।

দুনিয়া

কিন্তু যে মহাকাশের নীচে আশ্রয়, সেই আকাশই যদি ভেঙে পড়ে—

আনিস-আলজালিস

পড়ুক ক্ষতি কি? হাসাঞ্জলনল লাসানয় জগতে আমরা কিছুক্ষণও ছিলুম ত। আমি চাই ও সুখী হোক সুখে থাকুক—আমার সীমা ঐ পর্যন্ত—কিন্তু, কি বললে, বেষের পর বেষ আসছে, শোনো দুনিয়া, তাহলে আজই শেষরাত্রি, এই ইতি।

(আজীবের প্রবেশ)

কী আজিব, খবর কি?

আজীব

বান্দার কসুর মাফ করবেন, সাহেবান্, বসোরার অর্ধেক দোকানদার অর্থাৎ পাওনাদার বাইরের হলঘরে বসে জটলা পাকাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে আর শপথ নিয়ে বলছে—টাকা না দিলে ওরা পাকাপোক্ত ভাবেই আড্ডা গাড়বে।

আনিস-আলজালিস

তোমার হুজুরকে ডাকো।—কোথায় তিনি, দাঁড়াও একটু, হিসেবগুলো দেখি।

আজীব

সবগুলোই লম্বা ঠাসবুনন্—উপর থেকে নীচে কেবলই যোগবিয়োগের অঙ্ক।

আনিস-আলজালিস

ডাকো তাঁকে।

আজীব

এই যে এইখানে।

(নুরুদ্দীনের প্রবেশ)

নুরুদ্দীন

আরে, এই যে দুনিয়া বোনটি আমার—বালকিস—তুমিও, বা বা—কেমন চমৎকার সাজিয়েছি বলো দিকিন্, দেখতে এসেছো বুঝি—সুন্দর, নয়?

দুনিয়া

হাঁ, যেন চকচকে ঝকঝকে চিত্রবিচিত্র কবরখানা, স্থাপত্যশিল্পের চমৎকর্ষ, মণিমাণিক্যমুক্তার হাট—কিন্তু ভেতরে যিনি বসে, তিনি ও সাক্ষাৎ মৃত্যু—তাইটি আমার,

শুধু মরা হাড় নিয়ে কারবার করছো, মেদমাংসমজ্জা প্রাণ সবই গেছে যে, বিলকুল হাড়—অস্থি।

নুরুদ্দীন

বাইরে এই যে ত্রিলোভনা মধুরা প্রিয়ভনা দুনিয়াকে দেখছি তারও ভিতরে হাড় আর হাড়, তবে হাড় নয়, সে কথা ছেড়ে বরং মনে করা যাক গোলাপী গাল, মদালসা চোখ, হাসিমাখা ঠোঁট।

দুনিয়া

হাড়ের ভেল্কী ত খুব দেখালে, কিন্তু হাড়কে মাংসচ্যুত করলে কায়া—এখন যে ভিতরটা ফাঁপা ফোঁপরা, তলতুলে।

আনিস-খালজালিস

পাওনাদারগুলো নড়ছে না, নুরুদ্দীন, তাদের টাকাগুলো মিটিয়ে দিতে হয় যে—

নুরুদ্দীন

আরে, আনিস, হলো কী, তুমিও গম্ভীর হয়ে উঠলে?

আনিস-খালজালিস

সত্যিই বলছি, যতক্ষণ না ওগুলো মিটিয়ে দিচ্ছো, ততক্ষণ আমার হাসি আসছে না; আজীম, বিলগুলো নিয়ে এসো।

নুরুদ্দীন

দুনিয়া, তোমারই এই কাজ বুঝি?

দুনিয়া

আমার নয়, তোমারই, নিজেরই কৃতকর্ম, ভাই।

নুরুদ্দীন

সত্যি? আনিস?

আনিস-খালজালিস

আমি যা বলবার তা বলেছি।

নুরুদ্দীন

দেখি, বিলগুলো কই? তোমরা তিন খলিফা স'রে পড়ো দিকিন্।

আনিস-আলজালিস

উঃ, দেখছি ভদ্রলোকের বেজায় রাগ আর দুঃখ—আমারও কেমন ভালো লাগছে না, ওর মুখটা থমথমে দেখলেই কেমন খারাপ লাগে—যাই ওর কাছে যাই, দুটো মিষ্টি কথা বলি।

বালকিস

আঃ, সব মাটি করবে দেখছি—দুনিয়া, ওকে টেনে নিয়ে এসো।

দুনিয়া

চলে আয়, পোড়ারমুখী।

(আনিসকে টানতে টানতে দুনিয়ার প্রস্থান, পিছনে বালকিস্)

নুরুদ্দীন

কই, দেখি হিসেবগুলো।

আজীব্

আপনি নিজে দেখবেন?

নুরুদ্দীন্

কতো টাকা, বলো না।

আজীব্

এই দর্জী মার্দুকের চব্বিশ হাজার—পোষাক আশাক্—চাপকান্ আচকান শাল দোশালা, দামাস্কাসের সিল্ক রেশম—এই সব আর কী।

নুরুদ্দীন্

কর্দটা মুলতুবী দাও।

আজীব্

দর্জী লাখকান্ পাবে বিশ হাজার, কাটওয়ালা দুহাজার, মিষ্টিওয়ালাও তাই, বাগদাদের

টুকিটাকি দুর্লভ শিল্পবস্তু যা ঐ সওদাগরটি নিয়ে আসে তার চব্বিশ হাজার, ইস্পাহানের দালালটি পাবে ষোলো হাজার—জহরৎওয়ালা মণিকার—হার, চুড়ি, আংটি, কোমরের গয়না, ঐ যা সব কেনা হয়েছিল বাঁদী আনিস-আলজালিসের দরুণ, নব্বই হাজার—আর ঘর সাজিয়েছে যারা—

নুরুদ্দীন্

থামো, থামো—ব্যাপারটা কী বলো দিকিন্—লম্বা লম্বা ত খুব বলে যাচ্ছো—হাজার ছাড়া আর পেটে কথা নেই বুঝি? আমার মাথায় হাত বুলিয়ে এখন দেখছি দিলদরিয়া খরচা করনেওয়ালা বনে গেছো?

আজীম্

হুজুর, আমার গোস্তাকী মাফ্ করুন—এই ত বিলেই সব লেখা—আমার পেট মোটেই মোটা নয়—একেবারে থালি শূন্য-লবডঙ্কা।

নুরুদ্দীন্

অ্যাঃ, হাজার ছাড়া বাকি নেই বুঝি?

আজীম্

তা আছে বই কী হুজুর, হুসেন বাবুর্চির পাওনা মোটে ত সাতশো বারো আর কিছু খুচরো।

নুরুদ্দীন

বেটা চশমখোর বদমাইস—সামান্য সাতশোতেই সে এতো করেছে?

আজীম্

আর ফলওয়ালা, হুজুর।

নুরুদ্দীন্

সরে পড়ো, থলিগুলো নিয়ে এসো।

আজীম্

থলি?

নুরুদ্দীন্

ওহে মহামূর্খ, টাকার থলি বলো—হারকুশ ও অন্য খাদ্দাদের ডাকো, আমার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে এসো।

(আজীবের প্রস্থান)

সে আমার উপর ভ্রূকুটি করবে, বিরূপ মেজাজ্ দেখাবে—টাকার জন্য, দেনার জন্য—সামান্য ঐ সোনারূপোর চাকতিগুলো, যেগুলো আমরা মাটির অন্ধকূপ থেকে শাবল দিয়ে বের করে আনি। ভালবাসা এতই তুচ্ছ, এতই হীন যে প্রেমের স্বপন গণনা হবে টাকা-পয়সার হিসাবে—হায়রে!

(আজীব্, হারকুশ ও টাকার থলি নিয়ে দাস ভৃত্যদলের প্রবেশ)

ঐখানে সব স্তূপাকার করে ঢেলে দাও, যাও আজীব্, ঐ সব বুভুক্ষু পাওনাদারদের ডেকে নিয়ে এসো—ওদের পেটভরে খাওয়াচ্ছি।

(আজীবের প্রস্থান)

হারকুশ, দুটো থলি খোলো, সিল্ ভাঙো।

(পাওনাদারদের নিয়ে আজীবের প্রবেশ)

কে টাকা চাইছে?

পাচক

হুজুর, আমার পাওনা হয়েছে সাতশো দীনার, বারো আর তিনপো দিরহাম...

নুরুদ্দীন

বদমাইস্, ছুচো, নিয়ে যাও তোমার টাকা।

(তার দিকে একটা থলি ছুঁড়ে দিল)

এই তুমি নাও।

জহরৎওয়ালা

এতে আপনার দেনার একশোভাগের এক ভাগও মিটবে না।

নুরুদ্দীন্

দুশো ব্যাগ ওকে দাও।

হারকুশ

কী বললেন হুজুর—থলি, ব্যাগ...

নুরুদ্দীন্

হাসছিস্ কেন দুষ্টু বদমাইস্—এই নে।

(এক ঘা কশাইয়া দিলেন)

হারকুশ

ঁ্যা, যা ভেবেছি তাই—কার কলকাঠি কোথায় নড়লো, মারো হারকুশকে—হুজুর আপনাদের বুড়োই বা কী ছেলেই বা কী—হয় লাঠোঁওষধি না হয় চাবড়ায় বেত, হয় লাতকড়া না হয় দাবি—প্রভুদের বলিহারি যাই—আমার কোষ্ঠির ফলাফল ঐ একই।

নুরুদ্দীন্

আরে বেটা, মাথার ঠিক আছে নাকি?—নে এই সোনার দীনারটা নে,—আর এই সব টাকার থলিগুলো উজোড় করে ওদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে দে—এই রাস্কেলগুলো, সব গুনে নিয়ে যাও, বেশী যা হবে, গলায় ঠেসে নিয়ে যাও, না পারো ত যেখানে খুশী আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও।

পাওনাদারর।

(ঐ থলিগুলি নেবার জন্য ঝটোপুটি ঝগড়া করতে করতে)

—ওটা আমার, ওটি আমার—না, না ওটি নয়—যত শালা চোর, বদমাইস্, গুণ্ডা, ডাকাত—অ্যাঁ, কী বললে ডাকাত, চোর?

নুরুদ্দীন্

ওদের ভাগ্যে পিটে বের করে দাও।

(পাওনাদারদের থলিগুলো টানাটানি করতে করতে প্রস্থান—
পিছনে গোলামের দল)

আমীন্

এটা পাগলামী হুজুর।

(নুরুদ্দীনের ইসারায় আমীনের প্রস্থান)

নুরুদ্দীন্

ছেঁড়া কাপড় পরেও ও যদি থাকে আর তার জন্য আমাকে দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করতে হয় তাহলেও আমি ওর পিছন পিছন মহাচীনে অনুসরণ করতেও রাজী—টাকার জন্য আমার কিনা চোখ রাঙানো!

(আসিমের প্রবেশ)

আনিস্-আলজালিস্

নুরুদ্দীন্, এ কী করলে তুমি ?

নুরুদ্দীন্

পাওনাদারদের টাকা মিটিয়ে দিতে বলেছিলে তুমি, দিয়েছি ।

আনিস্-আলজালিস্

তুমি আমার উপর চটেছো প্রিয়তম ? কিন্তু আমি ভাবতেই পারছি না যে এতো তুচ্ছ কারণে তুমি রাগ করবে।

নুরুদ্দীন

আমিও ধারণা করতে পারিনি যে টাকার জন্য, সামান্য টাকার জন্য তুমি ষড়যন্ত্র করবে।

আনিস-আলজালিস

তুমি বিশ্বাস করো এই কথা ? তুমি এইটুকুই জানলে আমাকে ? আমার জন্য তুমি তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে, আর আমি চুপ করে হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে দেখবো ? তুমি তাহলে তিলে তিলে নষ্ট হও, আমায় পরীক্ষা করে দেখো তোমার চোখের সামনে।

নুরুদ্দীন

আনিস্, বণিক আমার—আমি চটেছি নিজের উপর—আমার ভিতর যে কাপুরুষটা আছে, সেইটিই তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তার নিজের কষ্টের দুঃখের প্রতিহিংসার জন্যে। আমি সব ভুলতে চাই, শুধু স্মরণে থাক তুমি আর তোমার ভালবাসা।

আনিস-আলজালিস

একটা গান শুনবে ?

নুরুদ্দীন

তাই গাও, আনিস।

আনিস্-আলজালিস

লেখাপড়া করলো প্রেম, সখের দলিলে
নয়নের তপ্ত ব্যথার সাথে আর চোখের সলিলে
হিয়া-জাগানিয়া, কালা, সে যে বড়ই চিকন্ গো
আজ যদি এলো ঘরে কাল বলে চলি গো।
দুখের পরশে তারে ধরিবার আগেতেই
বন্ধু যদি বিদায় নেয় কেননে উদাস-রই।
শুধু ঝরে পড়া ঝরঝর নয়নের বারিরাজি
দেবে কী সন্ধান পথের, প্রণয়ের কারসাজি—
না, আর গাইতে পারছি না।

নুরুদ্দীন্

কেনোনা, আনিস্, কেনোনা, লক্ষ্মীরানীটি আমার, যে তোমার চোখের জলের কারণ ঘটিয়েছে তার জন্যে তোলা আছে মহতী বিনষ্টি?

আনিস-আলজালিস্

না, না, কিছু না—দু'একপশলা হয়ে গেলেই আবার সূর্যোদয়। দুঃখ দূরে যাক্, টাকা গেছে ত কী হয়েছে—যাদের টাকা নেই, ভিক্ষান্নে যাদের উদরপূর্তি হয় তারা কী সুখী হয় না?

নুরুদ্দীন

নিশ্চয়ই সুখী।

আনিস-আলজালিস

তবে আমরা সেই মহাভিক্ষুকই হবো—প্রেমের দেওয়ানা—দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবো, ছেঁড়া পোষাক পরে—আমি নেবো আমার বাঁশী; আমার মধুকরা সুর দিয়েই তোমার মধুমাখানো খাবার কিনে দেবো—আচ্ছা হুজুর, বলুন ত আমার গলা মিষ্টি নয়?

নুরুদ্দীন

মিষ্টি—সত্যি, জানি না গেব্রিয়েলের কণ্ঠ এমন সুকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ হয় কিনা যখন তিনি মহাবহ্নির সামনে তান ধরেন আর সারা স্বর্গলোক তা শোনে।

আনিস-আলজালিস

একদিন আমরা বাগদাদে পৌঁছব—মহান্ খলিফার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হবে—মহামান্য হারুণ-অল-রশীদ্, হয়তো দেখবো তিনিও ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে পথে বিপথে বেরিয়েছেন—দেবে তাকে আমাদের রুটির টুকরো—হঠাৎ বন্ধুত্বও হয়ে যাবে—সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হারুণ—তাই না, প্রভু?

নুরুদ্দীন্

আলবাৎ, আনিস।

আনিস-আলজালিস্

তাহলে আমরা হলামই বা গরীব ভিক্ষুক—নেচে খল্‌খল্ হেসে গল্‌গল্ সারা দুনিয়ার যত পদাতিক আছে তাদের সঙ্গে মিলে যাবো. ওঃ—না, তোমার ত আবার বাপ না আছে—এসো, বসো এইখানে—আমি দাঁড়িয়ে একটা গল্প শোনাই।

নুরুদ্দীন

আমার পাশে বসে বলো।

আনিস্-আলজালিস

না, না, দাঁড়িয়েই বলবো আমি।

নুরুদ্দীন

বড্ড একগুঁয়ে তুমি, তোমার গল্প সুরু করো।

আনিস-আলজালিস

আমি ভুলে গেছি—গল্পটা হচ্ছে একজন মানুষের যার এমন একটা রত্ন ছিল যাকে কেনবার ক্ষমতা সারাপৃথিবীতে কারুর ছিল না।

নুরুদ্দীন

যেমন আমার তুমি।

আনিস-আলজালিস

চুপ করো বন্ধু. গল্পের রাজপুত্তুর সেই সেরা রত্নটিকে অন্যগুলির সঙ্গে রেখে দিত

এবং প্রতিদিন রাস্তায় ফেলে দিতো, বলতো—পৃথিবীর লোকে চেয়ে দেখুক, আমার এই রত্নের তুলনা নেই—সব যাক্ আমার ঐটি থাক্।

নুরুদ্দীন

যেমন আমি তোমায় রাখছি।

আনিস-আলআনিস

কিন্তু মূর্খ জানতো না যে ঐ অমূল্যরত্নের সঙ্গে সাধারণ নুড়োর সংযোগ আছে, তাই লোটি যখন ফেলে দিলে তখন ঐ ক্ষীণ যোগসূত্র ধরে রত্নটিও চললো পিছু পিছু। ক্যাপা সারা পৃথিবী খুঁজে বেড়াতে লাগলো তার পরশ পাথরটির জন্য, পেলো না, পেলো না।

নুরুদ্দীন্

(খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর)

না, আগামী কালই এই শূন্য জীবনের শেষ হবে, খরচা কমাতে হবে, এবং শুধু তোমারই জন্যে বেঁচে থাকবো। অবশ্য আজকের রাত্রের এই খানাপিনা আমোদ আহলাদ—এখন আর ছাঁটা যায় না, কথা দিয়েছি—আজীন্।

(আজীনের প্রবেশ)

আর কতো টাকা আছে—বাকী দেনা কতো?

আজীন্

দেনা ত সব মেটানো যাবে না—আজকের এই মাইফেল ব্যাপারটা না করলেও চলতো—এই নবাবী কাণ্ডকারখানা—হাঁ, আমায় মারতে হয় মারো, কিন্তু কথা আমায় বলতেই হবে।

নুরুদ্দীন্

স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি বিক্রী করে দাও, শুধু বাড়ীটা ছাড়া—পাওনাদারদের দেনা মিটিয়ে দাও—যা বাকী থাকবে, সময় চেয়ে নাও, বলো—পরে দেবো।

আজীন

তা তারা শুনবে না—তারা শকুনির জাত—ডাগাড়ে মরা জন্তুর গন্ধ পেয়েছে কী ঠোঁট বেঁকিয়ে পাখা ঝাপটিয়ে হাজির।

নুরুদ্দীন

পচা মাংসই বটে—পরম কারুণিক, তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবকে বিচারবুদ্ধি দিয়েছিলেন কেন, যদি তারা তাদের রক্তের উত্তেজনাকে ধীর স্থির বিবেচনায় রুদ্ধ করতে না পারে? যাও, যা পারো, করো—না হয়, সত্যিকার বন্ধুবান্ধবদের কাছেই হাত পাততে হবে, তারা কি আর আমার সাহায্য করবে না?

(প্রস্থান)

আজীব

সত্যিকার বন্ধুবান্ধব—রক্ত শুষে খায় যারা—চোর শিরোমণির দল, দুদিনে কত সাহায্যই তারা করবে, তা দেখা যাবে।

আনিস-আলজালিস্

আর কেউ না দিক্, আজীব আছে।

আজীম্

তাকে বিশ্বাস করবে? সে যে সাক্ষাৎ উজীরসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র...

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পূর্ববৎ)

[আনিস্-আলজালিস্, নুরুদ্দীন্]

আনিস্-আলজালিস্

ওরা সব চলে গেছে?

নুরুদ্দীন্

কাকুর গুটিসুটি মেরে চুপিচুপি পাওনাদারদের গলাবাজি শুনেছে; তারা সব "ভাগলবা", একেবারে পলায়ন। খানিমের মার বড়ই অসুখ—শুধু আমার প্রতি এতো মমতা যে না এসে থাকতে পারেনি; আয়ুবের কাকা কাল মক্কা যাচ্ছে; কাফুরের বাড়ীতে কে মরেছে, কবর দেবার হাঙ্গামা আছে; আর জেবের বাবা, ওমরের দাদা, হুসেনের

বউ সবারই অত্যন্ত অসুখ—আমার খেয়ালই ছিল না যে বসোরাতে হঠাৎ বসন্তমারী লেগে গেলো নাকি—এক একজনের এক এক রকম অসুখ।

আনিস্-আলমালিস্

এই তাদের বন্ধুত্ব।

নুরুদ্দীন্

অতোটা নির্মম হয়ে বিচার করোনা, হতে পারে তারা একটু উদার লজ্জা পেয়েছে কিম্বা তাদের একটা অনুতাপমিশ্রিত অনুশোচনা এসেছে যে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে পারলেই বাঁচে—আমি হারকুশকে তাদের কাছে পাঠিয়েছি টাকা ধারের জন্য—দেখাই যাক্ না কি বলে—ওখানে কে?

(আজীবের প্রবেশ)

আজীব, তুমি বন্ধু, তুমিই শুধু এলে—না তুমিই আমার সত্যিকারের অকৃত্রিম সুহৃদ। তুমিই বাধা দিয়েছিলে বারেবারে উচ্ছৃঙ্খলতার মুক্তপথে যেতে—ভাই, আসলে মানুষ খারাপ নয়, তার মধ্যেও দেবদূতের বিভূতি আছে—তারও আছে ঊর্ধ্বগতি, যদিও নিম্নের শয়তান তার পক্ষচ্ছেদ করে টেনে নামিয়ে আনে। আমাদের আত্মা আছে, সত্তা আছে, তাতে দেব-চেতনার অমৃতভাণ্ডের ছাপ আছে যা আদৌ নষ্ট করতে চেয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি বিনষ্ট হয়নি।

আজীব

আমিই তোমার সর্বনাশের কর্তা—যদি এখনও তরবারি থাকে, খোলো।

নুরুদ্দীন

কি বললে?

আজীব

উজীরের প্ররোচনায় এবং পিতৃব্যবহাশয় আমাকে আরো উঁচুতে তুলবেন এই আশায় ঐ ছোঁড়াগুলোকে আমিই তোমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলাম। নাও, আমায় মারো, কাটো।

নুরুদ্দীন

(খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর)

যাও, তোমার পূজ্যপাদ উজীর সাহেবকে গিয়ে বলো যে কাজটা সুসম্পন্ন হয়েছে।

আজীব

তোমার কি সবই গেছে ভাই?

নুরুদ্দীন

তুমি মনে সন্দেহ রেখো না যে কাজটায় কিছু ঘাটতি ঘটেছে; না, না খুড়োমশায়কে আশ্বস্ত করতে পারো—তুমি কি এইজন্যেই এসেছিলে?

আজীব

আমার যা কিছু আছে তা দিয়ে—

নুরুদ্দীন

আর না, যদি জীবন নিয়ে ফিরে যেতে চাও—যাও।

আজীব

শান্তির চরন দিলে এই।

(প্রস্থান)

নুরুদ্দীন

জীবটা এখনও ঘুরছে।

(হারকুশের প্রবেশ)

কী হলো কিছু?

হারকুশ

আয়ুবের ওখানে প্রথম গেলাম—তার হঠাৎ অনেক ক্ষয়ক্ষতি লোকসান্ হয়েছে—না, সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না বলে বড়োই দুঃখ জানালো।

নুরুদ্দীন

খানিক?

হারকুশ

তাঁর সম্প্রতি পদস্খলন হয়ে পপাত ধরণীতলে—উরুভঙ্গ—তিনি পড়ে আছেন—পক্ষাধিক কাল বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ।

নুরুদ্দীন

কাফুরের খবর কী ?

হারকুশ

সে তো সহরের বাহিরে—অর্থাৎ উপর তলায়।

নুরুদ্দীন

কেন ?

হারকুশ

একেবারে অশ্রুভারনত হয়ে পড়লো—সে কী কান্না—টাকার কথা বললেই ফুঁপিয়ে ওঠে—হয়তো সত্তরণ বিদ্যায় পারদর্শী হলে তার অর্থভাণ্ডারের দ্বারদেশে পৌঁছতে পারতাম —কিন্তু সে রসে বঞ্চিত যে আমি।

নুরুদ্দীন

ওমর ?

হারকুশ

তোমায় টাকাকড়ি দেবার আগে সে তার খাতাপত্র সব পুড়িয়ে ফেলবে।

নুরুদ্দীন

সবাই তাহলে না বললে ?

হারকুশ

হ্যাঁ, কেউ সজল চোখে, কেউ সোজাসুজি ভনিতা না করে। টাকার বেলায় সকলেরই এক রব।

নুরুদ্দীন

আচ্ছা, যাও

(হারকুশের প্রস্থান)

এর পরে কি করা যায় ? এথেন্সের সেই মানুষটির মত আমি কি সব মানুষকেই ঘৃণা করবো ? না নিজেকে ? আমার নিজের পাপের পশরা যদি না ভারী হতো তাহলে আমি ত জানতেই পারতাম না ওদের দোষগুণের কথা—নিজের দোষগুণের জন্য আমি নিজেই দায়ী,

সত্যি বটে ওরা আমার পিতৃ নিয়েছিল অস্বাভাবিক কুকুরের মত—ওদের ঐ অসৎ প্রকৃতির পিছনেও আছে সেই সর্বশক্তিমানের খেলা—যা কিছু সবই যে তাঁর মঙ্গল বিধান।

আনিস-আলজালিস

তোমার সব যাক্, আমি আছি।

নুরুদ্দীন

তাহলে ত অনেক আছে।

আনিস-আলজালিস

না, সবই আছে।

নুরুদ্দীন

সত্যিই তাই এবং শীঘ্রই সে কথার বোঝাপড়া হবে।

আনিস-আলজালিস

আমার জড়োয়ার গহনাগুলো আর কাপড়পোষাকে আল্মেক দেনা শোধ হবে না?

নুরুদ্দীন

আমার দেওয়া জিনিষ আমি ফেরত নেবো?

আনিস আলজালিস

যদি সেগুলি আমারই হয়, তবে আমি যদি বিক্রী করি, কার কী বলবার আছে।

নুরুদ্দীন

হাঁ, তাই করো—আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কাকুর ঐ পুশাধারটি চেয়েছিলো, সে নিক্ ওটা—আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম; চলো আনিস্, নুরাদের কাছে যাই—সে সাহায্য করতে পারে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আজীবের একটি কক্ষ

বালকিস, মীনুনা

বালকিস

আমার জ্বর হয়েছিল নাকি? মীনুনা, আমি অসুস্থ।

মীনুনা

অসুখ—তা হবে—আমারও মনে হচ্চে তোমাদের দুজনেরই রাজযক্ষা হয়েছে—তা না হলে গালদুটো এমন লাল হয়ে ওঠে, ভাল লক্ষণ নয়।

বালকিস্

ওকে বলবে যে আমি অসুস্থ, অত্যন্ত অসুস্থ, আমি মরছি—এমনভাবে বলবে যেন করুণা-সমুদ্র উথলে ওঠে।

মীনুনা

না বাপু, গণ্ডদেশে বরং গৈরিক প্রলেপ লাগাও—জাফরানের মত কাঁচা হলুদ রং দেখে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ মনে করে ও গলতে সুরু করবে।

বালকিস্

না, দেখছি, ভগ্নহৃদয়ই হবে।

মীনুনা

সাধু, সাধু, শীঘ্রই হোক—যত তাড়াতাড়ি ভাঙবে ততো তাড়াতাড়ি জোড়াতালিও দেওয়া যাবে।

বালকিস্

(চোখের জলে)

মীনুনা, এতো নিষ্ঠুরা কবে থেকে হলি?

মীনুনা

হায়রে আমার বোকারানী, নিজের শক্তিটাকে এতোটা টান্ দেওয়া চলে না রে—

ভেঙে যায়, যত শক্তই পাথর হোক্ না কেন, ঠিক ছন্দে যা পড়লেই গুঁড়িয়ে যায় তাই না, প্রকৃতির নিয়মই এই—একটা জায়গা থাকে যেখানে আঘাত পড়লেই সব চুরমার—তাই তত্তদূর এগুতে নেই—তার নীচের বিন্দুতেই খেলা দেখাও—ওরে, সুর আর স্বরগ্রাম খুব চড়া হলে চলে না, অলবাত্রা কেটে যায়। ঐ যে বিরহকাতর আসছেন

বালকিস্

আমি যাই।

মীনুনা

(তাকে ধরে রেখে)

না, কিছুতেই না।

(আজীবের প্রবেশ)

আজীব

আমি ভেবেছিলাম মীনুনা যে তুমি একাই আছো। যেখানে আমাকে কেউ চায় না, সেখানে আমি নিজেকে টেনে নিয়ে আসবো, আমি অতোটা সস্তা নই।

বালকিস্

আমি যাচ্চি, মীনুনা, ভেবেছিলাম নাপতিনীটা বুঝি এসেছে এখানে, তাই বসেছিলাম।

আজীব

জানো, মীনুনা, কতকগুলি হৃদয় এমনিই পাষাণী যে ভালোবাসার মর্যাদা দিতেই জানে না। প্রেম ভালবাসা এসব তাদের অহংকারের পাদপীঠ, নিরর্থক অত্যাচারের কশাঘাতগুলো জমিয়ে রাখার আস্তানা।

বালকিস্

মীনুনা, বোনটি আমার, শুনেছিস্ অনেক শক্তিহীন পুরুষ আছে যারা প্রেম করতেই জানেনা, একটা গর্বভের ভারের বেশীও বহন করতে পারে না ; আবার নিজেদের প্রতি আছে গভীর আত্মবোধ, তাই খুব শান্তসংবত হয়ে, ভালবেসে ক্রটি দেখালেও তাঁরা চটে যান্, তাঁদের প্রেমের মধুর সুধার বদলে তিক্তকটুত্বই বেরিয়ে পড়ে।

আজীব

কারুর কারুর প্রেমের ধরণধারণই আলাদা, মীনুদা।

যালকিস্

কেউ কেউ মনে করে শাসন মানেই শোষণ।

মীনুদা

তোমরা দুজনেই দেখছি নেহাৎ ছেলেমানুষ। না, আর নয়, কই, দেখি দুজনের হাত।

আজীব

আমার হাত, কেন কী হবে।

মীনুদা

সরিয়ে নিয়ে এসো—দুটি করপল্লবকে আমি একত্র করে দেবো, ওরা চায় এক হতে, কিন্তু ওদের মালিক মশায়েরা বুঝেও বোঝেন না—বুদ্ধিহীনবুদ্ধিহীনা নবীননবীনা।

যালকিস্

মীনুদার গায়ে কী জোর, টানছে দেখ, না হলে আমি স্পর্শও করতুম না।

আজীব

সত্যিই, মীনুদা হিতৈষিণী, তার মনে কষ্ট দেওয়া যায় না, কী করি, পাণিগ্রহণ করতেই হচ্চে।

মীনুদা

ও, তাই নাকি, বোকা ঘাড়দুটো বেঁকে থাকে কেন! আর ঐ আজানুলম্বিত বাহুদুটি ওই সুতনুকার কটিতট স্পর্শ করুক না।

আজীব

আচ্ছা, তোমার কথাই রাখছি, তুমিই আমার বক্ষের মণি।

মীনুদা

এইখানে আর একজনের

বালকিস্

আরে আমার হাই উঠছিল, তাই মুখটা তুলতে হলো।

মীমুনা

নাঃ, একটা বেত নিয়ে আসতে হলো দেখছি। ফিরে এসে দেখি যেন দুটিতে বেশ বানিয়ে গুছিয়ে নিয়েছো—বন্ধুর মত—আর তা যদি না হয় তাহলে পায়ের হাড় আর মাসগুলো আলাদা হয়ে তোমাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাবে।

(প্রস্থান)

আজীব

আচ্ছা, আমার এতো বড় ভালবাসার প্রতি এমন বিমুখ কেন?

বালকিস্

আর বলাই বা এতো নির্দয় নিষ্ঠুর কেন?

আজীব

হায় হায়, তোমার নশ্বর অধরে বধুর চুম্বন দিলাম, ঐ লাল টকটকে তাজা দুটি ওষ্ঠ, কেমন নরম, আর তুমি মানুষটা যেন শক্ত পাষাণ।

বালকিস্

আমিও তো তোমায় প্রতিচুম্বন দিয়ে ঋণ পরিশোধ করেছি।

আজীব

কথা দাও, আর একটু মায়াবতা দেখাবে, নিষ্ঠুরা হবে না।

বালকিস্

তুমিও প্রতিশ্রুতি দাও যে আমার কথা শুনবে, ঘৃণ্য পিতব্য মহাশয়ের অনুগত ভৃত্য হবে না।

আজীব

চুলোয় যান তিনি আর তাঁর কাজ। হাস্যমুখী, তুমি যদি সদয় হও একটিবার, তোমার হাসিমুখ দেখি।

বালকিস্

আমি হাসবো, খঞ্জিনীর মতো হাসবো—না, এই নাও আমায় জড়িয়ে ধরো। আমি তোমার দাসী।

আজীব

আমার হৃদয়রানী।

বালকিস্

দুইই, দুইই।

আজীব

তুমি এতো দেরী করলে কেন?

বালকিস্

তোমার মনে আছে যে বন্দীহাটে তোমায় আমি প্রাণধন সব দিয়েছিলাম, তুমিই বরং একটু ইতস্তত: করেছিলে।

আজীব

আরে কি দুর্বিনীতা দুর্ভাগিনী।

বালকিস

তাহলে এখন আমার রাগ করবার কিছু কারণ নেই বুঝি?

আজীব

হাঁ। সত্যই অনেক কারণ আছে। আমি যেন নিজেকে বড় ছোট মনে করছি যতক্ষণ না ঐ পিতৃব্যশপটি আমার ঘাড় থেকে নামছে।

(মীনুনার প্রবেশ)

মীনুনা

যা, বেশ। কিন্তু এখনই যে মুক্তাদীনের কাছে যেতে হবে সেটা মনে নেই—সেনার হাবুডুবু খাচ্ছেন তিনি, হয়তো বা আলিসকেই বিক্রী করে দেন।

বালকিস

কখনই না।

মীমুনা

উপায় নেই, করতেই হবে।

আজীব

আমি তাকে আনিসের দামের তিনগুণ ধার দেবো।

মীমুনা

না, না, তুমি তাকে ওসব প্রস্তাব করতে যেয়ো না—এই সেদিন তাকে যা আঘাত দিয়েছো।

বালকিস

তাহলে এক কাজ করা যাক—আজীবের টাকার জামিন হিসেবে গচ্ছিত রাখা হোক আনিসকে আমার কাছে।

মীমুনা

নুরুদ্দীন কোন অনুগ্রহপ্রার্থী নয়—আনিসকে সোজা বাজারেই বিক্রী করে দিক, আয়ুব ওকে সর্বোচ্চদামে কিনে নিক, যতদিন না নুরুদ্দীন ওকে দাম দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে ততদিন ও আমাদেরই কাছে থাকবে, অপেক্ষা করে থাকবে।

বালকিস

চলো, চলো, এখনি যাওয়া যাক।

মীমুনা

আমি চিঠি লিখতে যাচ্চি।

(প্রস্থান)

আজীব

এই রকমই থাকবে চিরকাল।

বালকিস

যদি তুমি এইরকম ভালো হয়, নিশ্চয়ই, তা না হলে ঐ যে গ্রীকস্বর্গবাসীর নামে দারুণ ঝগড়াটে বলে, তার মত অনবনবিতাকেই পাবে।

আজীব

না, একদিকে এমন স্বর্গ, আর একদিকে ঐ নরকের আভাস, আমার স্বর্গই ভাল— আমি দেবদূত হব।

বালকিস

কোন রংএর?

আজীব

তোমার পাশে বর্ণহীন কৃষ্ণই মনে হবে, কিন্তু আমি যা ছিলাম, তার তুলনায় একেবারে নিষ্পাপ দেবকিশোর।

(প্রস্থান)

ডাঃ কে, ডি, ঘোষ মহোদয়ের পরলোকগমনোপলক্ষে বিলাপ

[শ্রীঅরবিন্দের পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ (ডাঃ কে, ডি, ঘোষ নামে খ্যাত) একজন সিভিল সার্জন ছিলেন। রংপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থান তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল। চিকিৎসক হিসাবে তো বটেই,—পরোপকারব্রতী ব'লেও তিনি সেই সব জায়গায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর বহু কীর্তিকথা এখনও সে-সব স্থানে শুনতে পাওয়া যায়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীঅরবিন্দ যখন ইংলণ্ড থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর পিতা ডাঃ কে, ডি, ঘোষ খুলনার সিভিল সার্জন। যে-জাহাজে শ্রীঅরবিন্দের দেশে ফেরবার কথা, স্নেহময় পিতা সেই জাহাজের আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে পুত্রের দর্শন-প্রত্যাশা করছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ রওনা হয়েছিলেন অন্য একটি জাহাজে আর যে-জাহাজে তাঁর যাত্রা করার কথা ছিল সেই জাহাজখানি ডুবে যায় সমুদ্রগর্ভে। এই জাহাজডুবির খবর পেয়ে, পুত্রের নিশ্চিত মৃত্যু ধারণা ক'রে ডাঃ ঘোষ মর্মান্তিক আঘাত পান অন্তরে আর এই আঘাতজনিত অসুস্থতার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ডাঃ কে, ডি, ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুতে খুলনার জনসাধারণ শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। একজন শোকার্ত খুলনাবাসী এই মৃত্যুপলক্ষে একটি কবিতা রচনা ক'রে তাঁর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ডাঃ ঘোষের উদ্দেশে।

কবিতাটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, ভাগলপুরে—অধ্যাপক প্রদ্যোতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে। প্রদ্যোতচন্দ্র ডাঃ কে, ডি, ঘোষের সহোদর ভ্রাতা রামতারণ ঘোষের দৌহিত্র। রামতারণ ঘোষের দৌহিত্র শ্রীমান বসু কবিতাটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সত্তর বৎসর পূর্বে রচিত এই কবিতাটি নিয়ে প্রকাশিত হ'লো। —সম্পাদক]

(১)

খসিয়া পড়িল অমূল্যরতন,
কৃষ্ণধন ঘোষ বঙ্গ চূড়ামণি ;
অস্তে গেল আজি মধ্যাহ্ন তপন।
অকস্মাৎ আজি একি কথা শুনি ?

(২)

কাল সিন্ধুনীর হয়ে কৃষ্ণধন,
যাহার প্রভাবে কাল পেত ভয় ;
শত শত প্রাণ দিল যেই জন,
কাল হতে আজি তাহারি বিদায় ?

(৩)

রবি শশি তারা হইল মলিন,
তরুলতা তৃণ ঝরে অশ্রুবারি .
আজি সব হেরি সৌন্দর্যবিহীন,
তিমিরে ডুবিল "খুলনা" নগরী ?

(৪)

হাহাকার রবে ভেদিল গগন,
কান্দিল চৌদিকে "খুলনা"-নিবাসী ;
পিতার নিধনে সন্তান যেমন
ভূমি লুটাইয়া কান্দে দিবানিশি।

(৫)

বালবৃদ্ধ যুবা ধনী দীন যত,
শত্রু মিত্র মিলি কান্দে গলা ধরি ;
কি হল, কি হল, বলে অবিরত,
শূন্যময় হেরি "খুলনা" নগরী।

(৬)

চারিদিকে লোক কান্দিল সঘনে,
অজ্ঞানের প্রায় পড়িয়া ভূতলে ;
অই শুন রোল উঠিল গগনে ;
ভাসিল "খুলনা" শোকের সলিলে।

(৭)

আহা কৃষ্ণধন প্রাণের রতন,
চিতানলে তব নিমিষে হইল।
এত যার মান কোথায় এখন ?
"রূপশা" পুলিনে সকলি মিশিল।

(৮)

আহা কৃষ্ণধন "খুলনা" রতন,
হল বিসর্জ্জন "রূপশা"-সলিলে ;
হায় বিধি হ'ল একি অঘটন,
কার সাধ্য আছে যে রতন তোলে ?

(৯)

কোথা কৃষ্ণধন দয়ার আধার,
স্বদেশহিতৈষী বিপদতারণ,
তোমার বিহনে "খুলনা" আঁধার,
তোমা বিনা শূন্য মোদের জীবন।

(১০)

পথ, মাঠ, ঘাট যেদিকে নিরখি,
কীর্ত্তি কত তব রহে বিদ্যমান,
তোমার রচনা তাহে কত দেখি,
তোমা বিনা আজ সব শ্রিয়মাণ।

(১১)

অদ্ভুত তোমার বুদ্ধির কৌশল,
বিশ্বকর্ম্মা যেন ভবেতে উদয়।
মন্ত্রবলে তুমি সৃজিতে সকল,
হেন শিল্পকর নাহিক ধরায়।

(১২)

তুমি ধন্বন্তরি রোগীর সম্বল,
তুমি বৃহস্পতি মন্ত্রণা-প্রদানে।
তোমার দ্বিতীয় বঙ্গেতে বিরল,
মোদের কি হবে তোমার বিহনে ?

(১৩)

"খুলনা" তোমার প্রাণের কুমারী,
কত সাজে তুমি সাজাইলা তায়,
অঙ্গে অঙ্গে তার বিরাজে মাধুরী,
তারে ছেড়ে আজ রহিলে কোথায়।

(১৪)

কত সাধ তব ছিল গুণধাম,
"খুলনা" সাজাবে মনের মতন ;
অঙ্গে অঙ্গে তার বিরাজে মাধুরী,
তারে ছেড়ে আজ রহিলে কোথায়।

(১৫)

বিঃ দে, মহামতি তব পিতৃবর,
ম্লানমুখ যেন প্রভাত-চন্দ্রমা,
দিবানিশি তব শোকেতে কাতর
বিলাপনে কত নাহি তার সীমা।

(১৬)

অরবিন্দ ধীর প্রাণের কুমার,
আসি বাঙ্গলায় তুষিবে তোমায়,
এই আশা বড় ছিল যে তোমার,
সব আশা হায়, কোরকে বিলয়!

(১৭)

পুণ্যকাশীধামে তোমার জননী,
চেয়ে আছে পথ দেখিতে তোমায়,
শুনিলে একথা মরিবে তখনি;
কি দোষে জননী তোমায় হারায়!

(১৮)

আর কেন কাল "খুলনা" নিবাসী
কৃতঋণ ভবে ফিরিবে না আর।
যার সেইজন যারে ভালবাসি;
ভবের এ রীতি হেরি অনিবার।

(১৯)

আঁখি ভরি শুধু কাঁদিলে কি ফল?
মুখে বাক্যব্যয় কিবা প্রয়োজন?
নাই কোন ফল প্রস্তাবে কেবল,
কার্য্যসিদ্ধি তরে কর প্রাণপণ।

(২০)

দেও সবে মিলি শ্রদ্ধা উপহার,
দেখাও ভকতি খুলিয়া হৃদয়;
কর হেন কার্য্য স্মরণার্থে তাঁর,
নাম যেন তাঁর চিরকাল রয়।

জনৈক খুলনাবাসী দ্বারা রচিত।

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

[সার্টের পকেটের উপরে, মাথার টুপীতে দু'টি ঝকঝকে পিতলের প্রসারিত ডানা সব দেশের দুঃসাহসী দামাল ছেলেদের ডাক দিয়েছে। ভারতে আমরাও সেই জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করার ডাক শুনেছিলাম। তার মধ্যে ওড়ার খেলার আনন্দ একটি হাল্কা দিক, অন্যদিকে দেশ ও দেশজননীর সেবার কঠিনতর দিক। এই কাহিনীতে উভয় দিকের অবিস্মরণীয় যে স্বাদ পেয়েছিলাম আমরা তারই কিছু নমুনা। অনিবার্য কারণে আসল নামগুলিকে নকল নামের মুখোশ পরাতে হল।]

তেতাল্লিশ সন। বিয়াল্লিশ সনের ভারতছাড় আন্দোলনের তাণ্ডবলীলা অনেক করিয়া গেছে। আমাদের ডাইভ বম্বার স্কোয়াড্রন (Vultee vengeance) আসানের জঙ্গলে এক পাহাড়ের নাক কাটিয়া স্থাপিত এয়ারড্রোম (কুন্তীগ্রাম) হইতে বর্ম্মার নানা যায়গায় জাপানী সৈন্যদের উপর বোমা ফেলিতে যায়। দিনে প্রায়ই তিনবার যায়। প্রত্যেক বারের ফ্লাইটে বারখানা উড়োজাহাজ থাকে। আর পাহাড়ের নিচে ১৫-২০ মাইল দূরে এক গ্রামে (উদয়বন্দ) ধানক্ষেত-মাঠ পরিষ্কার করিয়া লুকান এক এয়ারড্রোম করা হইয়াছে। সেখানে আমাদের জাহাজগুলি রাত্রে রাখা হয়—এবং মেরামতের কাজও করা চলে। রাত্রে মেরামতের কাজ হইয়া গেলে সকলে পাহাড়ের মাথায় ফিরিয়া যায়। উড়োজাহাজগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য পদাতিক সৈন্য থাকে—সেই সাথে আমাদের স্কোয়াড্রনের কিছু গ্রাউণ্ড গানার এয়ারম্যেনও থাকে।

অনেক সময় মেরামতের কাজ এমন হয় যে উড়োজাহাজকে টেষ্ট ফ্লাইট (Test flight) করিতে হয়। টেষ্ট ফ্লাইটে উড়োজাহাজে গোলাগুলি বা বোমা থাকে না—যাহাতে উড়োজাহাজ ওজনে হাল্কা থাকে। আর টেষ্ট ফ্লাইট সব সময় ফ্লাইট কমাণ্ডার বা স্বয়ং স্কোয়াড্রন কমাণ্ডারের করার কথা।

আমাদের স্কোয়াড্রনে কমাণ্ডিং অফিসার (স্কোয়াড্রন লীডার মহিব চৌধুরী) হইতে সামান্য এয়ারম্যান পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের দেশের। স্কোয়াড্রন খুব ভাল বম্বিং করিতেছে। খুব

সুনাম। যেখানেই শক্ত লক্ষ্য—সেখানেই আমাদের বম্বিং করিতে যাইবার ডাক পড়ে—আর যদি রয়াল এয়ার ফোর্সের কোন ডাইভ বম্বারকেও ঐ এক টারগেটেই যাইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের পিছনে আসে। আমরা বম্বিং করিয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবার পর, তাহারা যাইয়া সেই আগুনের উপরে বোমা ফেলিয়া আসে।

এইরূপ সময় গ্রুপ হেড্‌কোয়ার্টার হইতে কয়েকজন ইংরেজ এয়ারমেন আমাদের স্কোয়াড্রনে পোষ্টিং লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন গোলাগুলি, বোমা বিষয়ে ওস্তাদ অর্থাৎ আর্ম্মামেন্ট স্পেশালিষ্ট। (ওয়ারান্ট অফিসার টনি)। তাঁহাকে আমাদের আর্ম্মামেন্ট ওয়ারান্ট অফিসারের সহকারী করা হইল (ওয়ারান্ট অফিসার দাসগুপ্ত)।

তিনি আমাদের উড়োজাহাজগুলিতে কাজ করার কিছুদিন পরে পরামর্শ দিলেন যে উড়োজাহাজগুলিতে কিছু নূতন ধরণের যন্ত্র লাগাইলে ভাল—যাহাতে ডাইভ করার সময় উড়োজাহাজ হইতে বিকট আওয়াজ হয়। তিনি বলিলেন জার্ম্মানদের ইুকা ডাইভ বম্বার ডাইভ করার সময় ভীষণ বিকট আওয়াজ (Screeching in high pitch) করে। সেই আওয়াজে সাধারণলোকেরা অত্যন্ত ভয় পায়—এমন কি উড়োজাহাজ ধ্বংসকারী সৈনারাও (anti-aircraft gunners) বিচলিত হইয়া পড়ে। এমনও শুনা গিয়াছে যে ঐ শব্দে উড়োজাহাজ ধ্বংসকারী সৈনারা ঘাঁটি ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া কমাণ্ডিং অফিসার তাঁহাকেই শব্দকারী নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে বলিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বাঁশের বাতা দিয়া তৈয়ারী শব্দকারী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। হাওয়ার ভিতর দিয়া বেগে ঐ যন্ত্র লইয়া গেলে ভীষণ শোঁ শোঁ আওয়াজ বাহির হয়।

তখন সেই যন্ত্র একখানা উড়োজাহাজে লাগাইবার জন্য তাঁহাকে বলা হইল। এবং ধানক্ষেতের এয়ারড্রোমে তাঁহাকে রাত্রে পাঠান হইল। সেইদিন রাত্রের কাজ তাড়াতাড়ি হইয়া যাওয়াতে তিনি এবং আর দুই একজন এয়ারমেন মেকানিক ছাড়া আর সকলেই পাহাড়ের উপরে ক্যাম্পে (Camp) ফিরিয়া আসিলেন। পদাতিক সৈনারা এবং গ্রাউণ্ড গানাররা যেমন পাহারায় থাকে সেইরূপ রহিল।

যে উড়োজাহাজে তিনি শব্দকারী বাঁশের বাতার যন্ত্র লাগাইলেন তাহার সামান্য দূরে অন্য আর একখানা উড়োজাহাজ রাখা ছিল। দ্বিতীয় উড়োজাহাজে দিনের বেলায় অনেক মেরামত করা হয়, এবং কথা ছিল পরের দিন কমাণ্ডিং অফিসার সকালবেলাতেই টেষ্ট ফ্লাইট করিবেন। ৩০ মিনিট টেষ্ট ফ্লাইট করার কথা। আর ৩০ মিনিট ফ্লাইট হইলে এঞ্জিন প্রায় ৪০ হইতে ৪৫ মিনিট চালু থাকে।

পরের দিন সকাল বেলায় প্রথম টারগেট কঠিন হওয়াতে কমাণ্ডিং অফিসার নিজেই ফ্লাইট লীড করিলেন, এবং একজন ফ্লাইং অফিসারকে (ফ্লাঃ অঃ ডি-সুজা) টেষ্ট ফ্লাইট করিবার জন্য বলিয়া গেলেন।

অপারেশনাল ফ্লাইট চলিয়া গেলে পর, প্রায় সকাল ৮টা নাগাদ ফ্লাইং অফিসার উড়োজাহাজ টেষ্ট ফ্লাইট করিবার জন্য এঞ্জিন চালু করিলেন। সঙ্গে একজন এয়ারম্যান গানার ফ্লাইটে গেলেন। আধঘন্টা আকাশে ফ্লাইটের পরিবর্ত্তে ফ্লাইং অফিসার মোটে বাইশ মিনিট টেষ্ট ফ্লাইট করিলেন, এবং উড়োজাহাজ বোডে (bay) আনিয়া এঞ্জিন বন্ধ করিয়া নামিয়া আসিবার পর, উড়োজাহাজে কোন ত্রুটি নাই বলিবার জন্য ফ্লাইট অফিসে এঞ্জিনীয়ারকে বলিতে চলিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ভীষণ শব্দ করিয়া ঐ উড়োজাহাজের এঞ্জিনের এবং পিছনের দিকের সবস্ত ঢাকনা (cowling) উড়িয়া গেল; ককপিট (অর্থাৎ পাইলট যেখানে বসিয়া উড়োজাহাজ চালান) হইতেও কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সাথে সাথে বারুদ-পোড়া গন্ধ ও ধোঁয়া পাওয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ দুইজন সিনিয়ার ফ্লাইট সারজেন্ট, সারজেন্ট চিরঞ্জীব ও ভাদুড়ী, আমাদের স্কোয়াড্রনেরই, উড়োজাহাজের কি হইল অনুসন্ধান করিতে গেলেন। যেখানে এঞ্জিনের পিছনে বিস্ফোরণ হইয়াছে সেখানে তাঁহারা কয়েক টুকরা তামার পাত পাইলেন। আর উড়োজাহাজের ব্যাটারীর সাথে লাগান সরু তার সামান্য কিছু পাইলেন। এগুলি ছাড়া আর কিছু তাহারা পাইলেন না। বোঝা গেল এই যে তামার টুকরোগুলি একটা সময়-বোমার টুকরা অংশ (Time bomb)। সময়-বোমাটা এমন তৈয়ারী যে ব্যাটারী সুইচ চালু (on) করিবার তিরিশ মিনিটের মধ্যে ফাটিবে, এবং উড়োজাহাজের এঞ্জিন চালু করিতে হইলে ব্যাটারী সুইচ চালু করিতেই হইবে। এ কথাও বোঝা গেল—যিনি লাগাইয়াছেন তাঁহার এই প্রকার বোমা ও তাহা লাগাইবার প্রণালীর সম্যক জ্ঞান আছে। এবং শুধু তাহাই নয়—ঐ উড়োজাহাজ কমাণ্ডিং অফিসারের নিজেই টেষ্ট ফ্লাইট করিবার কথা—এবং তিনি টেষ্ট ফ্লাইট করিলে প্রধানত তিরিশ মিনিট অন্ততঃ আকাশে থাকিতেন। তখন সময়-বোমা ফাটিত এবং উড়োজাহাজ নির্ঘাৎ পড়িত (crash)। উড়োজাহাজ আকাশ হইতে পড়িলে পাইলটের অবস্থা কি হয় সকলেরই জানা আছে। বেশীর ভাগ সময় পড়ার পর উড়োজাহাজে আগুন লাগে—তাহার পর সময়-বোমার কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত কিনা খুবই সন্দেহজনক। সম্পূর্ণ দোষ ভারতীয়দের দেওয়া হইত—বলা হইত তাহাদের উড়োজাহাজের কলকব্জা ঠিকমত মেরামত করিবার জ্ঞান ও নাইই অধিকন্তু কলকব্জা মেরামত করিবার হাতও (technical ability) নাই। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত আমাদের স্কোয়াড্রন সবগুলিতেই কিছু কিছু বয়ান এয়ার ফোর্সের এয়ারমেনরা আসিয়া কর্ত্তা হইয়া বসিত।

যাহা হউক ফ্লাইট হইতে ফিরিয়া মাত্র ঐ দুইজন সিনিয়ার ফ্লাইট সারজেন্টএর একজন গিয়া কমাণ্ডিং অফিসারের সাথে দেখা করিলেন এবং এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ দিলেন ও তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলও জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তামার পাতের টুকরা ও তারের টুকরাগুলিও তাঁহারা কমাণ্ডিং অফিসারকে দিলেন। আধ ঘন্টার মধ্যেই কমাণ্ডিং অফিসার একখানা ছোট উড়োজাহাজ লইয়া গ্রুপ হেড্ কোয়ার্টারে গেলেন। স্কোয়াড্রনের অন্য কেহ

আর কিছু জানিল না—শুধু জানিল একটি উড়োজাহাজে বিস্ফোরণ হইয়াছে এবং তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে।

সেই দিন বৈকালে গোরা গোলাগুলি-বোমা-বিশারদ ওয়ারান্ট অফিসার চনি আমাদের আর্মামেন্ট ওয়ারান্ট অফিসারকে বলিলেন তাঁহাকে যেন সেইদিন বৈকালে বোমা ও গোলাগুলি উড়োজাহাজে লাগাইবার কাজ দেওয়া হয়। সেই অনুরোধ অনুযায়ী আমাদের আর্মামেন্ট ওয়ারান্ট অফিসার এয়ারমেন বহাল (detailed) করিলেন। আঠারজন এয়ারমেন, একজন কর্পোরাল ও সেই সাথে গোরা ওয়ারান্ট অফিসারটি রহিলেন যাহাতে যে-উড়োজাহাজগুলি সকাল বেলা প্রথমে বম্বিং করিতে যাইবে সেইগুলিতে গোলাগুলি ও বোমা ঠিকমত লাগান হয়।

প্রত্যেক উড়োজাহাজের পেটের খোলের মধ্যে দুইটা করিয়া পাঁচশত পাউণ্ডের হাই এক্সপ্লোসিভ্ বোমা রাখা হয়। প্রত্যেক দিনের নিয়ম হইল বারটা উড়োজাহাজের জন্য ২৪টা বোমা বারটা বম্বট্রলির উপর পাশাপাশি করিয়া রাখিয়া ট্রাক্টর দিয়া টানিয়া উড়ো-জাহাজের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। প্রথমে এয়ারমেনরা ও পরে কর্পোরাল প্রত্যেক বোমা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। পরে প্রত্যেক উড়োজাহাজে দুইটা করিয়া বোমা ঝুলান হয়। তাহার পর ওয়ারান্ট অফিসার বোমাগুলি ঝুলান অবস্থাতেই পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং প্রত্যেক বোমাতে ফিউজ ঠিক নিজে লাগান। ফিউজ ঠিক না থাকিলে কোন বোমা পড়িয়া গেলেও বিস্ফোরণ হইবে না। এ ছাড়া প্রত্যেক ফিউজ টিকে একটা করিয়া পিন সামনে লাগান থাকে। এই পিন লাগান থাকিলে ফিউজ টিকও ফাটিবে না আর তাহা হইলে বোমাও ফাটিবে না। আমাদের প্রথা ছিল রাত্রেই বোমা ও তাহার মধ্যে ফিউজ টিক লাগান কিন্তু পিন না বাহির করা অর্থাৎ বোমাগুলি সেফ (safe) রাখা। সকাল বেলা ফ্লাইটের জন্য এঞ্জিন চালু করিবার পূর্ব মুহূর্তে এই পিন বাহির করা। এই কাজ গোলাগুলি-বোমা বিভাগের ওয়ারান্ট অফিসার নিজে অথবা তাঁহার প্রেরিত কোন সারজেন্ট করিত।

কিন্তু এই দিন গোরা ওয়ারেন্ট অফিসার ট্রলির উপর রাখা অবস্থাতেই বোমাগুলিতে ফিউজ টিকগুলি লাগান। শুধু তাহাই নয় তিনি ফিউজ টিকগুলি হইতে পিনও বাহির করিয়া ফেলেন। কর্পোরাল তাঁহার এই কাজে বাধা দেওয়াতে তিনি কর্পোরালকে বকিয়া দিলেন। অন্যান্য এয়ারমেনরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে—কেননা যদি কোনরূপে এখন একটা বোমার ফিউজ টিকে একটু আঘাতও লাগে তবে মুহূর্ত মধ্যে সবগুলি বোমাই ফাটিয়া যাইবে এবং বার হাজার পাউণ্ডের বিস্ফোরণ ভীষণ হইবে। এ সত্ত্বেও একজন এয়ারমেন ঠিক ওয়ারান্ট অফিসারের একটু পিছনে কাজ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

এই সময় দেখা গেল আমাদের কমাণ্ডিং অফিসারের ছোট উড়োজাহাজ গ্রুপ হেড-কোয়ার্টার হইতে ফিরিয়া নামিয়া আসিতেছে ও তাঁহার পিছনে আরও দুইটা বড় জাহাজ নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

কমাণ্ডিং অফিসারের নামিবার পূর্ব মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইল। এবং দেখা গেল বম্বটুলি ও তাহার নিকট যতগুলি এয়ারমেন ছিল তাহার কিছুই আর নাই। সকলে দৌড়াইয়া নিকটে যাইয়া দেখিতে পাইল বোমাগুলি সব ফাটিয়া গিয়াছে এবং এয়ারমেন সকলে শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। শুধু যেখানে বম্বটুলিগুলি ছিল, সেখানে একটা গভীর গর্ত্ত ধূলা-মাটিতে ভর্ত্তি হইয়া আছে। ধূলামাটির মধ্যে একটা হাত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হাত ধরিয়া টানিতে একটা গোটা এয়ারমেন সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে বাহির হইয়া আসিল। খোঁজাখুঁজিতে শুধু মানুষের কয়েক টুকরা ছাড়া অন্যদের আর কিছুই পাওয়া গেলনা। সংজ্ঞা পাওয়ার পর এয়ারম্যান বলিল যে গোরা ওয়ারেন্ট অফিসার কমাণ্ডিং অফিসারের উড়োজাহাজ দেখা মাত্র হাতুড়ি দিয়া ফিউজ টিকে আঘাত করে—তাহার পর সে আর কিছু জানে না।

পরে অনেক অনুসন্ধান হইল কিন্তু সঠিক কারণ, কেন গোরা ওয়ারেন্ট অফিসার এইরূপ কাণ্ড করিলেন, পরিষ্কার বোঝা গেল না। একটা ভাল ফল হইল যে যুদ্ধের সঙ্কটসময় পার না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দেশী সবগুলি স্কোয়াড্রন হইতে গোরা এয়ারমেন সরাইয়া দেওয়া হইল।

বহুদিন পরে গ্রুপ হেডকোয়ার্টারে একজন অফিসারের নিকট জানা যায় যে ঐ গোরার বিলাতি কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে এক সময় সংযোগ ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যধন্য মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
বিদ্যারত্ন বি, ই, এম্, আর, এস,-এর কয়েকখানি অনবদ্য গ্রন্থ :

The Swami Vivekananda—A study Rs. 3.00

বিবেকানন্দ—জীবন ও জিজ্ঞাসা ১.৫০
স্বামীজীর জীবন ও দর্শনের এমন বলিষ্ঠ নির্ভীক পর্য্যালোচনা বিরল।

উড়িষ্যার দেবদেউল ৫.৫০
উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর আলোচনা,
পাশ্চাত্য ও ভারতীয় স্থাপত্যরীতির তুলনামূলক বিচার।

বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর
ভারতীয় জীবনধারায় ইংরেজী ভাষার অনুপ্রবেশের প্রামাণ্য ইতিহাস।

কন্‌টেম্‌পোরারি পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
প্রধান কার্য্যালয় :—১২ নেতাজী সুভাষ রোড,
ক লি কা তা—১

Ascending Evolution

"There is an ascending evolution in nature which goes from the stone to the plant, from the plant to the animal, from the animal to man. Because man is, for the moment, the last rung at the summit of the ascending evolution, he considers himself as the final stage in this ascension and believes there can be nothing on earth superior to him. In that he is mistaken. In his physical nature he is yet almost wholly an animal, a thinking and speaking animal, but still an animal in his material habits and instincts. Undoubtedly, nature cannot be satisfied with such an imperfect result; she endeavours to bring out a being who will be to man what man is to the animal, a being who will remain a man in its external form, and yet whose consciousness will rise far above the mental and its slavery to ignorance."

— THE MOTHER —

***

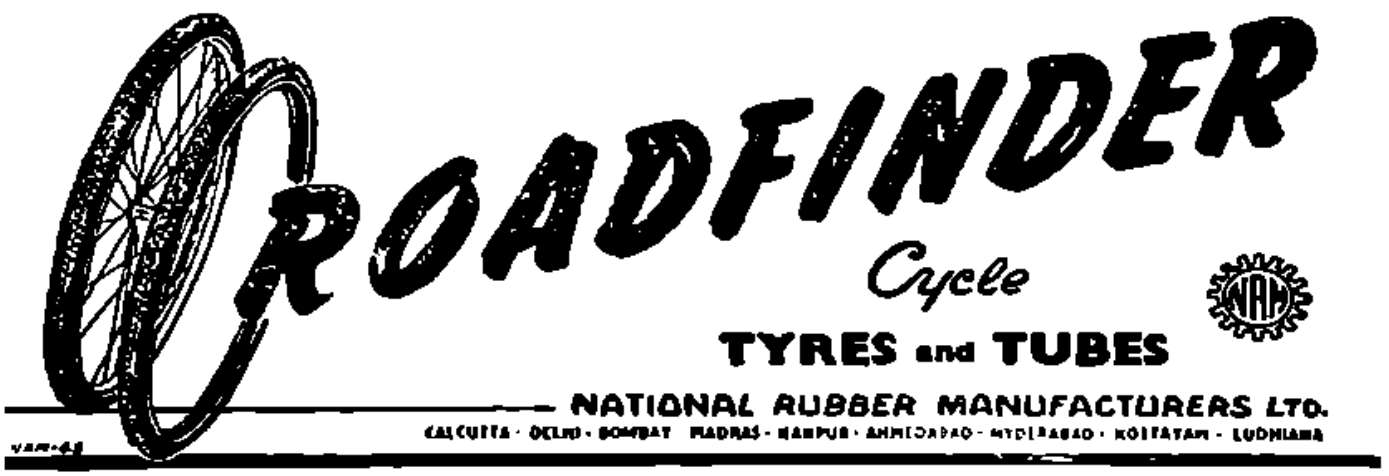

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

Only a change of consciousness and the conquest over falsehood can change the conditions of the world.

— The Mother

Independence Transport & Shipping Agency,
P. 40, Princep Street,
CALCUTTA-13.

Phone : **23-6503**

Cable : **ITSACINCH**

Nothing great is ever accomplished without endurance.

— The Mother

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

To work for the Divine is to pray with the body.

-The Mother

For all sorts of glasses for Buildings, Furniture and Cars, please send your enquiry to :—

B. K. SHAW & CO.,

P - 20, Radha Bazar Street,
CALCUTTA - 1

Cable : BIKEGLAS

Phone : 22-5613

Telegrams: 'Vessel' Cal
Codes: Scotts 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones: Office : 23-1393, Dock Office:
Residence: 55-6464, 55-3724, 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS

3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

DESIGNED

The Kuljian Corporation of India is a service organisation specialising in consulting engineering. ■ In its fully-equipped office in Calcutta, the Corporation has assembled a well-knit team of about a hundred trained Indian and American construction engineers and draughtsmen all qualified by experience in project construction. ■ Backed by the experience of a decade in power engineering in India and proud of the tradition of its American collaborators whose famous name it bears, the Corporation welcomes exacting assignments of all types, in any part of India, any time. ■ From feasibility report to initial operation is the scope of Kuljian service; from power plants to all-type public works is the range of Kuljian operation.

IRVEY
'PORT
:SIGN
IGINEERING
OCUREMENT
)NSTRUCTION
'SPECTION
ITIAL OPERATION

The **Kuljian** *Corporation*
(INDIA) PVT. LTD.

ENGINEERS · CONSTRUCTORS
24-B, Park Street, Calcutta 16

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

FOR SERVICE

For your Electrical Services

CONSULT

FARADAY ELECTRICALS

79, DHARAMTALA STREET

Show Room: 9, Lower Circular Road
CALCUTTA—16.
PHONE—24-2012.

Troubled by insects ? ?

If so, please do not hesitate to make use of our
up-to-date scientific and efficient servicing arrangements
by specially trained staff for completely
disinfecting your premises with :

I.C.I.'s "GAMMEXANE" FORMULATIONS

Eastern Insecticide & General Merchandise Pr. Ltd.
(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)
4, Lyons Range
CALCUTTA-1

PHONE : 47-2H0963

FAMOUS GROCER AND SPICES DEALER
OF
SOUTH CALCUTTA

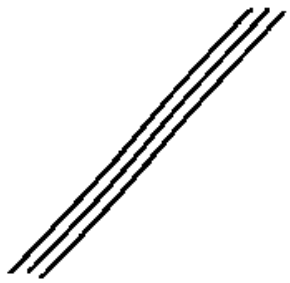

ASWINI KUMAR NANDI & SONS

JADU BABU'S BAZAR
BHOWANIPORE
CALCUTTA - 25

PHONE : 34-2665 GRAM : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

Jealousy is a deadly poison that is fatal to the soul.

— The Mother

NATIONAL GENERAL TRADING

19, STRAND ROAD

CALCUTTA-1.

GRAM: DONWEL

PHONE: 22-3577
35-3314

Everything is not for the best so long as you are in the ordinary consciousness.

—The Mother

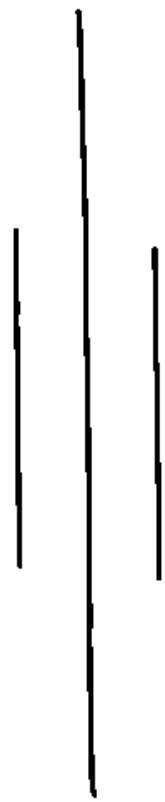

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

The merely sceptical mind loses itself in the void.

— Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

The thoughts of the Divine are like white doves of peace and sweetness.

— The Mother

With compliments from:-

Tata Scob Dealers (Controlled Stock) Cal. Ltd.,

20, Strand Road,

CALCUTTA-1.

Telephone : **22-1101-1107** *Telegram :* **TASCOB**

"Love in her was wider than the universe,
The whole world could take refuge in her single heart."

Sri Aurobindo

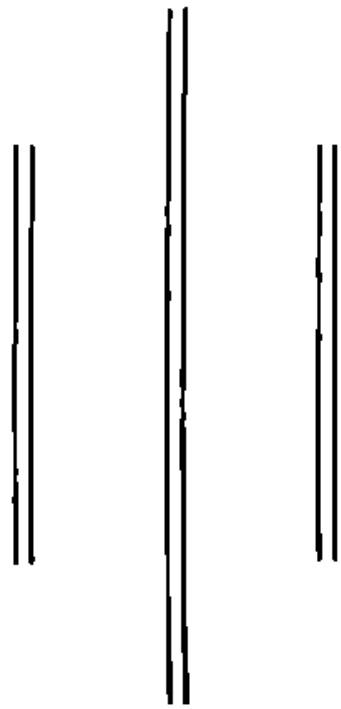

BENGAL IMMUNITY

COMPANY LIMITED

CALCUTTA-13

সরিষার তৈল

১/২, ১, ২, ৪ ও ১৬৷৷০ কে. জি. টিন এবং ৪০ কে. জি. ও ২০ কে. জি. সীল করা ড্রামে পাওয়া যায়।

গণেশ
সরিষার তৈল

প্রাগ অয়েল মিল্স · আলীগড়।

What is the duty of every Indian today
in the present emergency ?

Overgrow your small egoistic personality and become a worthy child of our Mother India, fulfil your duties with honesty and rectitude, and always keep cheerful and confident with a steady trust on the Divine's Grace.

বর্তমান সংকটে আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য কি ?

"তোমার সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে যাও এবং আমাদের ভারতমাতার যোগ্য সন্তান হয়ে ওঠো, নিজের কর্তব্য করে যাও সততা এবং অব্যভিচারিতার সঙ্গে, আর ভগবানের করুণার উপরে অবিচল নির্ভরতা রেখে সর্বদা প্রফুল্ল এবং প্রত্যয়শীল হও।"

—শ্রীমা